(দ্বি-বার্ষিক স্নাতক পর্যায়)

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন

অধ্যাপক - সুশীল রায়

কলিকাতা, বর্ধমান, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান দ্বি-বার্ষিক শিক্ষা বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়সমূহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন

[PRINCIPLE OF EDUCATION]

● দ্বিবার্ষিক স্নাতকোত্তর পর্যায় ●

[পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ]

অধ্যাপক সুশীল রায়, এম. এস. সি , বি টি

আনন্দচন্দ্র শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয, জলপাইগুড়ি।

সোমা বুক এজেন্সী ৪২/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সোমা বুক এজেন্সীর পক্ষে
৪২/১, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পাঞ্চালী রায়

।। আর্থিক মূল্য ঃ বত্রিশ টাকা মাত্র ।।

মুদ্রাকর ঃ
১। দক্ষিণেশ্বরী প্রেস
কলিকাতা-৬
২। নব গৌরাঙ্গ প্রেস
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

॥ চতুর্থ সংস্করণ ॥

বর্তমান পর্যায়ের 'শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন' গতানুগতিক পুনর্মুদ্রণ নয়। ইতিমধ্যে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর আমূল পরিবর্তন করা হ'য়েছে। ফলে, পূর্ব স্তরের জ্ঞানের সংগে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার প্রয়োজনে বর্তমান সংস্করণে শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শনের বিষয়বস্তুসমূহের উপস্থাপনে কিছু পরিবর্তন ঘটানো হ'য়েছে। তাছাড়া, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুটি স্তরের পাঠ্যসূচীর মধ্যে সংযোগের যে অভাব অনুভব করা গেছে, সেগুলি পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে নতুন আলোচনার অবতারণা করা হ'য়েছে। সব মিলিয়ে বর্তমান পর্যায়ের 'শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শ'কে একটি বিচ্ছিন্ন পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচনা করলে ভুল করা হবে। বরং উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা-বিজ্ঞানের সম্প্রসারিত একটি অংশ হিসেবে একে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে। তাই শিক্ষার্থীদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন বিষয়বস্তুর আলোচনাগুলিকে পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার করেন। বইটির উন্নতির সংস্কারের জন্য অধ্যাপকমণ্ডলীর সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

সুশীল রায়

॥ প্রথম সংস্করণ ॥

শিক্ষাদর্শনকে বাদ দিয়ে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা খুবই মুশকিল। কিন্তু শিক্ষা-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর পুনর্বিন্যাসের ফলে 'শিক্ষাদর্শনের আলোচনা' স্নাতক স্তরে শিক্ষা-বিজ্ঞান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এতে শিক্ষাতত্ত্বের মৌলিকত্ব অনেকাংশে ব্যাহত হবে।

পাঠ্য বিষয়কে তাৎপর্যপূর্ণ ক'রে তোলার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষানীতির দার্শনিক পটভূমির উল্লেখ সর্বত্র করা হয়েছে। ফলে, আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত কিছু বিষয় এসে গেছে। তবে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে কোথাও ইচ্ছাকৃতভাবে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়নি।

এই বই সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলার নেই, স্নাতক স্তরের পাঠ্যসূচীর তাৎপর্য এখানে সার্থকভাবে তুলে ধরতে পেরেছি, এ দাবী করি না। এ সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ আছে। সহকর্মী সকলের সহযোগিতা পেলে কৃতজ্ঞ থাকব।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীরা কোন অসুবিধা বোধ করলে, তাও দূর করার অঙ্গীকারবদ্ধ থাকছি।

সুশীল রায়

পুনশ্চ ঃ

'শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শনে'র (স্নাতক স্তর) **দ্বিতীয় সংস্করণ** এত তাড়াতাড়ি প্রকাশে যে সব অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষার্থিগণ সহায়তা করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। ব্যক্তিগত 'ভালোলাগা' তাঁরা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করেছেন বইটিকে গ্রহণ ক'রে। তাই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ইতিমধ্যে আরও কিছু ভাবনা এসেছে। তার সব কিছু এই সংস্করণে সংযোজিত হ'য়েছে, এ দাবী করছি না। কারণ, সময়ের সঙ্গে তাল দেওয়া যাচ্ছে না। তবুও কিছু অংশে পরিবর্তন ঘটিয়েছি। স্নাতক স্তরে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি সাধারণ বিবৃতি আমার কাছে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হ'য়েছে, জাতীয় শিক্ষা-নীতির পটভূমিতে। তাই তিনটি নতুন অধ্যায় এই সংস্করণে স্থান পেয়েছে **"সামাজিক অভিযোজনের জন্য শিক্ষা", "প্রক্ষোভিক অভিযোজনের জন্য শিক্ষা"** এবং **"উৎপাদনশীলতার জন্য শিক্ষা"**। এছাড়া, প্রতি অধ্যায়ের শেষে একটি **'সারসংক্ষেপ'** দেওয়া হ'য়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে। স্নাতক স্তরের পাঠ্যসূচীর কথা বিবেচনা ক'রে অন্যান্য অংশের কিছু পরিবর্তন করা হ'য়েছে।

সহযোগিতা পেলে ভবিষ্যতে সকলেরই চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারব, আশা রাখি।

সুশীল রায়

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বর্তমানে প্রশ্নপত্র রচনার ধারায় কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হ'য়েছে। তাই **তৃতীয় সংস্করণে** একটি অতিরিক্ত অংশ সংযোজিত হ'ল। এই অংশে সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছে। স্মরণ রাখার দরকার, এখানে প্রদত্ত প্রশ্নগুলি নমুনামাত্র। এর মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীরা পাঠ অনুশীলনের রীতি নির্ধারণ করতে পারবে, আশা রাখি। অন্যান্য পরিবর্তন মামুলি। নিবেদন ইতি—

সুশীল রায়

সূচীপত্র

॥ প্রথম পর্ব ॥

।। দ্বিতীয় পর্ব ।।

প্রথম পর্ব

শিক্ষা-বিজ্ঞান (Science of Education) আধুনিক-কালে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে একটি নতুন এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংযোজন। শিক্ষা-বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমাদের সর্বপ্রথম তার মৌল তথ্য ও তত্ত্বগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে এই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

●

শিক্ষা-বিজ্ঞান পরিচিতি

●

শিক্ষা কি? শিক্ষা শব্দের অর্থ কি? শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য কি? তার প্রয়োজনীয়তাই বা কোথায়? এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হ'য়েছে প্রথম অধ্যায়ে। * * *

* * * দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষার কার্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষা কিভাবে ব্যক্তি ও সমাজের সেবা করে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। * * শিক্ষার উপাদানগুলি কি কি, সে সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। এইসব উপাদানগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র পৃথকভাবে করা হবে।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের দার্শনিক পটভূমি

শিক্ষা-বিজ্ঞান বর্তমানে বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও তা মানবীয় বিজ্ঞান। যে কোন বিজ্ঞানের শাখা, বা মানব-কল্যাণে নিয়োজিত, তার পটভূমিতে একটি জীবন-দর্শন ও সমাজ-দর্শন কাজ করে। আলোচ্য কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা শিক্ষা-বিজ্ঞানের এই দার্শনিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করব। বিস্তারিত দার্শনিক আলোচনার সুযোগ পরবর্তী পর্যায়ে আরও আসবে।

শিক্ষার লক্ষ্য

যে কোন সচেতন প্রচেষ্টার একটা উদ্দেশ্য থাকে। শিক্ষাও সচেতন প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার উদ্দেশ্য বহু ও উদ্দেশ্য-স্থাপনের ইতিহাসও খুব দীর্ঘ, দার্শনিক তত্ত্বের দ্বন্দ্বে ভরপুর। চতুর্থ অধ্যায়ে এই সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করা হ'য়েছে। এই আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষার একটি গ্রহণযোগ্য লক্ষ্য স্থাপনের চেষ্টা করা হ'য়েছে। * *

শিক্ষা ও সমাজ

শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে শুধু নয়, অন্যান্য দিকেও তার উপর সমাজের প্রভাব অত্যধিক। শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক প্রক্রিয়ার যথেষ্ট মিল আছে এবং সামাজিক বিবর্তনে তা চিরদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'শিক্ষা ও সমাজ' শীর্ষক অধ্যায়ে শিক্ষা ও সমাজের এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। * *

প্রথম অধ্যায় | শিক্ষার অর্থ ও তাৎপর্য

Meaning and Concept of Education

মানুষ হিসাবে আমরা নিজেদের প্রাণিকুলে সর্বোচ্চস্তরের জীব হিসাবে বিবেচনা করি। অভিব্যক্তির স্তরে যতই উন্নত হই না কেন, জৈবনিক শক্তির মূল ধর্মগুলি আমাদের মধ্যে সতত ক্রিয়াশীল। তাই সাধারণ জৈবিক চাহিদাগুলিকে অস্বীকার করে পরিপূর্ণ মানুষকে বিচার করা যায় না। কিন্তু এই সব জৈবিক চাহিদা (Organic need) মানুষের ক্ষেত্রে স্থূল নয়। মানব সমাজ দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় স্থূল প্রাণীর চাহিদাগুলিকে পরিমার্জিত রূপদান করেছে। ইতর প্রাণীর ক্ষুধা (Hunger), যৌনতা (Sexuality) ইত্যাদির মত জৈবিক চাহিদার প্রকাশ যতটা স্থূল এবং অশিক্ষিত, মানুষের ততটা নয়। জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য জৈবিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি একান্তভাবে প্রয়োজন। কিন্তু এই জৈবিক চাহিদার পরিতৃপ্তির কৌশলগুলিকে কেবল মানুষই তার উন্নত চিন্তা ও ধীশক্তির প্রয়োগে শিল্পের (Art) স্তরে উন্নীত করতে পারে। স্বভাবজ জৈবনিক শক্তির প্রকাশ তার কাছে কাম্য নয়। মানুষের এই ইচ্ছা তাকে সামাজিক ও সংস্কৃতিবান করে তুলেছে। আধুনিক কালে অনেক চিন্তাবিদ্ মনে করেন, জীবনের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য যেমন সকল রকম জৈবিক চাহিদার পরিতৃপ্তি প্রয়োজন, তেমনি সমাজে সুস্থভাবে বসবাস করতে হলে মানুষের সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি মনুষ্য-সমাজে অর্জিত, সেহেতু সেগুলি শিক্ষা (Education) বা প্রশিক্ষণ (Training) সাপেক্ষ। তাই এই সকল চিন্তাবিদ্‌গণ মনে করেন, একমাত্র **শিক্ষাই** (Education) মানুষের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মেটাতে পারে। যেমন—গোয়েটিং বলেছেন, **জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি যেমন মানুষের জৈব সত্তা রক্ষার্থে প্রয়োজন, শিক্ষাও তেমনি তার সামাজিক সত্তা বজায় রাখার জন্য একান্তই প্রয়োজন** (**Just as there are certain vital processes of life in a biological sense, so education may be** considered as a vital process in a social sense.)। তবে শিক্ষা যে কেবলমাত্র সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজন তাই নয়, ব্যক্তিজীবনের দিক থেকেও প্রয়োজন। তাই শিক্ষা ব্যক্তিগত দিক থেকে এবং সামাজিক দিক থেকে মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, শিক্ষার ইতিহাসও তাই মানব সভ্যতার ইতিহাসের সমকালীন। শিক্ষার এই তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব।

প্রস্তাবনা

॥ শিক্ষা কি ? ॥
(What is Education ?)

শিক্ষা-বিজ্ঞানের (Science of Education) বিষয়বস্তু হ'ল **'শিক্ষা'**। আধুনিক কালের শিক্ষা-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হলেও আজও শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনাকারীদের

কাছে বড় প্রশ্ন হল—**শিক্ষা কি?** সাধারণভাবে 'শিক্ষা' শব্দটি আমরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি এবং তার দ্বারা কি বোঝাতে চাই তার সম্বন্ধে সচেতন; তবুও তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য সহজভাবে প্রকাশ করতে আমাদের অসুবিধে হয়। 'শিক্ষা' কথাটির দ্বারা আমরা এমন একটা কিছু বোঝাতে চাই, যা সত্যিই বিমূর্ত (abstract)। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্, চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিক এই কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছেন বিভিন্ন যুগে। তাঁদের আলোচনার ধারা বিশ্লেষণ করলে মতবিরোধই লক্ষ্য করি; একক কোন অর্থ বা তাৎপর্য তার থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে একটা সংলক্ষণ তাদের আলোচনা থেকে বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, 'শিক্ষা' শব্দটি যদিও বিমূর্ত, তবু সেটি একটি গতীয় (dynamic) ধারণা। সমাজ-ব্যবস্থার আদিম যুগ থেকে এই ধারণা মানুষের সহগ। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে, সমাজের প্রকৃতি অনুযায়ী এই ধারণারও বিবর্তন হয়েছে পরিবর্ধন ও পরিবর্জনের মধ্য দিয়ে। তাই বিভিন্ন যুগের মনীষীদের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা যে পার্থক্য দেখতে পাই, তা তাঁদের জীবনাদর্শের প্রভেদ বা সমকালীন সমাজ-জীবনের প্রতিফলনের পার্থক্য ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিবর্তনের ধারা আজও থেমে যায়নি; সমাজ অবিচ্ছিন্ন গতিতে, অচিহ্নিত দিকে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। মানুষের সমাজ যখন গতিধর্মী, তখন শিক্ষাকেও গতীয় ধর্মসম্পন্ন করতে হবে; আদিম যুগের শিক্ষা মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল, কিন্তু সেই শিক্ষার ধারণা দিয়ে বিংশ শতাব্দীর জটিল জীবনপরিস্থিতি-উদ্ভূত জটিলতর চাহিদার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা সম্বন্ধে মূল কথা হ'ল—**শিক্ষা সতত পরিবর্তনশীল সমাজে সতত বিকাশমান মানুষের চাহিদা মেটাচ্ছে।** কিন্তু শিক্ষা-সম্পর্কিত এই ধারণাই শিক্ষা-বিজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি না। কারণ, শিক্ষা-বিজ্ঞানের শুরুতেই এই ধরনের ব্যাপক ধারণা (Broad concept) তার বিষয়বস্তুকে আমাদের কাছে আরও জটিল ক'রে তুলবে। তাই আমাদের 'শিক্ষা' শব্দের আরও বিশিষ্ট (Specific) অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয় করতে হবে।

শিক্ষার পরিবর্তনশীল তাৎপর্য

॥ 'শিক্ষা' শব্দের ব্যুৎপত্তি ॥
(Origin of the term 'Education')

'শিক্ষা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায়, 'শিক্ষা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'শাস্' ধাতু থেকে। এর অর্থ হল—শাসন করা, শৃঙ্খলিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা, শিক্ষা দেওয়া বা নির্দেশনা দেওয়া। অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় আমরা যে শিক্ষা কথাটা ব্যবহার করি, তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে শিক্ষা-কৌশলকে বোঝায়। আবার অনেক সময় আমরা এর সমার্থক শব্দও ব্যবহার করি, যেমন—'বিদ্যা' গ্রহণ বা আহরণ। এই বিদ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটিও সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হল 'জানা' বা 'জ্ঞান আহরণ করা'।

এখানেও ঐ জ্ঞান-আহরণের ক্রিয়া বা কৌশলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার, ইংরেজী (Education) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজতে গিয়ে ভাষাবিদ্‌রা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এইসব বিশ্লেষণের মধ্যে কোনটি যে ভুল, তা নয়। তবে তাৎপর্যের তফাৎ আছে তাদের মধ্যে। এক মতবাদ অনুযায়ী Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে। Educare কথার অর্থ হ'ল প্রতিপালন করা বা পরিচর্যা করা (To bring up or to nourish)। অর্থাৎ, এই অর্থে বিচার করলে শিক্ষা হ'ল শিশু বা অপরিণত ব্যক্তিকে যথাযোগ্য যত্নের মাধ্যমে জীবনপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পন্থা বা তাকে জীবনোপযোগী কৌশল ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। অপর এক মতবাদ অনুযায়ী Education কথার ব্যুৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে, যার অর্থ হল নিষ্কাশন করা বা নির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া (To draw out or to lead out)। তৃতীয় মত হ'ল—এই শব্দ মূলে ল্যাটিন শব্দ Educatum থেকে এসেছে, যার অর্থ হল শিক্ষাদানের কাজ (teaching)। পূর্বেই বলেছি, ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণের দিক্ থেকে প্রত্যেকটি অর্থের সম্ভাবনা আছে। তবে তার তাৎপর্যগত দিক্ যুগের চাহিদার দিক্ থেকে বিবেচনা করতে হবে।

শিক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ

॥ শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ ॥

(Narrow meaning of Education)

বাংলার 'শিক্ষা' শব্দ বা ইংরেজীতে Education শব্দের প্রথম ও তৃতীয় অর্থ খুবই সংকীর্ণ। আর এই সংকীর্ণ অর্থে 'শিক্ষা' কথাটাকে আমরা সচরাচর ব্যবহার ক'রে থাকি। শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল কিছু প্রয়োজনীয় কৌশল আয়ত্ত করা বা অপরিপক্ব মনকে প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার চাপে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলা এবং তাই করতে পারলে শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হবে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে, এমন কি এখনও, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল। শিক্ষার প্রচলিত কয়েকটি ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করলে, এই মতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে সুবিধা হবে।

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ

অনেকে মনে করেন—"**জ্ঞান আহরণ করাই শিক্ষা**" (Education is acquisition of knowledge)। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে, এই অর্থের মধ্যে ভ্রান্তি কোথায়। কারণ যে কোন শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যক্তি কিছু-না-কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কিন্তু এই মতবাদের সমর্থকরা উদার দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে এই ধারণা গঠন করেন নি। তাঁদের মত—শিশু মন একটি শূন্য পাত্রের মত। আমরা যেমন শূন্য পাত্রকে কলের নীচে বসিয়ে তাকে ধীরে ধীরে জলপূর্ণ করি, তেমনি শিশু-মনের শূন্যস্থান পূরণের জন্য তার মধ্যে জ্ঞান প্রবেশ করানোর প্রয়োজন। জলেরও যেমন একটি উৎস থাকে, জ্ঞানেরও তেমনি উৎস আছে। এই উৎসগুলি তাঁদের মতে মূলতঃ শিক্ষক (Teacher),

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থের উদাহরণ (১)

পাঠ্যপুস্তক (Text book)। যে প্রক্রিয়ায় **জ্ঞান** (knowledge) **উচ্চ স্তর** (Higher level) অর্থাৎ, **শিক্ষক** বা পাঠ্যপুস্তক থেকে **নিম্নবর্তী স্তর** (Lower level) বা, শিক্ষার্থীর মনে প্রবাহিত হয়, তাকেই এই মতবাদ অনুযায়ী 'শিক্ষা' হিসাবে বিবেচনা করা হ'য়েছে। বহুলপ্রচারিত শিক্ষার এই অর্থ বিভিন্ন নামে শিক্ষাতত্ত্বে স্থান পেয়েছে। অনেকে এই মতবাদকে নাম দিয়েছেন—**আহরণ** বা **সঞ্চয়ন** মতবাদ (Theory of accretion)। আবার অনেক শিক্ষা-তাত্ত্বিক, জ্ঞানের বাস্তব মূল্যের কথা বিবেচনা করে তাকে স্বর্ণ কণিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর জ্ঞানরূপ স্বর্ণ কণিকার দ্বারা শিশুমনের শূন্য ঝুলি (Empty sack) পূর্ণ করা হয় বলে, এই মতবাদের আর এক নাম **স্বর্ণ কণিকা ও শূন্য ভাণ্ডার তত্ত্ব** (Gold-sack theory)। যে কোন নামে অভিহিত করাই হোক-না-কেন, এই মতবাদের মূল বক্তব্য হ'ল জ্ঞানই মুখ্য বস্তু এবং তা শিশু মনে যে কোন ভাবে প্রবেশ করানোই হ'ল শিক্ষা।

শিক্ষা-সম্পর্কিত সংকীর্ণ অর্থের ভিত্তিতে শিক্ষা সম্পর্কে আরও এই ধারণা প্রচলিত ছিল। একে বলা হয়, **মানসিক শৃঙ্খলাতত্ত্ব** (Theory of formal discipline)। এই ধারণায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা মনে করেন, শিশুমন একটি জটিল যন্ত্র বিশেষ যার এক-একটি যন্ত্রাংশ হ'ল এক-একটি মানসিক শক্তি (Mental faculty)। শিশুর দেহের সামগ্রিক স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য যেমন উপযুক্ত অঙ্গ-সঞ্চালন প্রয়োজন, তেমনি মানসিক দিক থেকে তার সামগ্রিক উন্নতির জন্য মানসিক শক্তিগুলির চর্চা বা যথাযথ অনুশীলন প্রয়োজন। মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ যে চর্চার দ্বারা সম্ভব, একথা এই মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদরা মেনে নিয়েছেন। এই কাজে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়কে (School subject) কাজে লাগানো যেতে পারে। এক-একটি পাঠ্যবিষয়ের পাঠের মাধ্যমে শিশুর এক-একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা যায়। এই ভাবে বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু অনুশীলনের মাধ্যমে মানসিক ক্ষমতাগুলি বৃদ্ধির প্রয়াসই হ'ল শিক্ষা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই ধারণা অনুযায়ী যান্ত্রিক অনুশীলনই শিক্ষার মূলকথা। এই যান্ত্রিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে শিশু-মনের চাহিদা, যোগ্যতা ইত্যাদি বিবেচ্য বিষয় নয়। তার মনের প্রয়োজন

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থের উদাহরণ (২)

পূর্ব-নির্দিষ্ট এই সংকীর্ণ অর্থে 'শিক্ষা' শব্দকে বিবেচনা করলে, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে। **প্রথমতঃ**, এই জাতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হবে শিক্ষার্থীকে বিদ্যায়তনের শিক্ষালয়ে বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রভাবে রেখে নির্দিষ্ট কতকগুলো পাঠ আয়ত্ত করানো এবং ডিগ্রি-গ্রহণের উপযোগী ক'রে তৈরি করা। **দ্বিতীয়তঃ**, সমাজের অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা বিশেষ কুশলী শিক্ষকদের উপর এই প্রশিক্ষণের (training) দায়িত্ব থাকবে। তাঁরা হবেন জ্ঞানের আধার আর শিশুরা বা অপরিণত শিক্ষার্থীরা হবে নিশ্চেষ্ট গ্রাহক। অর্থাৎ, তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক হবে দাতা এবং গ্রহীতার। অন্য কোন মানবীয় সম্পর্ক (Human-relationship) তাদের মধ্যে গড়ে ওঠার অবকাশ থাকবে না। **তৃতীয়তঃ**, জ্ঞানদান বা গ্রহণের ব্যাপারে শিক্ষার্থীর নিজস্বতার কোন দাম

নেই। সমাজের অভিভাবক শ্রেণীরা যা চাইবেন, তাই তাদের গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব জন্মগত কোন বিশেষ প্রবণতা থাকতে পারে বা কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি অনুরাগ থাকতে পারে, এ সব বিবেচনা করার দরকার নেই। তাই ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ থেকে শিক্ষার এই অর্থ পাওয়া গেলেও বা তার মিল সাধারণ ধারণার মধ্যে পাওয়া গেলেও এটাকে বর্তমান শিক্ষাবিদ্‌গণ সংকীর্ণ (narrow meaning) বলেছেন। কারণ এতে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আর তা না থাকলে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষা তার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকৃত তাৎপর্য হারাবে।

সংকীর্ণ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

॥ শিক্ষার ব্যাপক অর্থ ॥

(Broader meaning of Education)

ইংরেজী Education কথার যে দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, সেই অর্থে বর্তমান শিক্ষাতত্ত্বে 'শিক্ষা' কথাটা ব্যবহার করা হ'ল। এই মতানুযায়ী শিক্ষার অর্থ হ'ল 'নিশ্কাশন করা' বা 'নির্দেশনার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া'। অর্থাৎ শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হ'ল, শিশুর বা শিক্ষার্থীর মধ্যেকার অন্তর্নিহিত শক্তি বা সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা' শিক্ষাব এই ব্যাখ্যা মনোবিদ্যার (Psychology) ও সমাজবিদ্যার (Sociology) বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক মানবশিশু কিছু-না-কিছু সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, তার সেই সম্ভাবনাগুলো পরিপূর্ণভাবে সমাজ-উপযোগী করে বিকাশসাধন করা। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলো যদি পরিপূর্ণভাবে বিকাশলাভের সুযোগ না পায়, তা' হলে ব্যক্তিজীবন হবে পঙ্গু। আর ব্যক্তি যদি তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমাজ-জীবনে নিজেকে নিয়োগ করতে না পারে, তা'হলে সে হবে অসম্পূর্ণ। তাই শিক্ষা হবে তার এই উভয় ধরনের চাহিদার পরিপন্থী। 'শিক্ষা' শব্দকে এই অর্থে বিচার করলে আমাদের দুই ধরনের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। একে তাই আমরা শিক্ষার ব্যাপক অর্থ (Broader meaning) বলতে পারি। শিক্ষার কয়েকটি আধুনিক ধারণা সংক্ষেপে উল্লেখ করলে তার ব্যাপক তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ

জন ডিউই (John Dewey), পেস্তালাৎসী (Pestalozzi), রেমণ্ট (Raymont) প্রভৃতি প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষাকে জীবন-বিকাশের প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করেছেন (Education is development)। এই অর্থে শিক্ষা (Education) জীবন-প্রক্রিয়া থেকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একটি চারাগাছ যেমন সময়ের ব্যবধানে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, মানব শিশুও তেমনি জন্মের পর থেকে বাড়তে থাকে। একে বলা হয় বৃদ্ধি (Growth)। যে বৈশিষ্ট্যগুলি জন্মমুহূর্তে প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান থাকে, তাদের বিস্তারই হ'ল বৃদ্ধি। আবার, যে সব বৈশিষ্ট্যগুলি শিশুর মধ্যে জন্মমুহূর্তে আপাতঃভাবে দৃশ্য নয়, অথচ পরবর্তীকালে পরিস্ফুটিত হয়, তাকে বলা হয় **বিকাশ** (Develop-

শিক্ষার ব্যাপক অর্থের উদাহরণ ( )

ment)। আধুনিক অর্থে শিক্ষা হ'ল শিশুর জীবন বৃদ্ধি এবং বিকাশের প্রক্রিয়া (Education is process of growth and development)। আর এই বিকাশ হ'ল শিশুর জৈব-মানসিক-সামাজিক বিকাশ বা সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। অর্থাৎ, 'শিক্ষা' শব্দের প্রকৃত অর্থ হ'ল শিশুর সর্বাঙ্গীণ জীবন-বিকাশ। এবং সে বিকাশ উর্ধ্বগামী।

অনেক শিক্ষাবিদ্ শিক্ষাকে অভিযোজন-প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করেছেন (Education is adjustment)। শিশুর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য জন্মসূত্রে প্রাপ্ত হলেও তার পরবর্তী জীবনের গতি ও প্রকৃতি অনেকাংশে তার জীবন-পরিবেশ (Environment) দ্বারা নির্ধারিত হয়। মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, পরিবেশের বিভিন্ন চাহিদার সঙ্গে শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদার সংঘাত অনিবার্য। এই দুই শক্তির সংঘাতের উপশমের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-জীবনের উন্নয়নমুখী বিকাশ ঘটে। যে প্রক্রিয়ায় শিশু আত্ম-চাহিদার সঙ্গে পরিবেশের চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান করে, তাকে বলা হয় **অভিযোজন** (Adjustment)। শিশু এই অভিযোজন করতে গিয়ে জীবন-উপযোগী অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অর্থাৎ, যেকোন অভিযোজনমূলক প্রচেষ্টাই শিক্ষার নামান্তর। এই অর্থে শিক্ষা এক ধরনের অভিযোজন-প্রক্রিয়া। এখানে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু মানব শিশুকে পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজন করতে হয়, সেহেতু 'শিক্ষা' একটি জাতীয় (Dynamic process) প্রক্রিয়া। শিক্ষার এই ব্যাখ্যা তাকে ব্যাপক তাৎপর্য দান করেছে।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থের উদাহরণ : (২)

সুতরাং, এই অর্থে শিক্ষা কোন সীমিত পরিবেশের মধ্যে সীমিত সময়ের প্রশিক্ষণ নয়। ব্যক্তির জীবনব্যাপী যে অভিজ্ঞতার উন্নয়ন ও সঞ্চয়ন চলছে, তাই হ'ল শিক্ষা। এই শিক্ষায় জীবনধারণের কৌশল শিক্ষার্থীর উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। সে সমাজ-জীবনে বসবাসের মধ্যেই আয়ত্ত করবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এতে থাকবে অভিনবত্বের স্বাদ, গতানুগতিক চিরন্তন ভাবধারা পরিবহনের চাপ নয়। শিক্ষক এখানে দাতা নন। সহায়ক মাত্র। তিনি শিক্ষার্থীকে সমাজ-নিবন্ধ পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবেন মাত্র। জোর ক'রে তার ওপর সমাজের বিধিনিষেধ চাপিয়ে পঙ্গু ক'রে দেবেন না। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা শিক্ষাকে এই অর্থে আলোচনা করব।

মন্তব্য

'শিক্ষা' শব্দের পূর্বোক্ত দুটি ব্যবহারিক অর্থ তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে পার্থক্য সর্বস্তরে বর্তমান। অর্থাৎ, শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of education), পদ্ধতি (Method), পাঠ্যক্রম (Curriculum) ইত্যাদি সমস্ত দিকে এই দুই অর্থে ব্যবহৃত শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য আছে। পরপৃষ্ঠার তালিকায় শিক্ষার ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থের মধ্যেকার পার্থক্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হ'ল। এই পার্থক্যের দিকগুলি স্মরণ রাখলে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হবে।

আলোচনা

শিক্ষার সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

সংকীর্ণ অর্থে 'শিক্ষা'	ব্যাপক অর্থে 'শিক্ষা'
অর্থ : জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা।	**অর্থ :** শিশুর সকল রকম সম্ভাবনার বিকাশই শিক্ষা।
লক্ষ্য : পাঠ্যপুস্তক-কেন্দ্রিক জ্ঞানের মাধ্যমে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি।	**লক্ষ্য :** শিশুর দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ।
ব্যাপ্তিকাল : বিদ্যালয়-জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।	**ব্যাপ্তিকাল :** শিক্ষা মানুষের জীবন-ব্যাপী প্রক্রিয়া।
বিষয়বস্তু : কতকগুলি অপরিবর্তনীয় তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা।	**বিষয়বস্তু :** তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সমন্বয়।
শিক্ষকের ভূমিকা : তাত্ত্বিক জ্ঞান বিতরণ।	**শিক্ষকের ভূমিকা :** শিক্ষার্থীর সহায়কের ভূমিকা।
শিক্ষণ-পদ্ধতি : মৌখিক নির্দেশনা ও আবৃত্তি।	**শিক্ষণ-পদ্ধতি :** শিক্ষার্থীর আত্ম-প্রচেষ্টামূলক।
শিক্ষার্থীর ভূমিকা : নিষ্ক্রিয় শ্রোতা।	**শিক্ষার্থীর ভূমিকা :** সক্রিয়তা।

॥ শিক্ষার তাৎপর্য ॥
(Concept of Education)

পূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষার তাৎপর্য এবং অর্থ সমাজ-ব্যবস্থা ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই বিভিন্ন দেশের চিন্তাবিদ্‌দের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে সমাজ-বিকাশের ধারার পরিপ্রেক্ষিতে যদি তাদের মূল্যায়ন ক'রে দেখা যায়, তা' হলে আর অসঙ্গতির চিহ্ন থাকে না তাদের মধ্যে। ভারতবর্ষে যদি এই চিন্তাধারার বিবর্তন অনুশীলন করি, তা' হলে লক্ষ্য করব, তা নিরবচ্ছিন্নভাবে এক মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যুগের ও কালের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বৈদিকযুগে শিক্ষাকে মনে করা হ'ত—আত্মনির্ভরশীল করার ও আত্মকামনা ত্যাগ করার পন্থা মাত্র (**Education is something which makes man self-reliant and self-less**)। উপনিষদে বলা হয়েছে, শিক্ষা মানুষকে সংস্কারমুক্ত করে (সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে)। পাণিনির লেখার মধ্যে দেখতে পাই, তিনি প্রকৃতি বা পরিবেশের কাছ থেকে মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা শেখে, তার সমষ্টিকে বলেছেন শিক্ষা। কণাদ্ বলেছেন, শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য হ'ল এর দ্বারা মানুষের আত্মতৃপ্তির (**self-contentment**) যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয়। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, শিক্ষা সদ্‌চরিত্র

প্রাচীন ভারতীয় ধারণা

গঠনের এবং সমাজ-উপযোগী ব্যক্তিত্ব-গঠনের সহায়ক কৌশল। কৌটিল্যের মতে, শিক্ষা হ'ল, দেশ ও জাতিকে ভালবাসার প্রশিক্ষণ মাত্র। ধর্মগুরু শংকরাচার্যের মতে শিক্ষা হ'ল আত্মজ্ঞান (Realisation of self) বা আত্মোপলব্ধি।

আধুনিক ভারতীয় ধারণা

আধুনিক কালেও অনেক শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাবিদ্ শিক্ষার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের ঊনবিংশ শতাব্দী তথা আধুনিক কালের মুখপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন, শিক্ষা হ'ল মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া কিছু নয় (Education is the manifestation of perfection already in mar)। অন্তর্নিহিত সত্তা বলতে তিনি অধ্যাত্মভাবকে (Spirituality) বোঝাতে চেয়েছেন। বেদান্ত দর্শনানুযায়ী মানুষের (জীবের) মধ্যে যা সনাতন, তা হ'ল তার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মভাব। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন—"আমরা এমন এক শিক্ষা-ব্যবস্থা চাই যা মানুষের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মভাবকে জাগ্রত ক'রে তার আধ্যাত্ম-চেতনা উন্মেষের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে।" "(We need an education that quickens, that vivifies that knidles the urge of spirituality inherent in every mind.)।" ঠিক একইভাবে ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, মানুষের বিকাশমান আত্মসত্তাকে পূর্ণ বিকাশ করার প্রয়াসই (Helping the young soul to draw out that is in itself) হ'ল শিক্ষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মধ্যেও আমরা এই ধরনের অধ্যাত্মভাবের উপর গরুত্ব দেখতে পাই। তিনি কোন সুসংবদ্ধ সংজ্ঞা দেননি শিক্ষা সম্বন্ধে। তবে তাঁর বিভিন্ন লেখা ও আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার অর্থ ছিল তাঁর কাছে বিশ্বসত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তারই প্রভাবে ব্যক্তিসত্তার বিকাশসাধনের প্রয়াস। তিনি এ প্রসঙ্গে এক জায়গায় (শিক্ষা) বলেছেন—"ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই। বিদ্যারই কি, বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে। চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকে লাভ করে, তখনই সে অমৃত লাভ করে। ভারতবর্ষকে আজ সেই সাধনা করিতে হইবে,—নানা তথ্য, নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে আজ নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে।" জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, শিক্ষা হল ব্যক্তির দেহ-মন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াস ("By education I mean an alround drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit")। ভারতীয় এই চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর মূলে আছে বিশ্ব-চেতনাবোধ বা ধর্মবোধ। ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, এই দু'ধরনের চেতনা মানব-মনের অন্তরে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই সকল মনীষীরই শিক্ষা-চিন্তা প্রায় একই ধারায় প্রবাহিত। আধুনিক কালের বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এ সম্পর্কে তাঁর সভাপতিত্বে গঠিত বিদ্যালয় কমিশনের (১৯৪৮ খ্রীঃ) রিপোর্টে যা উল্লেখ করেছিলেন, তাকেই ভারতীয়

শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি সমস্ত ধারারই মূল সূত্রের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি বলেছেন, "ভারতীয় সমাজের জীবন ও মননের দিক্ থেকে বিশ্লেষণ করলে এ কথাই বলতে হয়, শিক্ষা কথার প্রকৃত তাৎপর্য জীবিকা-অর্জনের বা নাগরিকতার প্রশিক্ষণের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা হ'ল দ্বিতীয় জন্ম। উন্নততর অধ্যাত্মময় জীবনে প্রবেশের প্রথম সোপান হ'ল শিক্ষা। সত্যোপলব্ধি ও সৎ জীবন যাপনের জন্য প্রশিক্ষণই হ'ল শিক্ষা।" (**"Education, according to Indian tradition, is not merely a means to earning a living nor it is only a nursery of thought or a school for citizenship. It is initiation into the life of spirit, a training of human souls in the pursuit of truth and the practice of virtue. It is a second birth—'dvitiyam janma'."**)

পাশ্চাত্ত্য দেশেও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার কোন স্থায়ী রূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানেও সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে 'শিক্ষা' শব্দের তাৎপর্যেরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এই ক্রমবিকাশের ধারা অনেক স্পষ্ট। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের ধারার মূল সূত্র খুঁজে পেতে যেমন বহুযুগের খণ্ড খণ্ড ঘটনার টুকরোকে সংযোজন করার দরকার হয়, পাশ্চাত্ত্য দেশের ক্ষেত্রে তেমন এত প্রয়োজন নেই। সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই তালে শিক্ষার তাৎপর্যের পরিবর্তন প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়। কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর বক্তব্য উদ্ধৃত করলে এটা বোঝা যাবে। প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো (Plato) বলেছেন, শিক্ষা শিশুর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী দেহ-মনের সার্বিক বিকাশ সাধন করে। [**"It (Education) develops in the body and soul of the pupil all the beauty and all the perfection he is capable of."**] অ্যারিস্টট্‌ল্‌ও (Aristotle) শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে দেহ-মনের সমান্তরাল সুষম বিকাশের কথা বলেছেন। শিক্ষা দেহ-মনের সুষম এবং পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিকে জীবনের প্রকৃত মাধুর্য ও চরম সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করবে। (**"Education is the creation of sound mind in a sound body. It develops man's faculty, especially his mind, so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, goodness and beauty in which perfect happiness essentially consists.)** থম্‌সন (Thompson) বলেছেন, শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি শিশুর পরিবেশের প্রভাব; যে প্রভাবের দ্বারা শিশুর বাহ্যিক আচরণ, চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর স্থায়ী পরিবর্তন হয়। (**Education is the influence of the environment on the behaviour with a view to producing a permanent change in his habits of behaviour, of thought, of attitude.**)। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অ্যাডাম্‌স্

অন্যান্য দেশের চিন্তাবিদ্‌দের ধারণা

(Adams) বলেছেন, শিক্ষা হল সচেতন এবং ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া, যার দ্বারা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তার কিছু আচরণের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। (Education is a conscious deliberate process in which one personality acts upon another in order to modify the development of the other by the communication and manipulation of knowledge.) বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ নান্ (Nunn) শিক্ষার তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষা বলতে আমরা ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশকেই বোঝাই। এই বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতানুযায়ী মানুষের কল্যাণের পথে নিজেকে নিয়োজিত করবে। (Education is the complete development of individuality of the child so that he can make an original contribution to human life according to the best of his capacity.) দার্শনিক জন্ ডিউই (John Dewey) বলেছেন, শিক্ষা বলতে আমরা পূর্ণ জীবন-বিকাশের কথাই বলি। পূর্ণ বিকাশ বলতে সেইসব গুণের বিকাশকে বলি যার দ্বারা ব্যক্তি তার পরিবেশকে সুশৃঙ্খলিত ক'রে নিজের সমস্ত সম্ভাবনার বিকাশসাধন করতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, এই ধরনের বিকাশ নিছক বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া প্রশিক্ষণের দ্বারা সম্ভব নয়। ব্যক্তি জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে পাওয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে যুক্তি ও বিচারশক্তি দ্বারা যাচাই করে যা গ্রহণ করে, তা হল শিক্ষা। (Education is the process of living through a continuous reconstruction of experiences. It is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his possibilities.)

উল্লেখ করতে গেলে আরও অনেক মনীষীর কথাই উল্লেখ করতে হয়। তাতে ক'রে আমাদের আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি পাবে মাত্র। এই আলোচনা থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শিক্ষার অর্থ দেশ, কাল ও ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। তাই বর্তমানকালে শিক্ষার তাৎপর্যকে বোঝাতে গেলে তার কোন একটিকে সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা যায় না।

আলোচনা

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় মতবাদগুলো বিচার করলে এ কথাই বলতে হয় যে, সেগুলো বিশেষভাবে বাস্তব চিন্তাবর্জিত। আবার অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার মূলে আছে অতি-বাস্তব। প্রাচীন বাস্তবানুগ চিন্তাধারা অনুযায়ী শিক্ষা ছিল দ্বিমেরুয় (Bi-polar) প্রক্রিয়া। একদিকে শিক্ষক, অপরদিকে শিক্ষার্থী; একদিকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, অপরদিকে অনভিজ্ঞ অর্বাচীন শিশু। এই তাৎপর্যের উল্লেখ আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশে যেমন পাই, তেমনি প্রাচীন ভারতের চিন্তার মধ্যেও পাই।
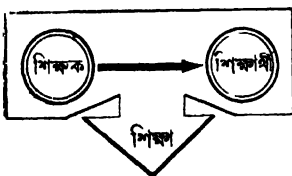
শিক্ষা সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা

যেমন বলেছেন স্যার অ্যাডাম্‌স্‌ (Adams)। আবার, উপনিষদে আছে "আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপ অন্তেবাসো উত্তররূপ, বিদ্যা সংবিধঃ প্রবচনং সংধানং"। এই মতানুযায়ী শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর দুই মেরুতে অবস্থান। জ্ঞান শিক্ষকের দিক্‌ থেকে শিক্ষার্থীদের দিকে প্রবাহিত। এই জ্ঞানই তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে। কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারা অনুযায়ী শিক্ষা হল ত্রিমেরুর প্রক্রিয়া (Tri-polar process)। এর তিন মেরুতে যথাক্রমে আছেন—**শিক্ষক, শিশু ও সমাজ**। তিন মেরুদেশে অবস্থিত সত্তার পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই শিক্ষা সংগঠিত হয়। শিক্ষক শিশুর ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করবেন সমাজের চাহিদার দিক্‌ বিবেচনা ক'রে। তাই বর্তমান শিক্ষা সমাজ-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই তিন সত্তা পরস্পরের উপর ক্রিয়া না করলে শিক্ষা সংগঠিত হতে পারে না। এ সম্পর্কে আমরা অন্য অংশে বিশদভাবে আলোচনা করব। এই আধুনিক এবং প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতীয় আদর্শের সমন্বয় ক'রে বলতে পারি, শিক্ষা হল সমাজের চাহিদানুযায়ী শিশুর উপর পরিণত ব্যক্তিদের সুপরিকল্পিত প্রভাবের সমষ্টি বা সুসমঞ্জস দেহ-মনের বিকাশের মাধ্যমে জীবনের পরম সত্যকে উপলব্ধিতে সহায়তা করা।' অথবা, শিক্ষাবিদ্‌ রেডেন্‌ (Redden) যা বলেছেন—Education is the deliberate and systematic influence exerted by the mature person upon the immature through instruction, discipline and harmonious development of physical, intellectual, aesthetic, social and spiritual powers of human being according to the individual and social needs and directed towards the union of the educand with the creator as the final end.
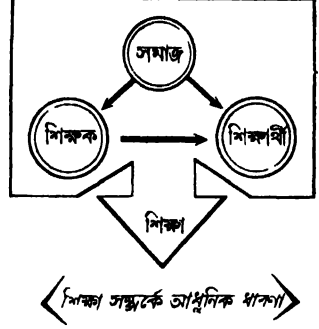
শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক ধারণা

॥ শিক্ষার উপযোগিতা ॥
(Importance of Education)

পূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষার ইতিহাস মানব ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন। জীবনের আদি পর্ব থেকে মানুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সজাগ। মানুষকে মানবীয় গুণের অধিকারী করার জন্য এই শিক্ষা যে একটা প্রাথমিক এবং প্রয়োজনীয় কৌশল, তা প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থাতেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বলেছেন, মৃত ও জীবিতের মধ্যে যা তফাৎ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে তা-ই তফাৎ (Educated men are as superior to uneducated as the living are to dead) প্রাচীন ভারতীয়

প্রস্তাবনা

শাস্ত্রেও আমরা এর উল্লেখ পাই। গীতায় উল্লেখ আছে, "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" (জ্ঞানের মত শুদ্ধিকারক আর কিছুই নাই)। বর্তমান সভ্য জগতেও শিক্ষাকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক রাষ্ট্র এবং সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টেও (Indian Education Commission, 1944—46)-এর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: "আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যার যুগে শিক্ষাই মানুষের সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা নির্ধারণ করে। আমাদের জাতীয় পুনর্গঠনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সাফল্য নির্ভর করে, বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থীদের গুণগত মানের উপর।" [In a world based on Science and Technology, it is education that determines the level of prosperity, welfare and security of the people. On the quality and number of persons coming out of our schools and colleges will depend our success in the great enterprise of national reconstruction whose principal objective is to raise the standard of living of our people.]। শিক্ষাকে এই গুরুত্ব দেওয়ার মূলে আছে কতকগুলো কারণ যা শিক্ষারই অন্তর্নিহিত। শিক্ষার অনেক ক্ষমতা আছে যা মানুষের জীবন-বিকাশের অনুকূল। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্, চিন্তাবিদ্, বৈজ্ঞানিক এই উপযোগিতার দিক্‌টা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার এই প্রয়োজনীয়তা মানব-মনের ধর্ম বা চাহিদার উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে, আর সেই চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এসেছে শিক্ষা।

জৈবিক উপযোগিতা

প্রথমতঃ, শিক্ষা মানুষের **জৈবিক প্রয়োজন** (Biological need) মেটাতে সক্ষম হয়। ইতর প্রাণী তার জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল স্বাভাবিকভাবে সংস্কারের (instinct) তাড়নায় আয়ত্ত করে। জন্মের কিছুদিন পরই বিড়াল ইঁদুর-শিকারের কৌশল আয়ত্ত করে, এমনি ক'রে তার খাদ্যের প্রয়োজন মেটায়। কিন্তু মানবশিশুকে যদি জন্মের পর যথাযথভাবে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহের দ্বারা যত্ন নেওয়া না হয়, তবে তার জীবন বিপন্ন হবে। তাই তাকে জীবনপথে যথাযথভাবে এগিয়ে দেওয়ার জন্য, তার বিভিন্ন ধরনের জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য দরকার সাহায্যের, আর এই সহায়তারেই আর এক নাম শিক্ষা। অন্যান্য ইতর প্রাণীর মধ্যে যে-সব প্রাথমিক চাহিদা থাকে, তার প্রত্যেকটিই মানুষের মধ্যে বর্তমান। কিন্তু, চাহিদাগুলো প্রাথমিক হ'লেও তার প্রকৃতি মানুষের জীবনে অনেক বেশী জটিলতা লাভ করে। যেমন, খাদ্যের চাহিদা প্রাণীমাত্রেই আছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই চাহিদা অনেক জটিল প্রকৃতির। তার খাদ্যসামগ্রী বিভিন্ন রকমের এবং তা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকেন্দ্রিক। এইজাতীয় জটিল চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এইসব জৈবিক চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে না পারলে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখাই অসম্ভব

হ'য়ে পড়বে। তাই শিক্ষার একটা জৈবিক উপযোগিতা (Biological importance) মানুষের কাছে আছে এবং চিরদিন তা থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা মানুষের **সামাজিক চাহিদা** (Social need) মেটাতে পারে। অন্যান্য প্রাণীকে বেঁচে থাকার জন্য তাদের জৈবিক চাহিদার পরিপূরক আচরণ করতে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষের জৈবিক সত্তা ছাড়াও তার একটা সমাজ-সত্তা (Social aspect) আছে। তাকে সমাজের সংস্কৃতির ধারাও (Cultural heritage) আয়ত্ত করতে হয়। এই সমাজ-সংস্কৃতির ধারা যা অতীত অভিজ্ঞতার সমষ্টি, তা জৈবিক বংশানুক্রমিক ধারায় মানুষের মধ্যে আসতে পারে না ; মানুষকে অনুশীলনের মাধ্যমে তা আয়ত্ত করতে হয়। আমাদের পিতামাতা বা পূর্বপুরুষরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে গেছেন, তা স্বাভাবিকভাবে আমাদের ওপর বর্তায় না। কিন্তু ব্যক্তি-সত্তার বিকাশের জন্য এইগুলির সংরক্ষণ ও সঞ্চালন দুই-ই প্রয়োজন। শিক্ষা এই উভয় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। তাই প্রত্যেক মানুষের জীবদ্দশায় শিক্ষার প্রয়োজন। এই কারণেই শিক্ষার একটা সামাজিক উপযোগিতা মনুষ্য-সমাজে বর্তমান।

সামাজিক উপযোগিতা

তৃতীয়তঃ, মানুষের **শিক্ষণধর্ম মনই** শিক্ষাকে তার জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ করে তুলেছে। জন্মমুহূর্তে মানুষের অনেক বৈশিষ্ট্যই সুপ্ত থাকে। প্রকৃতি তাকে ঐ অবস্থাতেই পাঠিয়েছেন পৃথিবীর বুকে। জন্মের পর সে কথা বলতে শেখে, হাঁটতে শেখে, আরও কত একান্ত প্রয়োজনীয় কৌশল আয়ত্ত করে। কিন্তু এইসব কাজ করবার সম্ভাবনা তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তাদের যথাযথভাবে প্রস্ফুটিত করার জন্য প্রশিক্ষণ বা শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। প্রকৃতি তাকে এমনভাবেই সৃষ্টি করেছেন যে, মনে হয় সে যেন শিক্ষা-গ্রহণের জন্যই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ এ প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপন করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—"Only the rudiments of that which is the highest and most excellent in man are given at birth. The fully fashioned social and moral being waits upon the process of growth." সুতরাং এই দিক্ থেকে বিচার করলে বলতে হয়, মনুষ্য-জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করার জন্য শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন এবং তা গ্রহণ করার জন্য তার মানসিক সংগঠনও বর্তমান।

মানসিক উপযোগিতা

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের জন্মগত সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করার জন্য এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রবাহকে সজাগ রাখার জন্য শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার দ্বারাই হবে অতীত জীবন ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন, শিক্ষার দ্বারাই উন্মোচিত হবে ভবিষ্যতের সিংহদ্বার। শিক্ষাই আনবে ব্যক্তি-জীবনে পরিপূর্ণতা, শিক্ষাই করবে ব্যষ্টি-জীবনকে সার্থক। এক কথায়, শিক্ষা ব্যক্তিকল্যাণ ও সমাজ-কল্যাণের পথে গড়ে তুলবে নতুন ও আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা। ব্যক্তি-

আলোচনা

জীবনে এই সর্বতোমুখী সমন্বয়ে শিক্ষাই (Education) মানুষের আবিষ্কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধিক কৌশল। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি আন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির সকল নিয়মের মধ্যে বাঁধা পড়ে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ হাক্সলে Huxley) শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রিক উপযোগিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাই বলেছেন—"Education is the instrument of intellect in the laws of nature ; under which name I include, not merely things and their forces, but men and their ways and the fashioning of the affections and the will into an earnest and living desire to move in harmony with their laws."

॥ **শিক্ষার পরিধি ও শিক্ষা-বিজ্ঞান** ॥

শিক্ষা-সম্পর্কিত ধারণা (Concept of education) এবং শিক্ষার উপযোগিতা (Importance of education) বিষয়ে আলোচনা থেকে আমরা লক্ষ্য করছি, 'শিক্ষা' আধুনিক কালে ব্যাপক তাৎপর্য লাভ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার উপযোগিতাও বহুমুখী হয়েছে। হাক্সলের (Huxley) যে মন্তব্যের কথা আমরা উল্লেখ করছি, সেখানে শিক্ষাকে যদি বিশ্ব ও মানব প্রকৃতির সূত্রের সঙ্গে সমাঞ্জস্য-বিধানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হয়, তাহ'লে তাকে দ্বিমুখী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। **প্রথমতঃ**, তাকে মনুষ্যজীবনের সীমিত সময়কালের মধ্যে ধরে রাখলে চলবে না। শিক্ষা বলতে শিশুর নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-জীবনের কালকে (Period of formal education) বোঝায় না। শিক্ষা হবে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, শিক্ষা মানুষের জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া (Education is a life long process), যা আধুনিক অর্থে জীবন-প্রক্রিয়ারই (Life process) সামিল। তাহ'লে এই অর্থে শিক্ষার (Education) পরিধি (Scope) ব্যক্তির জীবনব্যাপী এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনের ধারাবাহিক বিবর্তনের সঙ্গে প্রবহমান। **দ্বিতীয়তঃ**, শিক্ষা-প্রক্রিয়া কখনই নিম্নগামী নয়, সকল সময় উন্নতিকামী। তাই ব্যক্তিজীবনের ও সমাজের উন্নতি সাধন করতে হ'লে, বিশ্ব-প্রকৃতির ও মানব-প্রকৃতির সকল সাধারণ সূত্রগুলিকে (Laws of nature & Laws of human nature) সার্থকভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রেও কার্যকরী করে তুলতে হবে। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বর্তমানে জ্ঞানের এক শাখা সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা হয় **শিক্ষা-বিজ্ঞান** (Science of Education)। শিক্ষা-বিজ্ঞান কথাটি আমরা সচরাচর ব্যবহার করি না। বিকল্প হিসাবে আমরা তাকেও 'শিক্ষা' বলি। যেমন, আমাদের বর্তমান পাঠ্যসূচীটি (Syllabus) হ'ল 'শিক্ষা'র (Education)। কিন্তু এখানে শিক্ষা বলতে শিক্ষা-বিজ্ঞানকেই বোঝায়। যাই হোক, শিক্ষার পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা (extensity) এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানের বিস্তৃতি (area) উভয় সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন। এই দুই দিক্ থেকে আলোচনা করলে বোঝা যাবে, 'শিক্ষা'র আলোচনার ক্ষেত্র কতটুকু।

শিক্ষার পরিধি কি ?

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এই জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া কখন শুরু হয়? স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, এই প্রক্রিয়া জীবন-সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই কার্যকরী হয়। আমাদের গতানুগতিক ধারণা অনুযায়ী শিশু বিদ্যালয়ে এলে শিক্ষার কাজ শুরু হয়। এই ধারণার সঙ্গে শিক্ষার আধুনিক তাৎপর্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ার অর্থ হ'ল—যা জীবনকাল ব্যাপ্ত এবং জীবন-প্রক্রিয়ার সহগামী। তাই শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তি হ'ল—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। জন্ম বলতে এখানে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তকে বলা হচ্ছে না। এই জীবন শুরু হচ্ছে মাতৃগর্ভে। তাই শিক্ষা শুরু হচ্ছে সেখানেই; সেখানেও তাকে অভিযোজন করতে হয় যার এক নাম শিক্ষা। আবার, মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শিক্ষালাভ করতে থাকে। সে শিক্ষা অনিয়ন্ত্রিত (informal)। কিন্তু শৈশবের সেইসব অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিজীবনের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকে। শিশু বয়স্কদের কাছে শেখে, খেলার সাথীর কাছে শেখে, প্রকৃতির কাছ থেকেও শেখে। তাই বিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পূর্বেই সে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, অনেক বিষয়ে ধারণা গঠন করে। আবার শিক্ষালয়ের (school) নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ছাড়াও সমাজের অন্যান্য সংস্থার সদস্য হিসাবেও সে শিক্ষালাভ করে। এইসব সংস্থার মধ্যে বসবাস করতে গিয়ে সে যেমন পরোক্ষভাবে শিক্ষালাভ করে, তেমনি এইসব সংস্থার কাজে সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণ করার জন্যও তাকে শিখতে হয়। আবার বয়স্ক জীবনে, শিক্ষালয় ত্যাগ ক'রে তার শিক্ষা শেষ হ'য়ে যায় না। জীবনে প্রত্যক্ষভাবে অভিযোজন করতে গিয়েও সে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এমনিভাবে যতদিন সে বেঁচে থাকে, ততদিন প্রতি মুহূর্তে সে শিখতে থাকে। তাই 'শিক্ষা'র পরিধি জীবনবিস্তৃত। জীবনের প্রয়োজনে তাকে অভিযোজন করতে হয় প্রতিমুহূর্তে; আর তা করতে গিয়ে তাকে শিখতে হয়। এই অর্থে জীবন এবং শিক্ষা সমবিস্তৃত।

শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা

'শিক্ষা' শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি, শিক্ষা ব্যক্তিজীবন-কেন্দ্রিক হ'লেও, তার দ্বারা সমাজ-জীবনেরও সামগ্রিক বিকাশ ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা শিশু এবং সমাজ উভয়ের চাহিদাই পরিতৃপ্ত হয়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বা ব্যক্তিসত্তা এবং তার সমাজ-জীবন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানুষের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও সামাজিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও তাদের উন্নতিকরণের জন্য বর্তমানে বহু জ্ঞানের শাখা (Branch of Knowledge) গড়ে উঠেছে। এইগুলিকে বলা হয়, সামাজিক বিজ্ঞান (Social Sciences)। শিক্ষা যেহেতু মানুষের ব্যক্তিসত্তার উন্নতিতে এবং সমাজ-সংস্থার উন্নতিতে সহায়তা করে, সেহেতু তার প্রকৃতি অনুশীলন ও উন্নতিকরণের জন্যও জ্ঞানের এক শাখা গড়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় শিক্ষা-বিজ্ঞান (Science of education)। এম. আর. চার্লস্ (M. R. Charles) বলেছেন—"শিক্ষা হ'ল একটি প্রয়োগমূলক সামাজিক বিজ্ঞান" (Education is an applied

social science.)। এখানে, 'শিক্ষা' বলতে শিক্ষা-বিজ্ঞানকেই বোঝানো হয়েছে। তাই শিক্ষা কি, সে সম্পর্কে সকলের বলার অধিকার থাকলেও সেই প্রক্রিয়ার প্রকৃতি কি এবং তা ব্যক্তিজীবনের কতটুকু অংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে, তার দিক্ নির্ণয় করার দায়িত্ব শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের। আর এইসব বিজ্ঞানীরা শিক্ষা-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জ্ঞানের যে বিশেষ ক্ষেত্র রচনা করেছেন, তাকেই বলা হয় শিক্ষা-বিজ্ঞান। ফলে, শিক্ষা-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করলে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার পরিধি সম্পর্কে আরও কিছু ধারণা পাওয়া যাবে। শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূল অংশগুলি হ'ল—শিক্ষাদর্শন, শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষার ইতিহাস, শিক্ষণ-পদ্ধতি, শিক্ষালয় প্রশাসন, শিক্ষার আর্থিক সংস্থান ইত্যাদি। অর্থাৎ, প্রক্রিয়ার পরিচালনার জন্য জীবন-সম্পর্কিত আদর্শ বা জীবনাদর্শ প্রয়োজন। যে জীবনাদর্শ ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কল্যাণময়, তাকেই নির্বাচন করতে হয় শিক্ষাদর্শন (Educational Philosophy) হিসাবে। শিক্ষা-প্রক্রিয়ার পরিচালনার জন্য কতকগুলি নীতি নির্ধারণ করতে হয়। এই নীতিগুলি মূলতঃ সামাজিক আদর্শ এবং শিক্ষার্থীর মনঃপ্রকৃতি সংক্রান্ত। যেহেতু সমাজাদর্শ ও শিক্ষার্থীর মনঃপ্রকৃতি উভয়ই বিবর্তনধর্মী, সেহেতু শিক্ষাতত্ত্ব (Principles of Education) তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সততই পরিবর্তনশীল। এমনিভাবে শিক্ষা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি আলোচনার ক্ষেত্রই সেখানে শিক্ষার্থীর জীবনকেন্দ্রিক। তাই বলা যায়, শিক্ষা-বিজ্ঞান 'শিক্ষা'র যে পরিধি নির্ধারণ করে দিচ্ছে তাও জীবনকালব্যাপ্ত। এই অর্থেই 'শিক্ষা' শব্দটিকে আধুনিক চিন্তাবিদ্‌গণ ব্যবহার করে থাকেন।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের বিস্তৃতি

শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সুপরিচালিত করার জন্য বর্তমানে তাই ইতিহাস (History) অ্যান্‌থ্রপলজি (Anthropology), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), মনোবিদ্যা (Psychology) ইত্যাদির মত মানবীয় বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করা হ'চ্ছে। এইসব জ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষা মানব-জীবনের সমগ্র পরিসরের মধ্যে যে কর্তব্য সম্পাদন করছে, তা একটিমাত্র শব্দ—বৃদ্ধি (Development) কথাটির দ্বারা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। ব্যক্তি-জীবনের বৃদ্ধির সীমাই নির্ধারণ করে দেয় শিক্ষার পরিধি। সুতরাং, সবশেষে আমাদের স্মরণ রাখার দরকার, শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রয়োগমূলক সামাজিক বিজ্ঞান হ'লেও, তার আলোচনার একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র থাকলেও 'শিক্ষার পরিধি' সব সময়েই আপেক্ষিক। যাকে কেন্দ্র করে এই শিক্ষা, তার জীবনের বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার (Process of development) সীমাই শিক্ষার শেষ সীমা।

মন্তব্য

সারসংক্ষেপ

[এক] শিক্ষা কি তা এক কথায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়, কারণ, শিক্ষা একটি গভীর ধারণা ; সমাজ-জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন হ'য়েছে। বিদ্যা, জ্ঞান, বিদ্যার্জনের প্রক্রিয়া বা বিদ্যাদানের প্রক্রিয়াকে দীর্ঘদিন ধরে 'শিক্ষা' হিসাবে বিবেচনা করা হ'ত। কিন্তু আধুনিককালে 'শিক্ষা'

শব্দের অর্থের পরিবর্তন হ'য়েছে। তবে অর্থের এই অভিব্যক্তি বর্তমান পর্যায়ে স্থিতিলাভ করেছে, এ কথা বলা যায় না। তবে আধুনিক এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন অর্থকে সংকীর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, প্রাচীন সংকীর্ণ অর্থে, মানবীয় সজীবতাকে স্বীকার করা হয়নি। ফলে, তার বিভিন্ন অংশেও যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে আপাতঃ স্থিতিশীল বর্তমান অর্থকে বলা হয় 'শিক্ষার ব্যাপক অর্থ'। কারণ এখানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিষয়বস্তু সব কিছুকেই গতিশীল হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

[দুই] শিক্ষা-সম্পর্কিত ধারণারও যুগ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হ'য়েছে। সমাজ-পরিবেশেও এই ধারণার বিবর্তনে সহায়তা করেছে। ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেখানে শিক্ষাকে সকল সময় আত্মজ্ঞান, আত্মোপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হ'য়েছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায কিন্তু পরিবর্তন বা বিবর্তনের ধারা খুবই প্রকট। সেখানে, আদি পর্যায়ে শিক্ষাকে এক ধরনের প্রভাব (influence) হিসাবে বিবেচনা করা হ'য়েছে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এই ধারণা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হ'য়ে বর্তমানে জীবন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমপাতিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে শিক্ষাকে তিনটি উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে, এই প্রক্রিয়ার তিনটি মেরুতে বা প্রান্তে আছেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সমাজ। এঁরা প্রত্যেকেই ক্রিয়াশীল অঙ্গ।

[তিন] ব্যক্তিজীবনে শিক্ষার উপযোগিতা অপরিসীম। তিনটি মূল দিক থেকে শিক্ষার এই উপযোগিতাকে বিচার করা যায়। (ক) শিক্ষা মানুষের জীবনের জৈবিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম; (খ) শিক্ষা মানুষের সামাজিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম এবং (গ) শিক্ষা মানুষের মানসিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এক কথায়, মানুষের সকল রকম জন্মগত ও অর্জিত চাহিদা মিটিয়ে তার জীবন-বিকাশে পরিপূর্ণ সহায়তা করাই শিক্ষার প্রকৃত উপযোগিতা।

[চার] শিক্ষার পরিধি বা সীমা মানুষের শিক্ষালয় জীবনের (School life) মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষাও জীবন-সহগামী। তাই শিক্ষা জীবন-বিস্তৃত। এই যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায় শিক্ষার ব্যাপক তাৎপর্যে এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানের (Science of Education) বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যে। তবে শিক্ষার পরিধি ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক। ব্যক্তির কর্মজীবনে পরিসরের মধ্যেই শিক্ষা-প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. Education has been used in wider sense as well as in narrow sense. Explain the two uses of the word "Education".
   ['শিক্ষা' শব্দটি সংকীর্ণ এবং বিস্তৃত উভয় অর্থেই ব্যবহার করা'হয়ে থাকে। 'শিক্ষা' শব্দের এই দুই অর্থের ব্যাখ্যা কর।]
2. What is meant by the term 'education'? Dicsuss the various meaning of the term and discuss the sense in which it is used at present.

['শিক্ষা' বলতে কি বোঝায় ? 'শিক্ষা' শব্দের বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করে, বর্তমানে যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়, সেই সম্পর্কে আলোচনা কর ।]

3. **Define education and fully discuss its scope.**

['শিক্ষা'র সংজ্ঞা নির্ধারণ কর এবং তার পরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর ।]

4. **Trace the history of development of the various concept of Education. In what sense the term 'Education' is used at present ?**

['শিক্ষা' শব্দের তাৎপর্য বিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত কর । বর্তমানে শব্দটি কোন্ বিশেষ তাৎপর্যে ব্যবহার করা হয় ?]

5. **What do you understand by 'concept' of education ? What was the 'old' concept of education ? Describe any old theory of education.**

[শিক্ষার 'ধারণা' বলতে তুমি কি বোঝ ? শিক্ষার প্রাচীন ধারণা কি ছিল ? একটি প্রাচীন মতবাদের বর্ণনা দাও ।]

6. **Explain the various meaning of the term 'Education'. Which one will you accept and why ?**

['শিক্ষা' শব্দের বিভিন্ন অর্থগুলি ব্যাখ্যা কর । এইগুলির মধ্যে কোন্ অর্থটি তুমি গ্রহণ করবে এবং কেন ?]

7. **Critically examine the following definition of education and establish what considered to be the best definition of education.**

(a) Education is acquisition of knowledge ; (b) Education is the impression of the adults ; (c) Education is preparation for social life.

[শিক্ষার নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর এবং যেটিকে তুমি ভাল মনে কর, সেটি যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠাপন কর : (a) শিক্ষা হ'ল জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া ; (b) শিক্ষা হ'ল বয়স্কদের প্রভাব ; (c) শিক্ষা হ'ল সমাজ-জীবনের প্রস্তুতি ।]

8. **Develop a concept of education suitable for modern age.**

[আধুনিক যুগের উপযোগী শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা গঠন কর ।]

9. **What do you understand by 'concept' of education ? What was the old concept of Education ? Describe an old theory of education.**

[শিক্ষার 'ধারণা' বলতে তুমি কি বোঝ ? শিক্ষার প্রাচীন ধারণা কি ছিল ? একটি প্রাচীন শিক্ষা-মতবাদের বর্ণনা দাও ।]

শিক্ষার কাজ
Function of Education
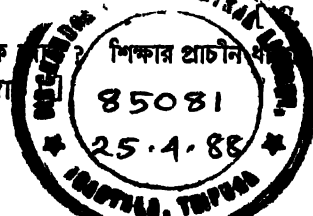
শিক্ষার লক্ষ্য (Aims), অর্থ (Meaning), তাৎপর্য (Concept) এবং কাজ (Function)—এদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বিভেদের সীমারেখা স্থির করা খুবই মুশকিল। কারণ এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তবুও শিক্ষাতত্বে তাদের পৃথক আলোচনার রীতি আছে। তাই আমরা এই অধ্যায়ের অবতারণা করেছি। যদিও এইসব দিকের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, তবুও আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য শিক্ষাকে বিভিন্ন দিক্ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। শিক্ষাতত্বের যে-কোন ছাত্রের কাছে আজকে যে তিনটি প্রশ্ন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল—শিক্ষা কি? শিক্ষার দ্বারা কি হয়? এবং শিক্ষার কি করা উচিত (আদর্শগত-ভাবে)। বিভিন্ন অধ্যায়ে এই তিনটি প্রশ্নেরই আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার অর্থ ও তাৎপর্য (Meaning and Concept of Education) অংশে শিক্ষা কি, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা শিক্ষার কাজ কি, সে সম্পর্কে আলোচনা করব এবং পরবর্তী অংশে শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education) বা শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

প্রস্তাবনা

॥ শিক্ষার সাধারণধর্মী কার্যাবলী ॥
General functions of Education

বর্তমানকালে শিক্ষাতত্ব, মনোবিদ্যা (Psychology), সমাজবিদ্যা (Sociology) ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের (Social Science) জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক ভাবধারা অনুযায়ী শিশু কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। এইসব সম্ভাবনাগুলো প্রকৃতিদত্ত। শিশুর বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব সম্ভাবনাগুলির বিকাশ হয়। কিন্তু এই বিকাশের একটা দিক্ নির্দিষ্ট করাও আছে। সেটা হ'ল সমাজকল্যাণের দিক্। অর্থাৎ, শিক্ষার দ্বারা শিশুর জন্মগতভাবে পাওয়া বিভিন্ন সম্ভাবনাকে সমাজকল্যাণের পথে নিয়োজিত করা হয়। তাই শিক্ষার দ্বারা যে উন্নতিসাধন হয়, তার দুটো দিক্ আছে। এই দ্বিমুখী উন্নতির একটা দিক্ হল—ব্যক্তিজীবনের বিকাশসাধন, এবং অপরটি হ'ল সামাজিক কল্যাণসাধন। আধুনিক ভাবধারার প্রবক্তা জন ডিউই-এ'র শিক্ষার সংজ্ঞা পুনরাবৃত্তি করলে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন —"Education is the process of living through a continuous reconstruction of experience. It is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his possibilities". সুতরাং, শিক্ষার কাজের (Function of Education) কথা বিচার করতে গেলে সর্বপ্রথম যে দুটো দিকের

কথা আলোচনা করতে হয়, তা হ'ল তার **ব্যক্তি-উৎকর্ষণ ও সমাজকল্যাণের** দিক। শিক্ষার সাধারণধর্মী কাজ সম্পর্কে আলোচনাটি সম্পূর্ণ করতে হ'লে আরও একটি দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তির কল্যাণই হোক বা সমাজেরই কল্যাণ হোক, তার গুণগত দিক (Qualitative aspect)ও বিচার করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, জীবন-বিকাশের **অভিমুখিতা** (Direction) নির্ধারণ করাও শিক্ষার কাজ। এখানে আমরা শিক্ষার এই তিনটি সাধারণধর্মী কাজ সম্পর্কে প্রথমতঃ আলোচনা করবো।

[এক] শিক্ষার কাজ ব্যক্তিজীবনের সুষম উন্নয়ন (Integrated development of individual as function of Education)

শিক্ষার অর্থ বিশ্লেষণের সময় উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্যেক শিশুই থাকে জন্মমুহূর্তে অসহায়। শিক্ষার কাজ হল, এই অসহায় অসমর্থ শিশুকে জবিনোপযোগী ক'রে গড়ে তোলা। আমরা সর্বশেষ সংজ্ঞায় এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। যে সব সম্ভাবনা ও ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মেছে, তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া সমাজ-জীবন স্থায়ী হ'তে পারে না। তাই শিক্ষার প্রথম কথাই হ'ল ব্যক্তিকল্যাণ। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনের প্রতি শিক্ষার একটা কর্তব্য আছে। জন্মাবস্থায় মানবশিশু যেমন পরনির্ভরশীল থাকে, তেমনি নমনীয়ও (Plastic) থাকে। তার এই নমনীয়তার উপর ভিত্তি ক'রে তাকে যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে দিতে হবে। তার ব্যক্তিজীবনের সকল সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করে তাকে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী ক'রে দিতে হবে। ব্যক্তিজীবনের এই সুষম বিকাশ তখনই হবে যখন সে যথাযথভাবে পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধান (adjustment) করতে পারবে; যখন সে তার সমাজ-জীবনের সঙ্গে সংগতিসাধন করতে পারবে; যখন সে জীবনের উন্নত আদর্শে'র (Higher value) অধিকারী হবে এবং যখন নৈতিক আদর্শে'রও অধিকারী হবে। ব্যক্তি যদি পরিবেশের সঙ্গে যথার্থভাবে সংগতিবিধান করতে না পারে, তবে তার জীবনে পরিপূর্ণতা আসবে না। আবার অন্য দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে পরিবেশই হ'ল শিক্ষালয়। শিক্ষা আধুনিক মতানুযায়ী বাহ্যিক কিছু ক্রিয়া নয়। জীবন-পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উত্থান-পতনের মাধ্যমে মানুষ যেভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাই হ'ল শিক্ষা। জন ডিউই বলেছেন, শিক্ষা ভবিষ্যতের আয়োজন নয়; জীবনই শিক্ষা। জীবনধারণের মাধ্যমে পরিবেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মানুষ যা গ্রহণ করবে, তাই শিক্ষা। যে সব প্রতিক্রিয়া বা আচরণধারা তাকে সার্থক জীবনযাপন করতে সহায়তা করবে, সেইসব আচরণধারার পুষ্টিসাধন করবে ব্যক্তি নিজেই। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ বসিং (Bossing) এ সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন—"শিক্ষার কাজ হ'ল ব্যক্তিকে কতকগুলি আত্মতৃপ্তিদায়ক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তার নিজের পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে সহায়তা করা" [The function of Education

ব্যক্তিজীবন বিকাশের বিভিন্ন দিক

is conceived to be the adjustment of man to his environment which contemplates man's adaptation to and the reconstruction of his environment to the end that the most enduring satisfaction may accrue to the individual.] এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরও একটি সুন্দর উক্তি আছে : "মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীত গ্রীষ্মে কোন কালে আমাদের মুখ ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশী শিক্ষিত, অর্থাৎ বাহিরের সঙ্গে কি করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহা সে ঠিক জানে।"

শিক্ষা যে শধু বাহ্যিক সংগতি-বিধানে সহায়তা করবে তা নয়, ব্যক্তি-জীবনের সুষম বিকাশের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকেও সাহায্য করবে। ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করে তার নৈতিক মূল্যবোধ জাগরণের ওপর। এই নৈতিক মূল্যবোধ তার মধ্যে আসবে যথার্থ শিক্ষার দ্বারা। শিক্ষার গতি হবে দ্বি-মুখী।

মন্তব্য

ব্যক্তি-জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রকে দুই অংশে ভাগ করা যায়। একটা হ'ল তার বাহ্যিক জগৎ (external aspect), অপরটা হ'ল তার অন্তর্জগৎ (internal aspect)। অর্থাৎ, ব্যক্তিজীবনের দুটো দিক্ আছে। প্রথমতঃ, বহির্জগতে শিশু চায় পরিবেশের সঙ্গে সংগতি-বিধান ক'রে বেঁচে থাকতে। যে পরিবেশ তাকে উত্তেজিত করছে, বিভিন্ন উদ্দীপকের (stimulus) দ্বারা তাকে বশে আনতে চায় সে। দ্বিতীয়তঃ, তার অন্তর্জগতে যে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, তাকেও সে চরিতার্থ করতে চায়। তার এইসব আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে বুদ্ধিবৃত্তি, প্রক্ষোভ এবং বিভিন্ন ধরনের নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে। আদর্শগত দিকে আবার বলা যেতে পারে—ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের ধারা জীবনের উন্নততর মূল্যবোধের (Higher value) দিকেও প্রবাহিত হয়। তার এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে। তাই শিক্ষার কাজ হবে ব্যক্তিকে বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন ক'রে তার সুষম বিকাশে সহায়তা করা। রস (Ross) এ সম্পর্কে বলেছেন—"Education must be religious, moral, intelltectual and aesthetic. None of these aspects may be neglected if a harmonious balanced personality is to be the result." মহাত্মা গান্ধীজিও একই কথা বলেছেন তাঁর শিক্ষা-দর্শনের ভেতর।

[দুই] শিক্ষার কাজ—সমাজ-কল্যাণ
(Social welfare as function of Education)

আজকে যে সব শিশুরা শিক্ষালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, কাল তারাই হবে সমাজের ধারক। সুতরাং, ব্যক্তিকে সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলা শিক্ষার আর এক প্রধান কাজ। এখন প্রশ্ন হ'ল, ব্যক্তিকে সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে শিক্ষা দিতে হ'লে লক্ষ্য রাখতে হবে বিশেষভাবে সমাজের দিকে। তাকে এমনভাবে

শিক্ষা দিতে হবে, যাতে ক'রে সে সমাজ-কল্যাণময় পথে এগিয়ে যেতে পারে। এখন সমাজের কল্যাণ কোন্ কোন্ দিক্ থেকে আসবে? সমাজবিদ্‌দের মতে সমাজ-কল্যাণ সম্ভব দু'ভাবে—এক হ'ল সমাজ-সংরক্ষণে (Social conservation), দ্বিতীয় হ'ল—সমাজ-অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখায় (Continuance of social progress)। দার্শনিক মিল (Mill) শিক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে তিনি শিক্ষার এই দু'ধরনের কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—"Education includes the culture which each generation purposely gives to those who are to be its successors in order to qualify them for at least keeping up, and if possible, raising improvement that has been attained." তা'হলে প্রকৃত শিক্ষার কাজ হবে ব্যক্তি-জীবনের উৎকর্ষণের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ আনা। পূর্বোক্ত দুই দিক্ থেকে ব্যক্তিকে সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে হ'লে তাকে সমাজের সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতিনীতি ইত্যাদির সঙ্গে যথাযথভাবে পরিচিত করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় সংঘটিত হবে এবং শিক্ষার দ্বারাই তাদের অনুশীলন এবং সংরক্ষণ সম্ভব। যুগ যুগ ধরে মানুষ যে সব অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছে, আজকের সমাজে বাস করতে গেলে প্রত্যেক মানুষকে তার যোগ্য অধিকারী হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। যদি মানুষ এইসব অতীত বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকে বঞ্চিত হয়, তবে সমাজ-ব্যবস্থাই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই শিক্ষার মাধ্যমে অতীত এইসব অভিজ্ঞতা এবং ভাবধারার সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। এতে ক'রে সমাজ যেমন চলমান থাকবে, তেমনি ব্যক্তিজীবনেরও শ্রমেব লাঘব হবে। প্রত্যেক মানুষকে যদি জীবনের সমস্ত পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য সেইসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তবে মানুষের জীবন হবে বিষময়। মানুষ বুদ্ধিমান জীব হিসেবে সমাজ-সংরক্ষণের অন্তরালে প্রাচীন অভিজ্ঞতা ও ভাবধারার সহজ সঞ্চালন চায়। আর তা সম্ভব হচ্ছে শিক্ষার দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"জীবনধর্মকে সংযত করিয়া সমাজধর্মের অনুকূল করাই সামাজিক জীবের শিক্ষার প্রধান কাজ।"

সমাজ-সংরক্ষণ

আবার অন্য এক দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে আমরা দেখি, শিক্ষাকে সমাজ-কল্যাণের অগ্রগতির দিকেও নজর দিতে হবে। মানুষেব সমাজ জড় বা স্থবির নয়, গতীয়-ধর্মী (Dynamical)। সমাজ হ'ল সতত পরিবর্তনশীল জৈবিক সত্তারই অনুরূপ। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, সমাজ-কল্যাণের সংরক্ষণের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা শিশুকে যদি নিয়মমাফিক পুনরাবৃত্তিমূলক শিক্ষা দিই, তাহলে সমাজ-জীবনে অভিনবত্ব আসবে কি ক'বে, সমাজের অগ্রগতি কিভাবে সম্ভব হবে? কিন্তু সমাজের অগ্রগতি (Social progress) ছাড়া সমাজের জীবনীশক্তিই থাকে না। একমাত্র প্রকৃত শিক্ষা এই দুই পরস্পর-বিরোধী ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। আধুনিক যুগের মানুষ যদি খাদ্যান্বেষণের জন্য আদিম পন্থা অবলম্বন করে, সেটি যেমন হাস্যাস্পদ হবে, তেমনি হবে বেদনাদায়ক।

সামাজিক অগ্রগতি

প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সমাজ-অগ্রগতিকে তার নিজের ক্ষমতানুযায়ী শক্তি প্রয়োগ করতে না শেখে, তাহ'লে সমাজ স্থবির হ'য়ে যাবে। সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে তোলার জন্য ব্যক্তিকে অতীত অভিজ্ঞতা, সংস্কার ও ধারণার অধিকারী করলেই শুধু চলবে না, তাকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যার দ্বারা সে ঐ সব অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস এবং পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে সভ্যতার অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখতে পারে। কোনার (Conner) এ সম্পর্কে সুন্দর উক্তি করেছেন, সেটা উদ্ধৃত করছি: "If generation had to learn for itself what had been learned by its predecessors, no sort of intellectual or social development could be possible and the present state of society would be little different from the society of the old stone age." সুতরাং, শিক্ষার প্রধান কাজ হবে ব্যক্তিকে উন্নততর সমাজব্যবস্থা-স্থাপনের অধিকারী ক'রে গড়ে তোলা। শিক্ষা সমাজ সংরক্ষণ ও সমাজ-উন্নয়ন এই দু'য়ের উপযোগী করে গড়ে তুলবে ব্যক্তি-জীবনকে —এটাই হবে তার প্রকৃত কাজ।

[তিন] শিক্ষার কাজ ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের অভিমুখিতা নির্ণয়
(Determining direction of individual development)

"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতগময়।"—এই হ'ল শিক্ষার গতি-নির্ণায়ক কাজ। অসত্য থেকে সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে এবং মর-জগতের বন্ধন মুক্ত করে অমৃতলোকের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে শিক্ষা। মানবশিশু জন্মের পর থেকেই সামাজিক আচরণ করতে পারে না। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা তার আচরণধারার বিকাশসাধন করতে চাই। যে সব সংস্কার এবং কর্মপ্রবণতা নিয়ে সে জন্মায়, তার পরিপূর্ণ বিকাশ করাই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য। এখন এই বিকাশ কোন্ পথে হবে, সে সম্বন্ধে যদি শিক্ষকের ধারণা না থাকে, তা'হলে সেই বিকাশের ধারা অনির্দিষ্ট বন্ধনহীন লক্ষ্যহীনতার পথে প্রবাহিত হবে। তাই শিক্ষার কাজ যে শুধুমাত্র জীবনের বিকাশসাধন তাই নয়; তার গতি-নির্ণয় করাও বটে। কোন্ উন্নততর জীবনাদর্শের দিকে জীবন-প্রবাহ বেগবান হবে, তা নির্ণয় ক'রে দেবে শিক্ষা।

জীবন-বিকাশের গতি-নির্ণয়

এই বিকাশের গতি স্বভাবতই হবে দ্বি-মুখী। প্রথমতঃ, শিক্ষা হবে বহিঃপরিবেশমুখী (External environment), যার মাধ্যমে হবে প্রাকৃতিক পরিবেশের (Natural environment) সঙ্গে সার্থক সংগতি-বিধান এবং সমাজ-পরিবেশের (Social environment) সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা হবে আন্তর-পরিবেশমুখী (Internal environment), যার মাধ্যমে ব্যক্তির আন্তরিক চাহিদা ও প্রবণতা তৃপ্তিলাভ করবে এবং আকাঙ্ক্ষিত দিকে বিকাশলাভ করবে। তবে শিক্ষার উদ্দেশ্যের দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে শিক্ষার কাজ হবে ব্যক্তির আন্তর-পরিবেশমুখী বিকাশে বিশেষভাবে

জীবন-বিকাশের গতি দ্বি-মুখী

সহায়তা করা। কারণ যে কোন বহিরঙ্গ দিকই বিশেষ বিশ্লেষণে আন্তরিক কোন অবস্থা থেকেই সৃষ্ট। ব্যক্তির এই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পূর্বোক্ত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা এই পথেই জীবন-বিকাশের সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

জীবনের গতিময়তার তাৎপর্য

জীবনের গতি-নির্ণয়কে সার্থক করা যায় দু'ভাগে। একটা হ'ল প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের (Direct control) দ্বারা, অপরটা হ'ল ব্যক্তিগত নির্দেশনা (Personal guidance) দ্বারা। প্রত্যক্ষভাবে আচরণের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব দৈহিক শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিধির মাধ্যমে। কিন্তু এই ধরনের বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব হয় খুবই স্বল্পস্থায়ী। এই শিক্ষা তার কাছে বোঝাস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়। তার প্রতি শিক্ষার্থীর কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির আচরণের মধ্যে আমরা স্থায়ী পরিবর্তন আনতে চাই। আর এই স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শিশু এবং শিক্ষকের পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। শিক্ষক ছাত্রদের আস্থা নিয়ে তাদের নিজ নিজ সম্ভাবনা অনুযায়ী তাদের জীবন-বিকাশের গতি স্থির করে দেবেন। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে গতির লীলা চলছে, সেই ভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যেও জাগ্রত করতে হবে। তবেই তো সে আপনবেগে এগিয়ে যাবে। নদী যে ছুটে চলেছে, তা তার আত্মগতিতে, বাইরের কোন শক্তির প্রভাবে নয়। মানুষের জীবনও সেই স্বাভাবিক গতিধর্ম লাভ করুক ; তার চিরচঞ্চল অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অমৃতলোকের দিকে ধাবিত হোক। জগৎ-স্রোতে ভেসে চলার এই মন্ত্রে শিক্ষার্থীর দীক্ষা হোক শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা ও শিক্ষক তার মনে সেই গতি এনে দিন, যার ফলে সে স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে উচ্চারণ করবে—'তৎত্বং পূষন্নাপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে'। এটাই হবে প্রকৃত শিক্ষা এবং প্রকৃত শিক্ষকের কাজ।

॥ শিক্ষার বস্তুধর্মী কার্যাবলী ॥
(Objective functions of Education)

ইতিপূর্বে শিক্ষার কাজ হিসাবে যে তিনটি দিক্ সম্পর্কে আলোচনা করলাম, তার মধ্যে শিক্ষার সকল রকম কাজকেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু এই বিস্তৃত ক্ষেত্রগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নির্দেশ করতে পারি। এই ধরনের বিশ্লেষণ করলে শিক্ষার কাজগুলি অনেকটা বিশেষধর্মী ও বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে।

বস্তুধর্মী কার্যাবলী কি ?

এই ধরনের বিশিষ্ট বস্তুনির্ভর বাস্তব কার্যাবলীকে শিক্ষার বস্তুধর্মী কার্যাবলী (objective functions) বলা হ'য়ে থাকে। স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগতে পারে, এই জাতীয় বস্তুধর্মী কার্যাবলী সম্পর্কে আমাদের জানার প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের প্রথমতঃ জানার দরকার, শিক্ষার কাজ (Function of education) সম্পর্কে জ্ঞান

আমাদের কি কাজে আসে। শিক্ষার কাজ সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান (Theoretical knowledge) সংগ্রহ নয়। শিক্ষার কাজ সম্পর্কে ধারণা থাকলে এই প্রক্রিয়াকে সুপরিচালিত করা যায়। শিক্ষা-পরিচালনার কাজ যেহেতু একটি বস্তুধর্মী কাজ, সেহেতু সেখানে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। এই কারণে, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার বস্তুধর্মী কাজ (Objective function) এবং শিক্ষার বস্তুধর্মী লক্ষ্য (Objective of education) ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। তাই শিক্ষার বস্তুধর্মী কাজগুলি নতুন কিছু সংযোজন নয়; পূর্ব আলোচনার বিশ্লিষ্ট ফল হিসাবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত, শিক্ষার বস্তুধর্মী কাজ অনেক হ'তে পারে। কিন্তু তার সবগুলি এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। শুধু নমুনা হিসাবে কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ব্যক্তিমুখী কাজ

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, শিক্ষার একটি প্রধান কাজ হ'ল ব্যক্তি-জীবনের সুষম উন্নয়ন করা। এখন দেখা যাক্, ব্যক্তিজীবনের সুষম উন্নয়ন সাধন করতে গিয়ে শিক্ষা ব্যক্তি-জীবনের কোন্ কোন্ দিকে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। এইসব পরিবর্তনের দিকগুলিকে শিক্ষার বস্তুধর্মী কাজের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন—

[এক] শিশুর বা ব্যক্তির ব্যক্তিগত সকল রকম অভিযোজনে সহায়তা করা শিক্ষার কাজ।

[দুই] অভিযোজন করতে গিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান সংগ্রহ করায় ব্যক্তিকে সহায়তা করা শিক্ষার একটি কাজ।

[তিন] ব্যক্তিজীবনে যে সকল অভিজ্ঞতা আত্মসক্রিয়তায় সংগৃহীত হয়, তা বহুমুখী। সেই অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে না পারলে, ব্যক্তি-জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হবে। শিক্ষার কাজ শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা-সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সেই অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করাও তার কাজ।

[চার] পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চারিত্রিক বিকাশসাধন করা শিক্ষার একটি প্রধান কাজ। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত কতকগুলি জৈব-মানসিক প্রবণতার সমন্বয়ে তার চরিত্র গঠিত হয়। শিক্ষার মাধ্যমে ঐ জৈব-মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশসাধন করা যায়।

[পাঁচ] ব্যক্তির প্রক্ষোভিক জীবনের বিকাশসাধন করা শিক্ষার কাজ। প্রক্ষোভিক বিকাশ বলতে আমরা বিশেষভাবে প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রিত প্রকাশকেই বুঝি। যে ব্যক্তি সংযত প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে, নিজের অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করতে পারে, সে-ই পরিণমনের দিক থেকে উন্নত। শিক্ষার কাজ হ'ল এই প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

[ছয়] শিক্ষার আর একটি কাজ হ'ল, শিশুর আচরণকে সমাজ-নির্ধারিত পথে পরিচালিত করা, অর্থাৎ শিশুর আচরণের সামাজিকীকরণ শিক্ষার কাজ। এই কাজের মাধ্যমে শিক্ষা সমাজের সংস্কারগুলিকে সংরক্ষণ করে।

[সাত] শিক্ষার্থীর মানসিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশসাধন করাও শিক্ষার কাজ। জন্মমুহূর্তে শিশুর মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলিকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত করা যেমন শিশুর কাজ, তেমনি নতুন বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে সংযোজন করাও শিক্ষার কাজ।

[আট] শিশুর মধ্যে যথোপযুক্ত আগ্রহ (Interest) সঞ্চার করা এবং তার আগ্রহের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা শিক্ষার কাজ।

[নয়] শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক দক্ষতার বিকাশসাধন করা আধুনিককালে শিক্ষার একটি প্রধান কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, ব্যক্তিকে জীবিকা-অর্জনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে না পারলে তার ক্ষেত্রে সামাজিক অপ্রতিযোজনের লক্ষণ দেখা দেবে এবং জীবন ব্যর্থ হবে। তাই বর্তমানে শিক্ষা বিশেষ পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে।

[দশ] শিক্ষার কাজ কেবলমাত্র কতকগুলি কৌশল আয়ত্তে সহায়তা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা-গ্রহণের উপযোগী মানসিকতা গঠন করাও শিক্ষার কাজ। আধুনিক অর্থে শিক্ষা জীবনব্যাপ্ত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীর জীবনে সারা জীবনকাল ধরে সক্রিয় থাকে, সেইরূপ নমনীয় মানসিকতা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে তোলা শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

শিক্ষা যেমন একদিকে ব্যক্তি-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি দায়িত্ব সম্পন্ন করে, তেমনি সমাজের দিক থেকেও তার কতকগুলি দায়িত্ব আছে। আধুনিক শিক্ষা সমাজের কিছু চাহিদা পরিতৃপ্ত করে। কারণ আধুনিক অর্থে শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process) এবং সমাজই তার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষা সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব বিশেষধর্মী কাজ সম্পাদন করে থাকে, সেগুলি হ'ল—

সমাজমুখী কাজ

[এক] সমাজের অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ। অর্থাৎ, শিক্ষা সমাজের অতীত আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সংস্কার ও কৃষ্টিকে ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে সঞ্চারিত করে। সমাজের ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখা শিক্ষার একটি প্রধান কাজ।

[দুই] শুধু মাত্র অতীত অভিজ্ঞতাকে শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত করার মধ্যে শিক্ষার কাজ সীমাবদ্ধ নয়, সঙ্গে সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতাবলী সঞ্চয় করাও তার কাজ। অর্থাৎ শিক্ষা সমাজের আধুনিকীকরণে (Modernization) সহায়তা করে থাকে। শিক্ষার কাজ হ'ল সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করা।

[তিন] শিক্ষার আর একটি প্রধান কাজ হ'ল সামাজিক বৈষম্য দূর করা। গতানুগতিক সমাজের মধ্যে আমরা সামাজিক শোষণের (Social exploitation) প্রবণতা লক্ষ্য করি। আধুনিককালে প্রত্যেক রাষ্ট্রই কামনা করে শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হ'লে চাই নাগরিকদের উপযুক্ত মানসিকতা। শিক্ষা এই মানসিকতা-গঠনে সহায়তা করে বলে বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রে শিক্ষার উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

[চার] শিক্ষার আর একটি প্রধান কাজ হ'ল সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। অনেকের ধারণা, শিক্ষা সামাজিক বিনিয়োগের (investment) একটা দিক। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনে যে উন্নতি হয়, তার দ্বারা ব্যক্তি সামাজিক সঞ্চয়ে সহায়তা করে। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতিতে শিক্ষা সহায়তা করে থাকে।

[পাঁচ] সমাজ-জীবনে বহু রকমের দ্বন্দ্ব (Conflict) বর্তমান। এই দ্বন্দ্বগুলি থাকা সমাজের পক্ষে স্বাভাবিক। আর এই দ্বন্দ্বের উপশমের অগ্রগতি হয়ে থাকে। শিক্ষার একটি প্রধান দায়িত্ব হ'ল এই সামাজিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো। আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক সহনশীল মনোভাব বর্তমানে সকল সুস্থ ব্যক্তির কাছে কাম্য, উপযুক্ত শিক্ষা শিশুদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বোধ জাগ্রত কবতে পারে।

শিক্ষার এই যে বিভিন্ন বস্তুধর্মী লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হ'ল, এইগুলিই সব নয়। শিক্ষা এমন একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া যে, তা জীবনের সকল অঙ্গকে স্পর্শ করে, তাই তার কাজকে বিশেষিত করা খুবই দুরূহ। আমরা শিক্ষার বিভিন্ন কাজগুলির মধ্যে যেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলির কথাই উল্লেখ করলাম মাত্র। প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও স্মরণ রাখার দরকার যে, শিক্ষার বস্তুধর্মী ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজগুলিও চিরস্থায়ী নয়।

মন্তব্য

মানুষের জীবন-পরিবেশ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে জীবনের মান ও মূল্যবোধের (values) পরিবর্তন হতে বাধ্য। শিক্ষার ব্যক্তিগত ও সামাজিক বস্তুধর্মী কাজগুলির প্রকৃতিও নির্ধারিত হয় এই মূল্যবোধের দ্বারা, তাই তারও পরিবর্তন হ'তে বাধ্য। তবে শিক্ষার যে কোন পর্যায়ে তার কাজের সীমা নির্ধারণ করে দিচ্ছে ব্যক্তিজীবনের প্রকৃতি ও পরিবেশ। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে শিক্ষার কাজও তাই শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মত পরিবর্তনশীল। সুতরাং, এই দিক থেকে বিচার করলে, এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, শিক্ষার সাধারণধর্মী কাজগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। স্থায়ী সাধারণধর্মী কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা ও জীবন-পরিবেশের বাস্তব অনুশীলন প্রয়োজন। আর

তাই বাস্তব ধর্মী কাজগুলির মধ্য দিয়ে, সাধারণধর্মী দায়িত্ব সম্পাদিত হয়। শিক্ষার এই দ্বিমুখী কার্যাবলীর তালিকা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হ'ল—
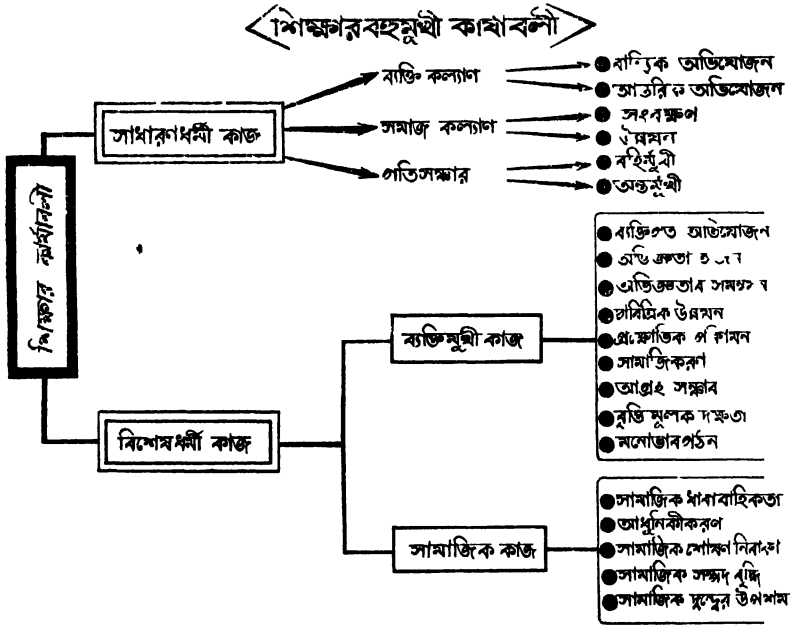
সারসংক্ষেপ

শিক্ষার কাজ কি, তা বিচার করতে গেলে মানুষের জীবন-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মানুষ একক ব্যক্তি হিসাবেও যেমন সত্য, সামাজিক জীব হিসাবেও তার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। তাই শিক্ষা তার জীবন প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে যেমন ব্যক্তিগত দিকের প্রতি নজর রাখে, তেমনি সমাজের দিকেও নজর রাখে। কারণ, সমাজ ভাল হ'লে ব্যক্তিও ভাল হবে; আবার ব্যক্তির ভাল হ'লে সমাজের ভাল হবে। এই কারণে শিক্ষার প্রধান দুটি কাজ হ'ল—(১) ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা ও (২) সমাজের কল্যাণ সাধন করা। সমাজ-কল্যাণ করতে গিয়ে শিক্ষা সমাজের অগ্রমুখী গতি নির্ধারণ করে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কৃষ্টি ও রীতিনীতির সংরক্ষণ করে থাকে। তাই শিক্ষার একটি প্রধান কাজ হ'ল—(৩) ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের বিকাশের গতি ও দিক্ নির্ণয় করা।

শিক্ষার এই সামগ্রিক কাজগুলিকে বিশ্লেষণ করলে, বিশেষ কতকগুলি বস্তুধর্মী কাজেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এই বস্তুধর্মী কাজগুলিও দু'ধরনের। কতকগুলি ব্যক্তি জীবন-কেন্দ্রিক এবং কতকগুলি সামাজিক চাহিদা-কেন্দ্রিক। তবে এই বস্তুধর্মী কাজগুলি শিক্ষার যে পরিধি নির্ধারণ করেছে, তা পরিবর্তনশীল। কারণ ব্যক্তি ও সমাজের সতত পরিবর্তন হচ্ছে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the various functions served by 'education' in a society.
[সমাজ-জীবনে 'শিক্ষা' যে কাজগুলি সম্পন্ন করে, সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।]

2. "Education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his possibilities."—Discuss how education serve these functions.
["শিক্ষা হ'ল ব্যক্তিজীবনের সেইসব গুণাবলীর বিকাশ যেগুলির দ্বারা সে পরিবেশকে আয়ত্তে এনে নিজের সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবায়িত করতে পারে"—বিবৃতিটির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা কিভাবে এই কাজ সম্পাদন করে, আলোচনা কর।]

3. "True education educates the whole man."—Explain.
["প্রকৃত শিক্ষা পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়।"—ব্যাখ্যা কর।]

4. "Lead me from untruth to truth, from darkness to light, from mortality to immortality."—Discuss how education helps man realising such objectives.
["অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতগময়"—শিক্ষা কিভাবে মানুষকে এই উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আলোচনা কর।]

5. Mention the various specific objective functions of education.
[শিক্ষার বস্তুধর্মী কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর।]

6. What are the functions of Education ?
[শিক্ষার বিভিন্ন কাজগুলি কি কি ?]

শিক্ষার উপাদান
Factors of Education

শিক্ষাকে তত্ত্বগত দিক্ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, শিক্ষা একটি আদর্শ ধারণা (ideal concept) এবং এই ধারণার মধ্যে যথেষ্ট দার্শনিক ও তাত্ত্বিক যুক্তির অবকাশ আছে। কিন্তু শিক্ষার তত্ত্বগত দিক্ (Theoretical aspect), তা যতই বিমূর্ত এবং আদর্শগত হোক-না-কেন, ব্যবহারিক দিক্ থেকে তাকে বিচার করতে গেলে দেখা যায়, তার সর্বশেষ পরিণতি হ'ল—তা কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য যাই হোক-না-কেন, সেই উদ্দেশ্যে পেঁছোতে গেলে দরকার অনুশীলনের। এই অনুশীলন সার্থকভাবে সম্ভব নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। তাই পৃথিবীর যে-কোন দেশেই আজ আমরা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার (Institutionalized fromal education) প্রচলন দেখতে পাই। এই শিক্ষাব্যবস্থার কতকগুলি অঙ্গ আছে, যাদের আমরা এখানে বলছি শিক্ষার উপাদান (Factors of Education)। অর্থাৎ, শিক্ষার উপাদান বলতে আমরা কতকগুলো খণ্ড খণ্ড অংশকে বলছি, যাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা। সাধারণতঃ এই উপাদান চার ধরনের—শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠ্যক্রম এবং পাঠ-পরিবেশ বা শিক্ষালয়। এখানে এদের তাৎপর্য সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

[এক] শিক্ষার উপাদান—শিক্ষার্থী
(Educand or Child as Factor of Education)

শিক্ষার সংজ্ঞা, তাৎপর্য ইত্যাদি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করেছি—শিক্ষার দ্বারা আমরা ব্যক্তির বা শিশুর আচরণধারার মধ্যে কিছু পরিবর্তন করতে চাই। তাকে এমন কিছু কৌশল আয়ত্ত করাতে সচেষ্ট হই যার দ্বারা সে যথাযথভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধান করতে পারে। সুতরাং যে কোন শিক্ষাব্যবস্থার মূলে একজন শিশু বা শিক্ষার্থী অবশ্যই থাকার প্রয়োজন, যার আচরণধারার আমরা পরিবর্তন সাধন করব। শিক্ষার্থী তার জন্মগত সম্ভাবনাকে বিকশিত করবে শিক্ষার প্রভাবে। তারই উদ্দেশ্যে শিক্ষা উৎসর্গীকৃত। অর্বাচীন, অপরিপক্ক শিশুরই যদি অস্তিত্ব না থাকে, তবে শিক্ষারও কোন প্রয়োজন নেই। তাই শিক্ষার প্রধান উপাদান হ'ল শিশু বা বৃহত্তর অর্থে শিক্ষার্থী। এই উপাদানের বৈশিষ্ট্য হ'ল সে দেহ-মন-বিশিষ্ট জৈবিক সত্তা। তার মনোময় জগৎই শিক্ষার-ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার প্রবৃত্তি বা সহজাত প্রবণতা (instinct) আছে, তার বুদ্ধি (Intelligence) আছে, আকাঙ্ক্ষা বা প্রেষণা (Desire and motives)

শিক্ষার্থী

তার মধ্যে সর্বদা জাগরূক, আগ্রহ আর প্রক্ষোভ (Interest and Emotion) সদাই সক্রিয় তার মধ্যে। এছাড়া, তার বৈশিষ্ট্য হ'ল সে নমনীয় (Plastic)। শিক্ষার দ্বারা তার বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং সবচেয়ে বড় কথা হ'ল সে সর্বদাই শিক্ষা-গ্রহণে ইচ্ছুক।

[দুই] শিক্ষার উপাদান—শিক্ষক
(Teacher or Educator as factor of Education)

শিক্ষক ছাড়া কোন শিক্ষাব্যবস্থা চলতে পারে না, বিশেষ ক'রে বর্তমান যুগে জীবনযাত্রার রীতি যখন অত্যন্ত জটিল। আদিম সমাজ-ব্যবস্থায় যখন নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না, তখন জীবনধারণের বিভিন্ন কৌশল শিশুরা অনুকরণের দ্বারা নিজেরাই কিছুটা আয়ত্ত করত। তবে সেখানেও পিতামাতা বা অন্যান্য বয়স্কদের প্রভাব তাদের উপর ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়মতান্ত্রিক রূপ ধারণ করেছে, সেদিন থেকেই শিক্ষকের প্রচলন চলে আসছে। তাই শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গ। তাঁর কাজের যতই পরিবর্তন হোক-না কেন, তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিহার্য। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক বা 'গুরুই' ছিলেন প্রধান। তাঁকে জ্ঞানের আধার হিসেবে বিবেচনা করা হ'ত, আর সেই জ্ঞান শিষ্য বা শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনি সঞ্চালনের প্রচেষ্টা করতেন। বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার যুগে তাঁর দায়িত্বের পরিবর্তন হয়েছে। তিনি কাজ করবেন পরামর্শদাতার, পথ-প্রদর্শকের। তিনি তাঁর আদর্শ ব্যক্তিত্ব দিয়ে শিশুকে প্রকৃত জীবনাদর্শের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। বিবেকানন্দ বলেছেন—"Like fire in a piece of flint, knowledge exists in mind; suggestion is the friction which brings it out."—চকমকি পাথরে যেমন আগুন অন্তর্নিহিত শক্তি, জ্ঞানও তেমনি মানুষের মধ্যে সুপ্ত। বহির্জগতের যে কোন ইঙ্গিত ঘর্ষণের কাজ ক'রে সেই জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ হ'ল এই ইঙ্গিত দেওয়া। তিনি হবেন শিক্ষার্থীর—"Friend, philosopher and guide"।

শিক্ষক

[তিন] শিক্ষার উপাদান—পাঠ্যক্রম
(Curriculum as factor of Education)

শিক্ষার তৃতীয় উপাদান হ'ল পাঠ্যক্রম। অর্থাৎ, শিশুর বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্বাচিত জীবন-অভিজ্ঞতা (Life experience) আমরা শিক্ষার মাধ্যমে তার সামনে উপস্থাপন করি। একে আমরা বলছি পাঠ্যক্রম। সাধারণ অর্থে পাঠ্যক্রম বলতে বোঝায় শিক্ষালয়ে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের তালিকাকে। আধুনিক অর্থে কিন্তু পাঠ্যক্রম ঠিক তা নয়। শিক্ষালয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ সব অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপকেই বলা হয় পাঠ্যক্রম। শিক্ষার উপযোগিতা অনেকাংশে এই পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে। আমাদের শিক্ষার

পাঠ্যক্রম

উদ্দেশ্য যদি ব্যক্তিত্বের বিকাশের মাধ্যমে সমাজ-উন্নয়ন করা হয়, তবে শিশুর বিকাশের ধারাকে সেদিকে প্রবাহিত করার জন্য পূর্ব পরিকল্পনার দরকার। পরিকল্পনানুযায়ী বিকাশমুখী অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন ও সংযোগ দরকার। পাঠ্যক্রম এই হিসেবে শিক্ষার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন।

[চার] শিক্ষার উপাদান—শিক্ষালয় বা শিক্ষার মাধ্যম (Educational institutions or Agencies of Education as factors)

শিক্ষার জন্য যেমন—শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষণীয় বস্তু বা পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন, তেমনি প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন। অর্থাৎ যেখানে শিক্ষাকার্য সম্পন্ন হবে। সমাজ-সংগঠনের মধ্যেই সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষালয়ের সৃষ্টি হয়েছে অনেক আগেই। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হ'ল ব্যক্তিকে বা শিক্ষার্থীকে জ্ঞানমূলক (intellectual), কৃষ্টিমূলক (cultural) এবং সামাজিক (social) অভিজ্ঞতা-অর্জনের সুযোগ দেওয়া। শিক্ষালয় বলতে আমরা বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সব রকম প্রত্যক্ষ শিক্ষার মাধ্যমকে বলছি। এছাড়া, আরও যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান (social institution) আছে, তারাও পরোক্ষভাবে শিক্ষাদানে সহায়তা করে। যেমন—রাষ্ট্র (state), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (religious institution), পরিবার (family) ইত্যাদি। এদেরই আমরা সামগ্রিকভাবে বলছি শিক্ষার মাধ্যম (Agencies of Education)। এর ভেতরে বিভিন্ন ধরনের জনসংযোগ-সংস্থাও (Mass Communication Media) পড়ে। যেমন—সংবাদপত্র, বেতার, পল্লীগোষ্ঠী ইত্যাদি। এরা প্রত্যেকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার উপাদান।

শিক্ষালয়

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারা যায়, শিক্ষা প্রধানতঃ চারটি উপাদানের দ্বারা সংগঠিত। এদের মধ্যে কাউকে বাদ দিয়ে শিক্ষাকার্য চলতে পারে না। যে কোন সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থায় এই চারিটি উপাদানের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন। স্যার গ্রাহাম বেলফোর (Graham Belfour) তাঁর বিদ্যালয়-পরিচালনা সংক্রান্ত (School Administration) বই-এ শিক্ষার কাজ (Function of Education) সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে এই চার ধরনের উপাদানের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—'The function of the administration of education is to enable the right pupil to receive the right education (the Curriculum) from the right teacher under conditions (institution) which will enable the pupils best to profit by their training.' অর্থাৎ, এক কথায় বলতে গেলে, শিক্ষা হ'ল সুশিক্ষকের নির্দেশনায় সুগঠিত প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষালয়ে সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর সুষম জীবন-বিকাশের প্রচেষ্টা।

মন্তব্য

॥ শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ॥
(Mutual Relation between factors of Education)

নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার চারটি মূল উপাদান আবশ্যিক—শিক্ষার্থী (Pupil), শিক্ষক (Teacher), পাঠ্যক্রম (Curriculum) ও শিক্ষালয় (School)। অনিয়ন্ত্রিত ও নিয়ম-বহির্ভূত (informal or non-formal) শিক্ষাব্যবস্থায় এই উপাদানগুলির কোন একটি বা তার বেশী সংখ্যক নাও থাকতে পারে। তাই ঐ ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমাদের আলোচনার বাইরে রেখে আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর যে কোন দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে এই চারটি উপাদান দেখা যায়। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখার দরকার, শিক্ষার এই উপাদানগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়। সামগ্রিকভাবে শিক্ষাকে আমরা একটি গতীয়-প্রক্রিয়া (Dynamic process) হিসাবে বিবেচনা করেছি। শিক্ষার এই গতিধর্মিতা নির্ভর করে তার বিভিন্ন উপাদানগুলির ওপর। ফলে, উপাদানগুলি (factors) কোনটিই স্থির (Fixed) নয়। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষালয় প্রত্যেকের প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। তাদের মধ্যে যে কোন একটির পরিবর্তন অপরগুলিকে প্রভাবিত করে। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ বলেছেন, শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানগুলি পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়াশীল সম্পর্কে (Functional relation) আবদ্ধ। অর্থাৎ, উপাদানগুলির প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির উপর ক্রিয়া করে এবং তাদের পারস্পরিক এই ক্রিয়ার (Mutual reaction) দ্বারা সামগ্রিকভাবে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। তাই আধুনিক অর্থে শিক্ষা কেবলমাত্র উপাদানগুলির (factors) সমবায় নয়; শিক্ষা হ'ল উপাদানগুলির ক্রিয়াশীল, গতীয় সমন্বয় (Dynamic Organisation)। এই ক্রিয়াশীল গতীয় সমন্বয়ের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য জানতে হ'লে, শুধুমাত্র উপাদানগুলির পৃথক অনুশীলন করলে চলবে না, তাদের মধ্যেকার ক্রিয়াশীল সম্পর্কের প্রকৃতিটিও উপলব্ধি করতে হবে।

প্রস্তাবনা

প্রথমতঃ, শিক্ষক (Teacher) ও শিক্ষার্থী (pupil) এই দুটি উপাদানের কথা ধরা যাক্‌। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই শিক্ষার মানবীয় সত্ত্বা। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুই মানবীয় সত্ত্বা সহ-অবস্থান করে। সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী যে কোন দুটি বা তার অধিক মানুষ পাশাপাশি অবস্থান করলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একজনের কাজ (action), অনুভূতি (feeling), অভিজ্ঞতা (experience) অন্যজনকে প্রভাবিত করে। আর এই ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ-জীবনের সজীবতা বজায় থাকে। শিক্ষালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণ যখন সমবেতভাবে বসবাস করে, তখন তাদের মধ্যেও এই সামাজিক নিয়ম কাজ করে। শিক্ষার্থীরা যেমন শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, জীবনাদর্শ ও প্রশিক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মনঃপ্রকৃতি অনুশীলন ক'রে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন। গতানুগতিক শিক্ষায় ধারণা ছিল, শিক্ষকের কাজ কেবলমাত্র

দান করা, আর শিক্ষার্থীর কাজ কেবলমাত্র গ্রহণ করা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে বলা হ'য়েছে, তাদের মনঃপ্রকৃতি ও কাজ সমধর্মী। এখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই দাতা ও গ্রহীতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। আর তা না হ'লে শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকের এই মনোভাব পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছেন, "গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যায়, তাহ'লে তিনি ছেলেদের ভার নেওয়ার অযোগ্য হন।" শুধুমাত্র সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। তাই শিক্ষা-প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হওয়ার একটি প্রধান শর্ত হ'ল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতার সম্পর্ক। তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শিক্ষার গতি নির্ধারণ করে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, শিক্ষার এই দুই সজীব উপাদান পরস্পরের প্রতি আকর্ষণবলে (Force of mutual attraction) আবদ্ধ। কোন কারণে তাদের মধ্যে বিকর্ষণজনিত বল সৃষ্টি হ'লে শিক্ষা-প্রক্রিয়া সংঘটিত হবে না।

শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক

শিক্ষক ⇌ শিক্ষার্থী

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থী (Pupil) ও পাঠ্যক্রমের (Curriculum) মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা যাক। শিক্ষার এই দুটি উপাদানের মধ্যে একটি হ'ল মানবীয় সত্ত্বা, অপরটি হ'ল বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা সামগ্রী (Object experiences) যেগুলিকে মনোধর্ম দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধারণা করা হ'ত—পাঠ্যক্রম হ'ল কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি, আর শিক্ষার্থীর কাজ হ'ল, যে কোনভাবে ঐ সব অভিজ্ঞতাগুলিকে আয়ত্ত করা। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে আসুক আর না আসুক, পাঠ্যক্রমে সন্নিবেশিত অভিজ্ঞতাগুলি আয়ত্ত করাই হ'ল শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রধান কাজ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে এই ধারণাকে পরিত্যাগ করা হ'য়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী তার জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করবে। সে সেইসব অভিজ্ঞতাগুলি গ্রহণ করবে যেগুলি তার চাহিদা পরিতৃপ্তিতে সহায়তা করবে। যে অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর জীবনের কোন চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারে না, সে অভিজ্ঞতার মূল্য তার কাছে নেই। তাই পাঠ্যক্রমকে আংশিকভাবে হ'লেও শিক্ষার্থীর চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে হয়। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হয় শিক্ষার্থীর চাহিদার কথা চিন্তা ক'রে। এই দিক্ থেকে বিচার করলে বলা যায়, পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনশীলতা (Variability) নির্ভর করে শিক্ষার্থীর মনঃপ্রকৃতি ও চাহিদার পরিবর্তনের ওপর। অপর দিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অভিজ্ঞতাগুলি শিশুর বা শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে (Apperceptive mass) আলোড়িত করে নতুন অভিজ্ঞতার আঘাতে। ফলে, শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস ঘটায় এবং তার প্রভাবে উন্নততর জ্ঞান সংগ্রহের

শিক্ষার্থী-পাঠ্যক্রম সম্পর্ক

উপযোগী হ'য়ে গড়ে ওঠে। পাঠ্যক্রমের সুপরিচালনার দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীকে নিছক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সরবরাহ করি না; তাকে অভিজ্ঞতা-সংগ্রহের উপযোগী করে তুলি। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকে ক্রিয়াশীল করে তোলে; তার মনকে সক্রিয় করে তোলে। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থী ও পাঠ্যক্রমের মধ্যে সম্পর্ক হ'চ্ছে পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতার। একদিকে পাঠ্যক্রম মানব-মনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

শিক্ষক ⇌ পাঠ্যক্রম

ক'রে উপাদান সংগ্রহ করছে বা মানব-মন পাঠ্যক্রমকে উপাদান সরবরাহ করছে; অপরদিকে, পাঠ্যক্রম সেই উপাদানের দ্বারা মানব-মনকে ক্রিয়াশীল করে তুলছে। শিক্ষার এই দুই উপাদানের মধ্যে ক্রিয়াশীলতা না থাকলে, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার গতিধর্মিতা ব্যাহত হবে এবং জীবন ও শিক্ষা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষক ও পাঠ্যক্রমের (Teacher and Curriculum) মধ্যেকার সম্পর্কের বিচার করা যাক। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের কাজ ছিল পাঠ্যক্রমের সুপরিচালনা করা। কিন্তু আধুনিক অর্থে পাঠ্যক্রম একটি নির্দিষ্ট স্থায়ী অভিজ্ঞতাপুঞ্জ নয়। সেটিও পরিবর্তনশীল। সামাজিক ও ব্যক্তিগত চাহিদার ভিত্তিতে তারও পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকের কাজ হ'ল পারিপার্শ্বিক এই চাহিদাগুলি যথাযথভাবে অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের মধ্যে পরিবর্তন আনা। পাঠ্যক্রম শিক্ষার সজীব সত্বা নয়। তার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে সজীব সত্বা। সেই সজীব সত্বা শিক্ষাক্ষেত্রে হ'লেন শিক্ষক। এই অর্থে শিক্ষার এই দুই উপাদান পরস্পরনিরপেক্ষ নয়। শিক্ষক নিজের বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ ক'রে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেন। তাই পাঠ্যক্রমের পরিপূর্ণ সংগঠন (structure) শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ (observation) এবং মনোভাব (attiture) দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে বিপরীতমুখী প্রভাব বা প্রক্রিয়াও এক্ষেত্রে বর্তমান। পাঠ্যক্রম একবার নির্ধারিত হ'লে শিক্ষকের কাজের সীমাও নির্ধারিত হয়; শিক্ষক নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হন। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষককে কি কি দায়িত্ব পালন করতে হবে, শিক্ষার্থীদের কি ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে হবে, কি ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, এই সবকিছু

শিক্ষক-পাঠ্যক্রম সম্পর্ক

শিক্ষার্থী ⇌ পাঠ্যক্রম

পাঠ্যক্রম স্থির করে দিচ্ছে। সুতরাং, এক্ষেত্রেও দেখা যায় পাঠ্যক্রম (Curriculum) এবং শিক্ষক (Teacher), শিক্ষার এই দুই উপাদানের মধ্যেও পরস্পর ক্রিয়াশীল সম্পর্ক (Functional relation) বর্তমান। একে অপরকে নির্ধারণ করছে।

চতুর্থতঃ, আমাদের স্মরণ রাখার দরকার, শিক্ষার আর একটি উপাদান হল শিক্ষালয় (School)। এই উপাদানের সঙ্গে শিক্ষার অন্যান্য উপাদানগুলি সম্পর্ক

আলোচনা করতে গেলে, প্রথমেই পূর্বোক্ত সম্পর্কগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু বলার দরকার। শিক্ষার যে তিনটি মূল উপাদান শিক্ষার্থী (Pupil), শিক্ষক (Teacher) এবং পাঠ্যক্রম (Curriculum) পারস্পরিক ক্রিয়াশীল সম্পর্কে আবন্ধ, তাদের এই পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা-প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। শিক্ষার এই তিনটি উপাদানের মধ্যে সম্পর্ককে একটি ত্রিভুজের মাধ্যমে পরিবেশন করা যায়। কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না, শিক্ষা-প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় একটি বিশেষ পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে। শূন্য অবস্থায়, শিক্ষক-শিক্ষার্থী-পাঠ্যক্রম প্রতিক্রিয়া সম্পর্ক স্থাপিত হ'তে পারে না। যে পরিবেশে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং পাঠ্যক্রম বর্তমান, সেই পরিবেশেই এই ধরনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা সংঘটিত হ'তে পারে। এই পরিবেশ প্রদান করে শিক্ষালয় (School)। আমরা বৃহত্তর অর্থে বলি, সম্পূর্ণ বিশ্বপ্রকৃতিই শিক্ষা-পরিবেশ ; আর মানুষ ঐ বৃহত্তর বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সারা জীবন শিক্ষা ক'রে থাকে। এই ধারণার সঙ্গে আমাদের পূর্বোক্ত ধারণার কোন অমিল নেই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেও শিক্ষক-শিক্ষার্থী-পাঠ্যক্রম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে আবন্ধ হয়। কিন্তু, সেখানে এই উপাদানগুলির নৈকট্য শিক্ষালয়ের মত নয়। কারণ,

শিক্ষক-শিক্ষার্থী-পাঠ্যক্রম ও শিক্ষালয় সম্পর্ক
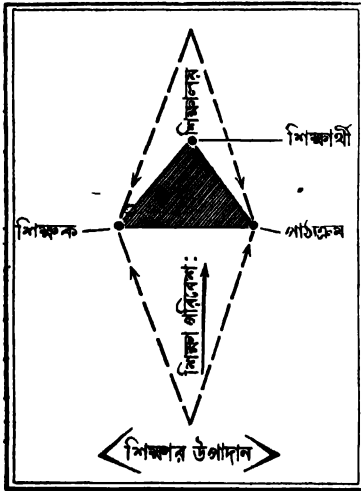
সে পরিবেশ আপেক্ষাকৃত অনিয়ন্ত্রিত। তাই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষালয় (School) অন্যান্য সকল উপাদানগুলির মধ্যে আনুপাতিক নৈকট্য বজায় রেখে তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে। শিক্ষার অন্যান্য উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে শিক্ষালয় একটি আবেষ্টনীর মধ্যে আবন্ধ রাখে। এই আবেষ্টনীর মধ্যে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং পাঠ্যক্রমের অবস্থান এমনভাবে থাকে যে, তাদের মধ্যে পাস্পরিক আকর্ষণজনিত বল সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। এই হিসাবে সেও অন্যান্য উপাদানগুলির সঙ্গে ক্রিয়াশীল সম্পর্কে আবন্ধ।

মন্তব্য

সুতরাং এই আলোচন্া থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার উপাদানগুলি নিষ্ক্রিয়-ভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে না। শিক্ষা-প্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার মূলে যেমন তাদের সক্রিয় ভূমিকা আছে, তেমনি পরস্পরকে সক্রিয় রাখার প্রচেষ্টাও তাদের মধ্যে আছে। তাই আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানে তাদের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি জানার জন্য ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নত গবেষণা হ'চ্ছে।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মতান্ত্রিক। এই নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার কতকগুলি অপরিহার্য অঙ্গ বর্তমান। এই অঙ্গগুলিকে বলা হয় শিক্ষার উপাদান। শিক্ষাকে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করার এই অঙ্গ বা উপাদানগুলির অনুশীলন অপরিহার্য হ'য়ে পড়েছে শিক্ষা-বিজ্ঞানে। শিক্ষার মূল চারটি উপাদান হ'ল—শিক্ষার্থী (Pupil), শিক্ষক (Teacher), পাঠ্যক্রম (Curriculum) এবং শিক্ষালয় (School)। এই অর্থে, সুশিক্ষকের নির্দেশনায়, সুগঠিত শিক্ষালয়ে, সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর ও শিক্ষার্থীর জীবন-বিকাশের প্রক্রিয়াই হ'ল শিক্ষা।

শিক্ষার এই উপাদানগুলি কোন নিষ্ক্রিয় বা পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়, উপাদানগুলি পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়াশীল সম্পর্কে আবদ্ধ। অর্থাৎ তারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্নাবলী

1. **What is meant by the factors of education? Discuss the relative importance of these factors in an effective scheme of education.**

   [শিক্ষার উপাদান বলতে কি বোঝ? একটি সার্থক শিক্ষা-প্রকল্পে উপাদান-গুলির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।]

2. **Name the various factors of education and show how they are related to each other.**

   [শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানগুলির নাম উল্লেখ কর। ঐ উপাদানগুলি কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তা দেখাও।]

3. **"Any effective scheme of education must be the balance of these factors—the child, the curriculum, the teacher and the environment".—Discuss fully.**

   ["যে কোন কার্যকরী শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষা-পরিবেশ—এই চারটি উপাদানের সার্থক সমন্বয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।"—উক্তিটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কর।]

4. **What are the different factors of education? How do they contribute to the realization of the aims of education?**

   [শিক্ষার উপাদানগুলি কি কি? শিক্ষার ঐ উপাদানগুলি শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে কিভাবে সহায়তা করে?]

5. What are the different factors of education? Why is the child regarded as a factor of education?

[শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি? শিশুকে শিক্ষার একটি উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হ'য়েছে কেন?]

6. Write notes on (টীকা লিখ) :

(a) Factors of education and their inter-relationship.

[শিক্ষার উপাদান ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক।]

7. What are the factors of education? How are these factors related?

[শিক্ষার উপাদানগুলি কি কি? এই উপাদানগুলি কিভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত?]

শিক্ষা-বিজ্ঞানের দার্শনিক পটভূমি

শিক্ষা-বিজ্ঞান বর্তমানে বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও তা মানবীয় বিজ্ঞান। যে কোন বিজ্ঞানের শাখা, যা মানব-কল্যাণে নিয়োজিত, তার পটভূমিতে একটি জীবন-দর্শন ও সমাজ-দর্শন কাজ করে। আলোচ্য কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা শিক্ষা-বিজ্ঞানের এই দার্শনিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করব। বিস্তারিত দার্শনিক আলোচনার সুযোগ পরবর্তী পর্যায়ে আরও আসবে।

শিক্ষার লক্ষ্য

●

যে কোন সচেতন প্রচেষ্টার একটা উদ্দেশ্য থাকে। শিক্ষাও সচেতন প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার উদ্দেশ্য বহু ও উদ্দেশ্য-স্থাপনের ইতিহাসও খুব দীর্ঘ, দার্শনিক তত্ত্বের দ্বন্দ্বে ভরপুর। চতুর্থ অধ্যায়ে এই সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করা হ'য়েছে। এই আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষার একটি গ্রহণযোগ্য লক্ষ্য স্থাপনের চেষ্টা করা হ'য়েছে। * *

শিক্ষা ও সমাজ

●

শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে শুধু নয়, অন্যান্য দিকেও তার উপর সমাজের প্রভাব অত্যধিক। শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক প্রক্রিয়ার যথেষ্ট মিল আছে এবং সামাজিক বিবর্তনে তা চিরদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'শিক্ষা ও সমাজ' শীর্ষক অধ্যায়ে শিক্ষা ও সমাজের এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। * *

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষার লক্ষ্য
Aims of Education

শিক্ষা একটি মানুষের সচেতন-প্রক্রিয়া। আমরা শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে কতকগুলো পরিবর্তন আনতে চাই। এই দিক্ থেকে শিক্ষা সচেতন-প্রক্রিয়া (conscious or deliberate process)। মানুষের যে কোনরকম সচেতন-প্রচেষ্টাই উদ্দেশ্যমুখী (purposive)। শিক্ষা যদি সচেতন-প্রক্রিয়া হয়, তবে তারও নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য থাকা উচিত। শিক্ষার নিজস্ব যদি একটা লক্ষ্য না থাকে, তবে তা ব্যক্তিজীবনে সংগতি বিধান করতে পারবে না। তাই 'শিক্ষা' কথার তাৎপর্যের সঙ্গেই তার লক্ষ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে-কোন ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থাই হোক-না-কেন, তার নিজস্ব একটা লক্ষ্য থাকবেই। প্রাচীনতম শিক্ষা-ব্যবস্থায় যদিও আমরা লিখিত কোন আদর্শ বা লক্ষ্যের উল্লেখ পাই না, তবুও এ কথা স্পষ্ট ক'রে বলা যায় যে, তারও একটা লক্ষ্য ছিল তা যতই জৈবিক স্তরের হোক-না-কেন। বর্তমান যুগে জীবনযাত্রার মান অনেক জটিল হয়েছে, মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও বহুবিস্তৃত হয়েছে। এমত অবস্থায় লক্ষ্যহীনভাবে বিচরণ করলে শিক্ষা মানব-কল্যাণে সহায়তা করবে না। তাই শিক্ষার লক্ষ্যকে আর উপেক্ষা করা যায় না। পূর্বেই তা স্থির করে নেওয়া দরকার। শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব।

॥ শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা ॥
(Necessity of Aims of Education)

॥ এক ॥ পূর্বেই বলা হয়েছে, শিক্ষা হ'ল উদ্দেশ্যমুখী সচেতন-প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে আমরা ব্যক্তির আচরণধারার পরিবর্তন করতে চাই এবং পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রচেষ্টা একেবারে অন্ধ প্রচেষ্টা (blind effort) নয়; নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখী পরিবর্তন বা নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী পরিবর্তন আমরা আনতে চাই আচরণের। যদি পূর্বেই আমরা সেই মান বা লক্ষ্য স্থির করতে না পারি, তা'হলে আমাদের কোনরকম প্রচেষ্টাই সার্থক হবে না। তাই সামনে একটা লক্ষ্য রেখে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির জন্মগত সম্ভাবনা ও কর্মপ্রবণতাকে বিকাশ করতে হবে।

শিক্ষা-সচেতন প্রচেষ্টা

॥ দুই ॥ যে কোন কাজে উদ্দেশ্য জানা না থাকলে নিজের প্রয়োগ-কৌশল যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্যহীন পরিস্থিতিতে বৌদ্ধিক সক্রিয়তা হ্রাস পায়, ব্যক্তির স্বকীয়তার প্রকাশের সুযোগও থাকে না। জন ডিউই (John Dewey) বলেছেন—"লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ" (Acting with an aim is all one with acting intelligently)। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি সামনে না থাকে, তবে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন আচরণের কোন তাৎপর্য বা অর্থ খুঁজে পাবেন না। ফলে, শিক্ষা হবে তাঁদের উভয়ের কাছে অর্থবিহীন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ

শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার তাৎপর্য

যে কোন কর্মক্ষেত্রের মত 'লক্ষ্যে'র উপস্থিতি শিক্ষাকেও অর্থপূর্ণ ক'রে তোলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের কাছে। শিক্ষার্থী যদি না জানে কেন সে ইতিহাস পড়ছে বা শিক্ষক যদি না জানেন কেন তিনি ইতিহাস পড়াচ্ছেন, তা'হলে সম্পূর্ণ বিষয়ই তাদের কাছে অর্থবিহীন অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এই কারণেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ একান্তভাবে প্রয়োজন।

॥ **তিন** ॥ সর্বশেষে লক্ষ্য পূর্ব-নির্ধারিত না হ'লে, শিক্ষার অগ্রগতি সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কোন-না-কোন ধরনের পরিমাপের জন্য একটা স্থির মান দরকার যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। বিশেষ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীকে বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রভাবে রাখার ফলে তার কি পরিবর্তন হ'ল, তা আমরা সাধারণভাবে পরিমাপ করতে পারি তুলনামূলকভাবে। কিন্তু তার সামগ্রিক বিকাশের ধারাকে যথাযথভাবে পরিমাপ করতে গেলে একটি সাধারণ তুলনীয় বস্তুর প্রয়োজন। শিক্ষার সর্বজনীন লক্ষ্য এ বিষয়ে আমাদের সহায়তা করে।

শিক্ষার অগ্রগতির পরিমাপ

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ধারণের উদ্দেশ্য তাত্ত্বিক প্রয়োজন মেটানো নয়; শিক্ষাকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্যই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কে সক্রিয় ক'রে তোলার জন্যও শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সবশেষে শিক্ষণ ও শিখন-প্রচেষ্টার মূল্যায়নের জন্য উদ্দেশ্যের প্রয়োজন। অর্থাৎ, এক কথায় বলা যায়, বিভিন্ন ব্যবহারিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য আমাদের স্থির করতে হবে।

॥ শিক্ষার লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য—পরিবর্তনশীলতা ॥
(Characteristics of Aims of Education—Variability)

শিক্ষার লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার পরই আমরা তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করব। শিক্ষার লক্ষ্যকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তার কোন একটা বিশেষ নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই বা যুগে যুগে তা একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না। তাই শিক্ষার লক্ষ্য না ব'লে লক্ষ্যকে বহুবচন করাই বাঞ্ছনীয়। যুগে যুগে দেখা গেছে, শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়েছে। আদিম মানব সভ্যতার যুগে শিক্ষার যে লক্ষ্য ছিল আজকে তা আর নেই। আবার একই কালে, বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করা গেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য বিভিন্ন। এটাই যেন তার স্বাভাবিক প্রকৃতি এবং বর্তমান শিক্ষাবিদ্‌রা এই পরিবর্তনশীলতাকে তার স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টে (মুদালিয়ার কমিশন, 1952) বলা হয়েছে—"সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বা যখন সমাজে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়, তখনই শিক্ষার লক্ষ্যগুলির পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং পুনঃস্থাপন প্রয়োজন" (As the political, social and economic conditions

change and new problems arise, it becomes necessary to re-examine carefully and re-state clearly the objectives which education at definite stage should keep in view.)। কিন্তু কেন এই পরিবর্তনশীলতাকে শিক্ষাবিদ্‌রা স্বীকৃত ক'রে নিয়েছেন? তার কারণ, প্রথমতঃ শিক্ষা নিজেই একটা গতিশীল ধারণা। 'শিক্ষা' শব্দের অর্থ এবং তাৎপর্যের কালভেদে পরিবর্তন আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। সুতরাং, এই পার্থক্য স্বাভাবিকভাবে তার লক্ষ্যের পরিবর্তনের জন্য দায়ী। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর মধ্যে বহু চাহিদা বর্তমান এবং শিক্ষাকে সেই সকল রকম চাহিদাই পরিতৃপ্ত করতে হয়। ফলে, তার অন্তর্নিহিত চাহিদার বিভিন্নতা অনুযায়ী শিক্ষারও বিভিন্ন লক্ষ্য স্থির করা হ'য়েছে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষাবিদ্‌, চিন্তাবিদ্‌, রাষ্ট্রনায়ক বা সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে দেশ-কালভেদে জীবনাদর্শের পার্থক্য দেখা যায়। তাঁদের এ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষ্যের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। স্যার পার্শিনান বলেছেন, যে কোন শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির জীবনাদর্শের সঙ্গে সব সময় সম্পর্কযুক্ত থাকবেই। সুতরাং জীবনাদর্শের যেমন ব্যক্তি, দেশ ও কালভেদে পরিবর্তন হয়, তেমনি শিক্ষার লক্ষ্যেরও পার্থক্য বর্তমান। "Every scheme of education being at bottom a practical philosophy, necessarily touches life at every point ··and as ideals of life are eternally at variance, their conflict will be reflected in educational theories."

সুতরাং, শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে মূল কথা হ'ল যে, তার (শিক্ষার) কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ্‌ বিভিন্ন সময়ে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন লক্ষ্য স্থির করেছেন। মানব সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে এই রীতি চলে আসছে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে তার ধারাবাহিক আলোচনার প্রয়োজন।

॥ শিক্ষার লক্ষ্যের অভিব্যক্তি ॥
(Evolution of Educational Aims)

শিক্ষার লক্ষ্যের স্থায়িত্ব নেই। জীবনের পরিস্থিতিভেদে তা পরিবর্তনশীল। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হ'লে, মনুষ্য সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করার প্রয়োজন। তাই, আমরা এখানে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য কিরূপ ছিল, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

আদিম মনুষ্য-সমাজে যে শিক্ষার প্রচলন ছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত এবং অসংগঠিত। কিন্তু সেই শিক্ষা-ব্যবস্থারও কিছু লক্ষ্য ছিল। যদিও সেই সব লক্ষ্যগুলি আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যের তুলনায় নিম্নমানের, তবুও একথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে, সেই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মানুষের জৈবিক প্রয়োজন (Physical need)

মেটানো। অনেক ঐতিহাসিক আদিম সমাজের (Primitive society) এই শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক শিক্ষা (Practical Education) নামে অভিহিত করেছেন। এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল শিশুদের খাদ্য সংগ্রহ, পরিধেয় সংগ্রহ ও আত্মরক্ষার কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে উৎসাহিত করা। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখা এবং বন্ধু ও শত্রুর সঙ্গে পরিচিত করাও তখনকার শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হ'তো। মানব-সভ্যতার বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে, মনুষ্য-সমাজগুলি যখন আরও সংগঠিত হ'লো, তখন শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের সমাজের রীতি-নীতির সঙ্গে পরিচিত করার ঝোঁক দেখা গেল। এই সময়, তাই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে যুক্ত হ'ল—সামাজিক রীতি-নীতির প্রশিক্ষণ (Training in social traditions)। তবে এই প্রশিক্ষণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে হ'তো। এই ঘটনা থেকে একটি সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে, জীবন-যাপনের তাগিদে মানুষ সামাজিক জীবনকে যতই সংগঠিত ক'রে তুলতে লাগল, শিক্ষার লক্ষ্যও তত বিস্তৃত ও বহুমুখী হ'তে লাগল। তাই মানব-সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্যও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হ'তে থাকলো এবং সমাজভেদে শিক্ষার লক্ষ্যেরও বিভিন্নতা দেখা দিল।

আদিম সমাজে শিক্ষার লক্ষ্য

প্রাচীন মিশরীয় সমাজে শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কিন্তু তখনকার দিনে মানুষের জীবন সম্পর্কে ধারণা ছিল ভিন্ন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের (Individual need) থেকে সমাজের (Need of the society) চাহিদাকে বড় করে দেখা হ'তো। বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্বগ্রহণের সামর্থ্য বা বৃত্তির (occupation) ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হ'তো। তাই ঐ সমাজে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক শিশুকে তার সামাজিক শ্রেণী অনুযায়ী বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া। জন্মসূত্রে শিশু যে পরিবারের মধ্যে এসেছে, সেই অনুযায়ী পারিবারিক বৃত্তিতে প্রশিক্ষণলাভের সুযোগ করে দেওয়াই ছিল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এক কথায় বলা যায়, সমাজ-অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি শ্রেণীর উপযোগী করে গড়ে তোলাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য।

প্রাচীন মিশরীয় শিক্ষার লক্ষ্য

প্রাচীন চীনদেশেও শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মিশরের অনুরূপ। চৈনিক সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, যা কিছু পুরাতন তাকে ধরে রাখা। আর এই কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য চীনারা নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। তখন, শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, সমাজের রীতি-নীতির সঙ্গে ভবিষ্যৎ নাগরিক অর্থাৎ শিশুদের পরিচয় ঘটানো এবং সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া। একজন বিশিষ্ট শিক্ষা-ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড পাওয়ার্স (Edward Powers) বলেছেন—'প্রাচীন চৈনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না মানবীয় গুণাবলীর বিকাশসাধন করা। তার মূল লক্ষ্য ছিল, প্রাচীন সামাজিক রীতি-নীতিগুলিকে আয়ত্ত করা।'

চৈনিক শিক্ষার লক্ষ্য

কিন্তু **প্রাচীন ভারতে** শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ, এই শিক্ষা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Individualistic)। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদরা মনে করতেন

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হ'ল মুক্তি বা মোক্ষ। আত্মজ্ঞানের মাধ্যমেই জীবের মুক্তি আসতে পারে। যে শিক্ষা মানুষকে তার এই আত্মজ্ঞানে সাহায্য করে, সেই শিক্ষাই হ'ল প্রকৃত শিক্ষা। তাই প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মজ্ঞান লাভ করা বা ব্যক্তিসত্তার বিকাশ করা। এই বিকাশ বস্তুকেন্দ্রিক নয়, এই বিকাশের ফলে মানুষ জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। অর্থাৎ, ব্যক্তির আত্মবিকাশই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য

পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই গ্রীসদেশের কথাই উল্লেখ করতে হয়। কারণ প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমিই ছিল গ্রীস দেশ। তখন সেখানে বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে (city-state) শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন রকমের। যেমন, স্পার্টার (Sparta) শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেখানে ব্যক্তির চেয়ে সমাজকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হ'তো। ব্যক্তিকে রাষ্ট্র বা সমাজের প্রয়োজনে গড়ে তোলাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। স্পার্টায় প্রশিক্ষণ দেওয়াই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। অপরদিকে এথেন্স নগরীর শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে বড় করে দেখা হ'তো। ব্যক্তির রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চেতনার উন্মেষসাধন করাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। অর্থাৎ, ব্যক্তির মধ্যে যা কিছু ভাল, তার বিকাশে সহায়তা করাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য।

প্রাচীন গ্রীক শিক্ষার লক্ষ্য

প্রাচীন রোমান শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রীক শিক্ষাব্যবস্থারই উত্তরসূরী বলা যায়। প্রাচীন রোমান সমাজ ছিল কৃষিভিত্তিক। তাই রোমানদের কাছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্য ছিল অনেক বেশী। শিক্ষার লক্ষ্যও তাই নির্ধারিত হয়েছিল এই চিন্তাধারার দ্বারা। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করাই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। অর্থাৎ, শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণভাবে জীবনমুখী।

প্রাচীন রোমান শিক্ষার লক্ষ্য

প্রাচীন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিক্ষানীতি পরবর্তীযুগে অন্য রূপ গ্রহণ করতে থাকে। বিশেষভাবে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে শিক্ষা সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হ'ল। যাজকশ্রেণী মানুষের সামনে শিক্ষার নতুন তাৎপর্য তুলে ধরলেন। শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে স্থির করা হ'ল—সাধারণ মানুষের নৈতিক মান উন্নয়ন। কিন্তু ধর্মযাজকদের নির্দেশে মানুষের জীবনের এই নৈতিক মান কেবলমাত্র ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা নির্ধারিত হতে লাগলো। ফলে, শিক্ষার লক্ষ্য হ'য়ে উঠ্‌লো খুবই সংকীর্ণ। শিক্ষা দ্বারা মানুষের জীবনযাপনের রীতিকে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করার চেষ্টা চলতে লাগলো। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে অনুশাসন, অবদমন ও কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা প্রাধান্য পেল।

ধর্মীয় শিক্ষার লক্ষ্য

কিন্তু, মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে যাজকশ্রেণীর এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে পৃথিবীব্যাপী শুরু হ'ল সংস্কার আন্দোলন। শাসন ও নির্যাতনের পরিবর্তে

এলো মানবতাবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল—ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ দান করা। এই স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের নৈতিক মান উন্নয়ন করা যাবে, এই ছিল তখনকার ধারণা। তবে একথা স্মরণ রাখার প্রয়োজন, এই চিন্তাধারা মানুষের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষাক্ষেত্রেও অল্পদিনের মধ্যে ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হ'য়েছিল।

সংস্কার আন্দোলন ও শিক্ষা লক্ষ্য

কুসংস্কার, অনুশাসন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর ওপর সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন ফরাসী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক রুশো (Rousseau)। তিনি বলেছেন—শিশুরা সৎভাবে জন্মায়; কিন্তু আমাদের সমাজ তাদের আবদ্ধ করে এবং অসৎ ক'রে তোলে (Everything is good as it leaves the hands of the author of nature ; everything degenerates in the hands of man)। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে—শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। রুশোর এই চিন্তাধারাকে বিস্তৃত করেছিলেন—পেস্টালাৎসী (Pestalozzi), হার্বার্ট (Herbert), ফ্রয়েবেল্ (Froebel) প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। এঁদের সকলের প্রচেষ্টায় শিক্ষা যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আদর্শ গ্রহণ করলো, তা আধুনিক যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। তবে শিক্ষার আধুনিক লক্ষ্য নির্ধারণে অন্যান্য অনেক মনীষীর অবদান আছে। এই লক্ষ্যের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও সমাজকেন্দ্রিকতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হ'য়েছে। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

নবজাগরণ ও শিক্ষার লক্ষ্য

সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা থেকে শিক্ষার লক্ষ্যের বিবর্তনের ধারা অনুশীলন করলে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই লক্ষ্যের পরিবর্তন হ'য়েছে। তবে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেলেও এর থেকে একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষার লক্ষ্য সব সময়ই জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

মন্তব্য

।। শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ।।
(Different Aims of Education)

পূর্বেই বলা হয়েছে, শিক্ষার কোন বিশেষ একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা খুবই কঠিন এবং তা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবও নয়। বিভিন্ন দেশে মনীষীদের বিভিন্ন সময়ের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, তাঁরা শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে মানব-জীবনের বিভিন্ন দিকের উৎকর্ষণের উপর দৃষ্টি আরোপ করেছেন। তাঁদের এই আলোচনার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ কয়েক শ্রেণীর লক্ষ্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে আমরা এদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করবো।

[এক] বৃত্তিমূলক লক্ষ্য (Vocational Aim)

প্রাচীন জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সরল ও সহজ। জীবনধারণের প্রয়োজনে শিশুর বিশেষ কিছু জটিল কৌশল আয়ত্ত করার প্রয়োজন হ'ত না। খাদ্য-সংগ্রহ, বাসস্থানকে কেন্দ্র করে সামান্য কিছু আচরণ তাদের আয়ত্ত করতে হ'ত। ফলে, ঐ সমাজব্যবস্থায় শিক্ষা ছিল নিতান্তই অনিয়মতান্ত্রিক (informal)। কিন্তু ক্রমে যতই জীবনযাত্রার পদ্ধতি জটিল হ'তে লাগল মনুষ্য-সমাজে অত্যধিক অভিজ্ঞতার সংযোজনের ফলে, তখন শিক্ষাও নিয়মতান্ত্রিক (formal) রূপ ধারণ করল; তার উপর দায়িত্বও অনেক বেশী এসে পড়ল। পিতামাতা বা পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না শিশুর আচরণধারাকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা। সম্ভব হ'ল না তাঁদের পক্ষে শিশুকে এই জটিল জীবন-পরিস্থিতির উপযোগী ক'রে তৈরি করে দেওয়া। তাই অনেকে বললেন, শিক্ষাকে অনেক গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সে দায়িত্ব হ'ল শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী ক'রে গঠন ক'রে দিতে হবে। আরও পরিষ্কার ক'রে বললে দাঁড়ায়, শিশুকে পরবর্তী জীবনের বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুকে ভবিষ্যৎ কোন বৃত্তির জন্য প্রস্তুত ক'রে দেওয়া। বর্তমানেও অনেক শিক্ষাবিদ্ এবং অভিভাবক এই লক্ষ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। যেমন, মিল্টন (Milton) বলেছেন—"I call a complete and generous education that which fits a man to perform justly, skilfully and magnanimously all the offices both public and private, of peace and and war." এঁরা মনে করেন, শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা জীবনের প্রয়োজন মেটাবে; শিক্ষার দ্বারা জীবনের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাবে, এমন কিছু কথা নয়।

শিক্ষার বৃত্তিমুখী লক্ষ্য কি?

শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে আমরা যদি ব্যক্তির বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণের প্রয়াসকেই ধরি, তাহ'লে জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। যেমন—**প্রথমতঃ**, এই ধরনের শিক্ষা ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে এবং এই অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা, মানসিক উন্মুক্ততা, নৈতিক বোধ ইত্যাদি আসবে। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীব হিসেবে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। জন ডিউই বলেছেন, ব্যক্তি কি করতে পারে, তা নির্ধারণ ক'রে তাকে সেই কাজে নিযুক্ত ক'রে দিতে পারলে সে সুখী হবে। ("To find out what one is fitted to do and to secure an opportunity to do it, is the key to happiness.) **দ্বিতীয়তঃ**, বৃত্তিমুখী শিক্ষার লক্ষ্য একাংশে মনোবিদ্যার তত্ত্বের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি নিজে যদি তার কাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়, তবে তার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বৃত্তিমুখী উদ্দেশ্য শিক্ষাকালীন আচরণকে শিক্ষার্থীর কাছে অনেক সহজভাবে অর্থপূর্ণ ক'রে

বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুবিধা

তোলে। ফলে, এই জাতীয় উদ্দেশ্য শিশুকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা আংশিকভাবে এই ধরনের বৃত্তিমূলক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। **তৃতীয়তঃ**, বৃত্তিমুখী শিক্ষা-পরিকল্পনা স্বল্পবুদ্ধি বা ক্ষীণবুদ্ধি (feeble-minded) শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী ; তাদের জীবনে পুঁথিগত শিক্ষা বা জ্ঞান আহরণ করার জন্য শিক্ষা বিশেষ কিছু লাগে না। কারণ, তারা নিজেদের সীমিত বুদ্ধির জন্য জ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ-ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয় ; বরং বৃত্তিমুখী শিক্ষার দ্বারা তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায়। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই লক্ষ্যের উপর এমনভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তিনি মন্তব্য করেছেন—"It is indeed criminal to attempt anything else with them (feeble-minded)।"

বৃত্তিমুখী শিক্ষার ত্রুটি

শিক্ষার বৃত্তিমুখী লক্ষ্যের কিছু সুবিধা থাকলেও তার ত্রুটির দিক্‌টাই বেশী। কারণ, শিক্ষা দ্বারা মানুষের সকল রকম চাহিদারই পরিতৃপ্তি হওয়া দরকার। কেবল-মাত্র খাদ্য এবং আরাম (food and comfort) তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। উপার্জনশীল হওয়া জীবনের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন, কিন্তু সেটাই জীবনের শেষ কথা নয়। মানব মনের আরও অনেক সূক্ষ্ম দিক্ আছে যেগুলোকে শিক্ষার দ্বারা বিকশিত করতে হবে। মানুষের সার্থক জীবনযাপন করতে হ'লে বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্ত দিক্ থেকেই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার দরকার। সম্পূর্ণভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা মানুষের মানসিক দিগন্তকে সীমিত ক'রে তোলে। তাই এই লক্ষ্যকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় না। অধ্যাপক কে. কে মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"Life is more than meat as the maxim goes. Man has various other duties such as acquisition of knowledge, realizing his position as a member of the society, and being able to utilize his leisure hours profitable." সুতরাং বৃত্তিমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য খুবই সংকীর্ণ এবং জীবনের সকল রকম সম্ভাবনা বা আদর্শকে বিকাশ করতে সক্ষম নয়। তাই সম্পূর্ণ বৃত্তিমুখী শিক্ষা কোনমতেই আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হিসেবে কাজ করতে পারে না। শিক্ষা আধুনিক তাৎপর্য অনুযায়ী জীবনের সকল দিক্‌কেই স্পর্শ করবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি বৃত্তিমুখী হয়, তবে সেই শিক্ষার দ্বারা হয়ত ভাল কারিগর বা দক্ষ এঞ্জিনীয়ার কি ডাক্তার তৈরি হ'তে পারে, কিন্তু আদর্শ মানুষ তৈরি হবে না।

নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও কারিগরী কৌশল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও সতত পরিবর্তন হচ্ছে। প্রতিনিয়তই তার জীবনপরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুকে এই পরিবর্তনশীল জীবন-পরিবেশের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলা। বৃত্তিমূলক শিক্ষা মনের সেই নমনীয়তা (flexibility) আনতে পারে না। সাধারণ মানবীয় শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তি

সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান, মানব মনে এই ধর্মের সঞ্চার করতে পারে। তাই সাধারণ মানবীয় শিক্ষাকে (general education) বৃত্তিশিক্ষা থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক ক'রে অনুশীলন করলে ভুল হবে। এই দুই বিদ্যারই ব্যক্তির প্রয়োজন-উপযোগী সমন্বয় আজকের দিনে বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিক্ষালয়ের পাঠ্যক্রমের ভেতর, সাধারণ মানবীয় জ্ঞান, সংস্কৃতিমূলক অভিজ্ঞতা এবং বৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতা সংযোজন করতে হবে। ছাত্রদের নির্দেশনা দিতে হবে যাতে ক'রে তারা নিজেদের ক্ষমতা-উপযোগী বৃত্তি নির্বাচন করতে পারে। শিক্ষার মধ্যে যদি আমরা এই সকল উপাদানের সমন্বয় করতে না পারি, গতিশীল জীবন-উপযোগী ক'রে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। মনে রাখতে হবে—ব্যক্তিজীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করতে হ'লে, পরিপার্শ্বকে যথাযথভাবে প্রভাবিত করতে হ'লে, এই সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে এই জাতীয় সমন্বয়ের নীতিকে মেনে নেওয়া হ'য়েছে। তাই পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে সাধারণ শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী (vocationalization of education) করার ওপর এবং তাকে উৎপাদনশীলতার (Productivity) সঙ্গে সংযুক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে।

মন্তব্য

[দুই] কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য
(Cultural Aim)

কৃষ্টি বলতে আমরা মানব-প্রকৃতির এমন একটা দিক্ বুঝি যাকে অনুশীলনের মাধ্যমে পরিণতির বা পরিপক্কতার স্তরে উন্নীত করা হয়। জন ডিউই বলেছেন, কৃষ্টি হ'ল মানুষের ক্ষমতার চর্চা যার দ্বারা ব্যক্তি স্বাধীনভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে সমাজের সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয় (cultivation of power to join freely and fully in shared or common activities)। এক কথায়, কৃষ্টি হ'ল জগতে যা কিছু ভাল ঘটেছে তার চর্চা করা। মনুষ্য-সমাজেরও অনেক ভাল অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি বা আচার-আচরণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ধারারূপে নিবদ্ধ থাকে। একেও আমরা কৃষ্টি বলি। কিছু কিছু শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, মানবশিশুকে সমাজের অতীত সংস্কৃতির ধারায় শিক্ষিত করতে 'হবে যাতে ক'রে সে মানব-অভিজ্ঞতার মূল ও সুন্দর অংশটিকে গ্রহণ করতে পারে। চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে আদর্শ আচরণ-ধারার অধিকারী করতে হবে। শিক্ষার এই লক্ষ্যকে বলা হচ্ছে কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল মানব শিশুকে উন্নততর অভিজ্ঞতার অধিকারী করা। শিক্ষিত ব্যক্তি সে-ই, যার ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলি (Personality traits) নৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়নে উন্নত, যার সৌন্দর্যবোধের (Aesthetic) সার্থক বিকাশ হয়েছে এবং যিনি সমাজে পরিপূর্ণ জীবনযাপনে সক্ষম। এই সকল বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির মধ্যে আসতে পারে,

শিক্ষার কৃষ্টিমূলক লক্ষ্যের তাৎপর্য

যদি আমরা শিক্ষার কৃষ্টিমূলক উদ্দেশ্য গ্রহণ করি। তাই কিথ্ (Keith) বলেছেন—"The educational ideal is an adequate participation in the present life of the race and in the life of the race."

কিন্তু এই উদ্দেশ্য-গ্রহণে নানা রকম অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, পৃথিবীর সকল সমাজের কৃষ্টিগত মান এক নয়। ফলে, আমাদের পক্ষে স্থির করা মুশকিল; কোন্ সমাজকৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য ঠিক করব। তাই বিভিন্ন দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে। আপন কৃষ্টিকে বড় করে এক সমাজব্যবস্থা অন্য সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক বিকাশকে স্তব্ধ ক'রে তাকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে, এমন ঘটনাও ইতিহাসে বিরল নয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যক্তিই উন্নত ধরনের কৃষ্টির অধিকারী হয়ে থাকেন। বেশীর ভাগ যারা সাধারণ শ্রেণীর, তারা এর থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি কৃষ্টিমূলক হয়, তবে তা সমাজে বিশেষ এক শ্রেণীর হাতিয়ার ছাড়া কিছু নয়। এই আদর্শ বর্তমান গণতান্ত্রিক ধারার বিরুদ্ধে যায়। তাই এই লক্ষ্যকে গ্রহণ করা যায় না। সর্বশেষে কৃষ্টি হল সমাজের অন্তর্নিহিত সত্তা, আর শিক্ষা হ'ল সচেতন মানসিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যক্তির উৎকর্ষণ। আন্তরিক কোন সত্তাকে বাহ্যিক কোন মাধ্যম (medium) দ্বারা পরিবাহিত ক'রে স্থানান্তরিত করা যায় না। অন্তরের উপলব্ধির দ্বারাই তাকে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং শিক্ষার এই কৃষ্টিমূলক উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করতেও যথেষ্ট অসুবিধা আছে।

কৃষ্টিমূলক লক্ষ্যের ত্রুটি

আধুনিক কালে কৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীর কোন সমাজব্যবস্থাই মনে করে না যে, সে অন্যের চেয়ে উন্নত। যুগধর্মের প্রভাবে ও পারিপার্শিবকের চাপে সকলেই আজকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে বিশ্বাসী। আজকের পরিস্থিতিতে তাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা হবে যা ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিক সমাজের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে; সীমিত সামাজিক কৃষ্টি বা সংকীর্ণ সংস্কারের প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে তার মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ জাগ্রত করবে। বিখ্যাত দার্শনিক রাসেল বলেছেন, প্রকৃত কৃষ্টিই হ'ল ক্ষুদ্র সামাজিক গণ্ডী থেকে মুক্তিলাভ ক'রে বিশ্বরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করা (Genuine culture consists in being a citizen of the universe, not only of one or two fragments of time)। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিক্ষার ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—"ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে, সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ"। আধুনিককালে প্রত্যেক মনীষীই এই কথা বলেছেন। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে গতানুগতিক কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য খুবই সংকীর্ণ। শিক্ষার দ্বারা যদি কৃষ্টির উন্নয়ন করতে হয়, তবে তার মাধ্যমে সর্বজনীন বিশ্বসংহতির চর্চাই করতে হবে।

মন্তব্য

[তিন] শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্য
(Moral Aim of Education)

অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হবে ব্যক্তির নৈতিক মান উন্নত করা বা আদর্শ চরিত্র গঠন করা। তাঁরা মনে করেন, শিশুর জন্ম-অবস্থায় যে দেহ-মনের অধিকারী হয়, তাকেই বিকশিত করার জন্য শিক্ষা। এখন তার দৈহিক গঠন ও ক্রিয়াকলাপ যা পরবর্তীকালে সে গ্রহণ করে, তার সবটাই প্রায় প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে থাকে। তার জন্য বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। দরকার তার মানসিক উন্নয়ন এবং নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ। নৈতিক জীবনের বিকাশ ও চরিত্রগঠন এর কোন কাজটাই শিশুর নিজের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষার দ্বারা এই দুটো দিক্ই বিকশিত করতে হবে। শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্যের মূল প্রবক্তা হলেন হার্বার্ট (Herbert)। তিনি নৈতিক মূল্যবোধ-বিকাশের ওপর এতই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"The one and the whole work of education which is a long and complex training, may be summed up in the concept of morality' দার্শনিক লক্ (Locke) বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল চরিত্রগঠন। প্রাচীন ভারতেও আমরা এই আদর্শের উল্লেখ পাই গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মধ্যে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদিভূমি প্রাচীন গ্রীসেও এই ধারণা ছিল। প্লেটোর শিক্ষা চিন্তার মধ্যে আমরা এর ইঙ্গিত পাই। তিনি বলেছেন, যা নৈতিক গুণাবলীর বিকাশকে ব্যাহত করে, সে রকম কিছু শিক্ষার মধ্যে থাকবে না "(Nothing should be admitted in education which does not conduct to the promotion of virtue.)" মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে আমরা এই নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্বের উল্লেখ পাই।

শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্য কি?

সুতরাং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু চিন্তাবিদ্ এবং শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার এই লক্ষ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের ধারণা, মানুষ অন্যান্য ইতর প্রাণীর মত কতকগুলো জৈবিক চাহিদা নিয়ে জন্মায়; শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে তার সেইসব জৈবিক চাহিদাগুলোকে যথাযোগ্য পথে পরিচালিত ক'রে তার জীবনকে সুন্দর ও সার্থক ক'রে তোলা। তবে এই লক্ষ্যকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। ব্যক্তির জীবনের উন্নয়ন শুধুমাত্র নৈতিক মান বা চরিত্রের ওপর নির্ভর করে না। সে দেহ-মন নিয়ে সম্পূর্ণ। তাছাড়া, তার জীবনের আধ্যাত্মিক দিক্ও আছে। সুতরাং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকে উপেক্ষা ক'রে শুধুমাত্র নৈতিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলে ভুল করা হবে। দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক মানও সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষে পৃথক্। নীতিবোধ সব সময় মূল্যায়নের ওপর নির্ভরশীল। একজনের দৃষ্টিতে যা ভাল, অন্যের কাছে তা ভাল নাও হ'তে পারে। যে আচরণ-বিশেষ

শিক্ষার নৈতিক মূল্যের অসুবিধা

এক সমাজব্যবস্থায় একান্ত কাম্য বলে মনে করা হয়, অন্য সমাজে তাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা নাও হ'তে পারে। সুতরাং ভাল-মন্দ বিচারের মাত্রার কোন সঠিক নির্ণায়ক নেই। সেই হিসেবে শিক্ষার দ্বারা যথার্থই কি উন্নতি হ'ল, তা পরিমাপ করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্যের যে সব দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করা হ'ল বা যা সচরাচর বলা হয়, তা কিন্তু নীতি-কথাটিকে খুব সংকীর্ণ অর্থে ধরে নিয়ে। নৈতিক বিকাশ বা চারিত্রিক বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈততার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। তবে সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার—নীতিবোধ বা চরিত্রগঠন একেবারে শূন্য অবস্থায় হতে পারে না। ব্যক্তির অন্যান্য সত্তাকে ত্যাগ ক'রে বা তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশে বেড়াজাল রচনা ক'রে তাকে নীতিশিক্ষা দেওয়া বা চরিত্রগঠনে চেষ্টা করা কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছু নয়। মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টে (মুদালিয়ার) এ সম্পর্কে সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—"Character education has to be visualized not in a social vacuum but with reference to contemporary socio-economic and political situation." অর্থাৎ, শিশুর বা ব্যক্তির নৈতিক মান-উন্নয়নের কাজকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে স্থির করলেও, সে নৈতিক মান সব সময় ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন করতে।

মন্তব্য

[চার] শিক্ষার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য
(Spiritual Aim of Education)

আদর্শবাদীরা বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ-সাধন করা। তাঁরা বস্তু-জগতের সমস্ত কিছু বন্ধনকে অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁদের মতে, ব্যক্তিজীবনের উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একক শক্তিকে উপলব্ধি করা। প্রাচীন ভারতে এই ধারণাই দৃঢ়বদ্ধ ছিল। অধ্যাত্মবাদ প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার প্রতীক। কিন্তু সেই আদর্শ বর্তমানে প্রায় লোপ পেয়েছে—কিছুটা আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে, আর কিছুটা বিদেশী শাসনের প্রভাবে। কিন্তু আধুনিক কালে অনেক শিক্ষাবিদ্ই জীবনের এই দিকের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষের কথাই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর A Poet's School-এ বলেছেন —"আমি একান্তভাবে দুটি জিনিসকে মিলিত করার আকাঙ্ক্ষা করেছি: প্রাচ্য সাধকের অন্তর্ময় দৃষ্টি, যার দ্বারা মনের নির্জনে সে দেখা পায় বিশ্ব-আত্মার, আর সেবা-কর্মে সেই ধ্যানেরই বহিঃপ্রকাশ—যা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা সংকোচের জড়িমার মধ্য থেকে জাগিয়ে তোলে সম্পদকে, সৌন্দর্যকে, কল্যাণকে।" বিবেকানন্দ বলেছেন—"Mine also is that infinite ocean of life, of power, of spirituality as

শিক্ষার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য কি?

yours. Therefore, my brethren, teach the life saving great ennobling, grand doctrine to your children even from their very birth." আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ রাধাকৃষ্ণনও একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য জাতীয় কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি নয় বা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের অন্তরে বুদ্ধির অগম্য যে সত্তা আছে, তাকে উপলব্ধি করা। "(Making the individual feel that he has within himself something deeper than intellect, call it spirit if you like.)" ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টেও (1944—46) এই বিষয়ের গুরুত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে—In the development that we envisage in the future, we hope that the pursuit of mere material afluence and power would be subordinated to that of higher values and the fulfilment of the individual. This concept of the mingling of science and spirituality is of special significance for Indian Education" বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌দের বক্তব্য থেকে একটা জিনিসই স্পষ্ট হচ্ছে যে, তাঁরা প্রত্যেক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ এবং উন্নত ধরনের জীবনাদর্শ (Higher value of life) বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তাকেই শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

কিন্তু শিক্ষার এই আধ্যাত্মিক আদর্শ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের সামনে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য বলতে আমরা যদি পরমাত্মা বা বিশ্ব-আত্মার উপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধিকে (self-realization) বুঝি, তাহ'লে সে বিশ্ব-আত্মার উপলব্ধির নৈর্ব্যক্তিক বহিঃপ্রকাশ কি, তা আমাদের জানা দরকার। কিন্তু এই জাতীয় বিমূর্ত ধারণার (abstract ideas) কোন নৈর্ব্যক্তিক বহিঃপ্রকাশ আদৌ সম্ভব কি না, তা স্থির করা যায়নি। সুতরাং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উভয়কেই শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে [illegible] থাকতে হয়। যদি অগ্রগতি হয়ই, তবে তাকেও আত্মোপলব্ধির আলোকেই বিচার করতে হবে। তাই আদর্শগত দিক্ থেকে এই মতবাদ যতই নির্ভুল হোক-না-কেন, ব্যবহারিক প্রয়োগে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। তবে একটা কথা বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার দরকার— এই ধরনের আদর্শ আমাদের ভারতীয় কৃষ্টি-বিকাশের ধারার অনুকূল। প্রাচীন ঋষিদের থেকে শুরু ক'রে বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রাধাকৃষ্ণন পর্যন্ত প্রত্যেক মনীষীই একই কথা বলে চলেছেন।

মন্তব্য

[পাঁচ] শিক্ষার লক্ষ্য—অভিযোজন
(Adjustment as Aim of Education)

অনেক শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে জীববিদ্যার জ্ঞান-প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। জীবের প্রধান ধর্ম হ'ল পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন। অভিব্যক্তিবাদের

মূলে আছে এই অভিযোজন (adjustment) ও প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection)। যে প্রাণী যত উন্নত, সে তত বেশী সার্থকভাবে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে সক্ষম, মানুষের শিক্ষা তাকে সাহায্য করে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে। যে সব প্রাণী পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারেনি, তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। তাই শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী ক'রে প্রস্তুত ক'রে দেওয়া। অর্থাৎ, সে যাতে পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে, তার জন্য তাকে শিক্ষা দিতে হবে। চ্যাপ্‌ম্যান (Chapman) ও কাউন্ট (Count) বলেছেন—"Education as a social process is nothing more than an economical method of assisting an initially ill-adapted individual, during the short period of a single life to cope with the ever increasing complexities of the world." সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষা ব্যক্তির স্বল্প জীবন-পরিসরের মধ্যে তাকে ক্রম-পরিবর্তনশীল জটিল জীবন-পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করতে সহায়তা করে মাত্র ; তার বেশী কিছু শিক্ষার কাছ থেকে কিছু আশা করা যায় না। তাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল, ব্যক্তির জীবনকে চির পরিবর্তনশীল জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে যথাযথভাবে সংগতি-বিধানের উপযোগী করে তৈরি ক'রে দেওয়া।

অভিযোজনের তাৎপর্য কি ?

ব্যক্তির পরিবেশ বলতে আমরা সেইসব অবস্থাকে বলছি যা ব্যক্তি-জীবনকে প্রভাবিত করে ; বিশ্বপ্রকৃতির এমন অনেক জিনিস এবং অবস্থা আছে, যাদের কোন প্রভাব ব্যক্তিজীবনের ওপর নেই। তাদের আমরা পরিবেশ বলব না। (By environment we mean sum total of all those stimulations which the individual receives from birth till death.)। যেমন, স্বাভাবিক লোকের কাছে আলোকরশ্মি (Rays of light) তার পরিবেশের অন্তর্গত, কিন্তু অন্ধ, যে দেখতে পায় না, আলোকরশ্মির কোন প্রভাব তার জীবনে নেই ; সুতরাং তা তার পরিবেশের অন্তর্গত নয়। ব্যক্তির পরিবেশকে আমরা তিন অংশে ভাগ করতে পারি তার জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সমতা রেখে—প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical environment), সামাজিক পরিবেশ (Social environment) এবং অন্তর-পরিবেশ (Internal environment)। সুস্থ জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য এই তিন রকম পরিবেশের সঙ্গে যথার্থ অভিযোজন প্রয়োজন। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে আমরা সাধারণভাবে জড় জগৎকে বোঝাতে চাই। আর তার অন্তর্গত আছে বিশ্বপ্রকৃতি। প্রকৃতির রহস্য-উদ্ঘাটনের জন্য মানুষ আবহমান কাল ধরে সংগ্রাম করে চলেছে ; মানব সভ্যতার আদি যুগ থেকে চলেছে তার সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা। আর এই বোঝাপড়ার মধ্যেই সভ্যতার অগ্রগতি। শিক্ষার

শিক্ষার অভিযোজন-মূলক লক্ষ্য কি ?

উদ্দেশ্য হবে মানুষকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করার উপযোগী ক'রে তৈরি ক'রে দেওয়া ; তার মধ্যে এমন গুণের সঞ্চার করতে হবে, যার দ্বারা সে বহিঃপ্রকৃতিকে নিজের আয়ত্তে এনে জীবন সুখময় ক'রে তুলতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ,** বিশ্বপ্রকৃতি ছাড়াও মানুষের আর একটি পরিবেশ আছে। তাহ'ল সমাজ-পরিবেশ। মানুষ দলবদ্ধ জীব। সে জন্মগ্রহণ করে সমাজ-পরিবেশের মধ্যে, সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সবকিছুই তাকে জন্মমুহূর্ত থেকে ঘিরে রাখে। এর থেকে সে মুক্তি পেতে চায় না ; এর মধ্যেই সে সার্থকতা চায়। "মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি"—এ তার চিরন্তন বাসনা। তাই শিক্ষার দ্বারা তাকে এই জীবনের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে হবে। সে যাতে সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে; সে বিষয়ে সচেষ্ট হ'তে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তি-জীবনকে সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে তৈরি করে দেওয়া। তার মধ্যে এমন কতকগুলি সামাজিক গুণ বিকাশ করা, যার দ্বারা সে সার্থকভাবে সমাজের পরিবেশের সঙ্গে সংগতি-বিধান করতে পারে শুধুমাত্র অন্ধভাবে সমাজের আচরণ-দ্বারা, অনুকরণের মাধ্যমে নয় ; সমাজ-জীবনকে নিজের নিজের সুবিধানুযায়ী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। **সবশেষে** আছে, ব্যক্তির অন্তর-পরিবেশ। মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট হ'ল যে, সে মনোময়। আশা, আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা—দৈহিক ও আধ্যাত্মিক—এইসব কিছু নিয়ে এই জগৎ। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির অন্তর-পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন। এক কথায় আমরা বলতে পারি, জড় ও প্রকৃতির সঙ্গে সমাজ, পরিবেশ ও অন্তর-সত্তার সার্থক অভিযোজনই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাবিদ্ রেমণ্ট (Raymont) যথার্থই বলেছেন—"শিক্ষা হ'ল এমন এক বিকাশের প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি-জীবনে শৈশব থেকে পরিণতকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ; যার মাধ্যমে ব্যক্তি ধীরে ধীরে বিভিন্ন কৌশলে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে সক্ষম হয়।" (**"Education means the process of development in which consists the passage of a human being from infancy to maturity, the process whereby he gradually adapts himself in various ways to physical, social and spiritual environment")।**

কিন্তু এ ধরনের উদ্দেশ্যের আদর্শগত দিক্ থেকে ত্রুটি না থাকলেও ব্যবহারিক দিক্ থেকে এই উদ্দেশ্য-গ্রহণের অনেক অসুবিধা আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি সকল রকম পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন হয়, তবে পরিবেশের প্রকৃতি ও ব্যক্তির প্রকৃতি নির্ণয়ের ওপর নির্ভরশীল হবে শিক্ষানীতি। এতে ক'রে একই পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার নীতি ব্যক্তিভেদে পৃথক হবে। আবার পরিবেশ চিরপরিবর্তনশীল। সুতরাং পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু পরিবর্তিত হওয়া দরকার। আদর্শগত দিক্ থেকে এটা ঠিক হ'লেও তার জন্য যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দরকার, তা সব সময় সম্ভব নাও হ'তে পারে। সবশেষে,

অভিযোজনমূলক লক্ষ্যের ত্রুটি

ব্যক্তিকে সার্থক অভিযোজন করার যোগ্য ক'রে তুলতে হ'লে কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত এর মধ্যে নেই। এইসব কারণে এই লক্ষ্যের মধ্যে তাত্ত্বিক সত্যতা থাকলেও গ্রহণের অসুবিধা আছে।

প্রসঙ্গক্রমে, একথা স্মরণ রাখার দরকার, মনোবৈজ্ঞানিক অর্থে 'অভিযোজন' (Adjustment) শব্দটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তার ব্যক্তিগত অভিযোজন-প্রচেষ্টাই নির্ধারণ করে দেয়। অভিযোজন-প্রয়াসের মধ্যেই ব্যক্তির আচরণগত স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। আর ব্যক্তির এই অভিযোজন-প্রয়াস যেহেতু তার জীবনের সর্বস্তরে ঘটে থাকে, সেহেতু, একে শিক্ষার-লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করলে, সে লক্ষ্য সংকীর্ণতামুক্ত হয়। তাই আধুনিক মনোবিদ্যার মত আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বেও অভিযোজন-প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মন্তব্য

॥ শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য সম্পর্কে মন্তব্য ॥
(Comment on the different Aims of Education)

শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আলোচনার ফলে একটা ধারণা প্রমাণিত হ'য়েছে যে, তাদের মধ্যে কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি আছে। আবার প্রত্যেকেরই একটা ভাল দিক্ আছে। তাই তাদের কোন একটাকে যেমন এককভাবে গ্রহণ করা যায় না, তেমনি বর্জনও করা যায় না। এইসব শিক্ষার লক্ষ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করলে আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, প্রত্যেক লক্ষ্যের

॥ শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যের মূল বক্তব্য ॥

লক্ষ্য	মূল বক্তব্য	ব্যক্তি-জীবনের ওপর প্রভাব
বৃত্তিমূলক লক্ষ্য	ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবনের প্রস্তুতি	জীবিকা অর্জন
কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য	সামাজিক রীতি-নীতির অনুশীলন	সামাজিক অভিযোজন
নৈতিক লক্ষ্য	ব্যক্তিগত চারিত্রিক বিকাশ	ব্যক্তিসত্তার গুণাবলীর বিকাশ
আধ্যাত্মিক লক্ষ্য	আত্মোপলব্ধি	অভিজ্ঞতার সমন্বয়ন
অভিযোজনমূলক লক্ষ্য	পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন	জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখা

পেছনে কিছু কিছু ব্যক্তিস্বার্থ জড়িয়ে আছে। চরিত্রগঠন, জীবিকা-অর্জন, আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়ন সবকিছুই ব্যক্তি-জীবনকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে। এইসব লক্ষ্যের

পেছনে আবার এক-একটা দার্শনিক তত্ত্বেরও (philosophical view) অবদান আছে।

আলোচনা

তবে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে আমরা সমাজ-উন্নয়নের কথাও উল্লেখ করেছি। এই ব্যক্তি-কল্যাণ ও সমাজ-উন্নয়ন মতবাদের মধ্যে যে পরস্পর দ্বন্দ্ব আছে, সে সম্পর্কে আলোচনা পৃথকভাবে করব। শিক্ষার লক্ষ্যকে যদি ব্যবহারিক দিক্ থেকে স্থির করতে চাই, তা'হলে তার সমস্ত ধরনের বিশেষ লক্ষ্যগুলির মূল গুরুত্বপূর্ণ অংশকেই গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে—ব্যক্তিকে কর্মজীবনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে দেওয়া, তার বৌদ্ধিক উন্নতি সাধন করা, তাকে সমাজ-জীবনের যোগ্য অধিকারী ক'রে গড়ে তোলা, তাকে আদর্শ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করা এবং সবশেষে তার আচরণের মধ্যে নমনীয়তার ভাব সঞ্চার ক'রে যে-কোন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন-ক্ষম রূপে তাকে গড়ে তোলা। আদর্শ ব্যক্তিজীবন এদের মধ্যে কোন একটা গুণকে বাদ দিয়ে হ'তে পারে না, এ কথা চিন্তা ক'রে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের (1964—66) প্রদর্শিত পথে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ স্থির করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—"The educational system must produce young men and women of character and ability committed to national service and development."

[এক] শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

॥ আলোচনা ॥

(Individual & Social Aims in Education)

শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ের সচেতন প্রয়াসের অনেক আগে যখন মানব-সমাজের শিক্ষার লক্ষ্য প্রাকৃতিক নিয়মে অবচেতন মনে সুপ্ত অবস্থায় থাকত, তখন থেকেই লক্ষ্য করা যায়, শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন সময়ে দুটো ভিন্নমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এই দুই ধারা হ'ল—ব্যক্তিতান্ত্রিকবাদ ও সমাজতান্ত্রিক-বাদ। শিক্ষার শুধু লক্ষ্য-নিরূপণে নয়, শিক্ষার তাৎপর্য, কাজ এবং অন্যান্য আঙ্গিক ক্ষেত্রেও এদের প্রভাব বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে। শিক্ষার যে কোন লক্ষ্যকে (ইতিপূর্বে যা আলোচনা করা হ'য়েছে) এই দুই শ্রেণীর যে কোন একটাতেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই দুই মতবাদ বিশেষভাবে দুই শ্রেণীর দার্শনিক চিন্তা থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতিবাদ (naturalism) থেকে এসেছে ব্যক্তিতান্ত্রিক ধারা এবং ভাববাদ (idealism) থেকে এসেছে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা। এছাড়া, মনোবিদ্যা (psychology) এবং সমাজ-বিদ্যার (sociology) উন্নত তান্ত্রিক ও পরীক্ষামূলক জ্ঞান যথাক্রমে তাদের ইন্ধন যুগিয়েছে। প্রথমে আমরা এদের সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করব।

প্রস্তাবনা

॥ শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য ॥

(Individual aim of Education)

ব্যক্তিতান্ত্রিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তিজীবনের উন্নতি-

সাধন করা। একমাত্র সুশিক্ষিত ব্যক্তিই সমাজে তার নিজের যোগ্যতা উপলব্ধি করতে পারে এবং তার সকল রকম সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হবে পরিবেশ বা সমাজ-নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির নিজস্ব দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ক্ষমতাবলীর সার্থক উপলব্ধিতে সাহায্য করা। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—"It is the business of education to develop the ideal prize man." অর্থাৎ, আদর্শ মানুষ তৈরি করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। যে ব্যক্তি দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে বিকাশের চরম অবস্থায় উন্নীত হ'য়েছেন, তিনিই আদর্শ মানুষ। যে ব্যক্তির জীবনে এই ধরনের সামগ্রিক সার্থকতা এসেছে, তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত। এই মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদ্‌দের কাছে ব্যক্তির চাহিদা সমাজের চাহিদার থেকে বড়। শিক্ষাজগতে এই ধারণা বা মতবাদ বিভিন্ন দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে।

ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের মূল ভিত্তি

॥ এক ॥ জীববিজ্ঞানীদের (Biologists) মতে, প্রত্যেক মানুষই এক-একটি একক জৈবিক সত্তা (Biological unit)। পৃথিবীতে প্রত্যেক শিশু তার নিজস্ব পৃথক্ সত্তা নিয়ে জন্মায়; প্রত্যেক শিশু অন্য শিশু থেকে আলাদা। তাদের প্রত্যেকের জীবনই নতুন এবং পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়। তাদের চোখের মণির রঙ যেমন আমরা বদলাতে পারি না, তেমনি তাদের অন্যান্য প্রকৃতিও আমরা পরিবর্তন করতে পারি না; ব্যক্তির এই স্বকীয়তাকে সংরক্ষণ করার জন্যই শিক্ষা। অধ্যাপক থমসন (Thompson) বলেছেন, শিক্ষা ব্যক্তির পরিপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তার মাধ্যমে তাকে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়ে রাখে ("Education is for the individual: its function being to enable the individual to survive and live out its complete life.")। আগে ব্যক্তি, পরে সমাজ। ব্যক্তির জন্যই সমাজ, সমাজের জন্য ব্যক্তি নয়। সুতরাং শিক্ষার মুখ্য কর্তাকেই সেবা করা উচিত।

জৈবিক ভিত্তি

॥ দুই ॥ প্রাগ্রতিবাদীরা (Naturalist) বলেছেন, সমাজ একটা কলুষিত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ব্যক্তির যদি নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ করতেই হয় শিক্ষার মাধ্যমে, তবে তা সমাজকে বাদ দিয়েই হওয়া উচিত। সমাজের সংস্পর্শে এসেই ব্যক্তিজীবন কলুষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর জনজাগরণের নেতা রুশো বলেছেন—"Everything is good as it comes from the hands of Author of nature but everything degenerates in the hands of man. God makes all things good. Man meddles them and they become evil." সুতরাং, ব্যক্তি এবং সমাজ পরস্পর-বিরোধী ধারণা। তাই মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে (Man as an individual) এবং ব্যক্তিকে সামাজিক প্রাণী হিসেবে (Man as a social individual) একসঙ্গে শিক্ষা

প্রকৃতিবাদের সমর্থন

দেওয়া যায় না। যেহেতু শিক্ষার লক্ষ্য মহৎ হওয়া উচিত, সেহেতু ব্যক্তি তার কাছে প্রধান।

॥ তিন ॥ মনোবিদ্যার (Psychology) বিকাশও ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (Individual difference) মতবাদ আধুনিক মনোবিদ্যায় একটা প্রমাণিত তত্ত্ব। মনোবিদ্‌রা বিশ্বাস করেন—প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদা। দৈহিক মানসিক উভয় দিক্ থেকেই ব্যক্তি তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। সুতরাং, যে সব শিক্ষাবিদ্‌রা এই তত্ত্বের উপর আস্থাবান, তাঁদের মতে শিক্ষাও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হবে। কারণ, প্রত্যেক শিশুই তার নিজস্ব স্বতন্ত্র সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (individual different) ধারাকে বজায় রেখে তার জীবন-বিকাশে সহায়তা করা।

মনোবিদ্যার সমর্থন

॥ চার ॥ ভাববাদী দার্শনিকদের (idealist) তত্ত্বের মধ্যে ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। এই মতানুযায়ী প্রত্যেক মানুষই পরমাত্মার অংশ। তার মধ্যেই ব্রহ্ম বিদ্যমান। বিবেকানন্দ বলেছেন—"Man is potentially divine."। এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে তার অন্তর্নিহিত এই ব্রহ্মসত্তার বিকাশসাধন করা। অনুরূপভাবে বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ টমাস শীল্ড (Thomas Shield) বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল রক্তমাংসের দেহের শিশুকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন ক'রে তোলা ("Education aims at transforming a child of the flesh into a child of God." সুতরাং শিক্ষা যদি ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে সম্পন্ন না হয়, তা'হলে ব্যক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ (manifestation) সম্ভব নয়। শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই পরমাত্মার (absolute) সামিল ক'রে তোলা।

ভাববাদের সমর্থন

॥ পাঁচ ॥ আবার প্রয়োগবাদীদের (Pragmatists) মতে, মানব-সভ্যতার বিকাশ হয়েছে বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বা যাদের আমরা 'মহাপুরুষ' বলি তাদের আবির্ভাবে। নিউটন, আইনস্টাইন প্রভৃতির মত বিজ্ঞানী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, কবীর প্রভৃতির মত ধর্মগুরু, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মত সমাজ-সংস্কারক যদি পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত না হ'তেন, তা'হলে মানুষের সমাজের এত উন্নতি সম্ভব হ'ত না। আধুনিককালে প্রয়োগবাদীরা যদিও ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন, তবুও প্রাথমিক অবস্থায় তাঁদের তত্ত্বের সংব্যাখ্যানের ঝোঁক ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের দিকেই অনেকটা বেশী ছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তির উন্নতি করতে না পারলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। ব্যক্তিদের দ্বারাই সমাজের উন্নতি হবে, তাই শিক্ষার আপাতঃ লক্ষ্য হবে ব্যক্তি বা শিশু।

প্রয়োগবাদের সমর্থন

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহ'লেও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তার অনেক দোষত্রুটি আছে, বিশেষ ক'রে চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের।

ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের ত্রুটি

[এক] **প্রথমতঃ,** অত্যধিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যক্তিকে আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর ক'রে তোলে। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে অনেক সদ্‌গুণের সংযোজন হয় যেগুলো একক জীবনে সম্ভব নয়। ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের মূলে যে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) কাজ করছে, তার অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ অনেক সময় ব্যক্তি-জীবনের সুস্থ বিকাশকে ব্যাহত করে। বিশেষভাবে নৈতিক শিক্ষার (Moral education) ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ব্যক্তিকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলতে পারে এবং বর্তমান সমাজে সেই আশঙ্কাই প্রবল।

প্রকৃতিবাদের ব্যর্থতা

[দুই] **দ্বিতীয়তঃ,** জীববিজ্ঞানের (Biology) যে তত্ত্বকে ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে স্থান দেওয়া হ'য়েছে, তাও ভ্রান্ত বা আংশিক প্রয়োগে দুষ্ট। প্রত্যেক মানুষই একক সত্ত্বা এবং স্ব-স্ব স্বাধীন (autonomous) জৈবিক একক (Biological unit) সেটা ঠিক, কিন্তু তার গুণ-নির্ণয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও যে সব সময় ক্রিয়াশীল, এ কথা তাঁরা অস্বীকার করেছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection), সেও যে পরিবেশ-নির্ভর—এ কথা অস্বীকার করলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভুল সংব্যাখ্যান হবে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য শুধু ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে নির্ধারিত হ'তে পারে না। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত-গ্রহণের জন্য পরিবেশকে বিবেচনা করতে হবে।

জৈবিক তত্ত্বের অপপ্রয়োগ

[তিন] **তৃতীয়তঃ,** ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের সপক্ষে যুক্তি হিসাবে মহৎ ব্যক্তিদের আবির্ভাবের ঘটনাকে উল্লেখ করা হয়েছে। মানব সভ্যতা ব্যক্তি-জীবনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে, সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হবে তাকে পরিচর্যা করা। কিন্তু একটু বিচার করলেই দেখা যায়, যে সব মনীষী সমাজকল্যাণে নিজেদের নিয়োগ করেছেন বা সমাজ-অগ্রগতিতে সহায়তা করেছেন, তাঁরা কেউই সমাজের প্রভাবমুক্ত নন। সমাজের অতীত সংস্কৃতির সার্থক অধিকারী হয়েছিলেন বলেই তাঁরা সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের এই সংস্কৃতিবান হওয়ার পেছনে যদি ব্যক্তিতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করত, তা'হলে কোনদিনই সম্ভব হ'ত না।

প্রয়োগবাদের অপপ্রয়োগ

[চার] **চতুর্থতঃ,** বক্তিস্বাতন্ত্র্য যে জীবজগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য হবে স্বাতন্ত্র্যকে সমাজোপযোগী ব্যক্তি-সত্তায় পরিবর্তিত করা। সুতরাং মনোবিদ্যার এই পরীক্ষিত তত্ত্বের বিশুদ্ধ প্রয়োগের মধ্যে ভুল থেকে যায় যদি আমরা তাকে ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। রস (Ross) এই স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে বলেছেন—**"By individuality we have in mind, ideal not yet attained, the attainment of which is the end not only of education but of life."** অর্থাৎ এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে এমন কিছুকে বলতে চাইছি, যার পরিপূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র সমাজ-পরিবেশেই সম্ভব।

মনোবিদ্যার ভ্রান্ত প্রয়োগ

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের অনেক দোষত্রুটি আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনকে সৌন্দর্যময় ক'রে তোলা, কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য সে পথে আমাদের বিশেষ সহায়তা করে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে জীবনের বিকাশকে ব্যাহতও করে। তাই চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়।

মন্তব্য

॥ শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য ॥
(Social aim of Education)

ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের ঠিক বিপরীত এক মতবাদ শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়। একেই বলা হয় সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মতবাদ। এই মতবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা বলেন, মানুষের একক জীবন অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বলেই সে একদিন সমাজ সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানে সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ব্যক্তির সমস্ত রকম নিরাপত্তা (security) সমাজ-জীবনের নিরাপত্তার ওপর নির্ভর করছে। তাই শিক্ষারও উদ্দেশ্য হবে সমাজ-কল্যাণের পথে নিয়োজিত করা। শিক্ষা এমন হবে যে, তার দ্বারা সমাজ-জীবন পুষ্ট হবে। সমাজ-জীবন পুষ্ট হলে ব্যক্তি-জীবনও পরিপুষ্ট হবে। তার কারণ, ব্যক্তি সমাজেরই একজন। এই মতবাদ জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hagel)-এর রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের (Political theory) ওপর প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য কি ?

সমাজ-বিজ্ঞানের (Sociology) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদ্‌রা বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপর এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ যেদিন থেকে সমাজ গড়ে তুলল, সেদিন থেকেই সমাজের মধ্যে জীবনযাপনের নিয়মাবলীও সৃষ্টি করেছিল। ল বা সমষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য এই জাতীয় নিয়মের বা অনুশাসনের প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিকে আয়ত্তে রাখার জন্য প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায় কিছু কিছু এইরকম নিয়ম আছে। তা সে নিয়ম লিখিত বা অলিখিত (formal or informal —দুই-ই হ'তে পারে। এখন ব্যক্তিরা যাতে ঐ সব নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে, তারও ব্যবস্থা করার দরকার। তার জন্য আবার সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা আছে। এদের তাঁরা বলেছেন, সমাজ-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Means of social control)। শিক্ষা এমনি এক ধরনের সমাজ-নিয়ন্ত্রণের উপায় মাত্র ("Education is a means of social control".)। শিক্ষার দ্বারা সমাজের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়। আবার শিক্ষালয়গুলো (Educational institution) হ'ল সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social institution)। এই বিশ্লেষণ থেকে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ প্রমাণ করতে চাইলেন— শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সমাজের চাহিদা মেটানোর জন্য, সুতরাং তার লক্ষ্যও

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের পক্ষে সমাজবিজ্ঞান

সমাজমুখী হবে। যেমন, রোজেনক্রানস্ (Rosenkranns) বলেছেন—"Education is the process by which the individual man elevates himself to the species."

চরম সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের অনেক ত্রুটি আছে। ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের মত একেও আমরা গ্রহণ করতে পারি না। বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্গণ এই সমাজতান্ত্রিক মতবাদকেও এক-পক্ষীয় মতবাদ হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁরা এর বিপক্ষে যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

সামাজিক লক্ষ্যের ত্রুটি

॥ **এক** ॥ এই মতবাদে সমাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, ব্যক্তিকে রাখা হয়েছে পেছনে। মনোবিদ্যার বিশ্লেষণে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব দেহ-মনের প্রবণতার অধিকারী। তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ সব কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে শিক্ষা দিতে গেলে সমাজব্যবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলা তো আনা দূরের কথা, চরম বিশৃঙ্খলা এবং আলোড়ন সমাজে দেখা দেবে। সুতরাং যে উদ্দেশ্য-সাধনের পথে আমরা যেতে চাই, সেই সমাজকল্যাণ কোনমতেই সম্ভবপর হবে না।

অমনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

॥ **দুই** ॥ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজ-আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ব্যক্তির নিজস্ব সৃজনী প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর হবে না। এতে ক'রে সমাজ-অগ্রগতি ব্যাহত হবে। কারণ, সৃজনশীল মানুষই সমাজের গতানুগতিক ধারা ভেঙে তাকে অভিনবত্বের পথে এগিয়ে দেয়।

স্বকীয়তা-বিকাশে বাধা

॥ **তিন** ॥ সভ্যতার বর্তমান পর্যায়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই শিক্ষার ভার রাষ্ট্রের (সমাজের) ওপর থাকে। হব্স্ (Hobbs)-এর লেভিয়াথানে (Leviathan) বর্ণিত সামাজিক চুক্তিতে (Social contract) বিশ্বাস করুন বা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাস করুন, যে কোন রাষ্ট্রের শিক্ষার লক্ষ্য রাষ্ট্রনায়ক বা শাসকগোষ্ঠীর মতবাদের দ্বারাই নির্ণীত হবে। তাতে ক'রে সকল ব্যক্তির কল্যাণ হবে কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাই বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং একদলীয় শাসন-ব্যবস্থার (Totalitarian state) আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে (Political Science) বিতর্কের সৃষ্টি হ'য়েছে, তেমনি শিক্ষাবিজ্ঞানেও গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য (Democratic aim of education) এবং একদলীয় শাসনাধীন ব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্যের (Totalitarian aim of education) আপেক্ষিক উৎকর্ষ নিয়ে বিতর্কের সূচনা হ'য়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির অনুপ্রবেশ

॥ ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমন্বয় ॥
(Synthesis of Individualistic and Socialistic Aim)

শিক্ষা-দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন সময়ে এই দুই মতবাদের যে কোন একটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এথেন্সের নগররাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিতান্ত্রিক। প্রাচীন ভারতের আশ্রমিক শিক্ষাও ছিল বিশেষভাবে চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির (Self realization) মাধ্যমে জীবনের উন্নতিসাধনই ছিল প্রধান লক্ষ্য। আবার প্রাচীন স্পার্টা রাষ্ট্রে শিক্ষা ছিল পুরোপুরিভাবে সমাজতান্ত্রিক। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যবৃদ্ধির জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল সামরিক বাহিনীর; তাই তাঁদের ছিল সৈনিক-তৈরির শিক্ষা। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সমাজতান্ত্রিক ভাবের প্রভাব দেখতে পাই। এমনিভাবে প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় বা সমাজে যেমন এই দুই মতবাদের অস্তিত্ব দেখতে পাই, তেমনি আধুনিক যুগেও তাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বর্তমান কালে শিক্ষাবিদ্ এবং দার্শনিকরা (Educational philosophers) এঁদের মধ্যে কোন একটিকে এককভাবে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেননি। তারা দু'টিরই চরম ভাবকে বর্জন করেছেন। তার কারণ, চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যক্তিকে স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিকভাবে গড়ে তুলবে; আর চরম সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব গুণাবলীকে বিকশিত হ'তে দেবে না। বর্তমানে প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্ এই মতবাদের এক সমন্বয়িত রূপকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

প্রস্তাবনা

বর্তমানে শিক্ষাবিদ্ এবং চিন্তাবিদ্‌রা প্রত্যেকেই মনে করেন, ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে বিরোধের কোন অবকাশ নেই। আসলে তাঁদের মধ্যে যে বিরোধ, তা আমাদের জীবন-সম্পর্কে আংশিক বা অসম্পূর্ণ ধারণা থেকে এসেছে। মানুষের জীবনের দুটো দিকই বর্তমান। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব চাহিদা, অনুরাগ, বিশেষ প্রেরণা, বিশেষ ক্ষমতা এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে। এটাই তার ব্যক্তিগত দিক। কিন্তু একই সঙ্গে তার জীবনের আর একটা দিকও আছে। কোন ব্যক্তিই একক বা নিঃসঙ্গ নয়। সে সমাজ-পরিবেশে জন্মায়, সমাজ-পরিবেশে বৃদ্ধিলাভ করে। এটাই তার জীবনের সামাজিকতার দিক। সে সমাজের বৃহত্তর অঙ্গে একটি একক সত্তা। শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য তার সমাজ-জীবনের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালে শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, তাঁর জীবনের এই দুটি দিকের মধ্যে কোন একটির গুরুত্ব কম বা বেশী নয়। তাছাড়া, তারা পৃথক বা পরস্পরবিরোধী নয়; বরং পরস্পর-নির্ভরশীল।

ব্যক্তি-জীবনের প্রধান দুটি দিক ও শিক্ষার লক্ষ্য

প্রথমতঃ, ব্যক্তির নিজস্ব দিকের কথা বিচার করা যাক। ব্যক্তি নিজস্ব চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, অনুরাগ এবং সকল রকম সম্ভাবনা নিয়েই জন্মায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ

: অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, মানবশিশু জন্মাবস্থায় একান্তই অসহায় থাকে। তার জীবনধারণের জন্য অন্যের বা বৃহত্তর অর্থে সমাজের বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। সমাজ-পরিবেশের বা পরিবারের মধ্যে যদি সে আশ্রয় না পায়, তা'হলে তার অস্তিত্ব বজায় রাখা মুশকিল হ'য়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে আমরা যদি ব্যক্তি-কল্যাণ ধরেই নিই, তা'হলেও বলতে হয় ব্যক্তির এই কল্যাণ সমাজ-পরিবেশের বাইরে হ'তে পারে না। জীবধর্মের নিয়মই হ'ল—তার বিকাশ হয় নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায়। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য দরকার উপযুক্ত পরিমাণ বায়ু, জল ও তাপ। তেমনই ব্যক্তির জীবনের সম্ভাবনার বিকাশের জন্যও দরকার যথার্থ পরিবেশ। সেই পরিবেশগত উপাদান যোগায় সমাজ। তাই ব্যক্তিজীবন সমাজ থেকে একেবারে আলাদা নয়, তার ওপর নির্ভরশীল। 'ব্যক্তি তার জীবন-বিকাশের জন্য আহার্য সংগ্রহ করে সমাজ থেকে'—দার্শনিক শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই এই মত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষাবিদ্ রেমণ্ট (Raymont) বলেছেন—"The isolated individual is a figment of the imagination." রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'শান্তিনিকেতনে' বলেছেন, "মানুষের কাছে কেবল জগৎ-প্রকৃতি নয়, সমাজ-প্রকৃতি বলে আর একটা আশ্রয় আছে। ·· মানুষকে একই সঙ্গে দুই ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য যে, তারই সমাঞ্জস্য সংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়।" শিক্ষাই সেই সামঞ্জস্য-সাধনায় নিযুক্ত।

সমাজ-জীবনের ওপর ব্যক্তিসত্তার নির্ভরশীলতা

আবার, সমাজ-জীবনকে অগ্রাধিকার দিলে আমাদের একই রকম সিদ্ধান্তে আসতে হয়। ব্যক্তি ছাড়া সমাজের কোন অস্তিত্ব নেই। সমাজ বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তির সচেতন এবং সক্রিয় সমবায়। · সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সক্রিয় মানসিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্ত। একজনের অনুভূতি অপরের মধ্যে মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া সমাজের উন্নতি হ'তে পারে না। ব্যক্তি যত উন্নত হবে, সমাজ ততই উন্নত হবে। পৃথিবীর যে কোন উন্নত সমাজ তার অন্তর্গত ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও প্রচেষ্টার সামগ্রিক ফল বলা যেতে পারে। কীর্তিমান ব্যক্তি অনেকাংশে সমাজের ও সভ্যতার উন্নতির জন্য দায়ী। যেমন—রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন প্রভৃতি মনীষী আমাদের সমাজব্যবস্থার কম উন্নতি করেননি। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সমাজকল্যাণের জন্য ব্যক্তিকল্যাণ একান্তভাবে প্রয়োজন।

ব্যক্তির উপর সমাজের নির্ভরতা

সুতরাং উভয় দিক্ থেকে বিচার করে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিজীবন যেমন সমাজের ওপর নির্ভরশীল, তেমনই সমাজও ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যের কল্যাণ সম্ভব নয়। ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব যদি সমাজপরিবেশ তার অনুকূল হয় : আর সমাজ-উন্নতি তখনই সম্ভব যখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকাশলাভ করবে। রাস্ক (Rusk) বলেছেন—"Individuality

is of no value and personality is a meaningless term apart from the social environment in which they developed and made manifest. Self-realization can be achieved only through social service and the social ideas if real value can come into being only through free individuals who have developed valuable individuality." জীবনের এই দু'দিকের কথা বিবেচনা ক'রে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা এমন শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করেছেন, যার মধ্যে উভয়ের গুরুত্বকে স্বীকার করা হ'য়েছে। যেমন, জন ডিউই বলেছেন—শিক্ষার লক্ষ্য হবে সেইসব সম্ভাবনা বা ক্ষমতার বিকাশসাধন করা যার দ্বারা সে পরিবেশকে আয়ত্তে আনতে পারে এবং যার মাধ্যমে তার জীবনের দায়িত্বপালনে সক্ষম হয়—"Education is development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his responsibilities."। তিনি ব্যক্তি (individual) এবং তাঁর দায়িত্বের (responsibilities), বিশেষভাবে সামাজিক দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শনে বিশেষ চারিটি উদ্দেশ্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্য হ'ল—(১) বৃদ্ধিই শিক্ষা, (২) জীবনই শিক্ষা, (৩) সামাজিক যোগ্যতা-অর্জনই শিক্ষা এবং (৫) অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাসই শিক্ষা। এ সম্পর্কে আমরা পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করব। এখানে আমরা আধুনিক কালের আর এক শিক্ষাবিদের মন্তব্যের উল্লেখ ক'রে এই আলোচনা শেষ করব, সেটা হ'ল স্যার পার্শিনানের। তিনিও শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে এই মতবাদের সমন্বয় করেছেন। তিনি এই দুই দিকের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, মানুষের অনেক আচরণ আছে, যাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে সামাজিক আচরণ বলতে পারি। কিন্তু সে সব আচরণের মধ্যেও একটা প্রবল 'অহং সত্তা' কাজ করে। আবার যে ব্যক্তি একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীবরেণ্য, তাঁকেও সঠিকভাবে বুঝতে হ'লে তাঁর সমাজ-পরিবেশকে জানা দরকার—"(The most clearly 'social' conduct implies a strong 'self' behind it. The most original personality is unintelligible apart from the social medium in which it grows.")। এই বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে তিনি যা স্থির করেছেন, তাতে ব্যক্তির বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেও সমাজের প্রভাবের কথা একেবারে অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যার মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করতে পারে,— 'Educational efforts must be limited to securing for every one, the conditions under which individuality is most completely developed,—that is to enable

সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের আধুনিক সংব্যাখ্যান

him to make his original contribution to the variegated whole of human life as truly characteristic as his nature permits."—নানের এই বক্তব্যের মধ্যে দুটি শব্দ—'conditions' এবং 'individuality' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, তিনি ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ (complete development) বিকাশের কথাও বলেছেন। 'Condition' বলতে তিনি বিশেষভাবে সমাজ-পরিবেশের কথাকেই ইঙ্গিত করেছেন। 'Individuality' বলতে তিনি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলীর সমন্বয়কে বুঝিয়েছেন। সুতরাং তাঁর মতবাদের মধ্যে আমরা সমাজতান্ত্রিক এবং ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের সমন্বয় পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই।

[দুই] ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন (১৯৬৪—৬৬) ও জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য

॥ আলোচনা ॥

[Indian Education Commission (1964–66) and aim of National System of Education]

পরিচিতি

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতের জাতীয় সরকার চিন্তা করেন যে, দেশের সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা না করলে পরবর্তী শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব নয়। তাই ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার ডাঃ ডি. এস. কোঠারীর সভাপতিত্বে এক কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। এই কমিশন ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'য়েছে; এই রিপোর্ট ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে নানা দিক্ থেকে প্রভাবিত করেছে। ভারত সরকার এক রেজলিউশনের মাধ্যমে এই কমিশনের নির্দেশিত পথে জাতীয় শিক্ষাসম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করেছেন। এই রেজলিউশনে বিশেষভাবে উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে—"জাতীয় সরকার একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, সামগ্রিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিমূলক উন্নয়নের জন্য, জাতীয় সংহতি বজায় রাখার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি নতুনভাবে রচনা করতে হবে এই শিক্ষা-কমিশনের নির্ধারিত মৌলিক সুপারিশগুলির ভিত্তিতে।" ("The Government of India is convinced that a radical reconstruction of education on the broadlines recommended by the Education Commission is essential for economic and cultural development of the country for national integration and for realising the idea of a socialistic pattern of society.")। তাছাড়া, ভারত সরকার পরবর্তী দুটি দশকে শিক্ষা-সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা করেছেন, তাও সকল ক্ষেত্রে এই কমিশনের রিপোর্ট দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এই কমিশনের আলোচনা যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে।

শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টে 'Education and National Objectives' শীর্ষক অধ্যায়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে। এখানে বলা হ'য়েছে, ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কার করতে হ'লে তাকে প্রকৃত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে। বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার উপযোগী ক'রে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে হবে। আর তা করতে হ'লে শিক্ষার লক্ষ্য হবে চতুর্মুখী—(১) জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করা, (২) সামাজিক সংহতি ও জাতীয় সংহতি স্থাপন করা, (৩) আধুনিক ভাবধারার দ্রুত প্রবর্তন এবং (৪) সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা। শিক্ষা-কমিশন এদের সম্পর্কে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ("The most important and urgent reform needed in education is to transform it to endeavour to relate it to life, needs and aspirations of the people and thereby make it a powerful instrument of social, economic and cultural transformation necessary for the realization of the national goals. For this purpose, education should be developed so as to increase productivity, achieve social and national integration, accelerate the process of modernization and cultivate social, moral and spiritual values."—Indian Education Commission).

শিক্ষা ও জাতির লক্ষ্য

কমিশনের সদস্যদের মতে ভারতবর্ষের মত দেশ যেখানে জীবনের সকল দিকের উন্নয়ন একান্তভাবে প্রয়োজন, সেখানে শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হ'লে তাকে শুধু জ্ঞানমুখী করলে চলবে না। জাতীয় সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথে শিক্ষাকে নিয়োজিত করতে হবে। শিক্ষাকে যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে হয়, তার জন্য যে ব্যয় হবে, তা তাকে নিজেই বহন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই শিক্ষার মাধ্যমে যাতে জাতীয় উৎপাদন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাঁরা অনেকগুলো উপায়ের কথাও বলেছেন। যেমন—(ক) বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার (Science Education), (খ) কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সুযোগ-দান (Work experience), (গ) প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ, (ঘ) বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা; বিশেষভাবে কৃষি ও শিল্পকেন্দ্রিক বৃত্তি-সমূহের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা ও উৎপাদন-বৃদ্ধি

কমিশনে আরও বলা হ'য়েছে, জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জাতির বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন করা এবং সমাজ ও জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে সহায়তা করা।

সে উদ্দেশ্যে—(১) বিদ্যালয়গুলোর সংস্কারের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সুযোগের সংগতি আনতে হবে; (২) শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে বাধ্যতামূলক, জনসেবামূলক কাজকে পাঠ্যক্রমের মধ্যে আবশ্যিক ক'রে; (৩) সার্থকভাবে ভাষানীতি নির্ধারণ করতে হবে এবং (৪) জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে অতীত কৃষ্টির অনুশীলন ও পুনর্বিন্যাস ক'রে আধুনিক সমাজ-জীবনের অধিকারী হতে হ'বে।

শিক্ষা ও জাতীয় সংহতি

শিক্ষাকে জাতীয় স্বার্থের অনুকুল করতে হ'লে তার ভেতর আধুনিক ধারার প্রবর্তন করতে হবে এবং তা যাতে ত্বরান্বিত হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। মানুষের জ্ঞানের প্রসারতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। কমিশন এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"Apart from raising the educational level of average citizen, it must try to create an intelligentia of adequate size and competence, which comes from all strata of society and whose loyalties and aspirations are rooted to the Indian soil."

শিক্ষা ও আধুনিকীকরণ

সবশেষে, জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমহারে যাতে নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ সকলের মধ্যে জাগ্রত হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি জাতীয় নীতি ও পাঠ্যসূচী ঘোষণা করতে হবে।

শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র

ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন দিকের সূচনা করেছেন বলা যেতে পারে। বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, এই উদ্দেশ্য-স্থাপনে একদিকে যেমন দেশের আর্থিক সমস্যা-সমাধানের কথা চিন্তা করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি জনগণের মধ্যে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার কথাও চিন্তা করা হয়েছে। এই লক্ষ্য একদিকে যেমন ব্যবহারিক জীবনোপযোগী, অপরদিকে তা মানবীয় গুণ-সঞ্চারণে সচেষ্ট। আবার এর মধ্যে আমরা একদিকে পাই পাশ্চাত্ত্য ধারার অতি-আধুনিকতার ওপর আস্থা, অন্যদিকে ভারতীয় কৃষ্টির সঙ্গে সেই আধুনিক ধারার সমন্বয়। এক কথায় বলা যেতে পারে, এই লক্ষ্যাবলী আমাদের প্রাচীন কৃষ্টির সঙ্গে আধুনিক গতিবাদী সভ্যতার ভাল দিকের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করেছে। তাই শিক্ষা-কমিশনের সঙ্গে প্রায় একমত হয়ে The Committee of Members of Parliament on Education তাঁদের ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য হবে—

মন্তব্য

(১) সংবিধান-নির্দেশিত পথে ভারতীয় সমাজকে সাম্য, ন্যায়বিচার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করা।

(২) প্রত্যেক শিশুকে তার আত্মবিকাশে সমান এবং প্রয়োজনীয় সকল রকম সুযোগ-দান করা।

(৩) ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা।

(৪) বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।

["Development of national system of education···which will

—accelerate the transformation of existing social system into a new one based on the principles of justice, equality, liberty and dignity of the individual, enshrined in the constitution of India.

—provide adequate and equal opportunity to every child and help him develop his personality to the fullest.

—make the rising generation conscious of the fundamental unity of the country... ; and

—emphasize science and technology and the cultivation of moral, social and spiritual values."]

শিক্ষার এই লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতীয় শিক্ষাকে বিভিন্ন দিক থেকে পুনর্গঠিত করা হ'য়েছে। কিন্তু, ভারতীয় শিক্ষার অগ্রগতি সব সময় যে প্রত্যাশামত হ'য়েছে, একথা বলা যায় না। এই কারণে, ১৯৮৫ সালে ২০শে আগস্ট কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ভারতীয় শিক্ষার পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে এবং তার লক্ষ্য নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে সামগ্রিকভাবে একটি মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন ভারতীয় সংসদে। এই প্রতিবেদন-পত্রের নাম দেওয়া হ'য়েছে—"Challenge of Education—A policy perspective." এই প্রতিবেদন পত্র জাতীয় বিতর্কের জন্য উপস্থাপন করা হ'চ্ছে। ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে দেশব্যাপী উৎসাহ দেখা দিয়েছে! আশা করা যায় এই বিতর্কের ফলশ্রুতি হিসাবে এই সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষানীতি রচনা করা সম্ভব হ'বে এবং একবিংশ শতাব্দীর চাহিদার কথা স্মরণ রেখে ভারতীয় শিক্ষার বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হবে।

সারসংক্ষেপ

সচেতন-প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। তাই বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। এইসব লক্ষ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কারণ শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাবিদ্দের জীবন-দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছে।

শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্যে বলা হ'য়েছে, মানুষকে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার এই ধরনের লক্ষ্য স্থাপনের সুবিধা হ'ল এর দ্বারা মানুষের আর্থিক চাহিদা ও সক্রিয়তার চাহিদা পরিতৃপ্ত করা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা স্মরণ রাখা দরকার, কেবলমাত্র

এই জাতীয় লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকে পরিচালিত করলে মানুষের অন্যান্য চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় না।

অনেক চিন্তাবিদ্ শিক্ষার কৃষ্টিমূলক লক্ষ্যের কথা বলেছেন। এই মতানুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ বা ব্যক্তিকে তার সামাজিক কৃষ্টি উপলব্ধি করতে সহায়তা করা। এই ধরনের লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হ'লে শিক্ষা তার সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য হারায়। আধুনিক যুগে মানুষকে বিশ্বমানবের কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। তাই সংকীর্ণ গোষ্ঠীভিত্তিক কৃষ্টিমূলক লক্ষ্যকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না।

শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্যে ব্যক্তির নৈতিক মান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা, সমাজসম্মত পথে পরিচালিত করা। কিন্তু, নৈতিক মান যেহেতু পরিবর্তনশীল, সেহেতু তার দ্বারা শিক্ষার একটি স্থায়ী মান ঠিক করা যায় না।

শিক্ষার আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের উন্নত মূল্যবোধ জাগ্রত করার কথা বলা হ'য়েছে। কিন্তু শিক্ষার এই লক্ষ্য বস্তুনির্ভর নয়। তাই অনেক শিক্ষাবিদ্ একে গ্রহণ করতে চান না।

শিক্ষার অভিযোজনমূলক লক্ষ্যে ব্যক্তিকে অভিযোজনক্ষম করে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। শিক্ষার এই অভিযোজনমূলক লক্ষ্য বাস্তবসম্মত। এই লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হ'লে শিক্ষা ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও তার নিজের অন্তর-পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে সহায়তা করবে।

এছাড়া, শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি বিপরীতমুখী মতবাদ দেখা যায়—ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের মূল কথা হ'ল—শিক্ষা ব্যক্তির জন্য; তার উন্নতি করাই হবে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মূল কথা হ'ল—শিক্ষা সমাজের জন্য; তাই সমাজের উন্নতি করাই হবে তার একমাত্র লক্ষ্য। আধুনিককালে এই ধরনের একক চরম মতবাদ বর্জন করা হ'য়েছে। তার পরিবর্তে সমন্বয়ী মতবাদ গ্রহণ করা হ'য়েছে। এই সমন্বয়ী মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হ'চ্ছে ব্যক্তি-কল্যাণের মাধ্যমে সমাজ-কল্যাণ সাধন করা।

আধুনিক ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য সমন্বয়ী নীতির দ্বারাই নির্ধারিত হ'য়েছে। তাই ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন শিক্ষার লক্ষ্যকে জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কবদ্ধভাবে বিচার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই লক্ষ্যে ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিকাশের কথাকেও অস্বীকার করা হয়নি। কমিশন ভারতীয় শিক্ষার চারটি লক্ষ্যের কথা বলেছেন—(১) জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করা, (২) সামাজিক ও জাতীয় সংহতি স্থাপন করা, (৩) আধুনিক ভাবধারার প্রবর্তন করা এবং (৪) সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা। শিক্ষা-কমিশনের মূল নীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় সংসদ শিক্ষার যে লক্ষ্য স্থির করেছেন, তার দ্বারাই ভারতীয় শিক্ষার পুনর্গঠন করা হ'য়েছে। বর্তমানে বাস্তব মূল্যায়নের ভিত্তিতে নতুন শিক্ষানীতি রচনার প্রস্তাব করা হ'য়েছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই এই শিক্ষানীতি রচনা করা সম্ভব হবে।

প্রশ্নাবলী

1. "Education is adjustment : a life to be lived."—Elucidate.

   ['শিক্ষাই অভিযোজন ; শিক্ষাই জীবন'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।]

2. The goal of education is sometimes said to be adjustment. Adjustment may be either to the nature or social environment. Express your opinion in this regard.

   [অনেক সময় অভিযোজনকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই অভিযোজন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে হতে পারে অথবা সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে হতে পারে। এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।]

3. 'The aim of education is to develop the total man'.—Discuss critically.

   ['শিক্ষাব লক্ষ্য হ'ল মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা।'—বিশদভাবে আলোচনা কর।]

4. Critically discuss the modern concept of development of individuality as the goal of education.

   [আধুনিক ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।]

5 What do you understand by individualistic and socialistic aim of Education ? Which would you advocate and why ?

   [শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য বলতে কি বোঝ ? এদের মধ্যে কোন্‌টি তুমি গ্রহণযোগ্য মনে কর এবং কেন ?]

6 Critically discuss the vocational aim of education.

   [শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।]

7. Critically examine the different views regarding the aims of education. What, in your opinion, should be the ultimate aim of Education ?

   [শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যগুলি পর্যালোচনা কর। তোমার মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য কি হওয়া উচিত ?]

8 Fully develop your ideas regarding aims of education.

   [শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তোমার ধারণা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ কর।]

9 Why it is necessary to have an aim of education ? Why there are aims of education rather than a single aim ?

[শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা কি ? শিক্ষার একটি লক্ষ্যের পরিবর্তে অনেকগুলি লক্ষ্য দেখা যায় কেন ?]

10. Discuss the general aim of education in India as put forward by the Indian Education Commission.
[ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ভারতীয় শিক্ষার যে লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ করেছেন, সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।]

11. Why should education have an aim ? How is the aim of education determined from the standpoints of individual and society.
[শিক্ষার 'লক্ষ্য' থাকা প্রয়োজন কেন ? 'ব্যক্তি' ও 'সমাজের' দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করা যায় ?]

12 "All round development of man is Education."—Explain in full
['মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই শিক্ষা'—বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।]

13 What do you understand by individualistic and socialistic aims of education ? How are these two interrelated ?

[শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য বলতে কি বোঝায় ? এই দুটি লক্ষ্য কি ভাবে পরস্পরযুক্ত ?]

14 What are the different aims of education ? Discuss in this connection, how can a balance between the individualistic and socialistic aims of education be made ?

[শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যগুলি কি কি ? এই প্রসঙ্গে শিক্ষার ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে কিভাবে সমতা আনা যায়, আলোচনা কর।]

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষা ও সমাজ
Education & Society

আমরা ইতিপূর্বে শিক্ষার কাজ (Function of Education এবং শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education) সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ঐ সব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছি, শিক্ষার একটি সামাজিক তাৎপর্য আছে। শিক্ষার কাজ হিসাবে আমরা বলেছি সামাজিক রীতিনীতি সংরক্ষণ করা এবং সামাজিক অগ্রগতির প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা। শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করা। শিক্ষার এই সামাজিক তাৎপর্যের কথা বিবেচনা ক'রে এ কথা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, শিক্ষা এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process)। কেন আমরা শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলব, শিক্ষা কিভাবে সমাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেই সম্বন্ধে আমরা বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করব।

॥ সামাজিক প্রক্রিয়া ॥
(Social Process)

সমাজ (Society) বলতে পারস্পরিক সচেতন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন মানবগোষ্ঠীকে বোঝায়। এই পারস্পরিক সচেতনতা বা প্রতিক্রিয়া ছাড়া সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস্ (Giddings) সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"A number of like-minded individuals, who know and enjoy their like-mindedness, and are therefore able to work together for common ends." আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানেও (Sociology) ব্যক্তির এই সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। এই সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে এবং এদের মাধ্যমেই সামাজিক অগ্রগতির ধারাও বজায় থাকে। যখন একটি সামাজিক প্রতিক্রিয়া অপর একটি প্রতিক্রিয়াকে অনুসরণ করে বা তার ওপর নির্ভর করে, বা পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হতে থাকে, তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় **সামাজিক প্রক্রিয়া** (social process)। অর্থাৎ, **যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজবদ্ধ জীব পর্যায়ক্রমে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ক'রে সামাজিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়, তাকেই বলা হয় সামাজিক প্রক্রিয়া** (social process)। সমাজের মধ্যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রতিক্রিয়া, ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও দুই বা ততোধিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজ-বিজ্ঞানীরা মনুষ্যসমাজে ক্রিয়াশীল, এরকম শত শত সামাজিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এদের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমরা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ কয়েকটি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করব।

সামাজিক প্রক্রিয়া কি?

সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে যেগুলি প্রায়ই সংঘটিত হয় এবং যেগুলিকে সামজবিজ্ঞানীরা মৌলিক সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেছেন, সেগুলি হ'ল —পারস্পরিক ক্রিয়া (Process of Interaction), সামাজিকীকরণ (Socialization Process), বিরোধিতা ও সহযোগিতার প্রক্রিয়া (Process of Opposition and Co-operation), সহাবস্থান (Accommodation), কৃষ্টিমূলক সমন্বয় (Acculturation) এবং আত্মীকরণ (Assimilation)।

বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়া

পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক সামাজিক প্রক্রিয়া যেটি ছাড়া সমাজের অস্তিত্বের কথা ভাবাই যায় না। সমাজ এক ধরনের নির্দিষ্ট সম্পর্কের তন্ত্র। কিন্তু সমাজ-অন্তর্ভুক্ত মানুষ পরিবর্তনশীল। প্রতিযোগিতা, বিবাদ, সহযোগিতা, অভিযোজন ইত্যাদির মাধ্যমে তার পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তন আসছে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু সব পারস্পরিক ক্রিয়াই সামাজিক নয়। যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সমাজে সভ্যদের মনোভাব প্রভাবিত হয়, তাকেই সামাজিক ক্রিয়া বলা যায়। সুতরাং সামাজিক দিক থেকে পারস্পরিক ক্রিয়া (interaction বলতে আমরা সেই সব ক্রিয়ার সমন্বয়কে বুঝি যার পরিবর্তনশীল সামঞ্জস্যের মাধ্যমে ব্যক্তির মনোভাব ও আচরণধারার পরিবর্তন হয়। এর প্রভাবে সামগ্রিকভাবে সমাজেরও মনোভাব বা রীতিনীতির পরিবর্তন হ'তে পারে। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ্ কিংসলি ডেভিস (Kingsly Davis) বলেছেন—'Social interaction involves contact and contact necessarily requires a material or sensory medium.' অর্থাৎ সামাজিক-পারস্পরিক ক্রিয়ার জন্য সাহচর্য প্রয়োজন। এই সাহচর্য হবে ব্যক্তি এবং ব্যষ্টির। এবং পারস্পরিক ক্রিয়ার জন্য ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে মনোবৈশিষ্ট্য বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিবহনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। পারস্পরিক আদান-প্রদান ছাড়া সামাজিক পারস্পরিক ক্রিয়া সংঘটিত হ'তে পারে না। সুতরাং বলা যেতে পারে, সামাজিক পারস্পরিক ক্রিয়া সমাজ-অন্তর্ভুক্ত মানুষের গতিশীল প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। পারস্পরিক ক্রিয়া তখনই সংঘটিত হ'তে পারে যখন মানুষ পারস্পরিক সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান করে।

পারস্পরিক ক্রিয়া

মানবশিশু সমাজের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে। সামাজিক প্রক্রিয়ার যে ধারা প্রবাহিত হ'চ্ছে জন্মমুহূর্তে, শিশু তার মধ্যেই স্থাপিত হয়। সে সমাজ-পরিবেশেই বড় হ'তে থাকে। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা বিভিন্ন সময়ে তাকে প্রভাবিত করে। প্রাথমিক পর্যায়ে সে পরিবারের (Family) মধ্যে নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে নিজের অস্তিত্ব সে প্রমাণ করে। ভাষার বিকাশ (Language development) তার মধ্যে এই ধরনের সচেতনতা আনে। শিশু ধীরে ধীরে সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদা (social status) সম্পর্কে সচেতন হয়। সামাজিক

মর্যাদা (social status) বলতে বোঝায় কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্যের সমবায়কে (collection of some rights and duties)। এই মর্যাদার কতকগুলি হ'তে পারে আরোপিত (Ascribed), আবার কতকগুলি হ'তে পারে অর্জিত (Achieved)। জন্মের পর পরিবার বা সমাজের সাংগঠনিক কাঠামোর দরুন শিশুর ওপর কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য এসে বর্তায়। এইগুলিকে বলা হয় **আরোপিত মর্যাদা** (Ascribed status)। আবার জীবনযাপনের মাধ্যমে ব্যক্তি বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা কতকগুলি মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়। এইগুলিকে বলে **অর্জিত মর্যাদা** (Achieved status)। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা স্মরণ করার দরকার, প্রত্যেক মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত থাকে কর্তব্য (Role)। অর্থাৎ, সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ শুধুমাত্র মর্যাদার অধিকারী হয় না, মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত কর্তব্যগুলি (Role) সম্পর্কেও সচেতন হয়। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ্ র‍্যাল্‌ফ্ লিটন বলেছেন –"There are no roles without statuses or statuses without roles." অর্থাৎ, কর্তব্যগুলি হ'ল অধিকার বা মর্যাদার সক্রিয় দিক। জন্মের পর থেকে মানব-শিশু যে প্রক্রিয়ার দ্বারা এইসব সামাজিক কর্তব্যগুলি পালন করার কৌশল আয়ত্ত করে, তাকেই বলা হয় **সামাজিকীকরণ** (socialization)। বিপরীত দিক্ থেকে বলা হয়, **যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার রীতিনীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদি গ্রহণ করতে শিক্ষা দেয় বা তার বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত করে, তাকেই বলা হয় সামাজিকীকরণ** (Socialization)। সামাজিকীকরণ (socialization) এই অর্থে এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়া।

সামাজিকীকরণ

পারস্পরিক বিরোধিতা (Opposition) এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া। কোন বস্তু (thing) পাওয়ার জন্য, কোন লক্ষ্যে (goal) পেঁছানোর জন্য বা কোন আদর্শ (ideal) বা মূল্যবোধ (value) অর্জনের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংগ্রামের প্রক্রিয়াকে বলা হয় **বিরোধিতার প্রক্রিয়া** (Process of opposition)। সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এই প্রক্রিয়া অনেকাংশে দায়ী। বিরোধিতার প্রক্রিয়া দু'রকমের হতে পারে—প্রতিযোগিতা (competition) এবং দ্বন্দ্ব (conflict)। যখন কোন সমাজের সদস্যরা নিজেদের দ্বারা স্থাপিত কোন লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা করে বা বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা একই উদ্দেশ্যে পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা করে, তখন তাকে বলা হয় **প্রতিযোগিতা** (competition)। এই বিরোধিতার প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগীদের মনোযোগ থাকে লক্ষ্যের দিকে ব্যক্তি হিসাবে, পরস্পরের দিকে নয়। অর্থাৎ, এখানে বিরোধীদের কাছে লক্ষ্যে পেঁছানো বা পুরস্কৃত হওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য, অপরকে বিব্রত করা নয়। প্রতিযোগিতার প্রক্রিয়া সব সময় নিয়মের নিয়ন্ত্রণে থাকে, নিয়ম-বহির্ভূত বিরোধিতা হ'লে তা আর প্রতিযোগিতা থাকে না। প্রতিযোগিতা সামাজিক প্রক্রিয়া

বিরোধিতা-প্রতিযোগিতা

হিসাবে সামাজিক বিবর্তনে এবং পরিবর্তনে নানাভাবে সাহায্য করে। যেমন—(১) প্রতিযোগিতা সমাজের মধ্যে ব্যক্তিকে ক্রমোচ্চশীল মর্যাদার (status) বিভিন্ন স্তরে স্থাপন করতে সহায়তা করে। (২) প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি হয় এবং ব্যক্তির সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। (৩) প্রতিযোগিতা ব্যক্তির মনে আত্মতুষ্টি আনতে সক্ষম হয় এবং তার দ্বারা সমাজবদ্ধ জীবনে আত্মগরিমার প্রবণতা চরিতার্থ হয়। (৪) প্রতিযোগিতার দরুন সমাজের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হওয়া সম্ভব হয়। কারণ, প্রায় একইরকম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তাদের নিজেদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব বণ্টন ক'রে নেয়। (৫) প্রতিযোগিতা নিয়মের সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার প্রবণতা দেখা দেয়। অর্থাৎ, প্রতিযোগিতা সামাজিক আচরণ-নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে।

পারস্পরিক বিরোধিতার (opposition) আর এক রূপ হ'ল দ্বন্দ্ব (conflict)।

বিরোধিতা-দ্বন্দ্ব

দ্বন্দ্ব কোন বিশেষ সমাজে সভ্যদের মধ্যে সংঘটিত হ'তে পারে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যেও হতে পারে। এই ধরনের বিরোধিতায় কোন ব্যক্তি লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বা কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাওয়ার জন্য অন্যের সম-ইচ্ছার বিরোধিতা করে। প্রতিযোগিতার সঙ্গে দ্বন্দ্বের পার্থক্য করলে দ্বন্দ্ব-প্রক্রিয়ার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। প্রতিযোগিতার মূল কেন্দ্র হ'ল বস্তু বা লক্ষ্য। কিন্তু দ্বন্দ্বের মূল কেন্দ্র হ'ল ব্যক্তি (Individual)। দ্বন্দ্বে প্রতিযোগীকে বিনাশ করার প্রবণতাই প্রধান। **দ্বিতীয়তঃ**, প্রতিযোগিতা সব সময় নিয়মাধীন আচরণ সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু দ্বন্দ্বে নিয়মের কোন শৃঙ্খল নেই। প্রকৃতপক্ষে নিয়মবিরুদ্ধ প্রতিযোগিতাই দ্বন্দ্ব। **তৃতীয়তঃ**, প্রতিযোগিতামূলক আচরণের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। কিন্তু দ্বন্দ্বে তা থাকে না। এক্ষেত্রে আচরণগুলি খুবই সাময়িক। ফলে, যে সামাজিক পরিবর্তন হয় তাও সাময়িক। **চতুর্থতঃ**, প্রতিযোগিতায় সামাজিক লক্ষ্যটি থাকে অনেক উন্নত স্তরে, কিন্তু দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে লক্ষ্যটি হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বস্তুধর্মী। **পঞ্চমতঃ**, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের মধ্যে সহযোগিতা থাকতে পারে, কিন্তু দ্বন্দ্বের সময় ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক থাকতে পারে না। দ্বন্দ্ব-প্রক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলে আপাতভাবে এ কথা বলা যায় যে, এই প্রক্রিয়া কেবলমাত্র সামাজিক বিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং, সামাজিক উদ্‌যোজনের দিক্ থেকে তা একেবারে অপ্রয়োজনীয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত আংশিক হ'লেও সম্পূর্ণরূপে সত্য নয়। পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কুফল আছে ঠিকই, সুফলও কিছু আছে। তাই সামাজিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ। এর ভাল দিক্‌গুলি হ'ল—(১) দ্বন্দ্ব দলগতভাবে মনোভাব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং সমাজকে বহিঃশত্রু আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। (২) দ্বন্দ্বের মাধ্যমে যে গোষ্ঠী জয়ী হয়, সে অন্যের ওপর তার আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে, দলের প্রভাবের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয় এবং আরও বিস্তৃত সমাজের সৃষ্টি হয়। (৩) দ্বন্দ্বের মাধ্যমে অনেক সময় সমাজে

নতুন নতুন মূল্যবোধ জাগ্রত হয় ; (৪) দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তির আধিপত্যের অবসান হওয়া সম্ভব।

সহযোগিতা

সহযোগিতা (co-operation) একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রক্রিয়া। **যে প্রক্রিয়া দ্বারা সমাজবদ্ধ জীবন কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য একত্রে কাজ করে, তাকেই বলা হয় সহযোগিতা** (co-operation)। সহযোগিতা ছাড়া কোন সমাজই থাকতে পারে না। সদস্যদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই সমাজ গঠিত হয় এবং সহযোগিতার দ্বারাই এই বোঝাপড়ার মনোভাব গড়ে ওঠে। সাধারণতঃ সমাজে দু'ধরনের সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজের এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে একাধিক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য ক'রে কোন সামাজিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এই ধরনের সহযোগিতাকে বলা হয় **প্রত্যক্ষ সহযোগিতা** (Direct co-operation)। আবার অনেক সময়ে একই সমাজের সদস্যরা একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। বর্তমানে কারিগরী সংস্থায় এই ধরনের সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। এই সহযোগিতাকে বলা হয় **পরোক্ষ সহযোগিতা** (Indirect co-operation)। সহযোগিতা সামাজিক পরিবর্তন এবং অগ্রগতিকে নানাভাবে সাহায্য করে। যেমন—(১) সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজে দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন সম্ভব হয়। (২) সহযোগিতার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা যায়। আর এই বিশেষজ্ঞরা সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করে। (৩) সহযোগিতার প্রভাবে সমাজের বিভিন্ন সদস্য নিজেদের মতবিরোধ ভুলে তৃপ্তির সঙ্গে একত্রে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। (৪) পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজ সামগ্রিক মানব কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। (৫) সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজ-অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মনোভাব দূর করা যায়।

সহাবস্থান

সহাবস্থান (Accomodation) সমাজ-জীবনে আর এক ধরনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। **যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজ-অন্তর্গত বিবদমান দুটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তি পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ ক'রে যেতে পারে, তাকেই বলা হয় সহাবস্থান** (Accomodation)। সাধারণতঃ দ্বন্দ্ব বা বিরোধিতার প্রক্রিয়ার পর এই প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়। এই প্রক্রিয়াকে সামাজিক অভিযোজনের প্রক্রিয়াও বলা যেতে পারে। এর মাধ্যমে সামাজিক সংগঠন (social structure) নির্ধারিত হয়। সমাজের মধ্যে সহাবস্থান (accomodation) কয়েকটি নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন—(১) যখন দুটি গোষ্ঠী প্রায় সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হয়, তখন তারা পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চায় না। কিছুটা দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে (Give-and-take) সংঘাত এড়িয়ে তারা সহাবস্থান করে। এই ধরনের সহাবস্থানকে **সহযোগী-সহাবস্থান** (co-ordinate accomodation) বলা যেতে পারে। (২) অনেক সময় সামাজিক দ্বন্দ্বের ফলে একদল জয়ী হয়। এমত অবস্থায় অপর দল তার

বশ্যতা স্বীকার করে এবং এই আনুগত্যের মধ্যেই সে সহাবস্থান করে। এই ধরনের সহাবস্থানকে বলা হয় **আনুগত্যমূলক সহাবস্থান** (subordinate accomodation)। (৩) সমাজে অনেক সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, একপক্ষ অপরপক্ষকে আঘাত করতে চায় না, অথচ কোনরকম বোঝাপড়া সম্ভব নয়। এমত অবস্থায় উভয়ে উভয়কে সহ্য ক'রে সহাবস্থান করে। কোন পক্ষেরই মূল দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হয় না। এই ধরনের সহাবস্থানকে বলা হয় **সহনশীল সহাবস্থান** (accomodation on the basis of tolerance)। প্রসঙ্গক্রমে এ কথা স্মরণ রাখা দরকার, যে কোন নীতির ওপর ভিত্তি ক'রে দুটি গোষ্ঠী বা সমাজ-অন্তর্গত ব্যক্তি সহাবস্থান করুক-না-কেন, সহাবস্থান এক ধরনের সামাজিক অভিযোজনের প্রক্রিয়া (Process of social adjustment)।

সমন্বয়ন

সমন্বয়নও (Acculturation) এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া। **যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ভিন্নকৃষ্টিসম্পন্ন গোষ্ঠী একত্রে যুক্ত হ'য়ে একক সামাজিক আচরণ মূল্য গড়ে তোলে, তাকেই বলা হয় সমন্বয়নের প্রক্রিয়া** (process of acculturation)। সমন্বয়ন এক ধরনের কৃষ্টি পরিমার্জনের প্রক্রিয়া। দুটি সামাজিক গোষ্ঠী পরস্পর সংযোগের ফলে পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং উভয়ের রীতিনীতির পরিবর্তন হয়। ব্যবসা-ব্যাণিজ্য, শিল্প, ধর্ম ও শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী পরস্পরের সংস্পর্শে আসতে পারে এবং তার প্রভাবে সমন্বয়ন হ'তে পারে।

আত্মীকরণ

আত্মীকরণ (Assimilation) সমন্বয়ের মতই প্রক্রিয়া। **যে প্রক্রিয়ার দ্বারা দুটি সামাজিক গোষ্ঠী পারস্পরিক প্রভাবে একে অপরের আদর্শগুলি** (ideals) **গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় আত্মীকরণের প্রক্রিয়া।** সমন্বয়নে বিশেষতঃ আচরণগত রীতির পরিবর্তন হয়, আত্মীকরণের ফলে সমাজাদর্শের পরিবর্তন হয়। তাই আদর্শের সমন্বয়নকেই আত্মীকরণ বলা যেতে পারে। এই অর্থে আত্মীকরণ সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়া।

মন্তব্য

আমরা এখানে যে সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়ার (social process) কথা উল্লেখ করলাম, সেগুলিই শেষ নয়। সমাজবিজ্ঞানীরা বহু ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। ঐ সব প্রক্রিয়ার মধ্যে যেগুলি বিশেষভাবে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলির কথাই উল্লেখ করা হ'ল। প্রসঙ্গক্রমে এ কথা স্মরণ রাখার দরকার, উল্লিখিত সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে যেটিকে মূল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, সেটি হ'ল পারস্পরিক ক্রিয়া (interaction)। অন্য প্রক্রিয়াগুলি তারই নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রকৃতপক্ষে সকল রকম সামাজিক প্রক্রিয়াই পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

॥ শিক্ষা ও সামাজিক প্রক্রিয়া ॥
(Education & Social Process)

আমরা ইতিপূর্বে সামাজিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ও কতকগুলি সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন ঐ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে দেখা যাক, শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা যায় কি না। আমরা পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে শিক্ষার তাৎপর্য, শিক্ষার কাজ, শিক্ষার লক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। শিক্ষা-সম্পর্কিত সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে তার মধ্যে সামাজিক প্রক্রিয়ার অনুরূপ কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি না, তা এখন আমরা বিচার ক'রে দেখব।

প্রস্তাবনা

আমরা জানি, সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজবন্ধ জীব পর্যায়ক্রমে প্রতিক্রিয়া ক'রে সামাজিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে এবং সামাজিক অগ্রগতির ধারাও বজায় থাকে। আধুনিক অর্থে শিক্ষাকেও একটি অনুরূপ প্রক্রিয়া বিবেচনা করা হয়েছে। জন ডিউই (John Dewey) বলেছেন—শিক্ষাই হ'ল জীবন। অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে জীবনযাপনের প্রক্রিয়ার নামই শিক্ষা" (Education is the process of living through a continuous reconstruction of experiences)। শিক্ষার্থীরা আত্মসক্রিয়তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তাদের এই আত্মসক্রিয়তা প্রকাশ পায় প্রতিক্রিয়ার বা আচরণের মাধ্যমে। সুতরাং এ কথা বললে ভুল হবে না যে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। দলবদ্ধভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ, তারা সমাজ-অনুরূপ একটি সংস্থা গড়ে তোলে। এই শিক্ষার্থী-গোষ্ঠী এবং এর প্রত্যেক সদস্য ক্রমপর্যায়ে প্রতিক্রিয়া ক'রে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যে প্রতিক্রিয়া করে, সেগুলি ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয় এবং একটি আর একটির অনুসরণ করে। কারণ, আমাদের পাঠ্য বিষয়ের ধারাবাহিকতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা হয়। আবার, প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সমাজে শিক্ষার একটি লক্ষ্য থাকে। আধুনিক কালে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্‌গণ সামাজিক উন্নয়নের কথাও বলেছেন। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে যে প্রতিক্রিয়াগুলি করে, তা উদ্দেশ্যমুখী এবং উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে প্রধান হ'ল সমাজ-জীবনের উন্নতিসাধন। সুতরাং, এই বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় সামাজিক প্রক্রিয়ার মত সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল—[এক] শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক আছে; [দুই] এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়; [তিন] এই প্রতিক্রিয়াগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং [চার] এই প্রতিক্রিয়াগুলির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন ও

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া

উন্নতি হয়। সুতরাং বৈশিষ্ট্যগত দিক্ থেকে শিক্ষা-প্রক্রিয়া সামাজিক প্রক্রিয়ারই অনুরূপ। তাই একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—"Just as there are certain vital processes in life in a biological sense, so education may be considered as vital process in a social sense." প্রসঙ্গক্রমে, আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া হ'লেও এটি একটি একক প্রক্রিয়া নয়। এর মাধ্যমে অনেকগুলি সামাজিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। পারস্পরিক ক্রিয়া Interaction), সামাজীকরণ (socialization), বিরোধিতা (opposition), সহযোগিতা (co-operation), সহাবস্থান (accomodation), সমন্বয়ন (acculturation) এবং আত্মীকরণ (assimilation) ইত্যাদির মত প্রাথমিক সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষা-প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। এই হিসাবে শিক্ষাকে একটি যৌগিক সামাজিক প্রক্রিয়া (compound social process) বলা যায়। এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে পরবর্তী আলোচনার মধ্যে।

আমরা জানি, পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction) একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যে সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, তা সবই সামাজিক নয়। যে সব পারস্পরিক ক্রিয়ার পরিবর্তনশীল সামঞ্জস্যের (Dynamic Organisation) মাধ্যমে ব্যক্তির মনোভাব ও আচরণধারার পরিবর্তন হয়, তাকেই সামাজিক অর্থে পারস্পরিক ক্রিয়া বলা হয়। রাস্তায় চলমান দুই ব্যক্তির মধ্যে ধাক্কা লাগলে তাকে পারস্পরিক ক্রিয়া বলব না। পরবর্তী পর্যায়ে ঐ দুই ব্যক্তি যদি আলাপ করতে শুরু করে বা বিবাদ করতে শুরু করে, তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ার জন্য ব্যক্তি এবং ব্যষ্টির সাহচর্য প্রয়োজন এবং একের থেকে অপরে মনোবৈশিষ্ট্য ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চালিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা শিক্ষার্থীদের আচরণ ও শিক্ষা-পরিবেশ বিশ্লেষণ করলে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাহচর্যে থাকে; প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়-গোষ্ঠীর সাহচর্যে থাকে। সুতরাং, এখানে ব্যক্তি ও ব্যষ্টির সাহচর্য ঘটে থাকে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ মনে করেন, অনুকরণ (Imitation) শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে শিক্ষালয়-সমাজে বসবাস করতে গিয়ে অনেক আচরণ আয়ত্ত করে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে আচরণধারার ও মনোভাবের সঞ্চালন ঘটে। একে অন্যের আচরণ অনুকরণ করে। এছাড়াও শিখন-পরিস্থিতিতে (Teaching situation) শিক্ষক (Teacher) এবং শিক্ষার্থীর (Pupil) মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার (social interaction) সম্পর্ককে সমতুল্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষা ও পারস্পরিক ক্রিয়া

দ্বিতীয়তঃ, জৈবিক সত্তা ছাড়া মানুষের একটি সামাজিক সত্তা আছে। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমাজের কৃষ্টির ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। এই সামাজিক কৃষ্টি যা প্রধানতঃ অতীত অভিজ্ঞতার সমষ্টি, তা বংশানুক্রমিক ধারায় মানুষের মধ্যে আসে না; তাকে চেষ্টার দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়।

শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ

যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামাজিক কৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়, তাকে বলে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া (Process of socialization)। এই অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের কাছে আসে শিক্ষার মাধ্যমে। তাই শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য সামাজিকীকরণ। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের প্রতিবেদনে এই উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। কমিশন বলেছেন—"Citizenship in a democracy is a very exacting and challenging responsibility for which every citizen has to be carefully trained." ব্রাউন (Brown) শিক্ষালয়ের কর্তব্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—"সামাজিক জীবনের রীতিনীতি শিশুদের মধ্যে সঞ্চালিত ক'রে এবং তাদের মাধ্যমে সামাজিক রীতি-নীতিগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা ক'রে শিক্ষালয় সমাজ-জীবনে স্থায়িত্ব আনে"। (To perpetuate social life by transmitting the social ways of living to the following generation, conserve social heritage through them are the main function of the school.) নিয়ন্ত্রিত এবং অনিয়ন্ত্রিত সব রকমের শিক্ষার দ্বারাই শিক্ষার্থীকে সমাজের সংরক্ষিত আচার-আচরণ ও রীতিনীতিগুলির সঙ্গে পরিচিত করা যায় এবং ঐ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রভাবে শিক্ষার্থীরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং ঐগুলি সম্পাদনের দক্ষতাও অর্জন করে। সুতরাং শিক্ষাকে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা প্রধানতঃ শিক্ষালয়ে পরিচালিত হয়। শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা একটি সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে বসবাস করে। এই সামাজিক গোষ্ঠীর সামনে কতগুলি লক্ষ্য এবং আদর্শ থাকে। এই লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য তারা সমবেত-ভাবে চেষ্টা করে, তারা দলবদ্ধভাবে ও যৌথভাবে কাজ করে। পাঠ্য বিষয়বস্তু-কেন্দ্রিক এবং সহপাঠ্যক্রম-কেন্দ্রিক সকল রকম অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করা তাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে পেঁছানোর জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। দলগতভাবে কাজ করতে গিয়ে দুর্বল শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত সবল শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে; আর, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ছাত্ররা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে। এমনিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার co-operation) প্রক্রিয়া কাজ করে। এই সহযোগিতার প্রক্রিয়া শিক্ষালয়ে কাজ করে বলেই শিক্ষকদের পক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টন করার সুবিধা হয়। শিক্ষা-প্রক্রিয়া যদি সহযোগিতামূলক না হ'ত, তাহ'লে শিক্ষা-পরিবেশ রচনা করা শিক্ষকের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ত। তাই শিক্ষাকে একটি সহযোগিতামূলক সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। সমাজ-জীবনে এই সহযোগিতার প্রক্রিয়া যেমন সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে, তেমনি

শিক্ষা ও সহযোগিতা

শিক্ষালয়-জীবনে সহযোগিতার প্রক্রিয়া শিক্ষা-পরিবেশ ও সামগ্রিকভাবে সমাজ-পরিবেশ পরিবর্তনে সহায়তা করে।

সহযোগিতা-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়-জীবনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরোধিতাও লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি, বিরোধিতা (opposition) সমাজ-জীবনে দু'ভাবে প্রকাশ পায়। এই দুই রূপ হ'ল প্রতিযোগিতা (competition) ও দ্বন্দ্ব (conflict)। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে নানা ধরনের পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে। তাদের সামনে থাকে একটি লক্ষ্য—জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করা, উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠা। শিক্ষা-প্রক্রিয়া এই প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দান করে। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ছাড়া শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির ধারা মন্থর হয়ে পড়ে। পারস্পরিক প্রতিযোগিতার জন্য এখানে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী এই নিয়ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে চলে। এই প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকার জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণে আগ্রহ দেখা যায়। এই কারণে সামাজিক প্রতিযোগিতার প্রক্রিয়াকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি, সামাজিক বিরোধিতা দ্বন্দ্বের মধ্যেও প্রকাশ পায়। এই দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াও শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এর প্রভাবে দলগত মনোভাব বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষালয়ের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয়কে একটি একক সমাজ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের শেষ পর্যায়ে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বের প্রবণতাকে যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়। কারণ, এই প্রক্রিয়ার অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ ব্যক্তি-জীবনের সুস্থ বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তাই আংশিকভাবে হ'লেও দ্বন্দ্ব (conflict) শিক্ষা-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা ও বিরোধিতা

সমাজ-জীবনে যেমন বিরোধিতার পরে আসে সহাবস্থান (accomodation), শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনি সহাবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। সহাবস্থান এক ধরনের অভিযোজন-প্রক্রিয়া (process of adjustment)। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীকে অভিযোজনক্ষম ক'রে তোলা। অনেক শিক্ষাবিদ্ শিক্ষাকেও অভিযোজনের প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন, চ্যাপম্যান এবং কাউন্ট (Chapman & Count) বলেছেন—"Education as a social process is nothing more than an economical method of assisting an initially ill-adapted individual, during the short period of a single life to cope with the everchanging complexities of the world." সুতরাং সহাবস্থান (accomodation) একদিকে যেমন ব্যক্তিজীবনের উন্নতি সাধন ক'রে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সফল করে, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ রচনা করতেও সহায়তা করে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও আদর্শের সংঘাত থাকা সত্ত্বেও যে একত্রে জীবনযাপন করে, পাঠ গ্রহণ করে, তার মূলে আছে এই সহাবস্থানের প্রক্রিয়া।

শিক্ষা ও সহাবস্থান

শিক্ষা-প্রক্রিয়া সামাজিক সমন্বয়নেও (acculturation) সহায়তা করে। শিক্ষার মাধ্যমে একদেশের শিক্ষার্থীরা অন্যদেশের রীতিনীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হয় এবং অন্য সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে আচরণগুলি ভাল, সেগুলিকে গ্রহণ করে। এমনিভাবে শিক্ষা প্রাচীন সমাজগুলির মধ্যে যে নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল, সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে এক একক বিশ্বসমাজ গঠনে সহায়তা করছে। শিক্ষা বিশ্বের সকল মানবগোষ্ঠীর কৃষ্টিমূলক সমন্বয়নে সহায়তা করে, এই হিসাবে এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে আদর্শগত আত্মীকরণও হয়ে থাকে। কারণ, সমন্বয়নের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীকরণ হয়।

শিক্ষা ও সমন্বয়ন

সুতরাং, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়াই শুধু নয়, অনেকগুলি সামাজিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়। ফলে, একক বিচ্ছিন্ন যে কোন সামাজিক প্রক্রিয়ার চেয়ে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার শক্তি অনেক বেশী। যে কোন ধরনের সামাজিক পরিবর্তন শিক্ষার মাধ্যমে অনেক সহজে সংঘটিত হ'তে পারে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখার দরকার, সমাজও অনেকাংশে শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। তবে সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ জানতে হলে এককভাবে শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে অনুশীলন করলেই জানা যাবে। তাই জিসবার্ট (Gisbert) বলেছেন—"The influence that in one way or another education exerts on society and society on education, entitles us to affirm that one of the most direct ways of discovering the goals and ideals of a society is to study its education system."

মন্তব্য

॥ শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন ॥
(Education & Social Change)

শিক্ষা যে এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া, এ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানী বা শিক্ষাবিদ্‌দের মনে কোন সন্দেহ নেই। এই সামাজিক প্রক্রিয়ার কাজ হ'ল সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করা। সামাজিক পরিবর্তন (social change) বলতে বোঝায় সমাজের বিভিন্ন এককগুলির সাংগঠনিক পরিবর্তন এবং তাদের কার্যাবলীর পরিবর্তন (change in structures and functions of different units of society)। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়। কেন এই পরিবর্তন হয়, কিভাবে এই পরিবর্তন হয়, এ বিষয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাই এ সম্পর্কে সমাজ-বিজ্ঞানে বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of social change) আছে। এমনকি, কি ধরনের পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলা হবে, সে নিয়েও চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হ'য়েছে। এ সবই সমাজ-বিজ্ঞানের (sociology) ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের (political science) আলোচনার বিষয়বস্তু। তাই এই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা সামাজিক পরিবর্তনকে সাধারণভাবে বিচার করবো। এই অর্থে সামাজিক

পরিবর্তন, তার যে কোন এক সত্তার বা এক সংগঠনের পরিবর্তন। তা সে পরিবর্তন ব্যক্তির হ'তে পারে বা সমাজ-অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংস্থার (social institution হ'তে পারে। এখন প্রশ্ন হ'ল, এই অর্থে শিক্ষার মাধ্যমে কি কি ধরনের সামাজিক পরিবর্তন (social change) সাধিত হয়? শিক্ষা যেহেতু একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক প্রক্রিয়া, সেহেতু তার দ্বারা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে নানা রকম পরিবর্তন হ'য়ে থাকে। এই পরিবর্তনগুলি হ'ল—

প্রস্তাবনা

॥ **এক** ॥ শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক উদ্‌যোজন (mobilization) হয়। এই সামাজিক উদ্‌যোজন সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে। সামাজিক পরিবর্তন শুরু হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির প্রচেষ্টায়। এই ব্যক্তিরা গতানুগতিক ধারার তীব্র সমালোচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে, সমাজের অন্যান্য সদস্যরা এই সব ব্যক্তিদের কেন্দ্র ক'রে নিজের মতামত গঠন করে পরিবর্তনের পক্ষে। সুতরাং, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্ব প্রয়োজন। যে ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে কোন বিষয়ের ওপর মতামত প্রকাশ করতে পারেন, যিনি বিশ্লেষণমূলক চিন্তার (analytical thinking) দ্বারা জীবনের যে কোন সমস্যা স্বাধীনভাবে সমাধান করতে পারেন এবং যিনি ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অন্যান্যদের ঊর্ধ্বে, তিনিই এই ধরনের নেতৃত্ব দিতে পারেন। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করতে সক্ষম। সুতরাং, শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে প্রশিক্ষণের দ্বারা নেতা leader) তৈরি করে এবং এইসব ব্যক্তির সক্রিয়তায় সামাজিক পরিবর্তনের প্রথম কাজ শুরু হয়। অর্থাৎ, শিক্ষা সামাজিক নেতৃত্ব পরিবর্তনের (change in leadership) ভিত্তি সৃষ্টি করে।

নেতৃত্ব

॥ **দুই** ॥ শিক্ষার প্রভাবে আমাদের গতানুগতিক সামাজিক সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন আসে। যে সকল সামাজিক সংস্থা (social institution) পূর্বে ব্যক্তি আচরণ-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করত, বর্তমানে তাদের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে পরিবার (family) এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (religious institution) কথা উল্লেখ করা যায়। পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন হ'চ্ছে, ধর্মের বন্ধন অনেক শিথিল হ'য়ে পড়ছে। শিক্ষার প্রভাবে মানুষ নতুন নতুন সামাজিক সংস্থা গড়ে তুলছে। এইসব সামাজিক সংস্থা বর্তমানে মানুষের আচরণধারাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বর্তমান সমাজ ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা গড়ে তুলেছে। শিক্ষার প্রভাবে সমাজের প্রত্যেক মানুষ এগুলির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছে; বিধানাবলী ও অনুশাসনগুলি মেনে চলছে। সুতরাং, বলা যেতে পারে, শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন (change in social structure) হ'চ্ছে এবং এই পরিবর্তন ব্যক্তিকে জীবনের বহুমুখী সমস্যা-সমাধানে সহায়তা করছে।

সমাজ-সংগঠন

॥ **তিন** ॥ শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হ'য়েছে। পূর্বে যে

সব আচরণগুলিকে বা রীতিনীতিগুলিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'ত, বর্তমানে তাদের অনেকের গুরুত্ব কমে গেছে। জীবনযাত্রার মান ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আচরণের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে সমাজ-পরিবেশের অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা মানুষের মধ্যে নতুন নতুন মূল্যবোধ (value) জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করছে। ফলে, সমাজ জীবনের অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হ'চ্ছে।

মূল্যবোধ

॥ চার ॥ শিক্ষা সমাজের অভ্যন্তরে সামগ্রিক মনোভাব (attitude) এবং বিশ্বাস (belief) পরিবর্তনে সহায়তা করছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ যে পরিমাণ ঐশ্বরিক শক্তির ওপর বিশ্বাস করত, বর্তমানে তা আর করে না। বর্তমানে তারা মানুষের ক্ষমতার ওপর বেশী আস্থাবান। এই বিশ্বাস ও মনোভাবের দিক্ থেকে যে সামাজিক পরিবর্তন হ'চ্ছে, তা শিক্ষার প্রভাবে সংঘটিত হ'চ্ছে।

মনোভাব ও বিশ্বাস

॥ পাঁচ ॥ শিক্ষার প্রভাবে সমাজের মধ্যে যে সাংগঠনিক পরিবর্তন হ'চ্ছে, তার জন্য শ্রম-বণ্টনের (division of labour) প্রথারও পরিবর্তন হ'চ্ছে। সমাজের মধ্যে বিশেষজ্ঞ (specialist) ব্যক্তিদের প্রাধান্য বাড়ছে। মানুষেরও বিশেষ জ্ঞানলাভের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। আর তার জন্য তাকে নিজের সীমিত গোষ্ঠী-জীবন ছেড়ে অন্যত্র যেতে হ'চ্ছে এবং সেখানে সুষ্ঠুভাবে মানবীয় সম্পর্ক (human relation) স্থাপনের মাধ্যমে অভিযোজন করতে হচ্ছে। তাই বলা যায়, শিক্ষার প্রভাবে সমাজের মধ্যে বিশেষজ্ঞের (specialist) সৃষ্টি হ'চ্ছে এবং মানবীয় সম্পর্কের (human relation) পরিধি বিস্তৃত হ'চ্ছে।

বিভেদীকরণ

॥ ছয় ॥ শিক্ষার প্রভাবে মানুষের অভিযোজন-ক্ষমতার বৃদ্ধি পায়। এই উন্নত অভিযোজন-ক্ষমতার প্রভাবে সে বর্তমান জটিল সমাজ-ব্যবস্থায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সার্থকভাবে বসবাস করতে শেখে। এই ধরনের ভিন্নমুখী পরিস্থিতিতে সে সহাবস্থান করতে গিয়ে সমন্বয়মুখী জীবনাদর্শ গড়ে তোলে। ব্যক্তির এই জীবনাদর্শ (life ideal) সামগ্রিকভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে এবং গতানুগতিক সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে।

সমাজাদর্শ

সুতরাং, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনে নানাভাবে সাহায্য করে। পরিবর্তনমুখী নেতৃত্ব গঠন, সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন, সামাজিক মনোভাব ও বিশ্বাসের পরিবর্তন, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন, সামাজিক আদর্শ গঠন, সবই শিক্ষার দ্বারা সম্ভব। তাই সমাজে পরিবর্তন আনতে হ'লে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ওপর সমধিক বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। এই কারণে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন তাঁদের প্রতিবেদনে বলেছেন—"The most **important and urgent reform needed in education is to transform it to endeavour, to relate it to life needs and aspirations of the**

মন্তব্য

people and thereby make it a powerful instrument of social, economic and cultural transformation necessary for the realization of the national goals." এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণ রাখার দরকার যে, শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক একপক্ষীয় নয়। অর্থাৎ, কেবল সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল, একথা ঠিক নয়। সামাজিক পরিবর্তনও শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারণ করে থাকে। যে কোন সমাজে তার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, পূর্ববর্তী সামাজিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দেয়। তাই একথা বলা যায়,—শিক্ষা আনে সামাজিক পরিবর্তন ; সামাজিক পরিবর্তন আনে শিক্ষা। চক্রাকারে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলশ্রুতি সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

শিক্ষা আধুনিক অর্থে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া (social process) ; এ কথা সমাজ-বিজ্ঞানিগণ ও শিক্ষাবিদ্‌গণ উভয়ে স্বীকার করেছেন। সামাজিক প্রক্রিয়ার নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল—পারস্পরিক ক্রিয়া (interaction), সামাজিকীকরণ (socialization), প্রতিযোগিতা (competition), দ্বন্দ্ব (conflict), সহযোগিতা (co-operation), সহাবস্থান (accomodation), সমন্বয়ন (acculturation) এবং আত্মীকরণ (Assimilation)।

শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলার কারণ, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মধ্যেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। অর্থাৎ, শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় ; শিক্ষার দ্বারা শিশুর সামাজিকীকরণ সংঘটিত হয় ; শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এখানে সহাবস্থান ও সমন্বয়নের বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

যে কোন সামাজিক প্রক্রিয়ার কাজ হ'ল সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করা। শিক্ষাও সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে। এই পরিবর্তন বিভিন্ন দিক থেকে সংঘটিত হ'য়ে থাকে। পরিবর্তনগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল—নেতৃত্বের পরিবর্তন, সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন, মূল্যবোধের পরিবর্তন, মনোভাবের পরিবর্তন, বিশ্বাসের পরিবর্তন ও সামাজিক সম্পদের পরিবর্তন। এই সঙ্গে একথাও সত্য যে, সামাজিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে শিক্ষারও পরিবর্তন হ'য়ে থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. What is meant by a social process? Name some of the fundamental social processes and show how they contribute to social changes.
   [সামাজিক প্রক্রিয়া কাকে বলে? কয়েকটি মূল সামাজিক প্রক্রিয়ার নাম উল্লেখ করে, তারা কিভাবে সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে দেখাও।]

2. "Education is essentially a social process." Do you agree ? Give reasons for your answer.
["শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া"—তুমি কি এই মতবাদ সমর্থন কর ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও ।]
3. Write a short essay on "education as a social process".
["শিক্ষা এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া"—এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর ।]
4. What changes are effected by education in the social life of man. Illustrate your answer.
[শিক্ষার দ্বারা মানুষের সামাজিক জীবনে কি কি পরিবর্তন হয় ? উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর ।]
5. Write notes on : [টীকা লিখ :]
   (a) Education & Socialization [শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ]
   (b) Education & Accomodation [শিক্ষা ও সহাবস্থান]
   (c) Education & Opposition [শিক্ষা ও বিরোধিতা]
6. What is meant by a social process ? Name some of the fundamental social processes and show how they contribute to social change.
[সামাজিক প্রক্রিয়া কাকে বলে ? কয়েকটি মূল সামাজিক প্রক্রিয়ার নাম উল্লেখ কর এবং তারা কিভাবে সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে দেখাও ।]

শিক্ষার উপাদান

শিক্ষার উপাদান সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে সাধারণভাবে উল্লেখ করেছি। এই সব উপাদানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল—শিক্ষার্থী, শিক্ষালয়, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষক। এই সব উপাদানই নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে বর্তমানে পারস্পরিক সহযোগিতায় স্থায়িত্ব লাভ করেছে। তাদের মধ্যেকার এই পারস্পরিক সম্পর্ক আধুনিক শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। শিক্ষার এই চারটি উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'য়েছে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে।

শিক্ষার্থী

আধুনিক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ'ল—**শিক্ষার্থী**। তাই শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই তার সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। কিন্তু শিক্ষার্থী সম্পর্কে আলোচনা-বিস্তারের এই পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ কোন সুযোগ নেই। বিকাশমান শিশু-প্রকৃতির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব মনোবিস্তার। এখানে আমরা তার কয়েকটি সাধারণ শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব। * * * *

* * * * শিক্ষার্থীর মধ্যে বহু বৈশিষ্ট্য ও গুণের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যকার এই সকল বৈশিষ্ট্য বিকাশে দু'ধরনের শক্তি তার ওপর ক্রিয়া করে—তার **বংশগতি ও পরিবেশ**। এই দু'য়ের আপেক্ষিক প্রভাব কি, সে নিয়ে চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে কলহের শেষ নেই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **ষষ্ঠ অধ্যায়ে**। * * * *

শিক্ষার মাধ্যম

শিক্ষার্থী ছাড়া শিক্ষার যে অন্যান্য উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ'ল শিক্ষার মাধ্যম বা শিক্ষালয়। শিক্ষা কি নিয়মিত কি অনিয়মিত, যে কোনরূপেই কোন-না-কোন মাধ্যমে পরিবাহিত হ'য়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবারের মধ্যেই বয়স্ক ব্যক্তিরা এই মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন। জীবনের জটিলতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার-জীবনে অনেক পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে ; শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পরিবারও তার স্বকীয়তা অনেক হারিয়েছে। ফলে, শিক্ষার ভার অন্যান্য সংস্থার ওপরও বর্তিয়েছে। পর পর দুটি অধ্যায়ে শিক্ষার এইসব সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে। * * * * * **সপ্তম অধ্যায়ে** শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা হিসেবে শিক্ষালয়ের ভূমিকা, উপযোগিতা ও তার আধুনিক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। * * * * আধুনিক জটিল সমাজ-ব্যবস্থায় অন্যান্য সামাজিক সংস্থাও শিক্ষার দায়িত্ব পালন করে। শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা হিসেবে পরিবার, রাষ্ট্রধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে। **অষ্টম অধ্যায়ে**। * * বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি-বিদ্যার উন্নতির ফলে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের গণ-সংযোগের মাধ্যম উদ্ভাবিত হয়েছে। এগুলিও বর্তমানে শিক্ষার দায়িত্ব পালন করছে. তাই এরা শিক্ষার মাধ্যম। এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে **নবম অধ্যায়ে**। * *

পাঠ্যক্রম

পাঠ্যক্রম যে কোন ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার একটি মাধ্যম। এই হিসেবে পাঠ্যক্রম শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাঠ্যক্রম-সম্পর্কে আধুনিক ধারণা অনেক বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ। পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ধারণার এই অভিব্যক্তি, প্রচলিত পাঠ্যক্রমের ত্রুটি, পাঠ্যক্রম রচনার মৌলনীতি ও তার অন্যান্য দিক্ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে **পাঠ্যক্রম শীর্ষক অধ্যায়ে**।

শিক্ষক

শিক্ষার দুই সজীব উপাদানের মধ্যে **শিক্ষক** হ'লেন একজন। শিক্ষার মধ্যে প্রাণ-সঞ্চারের দায়িত্ব শিক্ষকের ; যদিও আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্বের অনেক পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে, তা সত্ত্বেও তার গুরুত্ব কিছু কমেনি, বরং অনেক বেশী পরিমাণে বেড়েছে। আধুনিক শিক্ষার তাত্ত্বিক দিক্ থেকে শিক্ষকের গুণাবলী ও দায়িত্বের নব মূল্যায়ন করা হ'য়েছে **একাদশ অধ্যায়ে**। *

বংশগতি ও পরিবেশ
Heredity and Environment

যে কোন সমাজ-বিজ্ঞানে (social science) বংশগতি (heredity) এবং পরিবেশের (environment) মধ্যে দ্বন্দ্ব সমগ্র আলোচনার বিরাট একটা অংশ জুড়ে থাকে। চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বংশগতি প্রধান, না পরিবেশ প্রধান, এ নিয়ে শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিদ্‌দের মধ্যে বহুদিন ধরে জল্পনা-কল্পনা ও আলোচনা চলে আসছে। কেউ কেউ বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতির ভূমিকা প্রধান, আবার কেউ কেউ বলেন, পরিবেশের ভূমিকা প্রধান। যা হোক, শিক্ষাক্ষেত্রে এদের গুরুত্বকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে বংশগতি ও পরিবেশ বলতে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার।

॥ বংশগতি কি ? ॥
(What is heredity ?)

শিশু জন্মের সঙ্গে পূর্বপুরুষদের যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়, তাকেই বলা হয় তার বংশগতি। প্রত্যেক শিশুই তার বাবা, মা, ঠাকুরমা প্রভৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে যে শুধু বাবা-মায়ের গুণ নিয়ে জন্মাবে, তার কোন মানে নেই। যে-কোন পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে তার বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে। এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, যা তার বাবা-মায়ের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাইনি, সে সব গুণও শিশুর মধ্যে দেখা যায়। এই বংশগতির ধারাতেই পরিবারের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। বর্তমান কালে, জীববিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন যে,

বংশগতির উৎস

সন্তান উৎপাদন শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদার ফল নয়। বিশেষ ক'রে মানুষের মত বিচারবুদ্ধিশীল প্রাণীর ক্ষেত্রে একেবারেই নয়। তার পেছনে একটা প্রেষণা-শক্তিও কাজ করে। এই প্রেষণা হ'ল নিজের বৈশিষ্ট্যকে সময়ের দূরত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বজায় রাখার চেষ্টা। তাই মানবশিশু যদি তার বাবা-মায়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ে না জন্মাত, আর তার পেছনে যদি আত্মসংরক্ষণের প্রচেষ্টা না থাকত, তাহ'লে বাবা-মা তাকে এত যত্ন ক'রে লালন-পালন করতেন না। অবশ্য এর পেছনে বাৎসল্য যে নেই তা নয়, তবে ঐ ধরনের প্রেষণাও শক্তি যোগায়। তাই বংশগতি আছে বলেই মানবসভ্যতা সৃষ্টির আদি যুগ থেকে জনস্রোতের মত অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। তাহ'লে বংশগতি বলতে আমরা শিশু জন্ম-মুহূর্তে তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যে সব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, তার সমবায়কে বলব। স্টোন (Stone) বলছেন—"It is the sum total of all the physical and mental characteristics received by the

individual from his ancestor at birth.” পূর্বপুরুষ বলতে তিনি সকলকেই বোঝাতে চাইছেন, শুধু বাবা-মা নয়, বাবা-মা তার প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ। তাই তাঁদের কাছ থেকে যা পায়, তাকে আমরা প্রত্যক্ষ 'বংশগতি' (Direct heredity) বলতে পারি। আর অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যা পায়, তাকে আমরা 'পরোক্ষ বংশগতি' (Indirect heredity) বলতে পারি। আমরা বাবা-মা ছাড়াও অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বংশগতির ধারায় নানা ধরনের যে বৈশিষ্ট্য লাভ করি, তার উল্লেখ করেছেন মনোবিদ্ গ্যাল্টন (Galton) তাঁর Law of Ancestral Inheritance-এ। এই সূত্রে তিনি বলেছেন, কোন শিশু তার বৈশিষ্ট্যের অর্ধেক ($\frac{1}{2}$) অংশ পায় বাবা-মায়ের কাছ থেকে, এক-চতুর্থাংশ ($\frac{1}{4}$) পায় দাদু-দিদিমা শ্রেণীর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে, এক অষ্টমাংশ ($\frac{1}{8}$) পায় তারও পূর্ববর্তী বংশধরদের কাছ থেকে। এমনিভাবে চলতে থাকে। গ্যাল্টনের এই তত্ত্ব অভ্রান্ত নয়। তিনি যে পরিমাণের নির্দেশ দিয়েছেন, তার ভেতর সত্যতা নেই। কিন্তু মূল বক্তব্যের মধ্যে যে ভুল নেই, সে কথা আধুনিক বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। কি নিয়মে এবং কিসের মাধ্যমে বংশগতির ধারা সঞ্চালিত হয়, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ আছে। লামার্ক (Lamark) থেকে শুরু ক'রে ডি. ভ্রাইজ (De Vries), মেন্ডেল (Mendal), মর্গান (Morgan), ম্যাকলাং (Mclung) প্রভৃতি অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সে আলোচনার অবতারণা আর এখানে করব না। যে কোন ক্রিয়া বা কৌশলের মধ্যে হোক্-না-কেন, বংশগতি শিশুর মধ্যে বর্তমান থাকে তার জন্মমুহূর্তে। সে তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়, তাকেই আমরা সাধারণভাবে তার বংশগতি বলছি। উড্ওয়ার্থ ও মারকুইস (Woodworth and Marquis) খুব সহজভাবে এই বংশগতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ব'লে—“Heredity covers all the factors that were present in the individual when he began life......”

বংশগতি সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন হল—বংশগতির ধারায় আমরা কি কি ধরনের বৈশিষ্ট্য অর্জন করি। উডওয়ার্থ ও মারকুইস তাঁদের সংজ্ঞার 'সব রকম গুণ' (all the factors) যা জন্মগতভাবে পাওয়া যায়, তাকে বলেছেন বংশগতি। এই সব গুণ কি কি? স্টোনের (Stone)-এর সংজ্ঞায় এর একটু বিশ্লেষণ পাই। তিনি বলেছেন—জন্মগতভাবে পাওয়া দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য (Physical and mental characteristics)। তাঁর এই বিশ্লেষণের পথ ধরে আমরা বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করতে পারি—

বংশগতির ধারায় কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য আসে?

[এক] **দেহগত বংশগতি** (Physical heredity) : ব্যক্তির দৈহিক আকৃতি, গঠন, গায়ের রং, চুলের রং, চোখের মণির রং ইত্যাদি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো যা ব্যক্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে অর্জন করে, তাদের বলা যেতে পারে দেহগত বংশগতি। এর সঙ্গে দেহের অভ্যন্তরে রসক্ষরা গ্রন্থিগুলোরও সংযোগ আছে।

দৈহিক বংশগতি কি?

[দুই] **মানসিক বংশগতি (Mental heredity) :** এর অন্তর্গত নানা ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো আছে। যেমন - প্রবৃত্তি (Instinct), প্রক্ষোভ (Emotion), চিন্তন (Thinking), ঐচ্ছন (Willing) ইত্যাদি। মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর সম্পাদন করার প্রাথমিক কৌশলও আমরা জন্মগতভাবে পাই। এছাড়া বুদ্ধি এবং বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতাও আমরা জন্মগতভাবে অর্জন করি।

[তিন] **মনঃপ্রকৃতিগত বংশগতি (Temperamental heredity) :** কিছু কিছু জন্মগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে দৈহিক বা সম্পূর্ণভাবে মানসিক বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। এদের জন্য দেহ ও মন উভয়ে দায়ী (Psycho-somatic)।

মনঃপ্রকৃতিগত বংশগতি

এগুলোকে আমরা মনঃপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য (Temperamental characteristic) বলতে পারি। সাধারণ কথায় আমরা যাকে বলি (mood)। এই ধরনের মানসিক অবস্থা কোন বিশেষ জন্মগত দৈহিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সৃষ্টি হয় এবং কম-বেশী চিরস্থায়ী। সুতরাং, এই ধরনের বৈশিষ্ট্যকেও আমরা বংশগতির ধারায় লাভ করি। আলপোর্টও এই মনঃপ্রকৃতির ধারণার মধ্যে জন্মগত
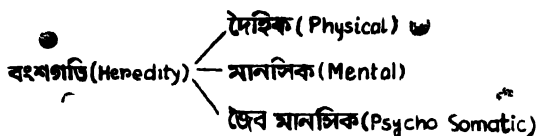
বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেছেন—"Temperament refers to the characteristic phenomena of an individual's emotional nature including his susceptibility to emotional stimulation, his customary strength, and speed of response......, these phenomena being regarded as dependent upon constitutional make up, and therefore largely hereditary in origin".

॥ পরিবেশ কি ? ॥
(What is Environment ?)

পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি, ব্যক্তিকে যা পরিপূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত ক'রে আছে। মনোবিদ্যায় বা শিক্ষাবিজ্ঞানে পরিবেশ কথাটা ঠিক এরকম নিষ্ক্রিয় অর্থে ব্যবহার করি না। আধুনিক মনোবিদ্যায় পরিবেশের সক্রিয় সংব্যাখ্যান দেওয়া হ'য়েছে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী পরিবেশ স্থান-কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। যে সব উত্তেজক জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে উত্তেজিত করে, তারই সমবায়ে সেই ব্যক্তির পরিবেশ গঠিত। স্টোন (Stone) বলেছেন—Environment is sum total of all the stimulations received by an individual from birth till death. এই সংজ্ঞাকে একদিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, ব্যক্তির পরিবেশ নিষ্ক্রিয় নয়।

প্রাকৃতিক জগতের যে বস্তু তাকে উত্তেজিত করতে পারে, তাই হ'ল তার পরিবেশের অন্তর্গত। যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বসে গবেষণার কাজ ক'রে যাচ্ছেন, তাঁর কাছে পরিবেশই হ'ল তাঁর পরীক্ষাগারের বিভিন্ন অংশ—যেগুলি তাঁকে সক্রিয় ক'রে তুলেছে। কিন্তু অন্য ব্যক্তি যে সাধারণভাবে সেখানে দেখতে গিয়েছে, তার কাছে তা পরিবেশ নয়। কারণ, ঐ সব জিনিস তাকে উত্তেজিত করতে পারে না। যে দেখতে পায়, তার কাছে আলোর উত্তেজক (Light stimulus) পরিবেশ, কিন্তু অন্ধের কাছে তা নয়। অর্থাৎ বিশ্ব-প্রকৃতির যে সব অংশ ব্যক্তিকে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে উত্তেজিত করেছে বা সক্রিয়ভাবে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তারই সমবায় হ'ল জীবন-পরিবেশ। আবার পরিবেশ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রিয়াশীল। এখানে জন্ম বলতে আমরা ঠিক ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণকে বলছি না। জন্ম বলতে আমরা মায়ের গর্ভে প্রথম জীবনের সঞ্চার-মুহূর্তকে বোঝাতে চাইছি। এই অর্থে বিচার করলে আমরা ব্যক্তির পবিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি—

পরিবেশের তাৎপর্য ও শ্রেণীবিভাগ

[এক] **ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের পরিবেশ (Pre-natal environment) :**

মায়ের গর্ভে থাকাকালীন বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উত্তেজনা ভ্রূণকে প্রভাবিত করে। এই ধরনের প্রভাবকে আমরা বলছি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের পরিবেশ। ব্যক্তিজীবনের বিকাশে, এই ধরনের পরিবেশের গুরুত্ব বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীরা সকলেই স্বীকার করেন। গর্ভাবস্থায় মায়ের আঘাত লাগলে, মা খুব জোরালো ওষুধ খেলে, মা

জন্মপূর্ব পরিবেশের পরোক্ষ প্রভাব

পরিবেশ (Environment)
- প্রাক্-ভূমিষ্ঠ পরিবেশ
- উত্তর-ভূমিষ্ঠ পরিবেশ
  - প্রাকৃতিক পরিবেশ
  - পারিবারিক-পরিবেশ
  - বিদ্যালয়-পরিবেশ
  - সমাজ-পরিবেশ
  - কর্ম-পরিবেশ
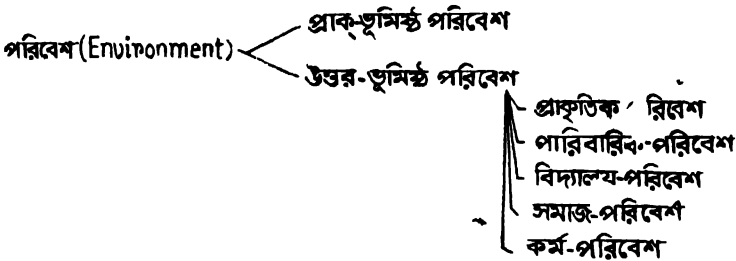
ঠিকমত খাওয়া দাওয়া না করলে শিশুকে তা নানাভাবে প্রভাবিত করে। এই পর্যায়ে পরিবেশ মায়ের দেহের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করে।

[দুই] **ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের পরিবেশ (Post-natal environment) :**

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে যে সব প্রাকৃতিক শক্তি ব্যক্তিকে মৃত্যু পর্যন্ত সক্রিয় রাখে, তাকেই বলা হচ্ছে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের পরিবেশ। এর ভেতর সমস্ত রকমের উত্তেজককে ফেলা যায়। এই পরিবেশকে ব্যক্তির ক্রিয়ার ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন—বিদ্যালয়-পরিবেশ, পরিবারের পরিবেশ, সমাজ-পরিবেশ, কর্ম-পরিবেশ ইত্যাদি।

জন্ম-পরবর্তী পরিবেশের বিভিন্নতা

॥ বংশগতি ও পরিবেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব ॥
(Relative importance of Heredity and Environment)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বংশগতি ও পরিবেশের গুরুত্ব নিয়ে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। একদল বলেন, শিশুর শিক্ষার জন্য বংশগতিই একান্ত প্রয়োজন, পরিবেশের কোন প্রয়োজন নেই। এই মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদ্‌দের বলা হয় **বংশগতিবাদী** (Hereditarian); আবার অপর একদল আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন বংশগতির মূল্য কিছু নেই, শিক্ষাক্ষেত্রের পরিবেশই প্রধান। পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বকে যে কোনভাবে পরিবর্তন করা যায়। এঁদের বলা হয় **পরিবেশবাদী** (Environmentalist)। এঁদের উভয় পক্ষের সিদ্ধান্তের পেছনে কিছু যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। সে সব সম্পর্কে আলোচনা করলে তাঁদের যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।

॥ বংশগতির পক্ষে যুক্তি ॥
(Argument in favour of Heredity)

বংশগতিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের বক্তব্য নীচের মন্তব্যটির দ্বারা সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হ'য়েছে। "Heredity not environment is the chief maker of men. Nearly all the misery and nearly all the happiness in the world are due not to the environment."...(Wiggam)। অর্থাৎ, "পরিবেশ নয়, বংশগতিই মানুষের স্রষ্টা; মানুষের জীবনের কোন সুখ বা কোন দুঃখের জন্যই তার জীবন-পরিবেশ দায়ী নয়।" বংশগতির ওপর যে সব চিন্তাবিদ্‌ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাঁদের মধ্যে গ্যাল্টন (Galton) প্রধান। তাকেই বংশগতিবাদীদের প্রবক্তা বলা হয়। তিনি শিশুর জীবনে বংশগতির প্রভাবের ওপর এমন আস্থাবান ছিলেন যে, তিনি এক বিজ্ঞানের শাখারও সৃষ্টি করেছেন, এ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য। একে আধুনিক কালে বলা হয় Engenics। গ্যাল্টনের মূল বক্তব্য হ'ল, মানবশিশুকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে তাকে ভাল বংশগতির অধিকারী করতে হবে (Mankind will have to breed first, before we attempt to educate him)। বাংলায় প্রবাদ আছে, 'গাধা পিটিয়ে মানুষ করা যায় না'—এই মতবাদে এঁরা বিশ্বাসী। গ্যাল্টন এবং তার অনুগামীরা অনেক পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা তাঁদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে দেখিয়েছেন।

বংশগতিবাদীদের বক্তব্য

[এক] গ্যাল্টন নিজে ডারউইন প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তির কুলপঞ্জী (Family history) সংগ্রহ ক'রে তার পর্যালোচনা করেন এবং তাঁর 'Hereditary Genius' নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। গ্যাল্টনের এই কাজকে সম্পূর্ণতর করেন কার্ল পিয়ার্সন (Karl Pearson)—তিনি ওয়েজউড-ডারউইন-গ্যাল্টন (Wedgewood-

Darwin-Galaon) পরিবারের এক হাজার বছরের বংশতালিকা তৈরি করেন এবং তার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই কয়টি পরিবার থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদিতে নিজেদের কীর্তি রেখে গেছেন। ডারউইন পরিবারের পাঁচ জন রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হ'য়েছিলেন। এর থেকে গ্যাল্টন এবং পিয়ার্সন সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ তার বংশগতি বা জন্মগতভাবে পাওয়া বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। তাই একই পরিবারের একজন বিশিষ্ট মনীষীর জন্মগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল।

গ্যাল্টন প্রভৃতিদের কালপঞ্জী পরীক্ষা

[দুই] এই ধরনের সিদ্ধান্ত আমরা ডাগডেল (R. L. Dugdale)-এর এক পর্যবেক্ষণে পাই। তিনি নিউইয়র্কের জেলাসমূহের অধিকর্তা ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি লক্ষ্য করেন, জেলখানায় যে বিভিন্ন ধরনের কয়েদী আসে, তাদের অনেকের পদবীতে সাদৃশ্য আছে। তিনি অনুসন্ধান ক'রে দেখলেন, তারা একই বংশোদ্ভব। তিনি জিউক (Juke) এই ছদ্মনাম ব্যবহার ক'রে সেই পরিবারের কুলপঞ্জী প্রকাশ করলেন। তাতে দেখা গেল, এই পরিবারটির শুরু হয়েছে এক দুশ্চরিত্র ভবঘুরে লোক থেকে। বহু বছর পর পর্যন্ত ঐ পরিবার থেকে যে সব ব্যক্তি জন্মেছে, তাদের লক্ষ্য ক'রে তিনি দেখলেন, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অসৎ ব্যক্তি। তিনি এই পরিবার থেকে উদ্ভূত প্রায় পাঁচ পুরুষে 1667 জন লোকের খোঁজ পান। তার মধ্যে 300 জন শিশু অবস্থায় মারা গেছে, 310 জন বহু বছর ধরে খুব দুঃস্থ অবস্থায় জীবনযাপন করেছে, 440 জন রোগে মারা গেছে, 400 জন নিজেদের ধূর্ততার জন্য মারা গেছে, 7 জন ছিল খুনী, 60 জন চোর, যারা এক-একজন অন্ততঃপক্ষে বারো বছর করে জেল খেটেছে, 130 জনকে কোন-না-কোন সময়ে অপরাধী হিসাবে কোর্টে অভিযুক্ত করা হ'য়েছে এবং মাত্র 20 জন কোনরকমে হাতের কাজ শিখে সুস্থ জীবনযাপন করেছে। এর থেকে ডাগডেল একই সিদ্ধান্ত করলেন যে, বংশগতির প্রভাবেই একই বংশের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এক-জাতীয় গুণ দেখা গেছে। এইসব ব্যক্তিদের মধ্যে বংশগতির প্রভাবই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ডাগডেলের জিউক পরিবার অনুশীলন

[তিন] গডার্ড (Goddard) অনুরূপভাবে কালিকক (Kalikak) ছদ্মনামে এক পরিবারের কুলপঞ্জী পর্যালোচনা করেন। তিনি দেখেন, এই পরিবার যে ব্যক্তি থেকে শুরু হয়েছে, তিনি দু'টি বিবাহ করেন—একজন সুস্থ বুদ্ধিমতী মহিলাকে এবং আর একজন ক্ষীণবুদ্ধি মহিলাকে। এই স্ত্রীর দরুন পরিবারে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়েছে। দেখা যায়, ক্ষীণবুদ্ধি স্ত্রীর দরুন যে পরিবারের ধারা চলে এসেছে, তাতে বেশীর ভাগ ব্যক্তিই ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অসামাজিক গুণসম্পন্ন। আর বুদ্ধিমতী স্ত্রীর দরুন যে

গডার্ড-এর কালিকক্ পরিবার অনুশীলন

পরিবারের ধারা এসেছে, সেখানে দেখা যায়, বুদ্ধিমান এবং স্বাভাবিক ব্যক্তির আবির্ভাব। এর থেকে গডার্ড বংশগতির অনুকূলে সিদ্ধান্ত করলেন।

বুদ্ধির তুলনা

[চার] টারম্যান (Terman) কালিফোর্নিয়ার এক হাজার তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের (Gifted children) বুদ্ধির পরিমাপ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিতা-মাতারও বুদ্ধি পরিমাপ ক'রে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, বংশগতি ব্যক্তির বুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান।

যমজ পর্যবেক্ষণ

[পাঁচ] মনোবিদ্ নিউম্যান (Newman), ফ্রেড্ (Fred) এবং এড্‌উইন (Edwin) নামে দু'জন সমকোষী যমজ সন্তানের খোঁজ পান যখন তাদের বয়স 25 বছর। শৈশবেই তারা পৃথক হ'য়ে যায় এবং বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়। কিন্তু 16 বছর বয়সে তিনি যখন তাদের খোঁজ পান, তখন দেখেন, বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। দৈহিক বিকাশের দিক্ থেকে তাদের মধ্যে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়নি। গায়ের রঙ্, চুলের রঙ্, ওজন সবই প্রায় একরকম ছিল। আবার মানসিক দিক্ থেকেও তাদের মধ্যে অনেক মিল দেখা গেল। দু'জনেই একই ধরনের বৃত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে ; তার-বিভাগে তাদের উভয়েরই বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করার ঝোঁক দেখা যায়। তাদের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্কেরও বিশেষ তফাৎ নেই ; দু'জনেই বিয়ে করেছে প্রায় একই সময়ে এবং তাদের একটি ক'রে ছেলেও হ'য়েছে। দু'জনে কুকুরের একই নাম রেখেছে 'টিক্সি'। এর থেকে নিউম্যান সিদ্ধান্ত করলেন, পরিবেশের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যখন তাদের মধ্যে মিল দেখা যাচ্ছে, সুতরাং জীবন-বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাবই বেশী।

॥ শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতির গুরুত্ব ॥
(Importance of heredity in Education)

পূর্বোক্ত যুক্তি থেকে বংশগতিবাদীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, শিশুর শিক্ষার জন্য তার বংশগতি একান্ত প্রয়োজন। বংশগতি প্রয়োজন অর্থে এই নয় যে, তাদের কারুর বংশগতি থাকে না ; আসলে উন্নত বংশগতি দরকার। শিশু যদি যথার্থ দৈহিক ও মানসিক গুণ জন্মগতভাবে না পায়, তাহ'লে তাকে শত চেষ্টা করলেও আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বারা উন্নত করা যাবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তি-জীবনের বিকাশসাধন

শিক্ষার জন্য বিকাশ-ধর্মী সত্ত্বা দেয় বংশগতি

করা। এখন শিশুর মধ্যে যদি কোন সম্ভাবনাই না থাকে, তার বিকাশ কি ক'রে হবে? বিকাশযোগ্য কোন বস্তুর মধ্যে বিকাশধর্মী কোন সত্ত্বা অবশ্য থাকার দরকার। একটা বীজ থেকে চারা গাছ হয়, তার থেকে একদিন বড় গাছ হয়। বীজের মধ্যে জীবনের বা বিকাশের সম্ভাবনা আছে বলেই তা সম্ভব হয়েছে। তেমনি, শিশুর মধ্যে যদি বংশগতির ধারায় সম্ভাবনাগুলো না আসে, তার বিকাশেরও কোন প্রশ্ন ওঠে না। এই যুক্তির ওপর ভিত্তি

ক'রে গ্যাল্টন এবং তাঁর অনুগামীরা বললেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান হ'ল বংশগতি ; বংশগতিই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের উপাদান যোগায়। অধ্যাপক নান (Nunn)-এর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, এই বংশগতিবাদীরা মনে করেন—"The circumstances of life are to a man what rocks and winds and currents to a ship ; merely accident that makes his qualities manifest but have nothing whatever to do with producing them."

॥ পরিবেশের পক্ষে যুক্তি ॥

(Arguments in favour of Environment)

পরিবেশবাদীদের বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা হ'বে যদি আমরা ওয়াট্‌সন-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি। তিনি বলেছেন—"Give me a dozen healthy infants well-formed, and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist, I might select..." এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, বংশগতি বলতে কিছু আছে, এঁরা তা বিশ্বাস করেন না। এঁরা মনে করেন, অন্তর থেকে বিকাশ করার মত শিশুর মধ্যে কিছুই থাকে না। নির্দিষ্টসংখ্যক হাত, পা, আঙ্গুল ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকলে আমরা যে কোন শিশুকে আমাদের ইচ্ছামত পরিবেশের প্রভাবে গঠন করতে পারি ; দরকার হ'লে এই ব্যক্তিকে উন্নত পরিবেশের মধ্যে রেখে প্রতিভাবান ক'রে তুলতে পারা যায় ; তাকেই আবার অন্য রকম পরিবেশের মধ্যে অসামাজিক ব্যক্তিতে পরিণত করা যায়।

পরিবেশবাদীদের মূল বক্তব্য

এই মতবাদের সপক্ষে বলেছেন ফরাসী দার্শনিক হেলভিসিয়াস (Helvetius)। ফরাসী দার্শনিক রুশোও এই মতবাদ প্রচার ক'রে গেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ ভাল বা খারাপ হ'য়ে জন্মায় না। সততা বা অসৎ ভাব সমাজেরই সৃষ্টি। রবার্ট আওয়েন (Robert Owen) এই মতবাদকে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ ক'রে স্কটল্যাণ্ডের এক গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন মনোবিদ্‌ ও শিক্ষাবিদ্‌ তাঁদের পথ অনুসরণ করেন এবং তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নানারকম যুক্তি দেখান। বিশেষভাবে আচরণবাদীরা এই মতবাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই মতবাদের সমর্থনের পেছনে তাঁদের আরও অনেক উদ্দেশ্য ছিল ঠিকই, কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে তাঁরা যে সব যুক্তি এর পক্ষে দেখিয়েছেন, তাতে ক'রে এই মতবাদের গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। এখন পরিবেশের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করব।

পরিবেশবাদের পক্ষে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্‌

[এক] ইস্টার ব্রুক (Easter Brooke, A. H.) ১৯১৫ সালে ডাগডেলের জিউক পরিবার-সংক্রান্ত গবেষণা সম্পর্কে আরও তথ্য প্রকাশ করেন। তাতে তিনি দেখলেন, জিউকদের অনেকেরই সামাজিক পরিবেশের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও চারিত্রিক উন্নতি হয়েছে। তিনি তাঁর প্রকাশিত পুস্তিকার বিভিন্ন তথ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ডাগডেলের অনুসন্ধান সম্পূর্ণ ছিল না, তাই তিনি বংশগতির সপক্ষে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। আসলে দেখা যাচ্ছে, পরিবেশের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব ব্যক্তিত্বেরও উন্নতি হয়েছে এবং তিনি এর থেকে পরিবেশের সপক্ষে রায় দেন। তবে বংশগতিকে একেবারে অস্বীকার করেননি।

জিউক পরিবার-সংক্রান্ত পরবর্তী তথ্য

[দুই] ক্যাটেল (Cattell) আমেরিকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের জীবনী অনুশীলন ক'রে তার পর্যবেক্ষণের ফল 1906 সালে প্রকাশ করেন "A Statistical Study of American Men of Science"—এই নামে। ক্যাটেল বলেছেন, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার উন্নতি বা বিকাশ, লোকবসতি, সুযোগ, আর্থিক সংগতি, আদর্শ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। ক্যাটেলের এই সিদ্ধান্ত গ্যাল্টন ও পিয়ার্সনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যায়।

ক্যাটেলের পর্যবেক্ষণ

[তিন] বারবারা বার্ক্স্ (Barbara Burks) শিশুর বিকাশের ওপর পালিত পিতা-মাতার গৃহ-পরিবেশের (Foster Home) প্রভাব পরীক্ষা ক'রে দেখেন। তিনি প্রায় 204টি ছেলেমেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন। এদের প্রত্যেককেই এক বছর বয়স হওয়ার আগেই পোষ্য নেওয়া হ'য়েছিল। তিনি শিশুদের বুদ্ধি পরিমাপ ক'রে দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিতামাতার ও তাদের পালক পিতা-মাতাদেরও বুদ্ধির পরিমাপ করে দেখেন। এদের তুলনামূলক বিচার ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পরিবেশের প্রভাবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে পালক পিতা-মাতার প্রভাবে শিশুর বুদ্ধির কিছু পরিবর্তন হয়। তিনি দেখেছেন, সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন হয় বুদ্ধ্যঙ্কের। তিনি আরও সিদ্ধান্ত করেছেন, শিশুদের সামগ্রিক পার্থক্যের জন্য শতকরা 17 ভাগ দায়ী পরিবেশ। তিনি অবশ্য একেবারে বংশগতিকেও অস্বীকার করেননি। তিনি তাঁর পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন বংশগতির প্রভাব শিশুর মধ্যে বেশী পরিমাণেই থাকে, তবে পরিবেশ সেখানে একেবারে অনুপস্থিত নয়। বার্ক্স্-এর এই সিদ্ধান্তকে লীহি (Leahy) নামে আর একজন মনোবিদ্ সমর্থন করেছেন। অনুরূপভাবে পরীক্ষা ক'রে তবে এই পরীক্ষার ফলকে একদিকে যেমন পরিবেশের পক্ষে উপস্থাপন করা যায়, আবার বংশগতির পক্ষেও উপস্থাপন করা যায়।

জীবন-বিকাশে পালিত গৃহের প্রভাব

[চার] ফ্রীম্যান (Freeman), হোলজিঙ্গার (Holzinger) এবং মিচেল (Mitchell) প্রভৃতি মনোবিদ্‌রা যমজ সন্তানদের (Twins) ওপর বিভিন্ন ধরনের

পরীক্ষা করেন। যমজ দু'ধরনের হয়। অনেক সময় একই নিষিক্ত অণ্ড (Fertilized ovum) থেকে কোষ-বিভাজনের সময় দুটি যমজ সন্তান সৃষ্টি করে। এদের বলা হয় **এককোষী যমজ** (Identical twin)। দৈহিক এবং মানসিক দিক্ থেকে এদের খুব বেশী মিল থাকে।

ভিন্নকোষী যমজ পর্যবেক্ষণ

আবার অনেক সময় একই গর্ভ-সঞ্চারের সময় দু'টো নিষিক্ত অণ্ড (Fertilized ovum) থেকে যমজ সন্তান হয়। এদের বলা হয় **ভিন্নকোষী যমজ** (Fraternal twin)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের যমজ সন্তানই বেশী হয়। এদের মধ্যেও বেশী রকম মিল থাকে, তবে সমকোষী যমজদের থেকে অপেক্ষাকৃত কম। এইসব যমজদের 19 জোড়া সম্পর্কে ফ্রিম্যান, হোলজিঙ্গার এবং মিচেল এক বিবরণী প্রকাশ করেন। এই যমজদের মধ্যে একজন ক'রে তাদের পিতামাতার কাছে মানুষ হয়। আর একজন দত্তক পিতার বাড়ীতে মানুষ হয়। মনোবিদ্‌রা এই যমজদের দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক গুণের পরিমাপ করেন। এর থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, বুদ্ধ্যঙ্কের দিক্ থেকে তাদের পার্থক্য কোন সময় 24 পর্যন্ত হ'য়েছে। ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের দিক্ থেকে এরা কখনও বেশ কাছাকাছি, আবার কখনও তাদের পার্থক্য যথেষ্ট। তবে স্নুইসিন্‌জার (Schwesinger) পরে এইসব যমজ পর্যবেক্ষণের ফলাফল পর্যালোচনা ক'রে দেখে বলেছেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পালক পিতার বাড়ীর পরিবেশ এবং নিজস্ব পিতার বাড়ীর পরিবেশ একরকম ছিল ব'লে পার্থক্য দেখা যায়নি। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে পরিবেশের পার্থক্য ছিল, সে সব ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য দেখা গেছে।

[**পাঁচ**] পরিবেশের সপক্ষে যুক্তি হিসেবে প্রায়ই গ্লাডিস (Gladys) এবং হেলেন (Helen) নামে দুই সমকোষী যমজ সন্তানের উল্লেখ করা হয়। এরা দু'জন ঘটনাচক্রে দেড় বছর বয়সের সময় পরস্পর দূরে সরে যায়। হেলেন পালিতা মাতার যত্নে পড়াশুনা ক'রে বি. এ. পাশ করে। পরে এক বিত্তশালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং সে

সমকোষী যমজ পর্যবেক্ষণ

ভালভাবেই ঘর-সংসার করতে থাকে। তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলোও বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু গ্লাডিস ঠিক তার বিপরীতধর্মী হ'য়ে ওঠে। সুযোগের অভাবে সে লেখাপড়া করতে পারেনি। ক্যানাডার রকি অঞ্চলে সে মানুষ হয় এবং জীবিকা-অর্জনের জন্য বিভিন্ন কল-কারখানায় ঘুরে বেড়ায়। স্বাস্থ্যও খুব ভাল ছিল না।

35 বছর বয়সের সময় যখন তাদের আবিষ্কার করা হয়, তখন তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায় দৈহিক ও মানসিক দিক্ থেকে। দৈহিক অবয়বের দিক্ থেকে তাদের মধ্যে কিছু মিল দেখা গেলেও, দৈহিক সৌন্দর্যের দিক্ থেকে তাদের মধ্যে তফাৎ দেখা যায়। সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক্ থেকেও তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। বুদ্ধির দিক্ থেকে তাদের মধ্যে 24 পয়েন্ট বুদ্ধ্যঙ্কের তফাৎ দেখা যায়। এর থেকে স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়, পরিবেশের গুরুত্ব জীবন-বিকাশের ক্ষেত্রে কম নয়।

[ছয়] পরিবেশের প্রভাবে বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তন হয় কি না তা অনুসন্ধান করার জন্য বিভিন্ন মনোবিদ্ পরীক্ষা করেন, এ সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ধরনের। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বুদ্ধ্যঙ্কের বেশ পরিবর্তন হ'য়েছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি।

বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তন

॥ শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশের গুরুত্ব ॥
(Importance of Environment in Education)

এইসব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে পরিবেশবাদীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, মানুষের জীবন-বিকাশ এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ'ল পরিবেশ। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষা হ'ল জীবন-বিকাশের কৌশল। তাই শিক্ষার জন্য পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। অঙ্কুরোদ্গম করার জন্য যেমন উপযুক্ত তাপ, বায়ু এবং জলের প্রয়োজন, তেমনি শিশুর জীবন-বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। মানব শিশুর প্রথম জীবনের সঞ্চার হয় মাতৃগর্ভে, তখন থেকেই তাকে পরিবেশ উপযুক্তভাবে যদি উত্তেজিত না করে, তাহ'লে তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না; তার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাই শুকিয়ে যাবে। সে মায়ের গর্ভে উপযুক্ত পরিবেশ পায় বলেই নির্দিষ্ট সময়ের পর সে পূর্ণাঙ্গ শিশুরূপে জন্মলাভ করে। তাই শিশুকে জন্মের পরে ঠিকভাবে জীবন-পথে পরিচালিত করতে হ'লে শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে। পরিবেশ ভাল হ'লে শিক্ষাও ভাল হবে, পরিবেশ যদি ঠিকমত না হয়, শিক্ষার কাজও সার্থক হবে না।

॥ বংশগতি ও পরিবেশের সমন্বয় ॥
(Integration of Heredity and Environment)

বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ের পক্ষেই নানা রকম যুক্তির অবতারণা করেছেন বিভিন্ন মনোবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্। বংশগতিবাদীরা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন শিশুর জীবন-বিকাশে বংশগতিই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আবার পরিবেশ-বাদীরা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, পরিবেশ জীবন-বিকাশের ক্ষেত্রে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই পরস্পরবিরোধী যুক্তির জালে আমাদেরই সবচেয়ে বেশী অসুবিধা। কোন্ মতটা আমরা গ্রহণ করব? কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্ বা মনোবিদ্রা এই ধরনের একপক্ষীয় মনোভাবে বিশ্বাসী নন। তাঁরা চরম বংশগতিবাদকে যেমন বিশ্বাস করেন না, তেমনি চরম পরিবেশবাদও তাঁদের কাছে অগ্রাহ্য। নান (Nunn) এই বংশগতি ও পরিবেশের মধ্যে দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—"The actual problem is not to choose one of the horns of a dilemma but to decide how much two distinct influences contribute to human development."

প্রস্তাবনা

আধুনিক কালে প্রায় প্রত্যেক মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, ব্যক্তিজীবন এই দুই শক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক কালে যমজ সন্তান, একই পিতামাতার বিভিন্ন সন্তান, কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির ওপর যে সব পরীক্ষা হ'য়েছে, তার থেকে কোন মনোবিদ্‌ই কোন এক বিশেষ রায় দেননি। তাদের পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে এই দু'ধরনের উপাদানেরই গুরুত্বের কথা বলা হ'য়েছে। যে জীবনের সমস্ত রকম সম্ভাবনা নিয়ে মাতৃগর্ভে প্রাণের সঞ্চার হয়, সেই সম্ভাবনাকে যদি তার জন্মমুহূর্ত থেকে মাতার দৈহিক অবস্থা ঠিকমত পরিবেশের মধ্যে যত্নের সঙ্গে ধরে না রাখতেন, তা'হলে তার সেইসব সম্ভাবনার অবস্থা কি হ'ত, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আবার সেই কোষের মধ্যে যদি প্রাণের সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে যতই আদর্শ অভ্যন্তরীণ অবস্থা থাকুক-না-কেন, তার মধ্যে জীবন সঞ্চারিত হত না। তাই ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ এই দুই উপাদান—বংশগতি ও পরিবেশ—এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই ঘটে থাকে। তাই এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) বলেছেন—"Heredity and environment are correlative factors." ব্যক্তি বংশগতির মাধ্যমে যে সম্ভাবনাগুলো নিয়ে জন্মেছে, তা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে কি হবে না, তা নির্ধারণ করবে তার জীবন-পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান ব্যক্তির যদি কোন বিশেষ এক অশিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম হ'ত, তাহলে তিনি কোনদিন বিশ্বের কবি হ'তে পারতেন না। হয়ত তাঁর জন্মগত সম্ভাবনা ও গুণ থাকার জন্য সেই গোষ্ঠীর মানসিকতার উপযোগী ভাল গান রচনা করতে পারতেন। আবার অন্য দিক্ থেকে চিন্তা করলে বলা যায়, সুন্দর আদর্শ পরিবেশ ব্যক্তির ওপর কতটা কাজ করবে, তার জীবন-বিকাশে কতটা সহায়তা করবে, তা নির্ধারণ করবে ব্যক্তি বংশগতির ধারায় কি অর্জন করছে, তার ওপর। এই কারণে বড়লোকদের ছেলেরা আদর্শ পরিবেশ ও সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় জীবনে উন্নতি করতে পারে না। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বংশগতি ও পরিবেশ এদের যে কোন একটা নয়, এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ওপরই ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ নির্ভর করছে। বংশগতি এবং পরিবেশ পরস্পরের ওপর কিভাবে ক্রিয়াশীল হবে, তার ওপর নির্ভর করছে শিশুর জীবন-বিকাশ কোন্ পথে পরিচালিত হবে। মনোবিদ্ আলপোর্টও এই মত সমর্থন করেছেন। তিনি ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ওপর বংশগতি ও পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তির পরিবেশ ও বংশগতির গুণফলের ওপর নির্ভরশীল (Personality) = (Heredity) × (environment)। এর যে কোন একটির প্রভাব যদি শূন্য হয়, তাহ'লে ব্যক্তিসত্তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। তিনি মন্তব্য করেছেন—"Since every quality is probably influenced by the original determinants inherent in the genetic system, and at the same time by course of life in an actively stimulating environment, it becomes

বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া

impossible to ascribe with finality any single feature of personality either to heredity or to experience."

॥ শিক্ষার বংশগতি ও পরিবেশ ॥
(Heredity and Environment in Education)

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ-সাধন করা। আবার পূর্বেই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, শিশুর জীবন-বিকাশের জন্য বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই প্রয়োজন। সুতরাং শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের গুরুত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের ভিত্তি হিসেবে তাদের মধ্যে যেমন সমন্বয়-সাধন করেছি, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও তাদের সমন্বয়িত প্রয়োগ করতে না পারলে শিক্ষা সার্থক হবে না।

প্রস্তাবনা

কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতির কথা বিবেচনা করতে গেলে দেখতে পাই, শিক্ষার এবং শিক্ষকের দায়িত্ব সেখানে নগণ্য। বিদ্যালয়ে শিশুরা আসে পাঠ-গ্রহণের জন্য, জীবন-উপযোগী প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য। কিন্তু যখন সে আসে, তখন কিছু বংশগতির ধারা নিয়েই আসে। এই বংশগতির ধারাকে নির্ধারণ করায় শিক্ষকের কোন সুযোগই নেই। তিনি কেবলমাত্র তাদের গ্রহণ করতে পারেন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়ে। একটি শিশু যে মানসিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে, সেইমতই তাকে গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে তাকে প্রকৃতির নিয়ম মেনে নিতে হবে। প্রত্যেক শিশুর ওপর বংশগতির নীতি (Principle of heredity) যেমনভাবে কাজ করেছে, সেইমতই সম্ভাবনা তার মধ্যে আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বংশগতির নিয়ম ও সীমাকে শিক্ষক কোন চেষ্টার দ্বারাই অতিক্রম করতে পারেন না। যতই উন্নত ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করুন না-কেন, তাঁর ক্ষমতা এক্ষেত্রে সীমিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর বংশগতি সম্পর্কে শিক্ষকের সীমিত ক্ষমতা

অপরপক্ষে বংশগতির সূত্রে বিভিন্ন সম্ভাবনাকে আদর্শ পরিবেশের মধ্যে স্থাপন ক'রেই পরিস্ফুট করা যায়। আর শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবেশকে শিক্ষক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সমস্ত রকম শিক্ষা-প্রচেষ্টার মূলেই আছে পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশের গুরুত্বই প্রধান, কারণ এই পরিবেশের প্রকৃতিই শিক্ষকের হাতে একটা সুযোগ দেয় শিশুকে তার সম্ভাবনার উপযোগী ক'রে বিকাশ করতে। স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) এই পরিবেশকে বলেছেন—**সামাজিক বংশগতি** (Social heritage)। তিনি বলেছেন—শিশু তার জৈবিক বংশগতি নিয়ে জন্মায়। তাই তার ওপর আমাদের কোন হাত নেই; কিন্তু সে সামাজিক বংশগতির মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়; আর এই সামাজিক বংশগতিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ("A child is born with a biological heritage, he is born a social heritage."—Sandiford)। তিনি পরিবেশকে বংশগতির সঙ্গে সমতুল্য

পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শিক্ষকের দায়িত্ব

হিসাবে কল্পনা করেছেন। তার কারণ, মানব শিশুর বেশ কিছু বয়স পর্যন্ত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন অধিকার থাকে না। জৈবিক বংশগতি যেমন সে পিতামাতার কাছ থেকে স্বাভাবিক নিয়মে পায়, ঠিক তেমনি পরিবেশ বা সামাজিক বংশগতিও পিতা-মাতা বা সমাজ তাকে দেয়, একে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার বেশ কিছুদিন পর্যন্ত থাকে না। এই পরিবেশও তার অধীন নয়। সমাজের বয়স্করা তাকে যেমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রাখবেন, তেমনি সে পরিবেশ পাবে। আর এখানেই শিক্ষার সুযোগ। শিক্ষক জৈবিক বংশগতির নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, কিন্তু এই সামাজিক বংশগতিকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। জৈবিক বংশগতির সঙ্গে সামাজিক বংশগতির পার্থক্য হ'ল জৈবিক বংশগতি স্বাভাবিক নিয়মে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়, তার জন্য বাইরের কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সামাজিক বংশগতিকে প্রত্যেক বংশধরের জন্য নতুন ক'রে গড়ে তুলতে হয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষকের প্রধান কাজ হবে, বিশেষ সময় ও সমাজ-ব্যবস্থার জন্য নতুন করে পরিবেশ রচনা করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশ বা সামাজিক বংশগতির গুরুত্ব শিক্ষকের হাতে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে তার নিজস্বতা প্রকাশ করার। শিক্ষক তাঁর বৃত্তিমূলক যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য পরিবেশে স্থাপন করার জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলো অবলম্বন করবেন—

[এক] শিক্ষক বংশগতির জন্য শিশুদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা যথার্থভাবে নির্ধারণ করবেন এবং ব্যক্তি-বৈষম্যের নীতির ওপর শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করবেন।

বংশগতির নির্ধারণ

শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার আগে, তার মধ্যে কতটুকু সম্ভাবনা আছে, তা বিচার ক'রে দেখা দরকার। এ বিষয়ে তাঁকে বিভিন্ন ধরনের মানসিক অভীক্ষা (Psychological tests) সাহায্য করবে। তিনি প্রত্যেক শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করবেন।

[দুই] বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশেরও উন্নতি করতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় এবং সমস্ত কিছুর মধ্যে যাতে পাঠ-গ্রহণের

বিদ্যালয়-পরিবেশ

উপযোগী পরিবেশ সৃষ্ট হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়-গৃহের সাজসজ্জা পাঠের অনুকূল যাতে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিভিন্ন মনীষীর ছবি দেওয়ালে ও বিভিন্ন জায়গায় টাঙানো থাকবে, বিভিন্ন মনীষীর বাণী লেখা থাকবে। পাঠাগারে শিশুদের উপযোগী সুন্দর সুন্দর বই থাকবে।

[তিন] শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষক আদর্শ সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্ট হবে না। বিদ্যালয়ের পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের মানবীয় সম্পর্ক

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

(Human relationship) গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক, শিক্ষার্থী ও তার দলের মধ্যে সম্পর্ক—এমনি নানা ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয় বিদ্যালয়-জীবনে। শিক্ষক এই সম্পর্ক-স্থাপনের ক্ষেত্রে যদি সক্রিয় ভূমিকা না নেন, তাহ'লে শিক্ষার জন্য

যে পরিবেশ তিনি ছাত্রদের দেবেন, তা আদর্শস্থানীয় হবে না। কারণ এই সম্পর্কের ওপরই নির্ভর করছে বিদ্যালয় কতটা ব্যক্তি-জীবনকে প্রভাবিত করবে।

[চার] শিক্ষা-সহায়ক বিভিন্ন ধরনের আধুনিক উপকরণ শিক্ষককে সংগ্রহ করতে হবে। তিনি ছাত্রদের তাঁর বিষয়-সংক্রান্ত সর্বাধুনিক জ্ঞান যাতে দিতে পারেন, সেইমত প্রস্তুতি তাঁকে নিতে হবে। তিনি জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকলে ছাত্রদের যুগোপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে পারবেন না।

আধুনিক জ্ঞান

[পাঁচ] বিদ্যালয়ের অবসর-সময়ে শিক্ষার্থীরা যাতে সুস্থভাবে শিক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে সময় কাটাতে পারে, তার আয়োজন করতে হবে। খেলাধূলার ব্যবস্থা, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানোর ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে করতে হবে। এইসব কাজের মাধ্যমে শিশুরা একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের কাজে একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবে, অন্যদিকে এই ধরনের শিক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্বকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করা যাবে।

অবসর-যাপনের ব্যবস্থা

[ছয়] বিদ্যালয়ের সুপরিবেশ গড়ে তুলতে হ'লে ছাত্রদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হ'বে। যে পরিবেশে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, সে পরিবেশ তাদের কাছে জেলখানাস্বরূপ। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ভার শিক্ষকের হলেও, শিশু যাতে সেই পরিবেশে খুব স্বাভাবিক বোধ করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে পরিবেশের মধ্যে শিশু তার বংশগতির ধারা অনুযায়ী কাজ করতে না পারবে, সে পরিবেশের প্রভাব কিছুই থাকবে না শিক্ষার্থীর মনে ; ব্যক্তিজীবনে পরিবেশের পুনর্গঠনের কোন অর্থ হয় না।

শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা

[সাত] সবশেষে, বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দিতে হবে। ছাত্রদের মনকে বর্তমান সমাজের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে হ'লে বিভিন্ন ধরনের দলগত নির্দেশনারও কৌশল (Group guidance technique) প্রয়োগ করতে হবে।

নির্দেশনা

এই ধরনের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন ক'রে শিক্ষক যদি পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহ'লে শিক্ষাক্ষেত্রে তার নিজের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন না। শিক্ষালয় যদি শিক্ষার্থীকে তার জীবন-বিকাশের উপযোগী পরিবেশই দিতে না পারে, শিক্ষার্থীর বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলো পরিস্ফুট ক'রে তুলতে না পারে, তাহ'লে সমাজব্যবস্থায় তার কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না। কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে কেবলমাত্র ভাল-খারাপ বাছাই করা উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেক শিশু যাতে তার নিজস্ব সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে সমাজকে সেবা করতে পারে, সেদিকে বেশী নজর রাখাই আমাদের কর্তব্য।

মন্তব্য

সারসংক্ষেপ

শিশুর জীবন-বিকাশ দুটি প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে—তার বংশগতি (Heredity) ও তার পরিবেশ (Environment)। বংশগতি বলতে বোঝায় জন্মসূত্রে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল রকম বৈশিষ্ট্য সম্ভাবনার সমষ্টিকে। আর পরিবেশ বলতে বোঝায়, সেইসব উদ্দীপকের সমবায়কে যাদের দ্বারা সে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানাভাবে উদ্দীপ্ত হয় ও ক্রিয়াশীল হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুই প্রক্রিয়ার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে মনোবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

বংশগতিবাদীরা বলেন, ব্যক্তিজীবনের বিকাশে তার বংশগতিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তাঁরা তাঁদের যুক্তির সমর্থনে অনেক রকম তথ্য পরিবেশন করেছেন। যেমন—কুলপঞ্জী অনুশীলন, বুদ্ধির তারতম্যের অনুশীলন, যমজদের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষণ ইত্যাদি। অন্যদিকে পরিবেশবাদীরা মনে করেন, মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে যে কোন দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করুক-না-কেন, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে যা ইচ্ছা তাই তৈরি করা যায়। পরিবেশবাদীরাও তাদের যুক্তির সপক্ষে নানা রকম তথ্য পরিবেশন করেছেন।

আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে কিন্তু শিশুকে এককভাবে পরিবেশ বা বংশগতির ফল হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। বরং তাঁরা মনে করেন, মানুষ তার বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। শিক্ষা ব্যক্তিকে উপযুক্ত পরিবেশ দান করে, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা বংশগতিকে পরিপূর্ণতালাভে সহায়তা করে।

প্রশ্নাবলী

1. What do you understand by nature and nurture? Develop the idea that nature is a great factor which moulds human lives in various ways.

   [বংশগতি ও পরিবেশ বলতে কি বোঝ? বংশগতি মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে, এ সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যক্ত কর।]

2. Discuss the influence of environment on the mental development and illustrate your point.

   [শিশুর মানসিক বিকাশে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর।]

3. Discuss with a brief reference to relevant research finding the influence of environment on the child's mental development.

   [উপযুক্ত গবেষণালব্ধ তথ্যের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করে শিশুর মানসিক বিকাশের ওপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।]

4. Discuss the relative importance of heredity and environment of the mental development of children.
[শিশুর মানসিক বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।]
5. "Children are born with a biological heritage ; they are born into a social heritage."—Discuss.
["শিশুরা জৈবিক বংশগতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ; তারা সামাজিক বংশগতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে।" –আলোচনা কর।]
6 Discuss the relative contributions of heredity and environment in determining human behaviour
[মানুষের আচরণের প্রকৃতি নির্ধারণে বংশগতি ও পরিবেশের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।]
7. Discuss how education can be made meaningful in terms of his hereditary nature and the environmental stimulation.
[শিশুর বংশগতি ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার শিক্ষাকে কিভাবে অর্থপূর্ণ করে তোলা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।]
8. Write an essay on 'social heredity'.
["সামাজিক বংশগতি" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।]

শিক্ষা-সংস্থা (১)
Factors of Education

সমাজ-জীবনের বিকাশ, উন্নয়ন এবং ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ব্যক্তি-সত্তার নিয়ন্ত্রণের ওপর। প্রত্যেক সমাজেরই কিছু-না-কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে মেনে চলতে হয়। সমাজ-জীবনের নিয়ম এবং আদর্শ মেনে চলার মাধ্যমেই ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই বিকাশ হয়। সমাজ-জীবনের নিয়ম ও আদর্শ ব্যক্তিকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সমাজের মধ্যেই কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সৃষ্ট হ'য়েছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social institution)। এইসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হ'ল ব্যক্তি-আচরণকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে সমাজ-নির্ণীত পথে পরিচালিত করা। শিক্ষা (Education) সমাজে এমনই এক দায়িত্ব পালন করে। প্রত্যেক সমাজেরই কিছু-না-কিছু রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, চিন্তাধারা এবং অভিজ্ঞতা আছে, যা সে তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায়। তাছাড়া, যে সব অভিজ্ঞতা সে দুঃসাধ্য পথে অর্জন করেছে, তাও তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য সহজলভ্য করতে চায়। এইসব দিক্ থেকেই শিক্ষার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আর এইসব কারণেই প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থায় তার সৃষ্টির ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে হয়। এই ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social institution) যারা সমাজের উন্নত সংস্কার ও কৃষ্টি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারণের দায়িত্ব নিচ্ছে, তাদের আমরা বলছি **শিক্ষার সংস্থা** **(Agencies of Education)**।

প্রস্তাবনা

এই ধরনের শিক্ষার সংস্থাকে আমরা দু'শ্রেণীতে ভাগ ক'রে বিচার করতে পারি। সমাজের মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যারা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ, তাদের উদ্দেশ্য, উপযোগিতা এবং কর্মপরিকল্পনা সব দিক্ থেকে তারা পূর্ব-পরিকল্পিত বিশেষ রীতিতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই হ'ল শিক্ষাদান। এদের বলা হয়, **শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা** (Formal Agencies of Education)। কখন, কোথায়, কি পদ্ধতিতে, কাকে শিক্ষা দেওয়া হবে এইসব প্রতিষ্ঠানে, তা সবই নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়মিত তদারকও করা হয়ে থাকে। এই ধরনের সংস্থার নাম করতে গেলে বিশেষভাবে শিক্ষালয় (School), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious institution), রাষ্ট্র (State), বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র (Organised recreational centres), সংগ্রহশালা (Museum), গ্রন্থাগার (Libraries) এবং চিত্র-সংগ্রহশালা (Art galleries) ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এছাড়া, কিছু কিছু সংস্থা আছে যেগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছে

প্রত্যক্ষ সংস্থা

এবং আবার কোন ক্ষেত্রে তারা স্বাভাবিকভাবে চলেও গেছে। তাদের কোন নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধন নেই। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষাদান নয়, কিন্তু পরোক্ষভাবে তারা সমাজের ব্যক্তিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। শিশুরা জীবনধারণের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই একান্ত অবচেতনে অনেক কিছু প্রয়োজনীয় কৌশলই এইসব প্রতিষ্ঠানের কাছে আয়ত্ত করে; এদের বলা যেতে পারে **শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা** (Informal agencies of Education) যেমন—বৃহত্তর সমাজ-জীবন, পরিবার এবং অন্যান্য যুব-সংস্থা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, অনেক শিক্ষাবিদ্, কেবলমাত্র শিক্ষালয়কেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করেন এবং সকল সংস্থাকে পরোক্ষ সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করেন। ফলে, এই ধারণা অনুযায়ী পরিবার, রাষ্ট্র ইত্যাদি সবই পরোক্ষ সংস্থা।

পরোক্ষ সংস্থা

আমরা অন্য এক দিক্ থেকেও শিক্ষা-সংস্থার (Educational Agencies) শ্রেণীবিভাগ করতে পারি। এই শ্রেণীবিভাগ ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার (interaction of persons) ওপর নির্ভরশীল। যে সব সংস্থায় শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে হ'য়ে থাকে, তাকে আমরা **সক্রিয় সংস্থা** (Active Agencies of Education) বলতে পারি। এইসব সংস্থায় শিক্ষা দ্বিমুখী। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ে পরস্পরকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ, এইসব সংস্থার শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষ কিছু তফাৎ নেই। একজন আর একজনের চেয়ে বেশী কি কম, তারতম্যের তফাৎ মাত্র। পরিবার (Family), রাষ্ট্র (State), ধর্মীয় সংস্থা (Religious organisation) এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সঙ্ঘ (Social organisation)-কে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সক্রিয় সংস্থা

কিন্তু বর্তমান জগতে এমন অনেক সংস্থা শিক্ষার কাজে ব্যাপ্ত আছে যেখানে পারস্পরিক ক্রিয়া একমুখী মাত্র। অর্থাৎ, সেখানে এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রভাবিত করে মাত্র, তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ, এক পক্ষের সঙ্গে অপর পক্ষের আন্তরিক কোন যোগাযোগ নেই। শিক্ষার এইসব সংস্থাকে বলা হয় **নিষ্ক্রিয় সংস্থা** (Passive agencies of education)। যদিও এইসব প্রতিষ্ঠান সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন, তবুও ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার তাদের কোন সুযোগ নেই। যেমন—বেতার-সূচী, সংবাদপত্র, সিনেমা ইত্যাদি।

নিষ্ক্রিয় সংস্থা

এইসব শিক্ষা-সংস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, যে কোন ধরনের সংস্থা তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক-না-কেন, তা কোন সময়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না; জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সংস্থার প্রভাব বিশেষভাবে ব্যক্তির ওপর আসে এবং এদের প্রত্যেকের দ্বারাই ব্যক্তি প্রভাবিত হয়। যেমন, শৈশবের শিক্ষা বিশেষভাবে পরিবার দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাল্যে শিক্ষার দায়িত্ব বিশেষভাবে শিক্ষালয়ের ওপর ন্যস্ত থাকে। আবার কৈশোর এবং যৌবনকালে ব্যক্তির শিক্ষা হয় বিভিন্ন সামাজিক

মন্তব্য

সঙ্ঘের (Social organisation, group) প্রভাবে। প্রাপ্তবয়স্ককালে শিক্ষা বিশেষভাবে সংবাদপত্র এবং রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; আর শেষ বয়সের শিক্ষা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং, প্রত্যেক ধরনের সংস্থাই তার নিজস্ব ধারায় ব্যক্তির জন্মগ্রহণের পর থেকে জীবনব্যাপী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই যে কোন শিক্ষা তা যদি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চায়, তবে তাকে সব রকম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের (Educational Agencıs) সাহায্য নিতে হবে। এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষভাবে কয়েকটির সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব, যেমন—শিক্ষালয় (School), পরিবার বা গৃহ (Family or Home), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious institution) ইত্যাদি।

॥ শিক্ষালয় ॥
(School)

প্রত্যক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষালয়ের স্থান সর্বপ্রথম। বর্তমানে যে কোন সভ্য সমাজেই শিক্ষালয়েব অস্তিত্বের কথাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা যদি সভ্য মানব-সমাজের বিবর্তনের ধারা অনুশীলন করি এবং যদি মানব-সভ্যতার বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করি, তা'হলে দেখব যে, শিক্ষালয় শ্রেণীভুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সকল সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে বর্তমান ছিল না। মানব-সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে জীবনযাত্রার কলা-কৌশল যখন ছিল খুবই সহজ এবং সাধারণ, তখন শিক্ষালয়ের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই না। জীবনের প্রয়োজন ছিল তখন খুব সাধারণ কয়েকটি প্রাথমিক চাহিদা (Basic need) কেন্দ্রিক। তার এই চাহিদা, খাদ্য এবং আশ্রয়, সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে সীমাবদ্ধ থাকত। আর শিশুদের যেটুকু কৌশল আয়ত্ত করতে হ'ত, তা সাধারণতঃ এই খাদ্যসংগ্রহ ও আশ্রয়ের সংস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই উভয় দিক্ থেকে তখন প্রকৃতিও পেছনে অফুরন্ত এবং পর্যাপ্ত। ফলে, এইসব কৌশল ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা দেওয়াব জন্য আধুনিক ধাঁচের কোন শিক্ষালয় প্রয়োজন ছিল না। কলা-কৌশল-বর্জিত সেই জীবনের প্রয়োজনীয় আচরণধারা আয়ত্তের জন্য পারিবারিক জীবনযাপনই ছিল শিশুর কাছে যথেষ্ট। শিশুদের শিক্ষা হ'ত পরিবারের মধ্যে দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মাধ্যমে; সে পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক সদস্যদের সঙ্গে থাকতে থাকতে অনুকরণের দ্বারা (imitation) জীবনধারণের প্রয়োজনীয় কৌশল শিক্ষা করত। সুতরাং, প্রাথমিক এই সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণের রীতি ছিল, কিন্তু শিক্ষালয়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না; এটাই হ'ল তার বড় বৈশিষ্ট্য। সমগ্র পরিবার-জীবনই ছিল শিক্ষালয়।

শিক্ষালয় বিবর্তনের প্রথম স্তর

কিন্তু ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার মান উন্নত এবং জটিল হ'তে লাগল। সমাজ-জীবনেও জটিলতা দেখা দিল। এই জীবনের জটিলতর পরিস্থিতির যথাযথ

মোকাবিলার জন্য নতুন নতুন কৌশলের উদ্ভাবন প্রয়োজন হ'ল। আর সেইসব জটিল কষ্টার্জিত কৌশলকে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য চাই যথেষ্ট শিক্ষা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা। ফলে, ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যেই এই ব্যবস্থার সূত্রপাত হ'ল। শিশুরা যখন বিশেষ একটা বয়ঃক্রমে উপনীত হ'ত, তখন তাদের সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার আগে কিছুদিনের প্রশিক্ষণ (Training) বা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। একে বলা হত উপনয়ন (Initiation ceremony)। এই ধরনের প্রথা এখনও আমাদের দেশে বিশেষ এক শ্রেণীতে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য হল শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী ক'রে তৈরি ক'রে দেওয়া এবং তাকে সকল দায়িত্ব অর্পণ করা। কিন্তু এই অনুষ্ঠান সংঘটিত হ'ত সমাজ বা পরিবারের মধ্যে। এর জন্য কোন পৃথক প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে এই অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করার জন্য এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজের মধ্যে তাদের বলা হ'ত পুরোহিত (Priest)। এমনিভাবে সমাজ-বিবর্তনের ধারায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ও শিক্ষার রীতির কিছু বিবর্তন হ'ল; অর্থাৎ, এই পর্যায়ের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হ'ল—শিক্ষাদানের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। গৃহ-পরিবেশ বা কোন ধর্মীয় সংস্থাকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। কিন্তু শিক্ষাদানের জন্য এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ, শিক্ষা পূর্ব স্তরের মত আর সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত (informal) রইল না; শিক্ষক বা পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টির ফলে নিয়ন্ত্রিত (formal) হ'ল।

শিক্ষালয় বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর

ক্রমবিকাশের ধারায় ক্রমে ঐ সব পুরোহিত শ্রেণীকে কেন্দ্র ক'রে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হ'তে লাগল। মানুষ যখন উপলব্ধি করল যে, জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে এত সহজভাবে স্বল্পকালব্যাপী উপনয়ন-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবীনদেব মধ্যে সঞ্চার করা সম্ভব নয়, তখন সে আরও দীর্ঘতর সময়ের শিক্ষার কথা চিন্তা করল। অন্য এক দিক্ থেকে ভাষা ও লিপির আবিষ্কার তাকে এই পথে অনেক সাহায্য করল। ধীরে ধীরে বিশেষজ্ঞ পুরোহিতকে কেন্দ্র ক'রে সমাজের অঙ্গের বাইরে পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল এবং এমনিভাবেই ক্রমে ক্রমে শিক্ষালয়ের সৃষ্টি হ'ল। আর পুরোহিতরা ক্রমে শিক্ষক হিসাবে বিবেচিত হতে লাগলেন।

শিক্ষালয় বিবর্তনের সর্বশেষ স্তর

প্রত্যেক প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই শিক্ষালয়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। চীন, ভারত, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস এবং রোম প্রত্যেকের প্রাচীনতর সভ্যতায় ছিল শিক্ষালয়ের অস্তিত্ব। কিন্তু এইসব বিদ্যালয়ে ভাষা, দর্শন ইত্যাদি কৃষ্টিমূলক দিকেরই আলোচনা হ'ত। ফলে, এই শিক্ষা বিশেষভাবে যাজকশ্রেণী এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে শিক্ষালয়ের শিক্ষার এমন কোন বিধিনিষেধ নেই। ফলে, অতীতের শিক্ষালয়ে যে রীতি, তার সঙ্গে বর্তমানের কোন মিল নেই। যেমন মিল নেই তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের।

শিক্ষালয় শব্দের আধুনিক তাৎপর্য

ইংরেজীতে 'স্কুল' (School কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ (Skhole, থেকে, যার অর্থ হ'ল—অবসর-বিনোদনের সময়কালীন তত্ত্বমূলক আলোচনা। ক্রমে এই শব্দকে ব্যবহার করা হ'তে লাগল যে স্থানে বসে আলোচনা করা হ'ত, সেই স্থানকে বোঝানোর জন্য। আর এই অর্থেই বর্তমানে এই শব্দটি ইংরেজীতে ব্যবহার করা হ'লেও অবসরকালীন আলোচনার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ততা আছে, তা বর্তমান শিক্ষালয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় না। বরং বর্তমান শিক্ষালয়ে শৃঙ্খলা ও অন্যান্য বিধিনিষেধের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। তাই বর্তমানে শিক্ষালয় কি, তা বলতে গেলে ক্যাটার গুড-এর শিক্ষা-অভিধানের সংজ্ঞা উল্লেখ করতে হয়—এক বা একাধিক শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের তত্ত্বাবধানে, একটি নির্দিষ্ট আসবাবপত্রযুক্ত বাসগৃহে, নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমে অনুশীলনরত শিক্ষার্থী-সমবায়ই হ'ল শিক্ষালয়। ["School is an organised group of pupil pursuing defined studies at defined levels and receiving instruction from one or more teachers frequently with the addition of other employees and such as principal, various supervisors of instruction and a staff of maintenance workers usually housed in a simple building or a group of building".] তাহ'লে বর্তমানে শিক্ষালয়ের এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে থাকার প্রয়োজন—(১) নির্দিষ্ট গৃহ, (২) নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী, (৩) ছাত্র বা ছাত্রী, (৪) শিক্ষক, (৫) আসবাবপত্র ও (৬) অন্যান্য সহকারী কর্মচারী।

॥ শিক্ষালয়ের কার্যাবলী ॥
(Functions of School)

শিক্ষালয়ের বিকাশের ধারা অনুশীলন করলে আমরা দেখতে পাই সমাজ-জীবনের গতিকে সক্রিয় রাখায় যে সব সামাজিক শর্ত বা অনুশাসন কাজ করছে, সেগুলো একইভাবে শিক্ষালয়-সৃষ্টির পেছনেও ক্রিয়াশীল। মনুষ্য সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পেছনে দুটো নীতি সর্বদা ক্রিয়াশীল। তার প্রথমটি হ'ল—মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের প্রয়াস (preservation of cultural heritage) এবং দ্বিতীয়টি হ'ল অভিজ্ঞতার সঞ্চালন (Transference of cultural heritage)। দীর্ঘদিনের

প্রস্তাবনা

সাধনায় অনেক ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে সে যে-সব অভিজ্ঞতা এবং আচরণধারা অর্জন করেছে এবং সঞ্চয় করেছে যা সে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে এবং যা-কিছু সে নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছে, সবই সে দিয়ে যেতে চায় তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। এই প্রক্রিয়াকে সমাজবিদ্‌রা (Sociologis) নাম দিয়েছেন সংস্কারের সঞ্চরণ (Transmission of cultural heritage)। এই উভয় প্রক্রিয়া মানুষকে সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে চিরদিন। এই উভয় প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মানবসমাজ

শিক্ষালয়রূপ শিক্ষা-সংস্থা গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে। তাই শিক্ষালয়ের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এই দুই শ্রেণীর কাজের উল্লেখ করতে হয়।

[এক] শিক্ষালয়ের কাজ : অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ (Function of school . Preservation of cultural heritage) : প্রাচীনকালে শিক্ষালয়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল সমাজের আচার-আচরণ ও রীতিনীতি সংরক্ষণ করা।

সংরক্ষণমূলক কাজ

শিক্ষালয়ের মাধ্যমে আমরা চাই সমাজ-জীবনের যা কিছু ভাল তাকে ধরে রাখতে ; আর তা সমাজ-জীবনের অবিচ্ছিন্নতাকে বজায় রাখার জন্যই। সমাজে বয়স্ক লোকেরা জীবনের প্রত্যক্ষ পরিস্থিতিতে যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে বা যে সব অভিজ্ঞতা তারা পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছে, শিক্ষালয়ের প্রধান কর্তব্য হবে, তা সংরক্ষণ করা। এই সংরক্ষণ পুঁথির মাধ্যমে হ'তে পারে, শিক্ষালয়ের দৈনন্দিন কার্য-পরিচালনার মাধ্যমে হ'তে পারে বা শিক্ষকদের আচরণের মধ্যেও হ'তে পারে। এইসব অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণের ব্যবস্থা যদি সমাজ না করতে পারে, তাহ'লে প্রত্যেক মানুষকেই তার জীবন প্রস্তরযুগ থেকে শুরু করতে হবে। মানব-সভ্যতার যে অগ্রগতি হয়েছে, তার কোন মূল্যই থাকবে না। তাই জীবনের পথে সহজভাবে এগিয়ে চলার জন্য, মানব-সভ্যতাকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যক্তি-জীবনকে সমৃদ্ধিশালী ক'রে সমাজ-জীবনকে সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চাই অতীত সংস্কারের সংরক্ষণ। শিক্ষালয় সমাজের এই দায়িত্ব বিশেষভাবে নিজের ওপর নিয়েছে। তাই শিক্ষালয়ের প্রধান কাজ হ'ল - অতীত সংস্কারের সংরক্ষণ (Preservation of Cultural Heritage)। ব্রাউন (Brown) ঐ সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে বলেছেন—"The preservation of cultural heritage is the primary function of education carried through the informal agencies of primitive society ; it still is and must remain a major function of modern school."

[দুই] শিক্ষালয়ের কাজ : অতীত সংস্কারের সঞ্চালন (Function of School : Transmission of cultural heritage) : পূর্বোক্ত কাজের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বা তার ব্যবহারিক দিক্ হিসেবে শিক্ষালয়ের দ্বিতীয় কাজের কথা উল্লেখ করা যায়। শিক্ষালয় যে শুধুমাত্র অতীত সংস্কার বা কৃষ্টির ধারক হবে তাই নয়, ঐ সব অভিজ্ঞতার যথাযথ সঞ্চালনের ভারও তাকে নিতে হবে।

সঞ্চালনমূলক কাজ

সমাজ জীবনের অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখতে হ'লে শিক্ষালয়ের অন্তর্গত শিশুদের মধ্যে অনুশীলনের দ্বারা সমাজের অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে সঞ্চালিত করতে হবে। এর মাধ্যমে এক দিক থেকে সমাজ-জীবনে যেমন আসবে সমতা, অন্য দিক্ থেকে বৈচিত্র্যও দেখা দেবে সমাজ-জীবনে। শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি, শিক্ষার দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীর মনের ওপর

প্রভাব বিস্তার করতে চাই। শিক্ষালয় এই দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে পালন করে। এই কাজকে বলা হয় অতীত সংস্কারের সঞ্চালন (Transmission of cultural heritage)।

[তিন] **শিক্ষালয়ের কাজ: গৃহ ও সমাজ-পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন** (Function of school: to develop relation between home-life and social-life): পূর্বোক্ত দু'টো কাজ ছাড়াও শিক্ষালয়কে একটা দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে সমাজ-জীবনে তার নিজের অবস্থানের কথা বিচার ক'রে। শিশুরা গৃহ-পরিবেশ (Home environment) থেকে শিক্ষালয়ে আসে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে পিতা, মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়ের স্নেহময় আশ্রয়ে তারা বড় হ'তে থাকে। তারপর একদিন তারা আসে শিক্ষালয়ে। সেখানকার পাঠ ও প্রশিক্ষণ (Training) শেষ করে তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করে। অর্থাৎ, জীবন-পরিক্রমার পথে তিনটি ধাপ (১)—দায়িত্বহীন, পরনির্ভরশীল, স্নেহময় গৃহ-পরিবেশ, (২) শিক্ষালয়ে বাস, ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী প্রশিক্ষণলাভ এবং সমাজ-জীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে গভীর পরিচিতি এবং (৩) কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কর্মময় সমাজ-জীবন। সুতরাং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষালয় মানুষের জীবনের এমন পর্যায়ে অবস্থিত যে, তাকে জীবনের দুই পরস্পরবিরোধী পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হবে। শৈশবের দায়িত্বহীন জীবনকে বয়স্ক জীবনের দায়িত্বগ্রহণের উপযোগী ক'রে দেওয়ার দায়িত্বও যেমন তাকে নিতে হবে, তেমনি এই দুই ভিন্নমুখী জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানও তাকে করতে হবে। মানুষ প্রাণী হিসেবে যতই অভিযোজনক্ষম (Adjustable) হোক-না-কেন, জীবনের বিভিন্ন পরিবেশে সার্থক অভিযোজনের জন্য তার কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হয়ই। শিশু যাতে ক্রমে বয়স্ক জীবনের পথে সহজভাবে এগিয়ে যেতে পারে, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিদ্যালয়কে নিতে হবে। তার জীবন-পরিক্রমার পথকে সহজ ও সরল ক'রে তুলতে হবে; জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে যে সীমারেখা বর্তমান, তাকে মুছে ফেলে জীবন-বিকাশের ধারাকে সহজ ক'রে তোলাই হবে শিক্ষালয়ের কাজ।

সমন্বয়মূলক কাজ

[চার] **বিদ্যালয়ের কাজ: সমাজ-উন্নয়ন** (Function of school: Development of Society): শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অর্জিত আচরণধারা বা অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন করা নয়। শিক্ষার বা শিক্ষালয়ের দায়িত্ব যদি অতীত অভিজ্ঞতার বা সংস্কারের সংরক্ষণ ও সঞ্চালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তাহ'লে সমাজ-জীবনের অগ্রগতি বা বিকাশ সম্ভব হ'ত না। এইজন্য শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন সমাজ কৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ লাভ করবে, তেমনি অন্যদিকে কৃষ্টির ধারাকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে নতুন নতুন কৃষ্টির উপাদান গড়ে তোলার সুযোগও সেখানে পাবে। শিক্ষালয়ে যদি সে সুযোগ না থাকে, তবে সভ্যতার অগ্রগতি থেমে যাবে। তাই শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য হবে সভ্যতার অগ্রগতিকে বজায় রাখা, সভ্যতার ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করা। ক্যানন (D. J. O. Cannon) এই

উন্নয়নমূলক কাজ

সম্পর্কে যে বাস্তবসম্মত মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন —"If a generation had to learn of itself what has been learned by its predecessors, no sort of intellectual or social development would be possible and the present state of society would be little different from the society of the old stone age." সুতরাং শিক্ষালয়ের প্রধান কাজ হবে মানুষের অতীত অভিজ্ঞতার সুসংগঠনের মাধ্যমে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা করা।

[**পাঁচ**] **শিক্ষালয়ের কাজ : ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন** (Function of the School Development of Individuality) : শিক্ষালয়গুলো শুধু সমাজ-কল্যাণের দিক্ই দেখবে, তা ঠিক নয়। ব্যক্তি-মনের পরিপূর্ণ বিকাশের দায়িত্বও তাকে নিতে হবে। বর্তমানে কোন শিক্ষাবিদ্ বিশ্বাস করেন না, সমাজ-কল্যাণ ও ব্যক্তি-কল্যাণ পরস্পর-নিরপেক্ষ। ব্যক্তির কল্যাণের দ্বারাই সাধিত হবে ব্যষ্টির উন্নয়ন এবং সমাজের কল্যাণের মাধ্যমে আসবে ব্যক্তির কল্যাণ। তাই শিক্ষালয়ের কাজ হবে একই সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়ন করা। স্যার পার্শিনান এ সম্পর্কে বলেছেন—"...While the school must never fail to form its pupil in the tradition of brotherly kindness and social service, it must recognise that the true training for service is one that favours individual growth, and that the highest form of society would be one in which every person would be free to draw from the common medium what his nature needs, and to enrich the common medium with what is most characteristic of himself" শিক্ষালয়ের পাঠ্যসূচী ও সহপাঠ্যক্রমিক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষালয়ের প্রধান কাজ হবে প্রত্যেক শিশুকে তার নিজের যোগ্যতানুযায়ী পরিপূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে দেওয়া। শিক্ষালয়ের জীবন পরিসরের মধ্যে দৈহিক, আত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক সমস্ত দিক দিয়েই শিক্ষার্থী বিকাশলাভ করবে। শিক্ষালয়কে এইসব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে যত্নশীল হ'তে হবে।

বিকাশমূলক কাজ

[**ছয়**] **শিক্ষালয়ের পরোক্ষ কাজ** (Indirect function of the school) : উপরি-উক্ত বিভিন্ন দায়িত্ব ছাড়াও শিক্ষালয়ের ওপর আরও অনেক ছোট-খাটো দায়িত্ব এসে পড়ে। বিশেষভাবে আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এদের উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। যেমন, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ পিতামাতাই অশিক্ষিত, ফলে আমাদের দেশের শিশুরা যে গৃহ-পরিবেশ থেকে শিক্ষালয়ে আসে, তাকে ত্রুটিহীন বলা যায় না। অনেক আচরণ এবং অভ্যাস তারা আয়ত্ত করে যা ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের অনুকূল নয়। এইসব শিশু যখন শিক্ষালয়ে আসে, তখন শিক্ষালয়ের দায়িত্ব হবে সেইসব

শিক্ষালয়ের পরোক্ষ কাজ

আচরণধারার সংশোধন করা। অর্থাৎ, শিক্ষালয়কে শিশুদের অবাঞ্ছিত আচরণ ও অভিজ্ঞতার সংশোধন করার দায়িত্বও নিতে হয়। একে আমরা শিক্ষালয়ের **সংশোধনী দায়িত্ব** (Corrective function) বলতে পারি। এরই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক ধরনের দায়িত্ব শিক্ষালয়গুলোর ওপর এসে পড়ে, তা হ'ল **সমাজ-শিক্ষণের দায়িত্ব** (Social Educative function)। শিক্ষালয়ের কাজের দ্বারা শিশু এবং সমাজের উভয়েরই কল্যাণ করতে হ'লে অভিভাবক এবং শিক্ষালয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হওয়ার দরকার। শিক্ষালয়ের কার্যসূচীর মধ্য দিয়ে আচরণধারার যে পরিবর্তন সাধন করার প্রচেষ্টা চলেছে, গৃহ-পরিবেশে অভিভাবকরা যদি সেইসব আচরণ-বিধির যথার্থ মূল্য না দেন, তাহলে শিক্ষালয়ের একক চেষ্টার দ্বারা উন্নতি বা বিকাশ কখনই সম্ভব হবে না। তাই প্রয়োজনমত অভিভাবকদের, তথা বয়স্কদের, কিছুটা শিক্ষার ভার শিক্ষালয়কে নিতে হবে। ব্রাউন (Brown) বলেছেন—"the role of community is that it sets the climate in which the school functions." শিক্ষালয়কে পরোক্ষভাবে এই আবহাওয়া সৃষ্টি করানোর দায়িত্ব নিতে হবে। তা না হ'লে শিশুর জীবনবিকাশের চেষ্টাই শুধু ব্যর্থ হবে না, শিক্ষালয়ের নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাও মুশকিল হবে। সবশেষে, বর্তমান সমাজ ও শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষালয়ের আর একটা দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা যাক। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সার্থক নাগরিক হ'তে হ'লে চাই ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী বিকাশের সুযোগ থাকা, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের যোগ্যতানুযায়ী সমাজকে সেবা করার সুযোগ পাবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষার, তথা শিক্ষালয়ের, উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা। আর এই ধরনের বিকাশ সম্ভব হবে তখনই, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব ক্ষমতা, রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ পাবে। এই উদ্দেশ্যে বহুমুখী পাঠ্যক্রম ও শিক্ষালয়ের প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে **শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক নির্দেশনার** (Educational and vocational guidance) প্রয়োজন। শিক্ষালয়কে সেই দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষালয়ের এই দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমদপ্তর তাঁদের এক বুলেটিনে [The school's responsibility for counselling extend far beyond the classroom or campus In co-operation with community agencies it should assist young people in procuring and retaining employment —U. S. Dept. of Labour Bulletin—105]। ব্যক্তি যদি পরবর্তী জীবনে পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে না পারে, তবে শিক্ষালয়ের গুরুত্ব সমাজ-ব্যবস্থায় কমে যাবে। সেই কারণে তাকে এই ব্যক্তি-জীবনের নির্দেশনার দায়িত্ব (Guidance Function) নিতে হবে।

শিক্ষালয়ের বিভিন্ন দায়িত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হ'ল তার মধ্যে কোন্‌টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তা বলা খুবই মুশকিল বা তার চেষ্টা করাও ভুল। কারণ, এদের প্রত্যেকটাই পরস্পর নির্ভরশীল। প্রত্যেকের পেছনে একই উদ্দেশ্য কাজ করছে। তা হ'ল ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং সমাজ-নির্দিষ্ট পথে সমাজ-জীবনের ধারার শুধুমাত্র অনুশীলনে নয়, তার পরিবর্ধনের মাধ্যমেও বটে। আর সেই পথে ব্যক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, অন্যান্য বিশেষ দায়িত্বগুলো শিক্ষালয়কে পরোক্ষভাবে গ্রহণ করতে হবে। তাই আমরা বলতে

আলোচনা
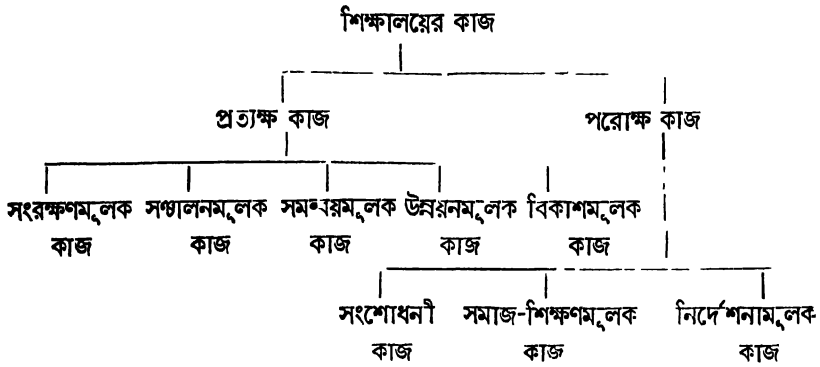
পারি—অর্বাচীন শিশুদের নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলা, সমাজের অতীত সংস্কৃতির সার্থক উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা, অভিজ্ঞতায় ও প্রচেষ্টার দ্বারা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারাকে পরিবর্ধন করার ক্ষমতা সংযোজন করা, এ সব হ'ল শিক্ষালয়ের দায়িত্ব। দেহ মনে, চিন্তায়, রুচিতে, নৈতিক ও আত্মিক মানে নিজের ক্ষমতানুযায়ী বিকাশে সহায়তা করাই হ'ল শিক্ষালয়ের কাজ। বা, আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের মত সহজে বলা যায়, ব্যক্তির বিকাশের ধারাকে ব্যাহত না ক'রে তাকে সমাজমুখী করাই হ'ল শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য।

॥ শিক্ষালয় ও সমাজ ॥
(School and Society)

॥ শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক ।
(Relation between School and Society)

শিক্ষালয়ের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা লক্ষ্য করেছি, সমাজের বিশেষ এক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য এ প্রতিষ্ঠানের (Institution) সৃষ্টি হয়েছে। তাই শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিবিড় হওয়াই স্বাভাবিক। সমাজের অতীত সংস্কার সংরক্ষণের জন্যই শিক্ষালয়ের সৃষ্টি; এর মাধ্যমেই ভাবীকালের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ হয়। তবে শুধু এইটুকু বললেই সমাজ ও

প্রস্তাবনা

শিক্ষালয়ের সম্পর্ক পরিষ্কার ক'রে বলা হয় না। তাদের সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক। সমাজ যে শুধু শিক্ষালয়ের ওপর নির্ভর করে তা নয়, শিক্ষালয়ও তার কার্যসূচী স্থির করার জন্য সমাজের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকে। তাদের এই পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি হয়। আমরা এ সম্পর্কে এখন আলোচনা করব।

শিক্ষালয়ের ওপর সমাজের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি করতে গেলে বলতে হয়—

শিক্ষালয়ের ওপর সমাজের নির্ভরতা

[এক] সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশ নির্ভর করে অতীত সংস্কারের ধারণ ও সঞ্চালনের উপর। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যদি আমরা সমাজের প্রচলিত রীতিতে শিক্ষিত করতে না পারি, তা হ'লে সমাজ-জীবনের যে ধারাবাহিকতা, তা বন্ধ হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবে। তাই সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হ'লে প্রত্যেক শিশুকে সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। শিক্ষালয়ের উপর সেই দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। এই দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে সমাজ শিক্ষালয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং শিক্ষালয়ও অতীত সমাজ সংস্কারের সংরক্ষণ ও সঞ্চালনের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব পালন করে।

সংস্কারের সংরক্ষণ ও সঞ্চালন

[দুই] আবার সমাজ-দেহেরও জৈবিক দেহের মত অভিব্যক্তি হয়। সমাজ স্থিতিশীল নয়। জীব-জগতে অভিব্যক্তির ধারায় অনেক প্রাণী চলে গেছে, আবার অনেক প্রাণীর সৃষ্টি হ'য়েছে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে। সমাজ-জীবনের মূলেও একই নিয়ম কাজ করছে। সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কত সমাজ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আবার কত নতুন সমাজের আবির্ভাব হয়েছে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করার নতুন কৌশল আয়ত্তের মাধ্যমে সমাজ যদি ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যেতে না পারে, তবে সে সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাবে। তাই সমাজকে বজায় রাখার জন্য যে শুধুমাত্র সংস্কারের সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন প্রয়োজন তা নয়, নতুন কৃষ্টি-রচনাও করার দরকার। শিক্ষালয় একমাত্র স্থান যেখানে কর্মসূচীর মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা শিশুরা নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারবে এবং জীবন-ধারণের নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে। তাই সমাজ-জীবনের অগ্রগতির জন্য সমাজকে বিদ্যালয়ের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয়।

সমাজের অগ্রগতি

[তিন] শিক্ষালয় অন্ধ-যান্ত্রিক কোন সংস্থা নয় যে, সমাজের যে সব আচার-আচরণ আছে, তা সবই শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত করবে, বিচার-বিবেচনা না ক'রে। আদর্শ সংস্থা হিসেবে তার দায়িত্ব হবে সমাজের যা ভাল, তারই শুধুমাত্র অনুশীলন করা। সমাজের মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যা খুবই ত্রুটিপূর্ণ। শিশুরা শিক্ষালয়ে সমাজের ভাল-মন্দ সব কিছুর সঙ্গে পরিচিত হ'লেও শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য হবে তারা যাতে মন্দগুলোকে ত্যাগ ক'রে ভাল

সমাজের সংস্কার

বৈশিষ্ট্যগুলোকে গ্রহণ করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তার দ্বারা সমাজের শোধন সম্ভব হবে। যুগে যুগে পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনেরও শোধন প্রয়োজন। সমাজ-বিকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে যদি তাকে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়, তা হ'লে অনাচার দেখা দেবে। শিক্ষালয়ের দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হ'য়ে থাকে। সুতরাং, এদিক্ থেকে সমাজ শিক্ষালয়ের ওপর নির্ভরশীল।

[**চার**] সমাজ-জীবনের গতি ও মান নির্ণয়ে শিক্ষালয়ের দান বর্তমানে কম নয়। সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হ'লেও শিক্ষালয়ের সুষ্ঠু সংগঠন প্রয়োজন। সমাজ-জীবনে অনেক সময় অনেক সমস্যার উদ্ভব হয় যা সমাধানের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। সমাজ-জীবন যখন সমস্যা-জর্জরিত হ'য়ে পড়ে, তখন শিক্ষালয়ই তাকে মুক্তির প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে পারে। আবার সমাজের নৈতিক মান এবং মৌলিক অন্যান্য নীতি-নির্ণয়ে শিক্ষালয়কে দায়িত্ব নিতে হবে। তাকে মানব-কল্যাণমূলক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে একমাত্র শিক্ষালয়। শিক্ষালয় শুধু সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি হবে না, সমাজ-জীবনের পরীক্ষাগার হবে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ ক'রে তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষালয় উন্নততর সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

সামাজিক সমস্যার সমাধান

অন্য দিকে আমরা যদি শিক্ষালয়ের সমাজ-নির্ভরতার কথা বিবেচনা করি, তাহ'লে একই কথা বলতে হয়; শিক্ষালয় যেহেতু সমাজের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হ'য়েছিল, সেহেতু তার সমাজের ওপর নির্ভরতা থাকা স্বাভাবিক। সমাজ-জীবনের সংরক্ষণের জন্য তাকে যে সব কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে, তা অবশ্যই সমাজের ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষালয়ের দায়িত্ব সমাজ সংরক্ষণ করা। সুতরাং শিক্ষালয়ে এমন আচরণের অনুশীলন হবে, যা সমাজ-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাই শিক্ষালয়কে তার কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হ'লে সমাজের মুখাপেক্ষী হতে হবে। সমাজের সংগঠন, রীতিনীতি সবকিছু বিচার ক'রে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করতে হবে, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করার জন্য ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের চাহিদার কথা বিবেচনা করতে হবে। তাই শিক্ষালয়ের যে-কোন কার্যসূচী সমাজ-ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শিক্ষালয়ের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ কে জি সৈদিয়ান (K. G. Saiyidian) বলেছেন—'**A peoples' school must obviously be based on the peoples' needs and problems. Its curriculum should be an epitome of their life·· It should reflect all that is significant and characteristic in the life of the community, in its natural setting.**"

শিক্ষালয়ের সমাজ-নির্ভরতা

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। উভয়ে উভয়ের ওপর নির্ভরশীল। সমাজ ছাড়া শিক্ষালয়ের যেমন অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না, তেমনি

শিক্ষালয় ছাড়া সমাজ-জীবনের অগ্রগতির কথা ভাবা যায় না। তাদের এই সম্পর্কের কথা বিবেচনা ক'রে শিক্ষালয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। এই সম্পর্ককে দৃঢ়তর করার জন্য কতকগুলো বিশেষ ধরনের কার্যসূচীর কথা উল্লেখ করা যায়।

মন্তব্য

সমাজ ও শিক্ষালয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন পন্থা (Means to cultivate relation between School and Society):

[এক] পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, সমাজ-জীবনের প্রচলিত রীতিনীতির দ্বারা শিক্ষালয়ের কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। সুতরাং শিক্ষালয়ের কাজ হবে স্থানীয় সমাজের আচার-আচরণ, রীতিনীতির অনুশীলন ক'রে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা; সমাজের প্রয়োজনীয়তা কি, তাও বিচার করে দেখতে হবে। শুধু মাত্র পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়। কেবলমাত্র নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুশীলন করলেই শিক্ষালয়ের দায়িত্ব পালন করা হবে না। প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষার কোন মূল্য নেই। তাই শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করতে হ'লে শিক্ষার্থীর এমন সব অভিজ্ঞতা দিতে হবে যা তাদের সমাজ-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, যা তাদের সামাজিক জীবনের যে বিভিন্ন চাহিদা, তা মেটাতে সক্ষম হয়। এ সম্পর্কে মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে—"...it (শিক্ষালয়) will give full room for the expression of pupils' social impulses. It will train them, through practical experience in co-operation, in subordinating personal interests to group purposes in working in a disciplined manner and in fitting means to ends"

পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন

[**দুই**] শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক স্থাপন করতে হ'লে শিক্ষালয়কে বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষালয়ের সক্রিয়তার মাধ্যমেই সমাজকে সক্রিয় ক'রে তোলা যায়। শিক্ষালয়কে দুদিক্ থেকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে এই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য। **প্রথমতঃ**, সমাজের মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু আছে। প্রাচীনকালের নিদর্শন-স্বরূপ যে সব মন্দির ও গৃহাদি আছে বা আধুনিক কালে যে সব সমাজিক ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তা শিশুদের জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। শিক্ষালয় থেকে ছাত্রদের মাঝে মাঝে ঐ সব জায়গায় নিয়ে গিয়ে সমাজের অতীত এবং বর্তমান কৃষ্টির ধারার সঙ্গে পরিচিত করা যায়। এতে ক'রে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমাজ-জীবনের গভীর সংযোগ স্থাপিত হয়। শিক্ষালয় যদি এই ধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করে, তাহ'লে তার দ্বারা শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের আদর্শ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। **দ্বিতীয়তঃ**, সমাজের সঙ্গে শিক্ষালয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে হ'লে শিক্ষালয় থেকে সমাজের বিভিন্ন সংস্থাকে আমন্ত্রণ ক'রে বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন

শিক্ষালয়ের সক্রিয়তার মাধ্যমে সম্পর্ক-স্থাপন

করতে হবে। অভিভাবক ও অন্যান্যদের শিক্ষালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করলে এবং তাদের অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ দিলে এই সম্পর্ক অনেক সহজ হয়। শিক্ষালয়কে সব সময় মনে করতে হবে, সমাজের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া কোন কর্মসূচীরই সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। আর এই দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

[তিন] সমাজ চির-পরিবর্তনশীল সত্তা। আজকে সমাজ-জীবনে যা একান্ত প্রয়োজন, আগামী কাল তার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। সমাজ-জীবনের সকল রকম ব্যবস্থারই পরিবর্তন হয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদারও পবিবর্তন হয়। শিক্ষালয়কে এই পরিবর্তনশীল সংস্থার সঙ্গে সার্থক সম্পর্ক স্হাপনের জন্য, তার পাঠ্যক্রম ও কর্মধারার মধ্যে পরিবর্তনশীলতার ধর্ম সংযোজন করতে হবে। অর্থাৎ, পরিবর্তনশীল

পরিবর্তন-ধর্মিতার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন

সমাজের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস করতে হবে। স্হির-নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের দ্বারা সমাজের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তাই শিক্ষালয়ের কাজ হবে কিছুদিন অন্তর অন্তর চাহিদার বিশ্লেষণ করা ও সেই অনুযায়ী কর্মসূচী নির্ধারণ করা।

[চার] সবশেষে এ কথা মনে রাখতে হবে, শিক্ষালয় শুধু মাত্র সমাজ-নির্ধারিত পথে অগ্রসর হ'লে চলবে না তার কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজের উন্নতিসাধনও করতে হবে।

ব্যক্তিজীবনের উন্নতির মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন

এই উন্নতিসাধন করতে হলে শিক্ষালয় যেমন একদিকে সমাজের রীতিনীতির বিশ্লেষণ করে দেখবে, তেমনি শিক্ষালয়ের জীবনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে সব নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, তা যাতে সমাজ-দেহে সঞ্চারিত হয়, তার চেষ্টাও করতে হবে। সমাজে যে সব খারাপ আচরণ আছে, সেগুলোকে ত্যাগ করতে শেখাতে হবে, ভালগুলোকে গ্রহণ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলে সমাজ-জীবনের মান উন্নত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনও নির্দিষ্ট আদর্শ পথে এগিয়ে যাবে।

॥ আলোচনা ॥

শিক্ষালয় সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি
(School is a Society)

শিক্ষালয়ের অভিব্যক্তির কথা স্মরণ করলে আমরা দেখতে পাই, শিক্ষালয় সমাজের প্রয়োজনেই সৃষ্ট হ'য়েছে। ইংরেজী School কথার ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, শিক্ষালয় সমাজের বিশেষ এক ধরনের প্রায়াজন মেটানোর জন্য গড়ে উঠেছিল।

প্রস্তাবনা

কিন্তু পরবর্তী কালে আমরা লক্ষ্য করি, সমাজ এবং শিক্ষালয়ের মধ্যে আর সে স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই। ক্রমে শিক্ষালয়কে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলা হ'য়েছে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে সেই প্রচেষ্টাই চলে এসেছিল। সমাজ এবং শিক্ষালয়ের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে সমাজ এবং শিক্ষালয় উভয়ের

বিকাশকে যেন চেপে রাখা হ'য়েছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, শিক্ষালয় হবে সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। কিছু কিছু শিক্ষাবিদ্ তাকে সমাজ হিসেবে বিচার করতে চান অর্থাৎ তাকে সমাজের সমপর্যায়ে ফেলেন। যেমন, জন ডিউই (Jon Dewey -এঁর মতে শিক্ষালয় হ'ল এক ধরনের আদর্শ সমাজ ; মার্জিত, সুন্দর ও সুষম সমাজ। তিনি বলেছেন —"School is a simplified, purified and better balanced society." ফ্রয়বেল (Froebel) শিক্ষালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন (niniature society)। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষালয়ের জীবন এবং সমাজ-জীবনের মধ্যে পার্থক্যের কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন—"মানুষের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে পাঠশালায় যায়। সে কান্নায় এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা নিরন্তর প্রতিবাদ রয়েছে।" এমনিভাবে আধুনিক কালে প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্ শিক্ষালয়-সমাজ জীবনের বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং শিক্ষালয়কে সমাজেরই অংশ বা ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে সংগঠিত করার পক্ষে মত দিয়েছেন। আবার অন্যদিকে, অনেক চিন্তাবিদ্ এই মতবাদের প্রতিবাদও করেছেন। সুতরাং বিচার ক'রে দেখার দরকার কেন আমরা শিক্ষালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচনা করব। কেন আমরা শিক্ষালয়কে সমাজের সমতুল্য বলব। সমাজ ও শিক্ষালয়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে আমরা তাদের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাব।

[এক] **প্রথমতঃ,** বিচার ক'রে দেখা যাক্, সমাজ ও শিক্ষালয়ের সাংগঠনিক কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি না। আমরা দলবদ্ধ মানব-গোষ্ঠীকে বলি সমাজ, সাধারণ অর্থে। কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তির সমষ্টিকে সমাজ বলতে পারি না। এছাড়া, তার আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। সমাজবিদ্‌রা অনেক রকম দলের (group) কথা বলেছেন, তাদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবেচনা ক'রে। সমাজের মধ্যে মানুষ শুধু দলবদ্ধভাবে বাস করে না, তাদের একটা নির্দিষ্ট জীবন-মান বা লক্ষ্য আছে—যে লক্ষ্যের পথে তারা এগিয়ে যায়। এছাড়া, তাদের মধ্যে এক ধরনের পারস্পরিক সক্রিয় মানসিক প্রতিক্রিয়া কাজ করে। এই পারস্পরিক মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাদের সমাজের মধ্যে বন্ধনের সৃষ্টি করে। [A society is a group of individuals living together with conscious mental interaction and pursuing a universal goal.] তাহ'লে প্রত্যেক সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে (১) দলবদ্ধ মানুষ, (২) একটি সাধারণ উদ্দেশ্য এবং (৩) ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মানসিক প্রতিক্রিয়া। এখন শিক্ষালয়ের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সবই বর্তমান। শিক্ষালয়ে একদল শিক্ষার্থী দলবদ্ধভাবে বাস করে। তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্যই এক—জ্ঞানার্জন করা বা ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী প্রশিক্ষণ লাভ করা। সুতরাং সমাজের প্রথম দুটো বৈশিষ্ট্য শিক্ষালয়ের মধ্যে বর্তমান। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ পারস্পরিক

সাংগঠনিক সাদৃশ্য

প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমাজবিদ্‌রা (Sociologist) বলেছেন—শিক্ষালয়েও বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষালয়ে যে বিভিন্ন ধরনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তা সাধারণতঃ চার-শ্রেণীর—(১) ছাত্রে-ছাত্রে সম্পর্ক (Pupil-pupil relation), (২) ছাত্র-দল সম্পর্ক (Pupil-group relation), (৩) দল-ছাত্র সম্পর্ক (Group-pupil relation) এবং (৪) সম্পূর্ণ দলীয় সম্পর্ক (Total group relation)। সমাজ-জীবনের মুখ্য বৈশিষ্ট্য যেমন পারস্পরিক মানসিক প্রতিক্রিয়া, তেমনি শিক্ষালয়-জীবনেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কস্থাপন। এই মানসিক সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমেই শিক্ষালয়ের অগ্রগতি সম্ভব হয় এবং পরোক্ষভাবে তা সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই সমাজবিদ্‌রা এই বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশুরা অন্যের সঙ্গে মিশতে শেখে, সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হয়, অন্যের অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন হয়। দেখা যাচ্ছে, স্বাভাবিক সমাজের যে সব বৈশিষ্ট্য আছে, শিক্ষালয়ের মধ্যেও সেগুলো বর্তমান। সুতরাং বৈশিষ্ট্যের দিক্ থেকে সমাজ ও শিক্ষালয় সমগুণসম্পন্ন।

[দুই] **দ্বিতীয়তঃ**, আমরা শিক্ষালয়ের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছি, সমাজ-জীবনের প্রথম স্তরে শিক্ষালয়ের কোন অস্তিত্বই ছিল না। সমাজ-জীবনের মধ্যে এমন এক শক্তি কাজ করত যা ছোটদের বাধ্য করত জীবনধারণের কৌশল আয়ত্ত করতে, শুধুমাত্র অনুকরণের মাধ্যমে। পরবর্তী যুগে এল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, কিন্তু তাও কোন শিক্ষালয়ের মাধ্যমে নয়। তারও পরে এল শিক্ষালয়। শিক্ষালয়ের এই ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষালয়েরও অভিব্যক্তি হয়েছে। শিক্ষালয় সমাজের অঙ্গ হিসেবেই গড়ে উঠেছে, তার থেকে পৃথক কিছু সত্তা নয়। শিক্ষালয় ও সমাজকে যদি আমরা জৈবিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করি, তা'হলে বলতে হয় শিক্ষালয় হ'ল সমাজের একটা অঙ্গ মাত্র। তাদের দেহের শিরায় একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, একই হৃৎপিণ্ড তাদের জীবনীশক্তি যোগাচ্ছে। অধ্যাপক কে. কে. মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"It is an organic growth of society no less than a particular limb in the organic growth of an animal body."। সুতরাং, সংগঠনের দিক্ থেকে শিক্ষালয় এবং সমাজের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। এই কারণে শিক্ষালয়কে আমরা সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলতে পারি।

ব্যুৎপত্তিগত সাদৃশ্য

[তিন] **তৃতীয়তঃ**, সমাজবিদ্‌দের মতে সমাজ-সৃষ্টির পেছনে দু'ধরনের মানসিক চাহিদা কাজ করছে। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। প্রথমটা হ'ল অতীত সংস্কার সংরক্ষণের (preservation of cultural heritage) চাহিদা এবং দ্বিতীয়টা হ'ল অতীত সংস্কারের সার্থক সঞ্চালনের (Transmission of cultural heritage) চাহিদা। এই দুই চাহিদা মানুষের সমাজ গড়তে যেমন সাহায্য করছে এবং বিভিন্ন সময়ে সমাজ-অগ্রগতিকে

প্রেরণা ও উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য

নিয়ন্ত্রণ করেছে, তেমনি শিক্ষালয় সৃষ্টির পেছনেও তারা কাজ করেছে। মানুষের বিভিন্ন ধরনের সংস্কারগত প্রবণতা (instinctive urge) যা সমাজ-সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে, তা শিক্ষালয়-সৃষ্টির পেছনেও একইভাবে কাজ করেছে। তাই একই শক্তির দ্বারা নির্ণীত বা একই ধরনের চাহিদার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সংস্থা, সমাজ এবং শিক্ষালয় এক-ধর্মীয় হওয়া স্বাভাবিক।

[**চার**] **চতুর্থতঃ,** আমরা জানি যে, কোন সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হ'ল গোষ্ঠী তার মনোভাব সব সময় ব্যক্তির ওপর আরোপ করে। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে এক পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্ক বর্তমান। ব্যক্তি গোষ্ঠীর প্রতি প্রতিক্রিয়া করে এবং গোষ্ঠী ও ব্যক্তির উপর সচেতন প্রতিক্রিয়া করে। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলো বিশেষ ধরনের আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এদের বলা হয়, সামাজিক আনুগত্যমূলক আচরণ (Social inclination, বা সামাজিক সংস্কার (Social instincts)। যেমন—যূথচারিতা (Gragariousness), মাতৃসুলভ আচরণ (Motherly behaviour), আত্মপ্রকাশ (Display), প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব (Rivalry), অনুকরণ (Imitation), যৌন আচরণ (Sex behaviour) ইত্যাদি। এটাই হল, যে কোন সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। শিক্ষালয়ে ছাত্রদের আচরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, তাদের মধ্যেও এই ধরনের আচরণধারার উদ্ভব হয়। শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে থাকতে ভালবাসে। বিশেষ করে বড় বড় দলের মধ্যে তারা আবার ছোট ছোট দল গড়ে তোলে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সহানুভূতিমূলক আচরণও দেখা যায়। তারা নিজেদের জিনিস অন্যকে দেখাতে ভালবাসে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবও তীব্র থাকে। অনুকরণ-স্পৃহা ও যৌন-আচরণও তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কোন সামাজিক গোষ্ঠীর মত শিক্ষালয়েরও ক্ষমতা আছে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক আনুগত্যমূলক প্রবণতা সৃষ্টি করার। এই দিক্ বিচার করলে বলা যেতে পারে, তাদের মধ্যে কোন অমিল নেই।

ক্রিয়াগত সাদৃশ্য

সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ এ কারণেই শিক্ষালয়কে সমাজের সমগুণসম্পন্ন ব'লে বিবেচনা করেছেন এবং তাকে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার—শিক্ষালয়কে সমাজ হিসেবে বিবেচনা করলেও তাঁরা একেবারে সমাজের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি মনে করেন না। ডিউই (Dewee) বলেছেন—"School is a simplified, purified and better balanced society." তিনি শিক্ষালয়কে সমাজ বললেও সরল (simplified), সুমার্জিত (purified) এবং সুষম (better balanced,—এই তিনটি বিশেষণ তার বিবরণে ব্যবহার করেছেন এবং এর ফলে, শিক্ষালয়-সমাজের সঙ্গে স্বাভাবিক

মন্তব্য

সমাজের অনেক পার্থক্য হয়ে যায়। অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, শিক্ষালয়ে আমরা সমাজের যেটুকু ভাল, সেটুকু পরিবেশন করব। খারাপটুকু সযত্নে বাদ দেব। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষালয় এক দিক্ থেকে যেমন স্বাভাবিক, তেমনি কৃত্রিমও বটে। তার কারণ, আমরা সমাজের ভালটুকু নির্বাচন ক'রেই শিক্ষালয়ে নিয়ে আসি। সুতরাং যেহেতু আমরা নির্বাচন করছি, সেহেতু তার মধ্যে কোন স্বাভাবিকতা নেই। নান্ (Nunn এই দুই মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষালয়ের সমাজকে একই সঙ্গে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম দুই বলতে পারি। শিক্ষালয়ের
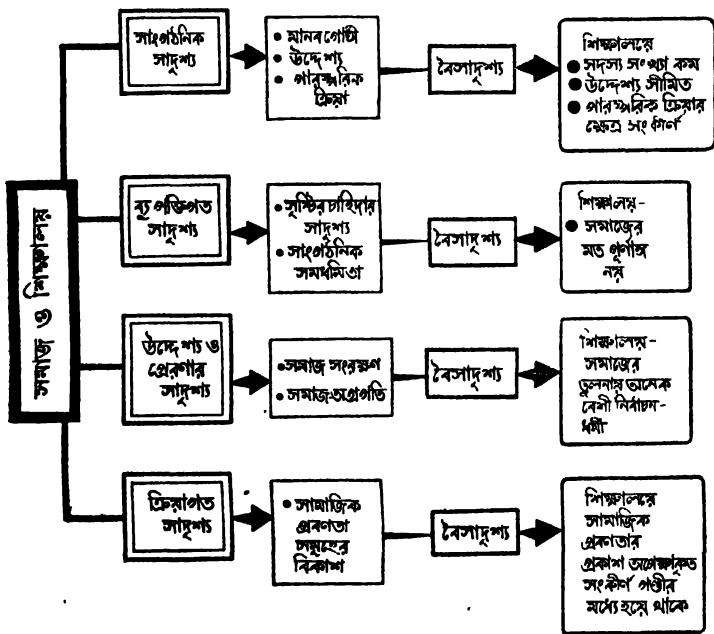
জীবন স্বাভাবিক হবে, কারণ শিক্ষালয় এবং বহির্জীবনের সঙ্গে কোন ব্যবধান থাকবে না। কিন্তু, অন্য দিক্ থেকে শিক্ষালয় কৃত্রিম সমাজ হবে, তার কারণ শিক্ষালয়ে অনুশীলনের জন্য আমরা শুধু সমাজের ভাল জিনিসগুলো আনব। নান্ Nunn) বলেছেন—"It must be a natural society in the sense that there should be no violent break between the condition of life within and without it...On the other hand a school must be an artificial society in the sense that while it should reflect the outer world truely it should reflect only what is best and most vital there."

তবে যাঁরা নির্বাচনের কথা বিবেচনা ক'রে শিক্ষালয়কে কৃত্রিম ভাবেন তাঁদের বিপক্ষে বক্তব্য হ'ল শিক্ষালয়ে নির্বাচন হ'লেও তা একেবারে সার্থক এবং সম্পূর্ণ, এ কথা বলতে পারি না। আর তাছাড়া, তা হওয়া উচিত নয়। শিক্ষালয়ে আমরা যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন করি, তা শুধু যে ভাল হবে, এমন কোন কথা নেই। শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য হবে মন্দের পরিপ্রেক্ষিতে ভালকে উপলব্ধি করতে শেখানো। তা নাহ'লে শিক্ষা সার্থক হবে না। তাছাড়া, যে কোন ভাল সামাজিক বৈশিষ্ট্য আমরা অনুশীলনের জন্য নির্বাচন করি-না-কেন, তার সঙ্গে কিছু মন্দ এবং গৌণ বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত থাকবেই। যেমন, চারাগাছ রোপণ করার জন্য আমরা কিছুটা মাটি সঙ্গে নিয়ে যাই, তেমনি সমাজের কোন বৈশিষ্ট্যকে অনুশীলন করার জন্য যখন আমরা নির্বাচন করি, তখন তার সঙ্গেও কিছু কিছু গৌণ বৈশিষ্ট্য চলে যাওয়া স্বাভাবিক এবং এগুলো ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করে না, যদি শিক্ষালয় তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করে। তাই নির্বাচন হ'লে সে নির্বাচন একেবারে চরম (absolute, নয়। সুতরাং শিক্ষালয়কে আমরা স্বাভাবিক সমাজ হিসেবেই বিবেচনা করতে পারি। কারণ, অনুকরণ করলেও আমরা একটা স্বাভাবিক জিনিসকেই অনুকরণ করছি।

।। শিক্ষালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণে রূপান্তরের উপায় ।।
(Means of changing School into miniature Society)

শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা আমরা আলোচনা করলাম, তা কখনই স্বাভাবিক নিয়মে স্থাপিত হ'তে পারে না। এর জন্য দরকার সক্রিয় প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষালয়ের ওপর এসে পড়ে। শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিরূপ হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে শিক্ষা সার্থক হবে না, তাই শিক্ষালয়কে এদিক্ দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষালয়ের কার্যসূচী এমনভাবে নিতে হবে যাতে ক'রে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, সমাজ-জীবন এবং শিক্ষালয়-জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শিক্ষালয়-জীবন থেকে কর্মজীবন বা সমাজ-জীবনে প্রবেশের পথ যাতে স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়, সেদিকে শিক্ষালয়কে নজর দিতে হবে। এইজন্য শিক্ষালয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। এইসব কার্যসূচী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

প্রস্তাবনা

[এক] শিক্ষালয়কে সমাজ-জীবনের প্রতিরূপ করার প্রধান উপকরণ হ'ল **যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করা।** সমাজ-জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল সেখানে মানুষ দলবদ্ধভাবে কাজ করে বিশেষ এক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। শিক্ষালয়ে এই আদর্শ গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে, শিক্ষালয়ে বিভিন্ন ধরনের সহ-পাঠ্যক্রমিক (Co-Curricular) কাজের মাধ্যমে ছাত্রদের দলবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ,

যৌথ কর্মসূচী-গ্রহণ

সহানুভূতি ইত্যাদির মত কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিকাশ করা যায়। খেলাধুলা, অভিনয় ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও এই ভাব তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায়।

[দুই] সামাজিক মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, সে অন্যান্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল। সমাজের মানুষের মধ্যে যদি এই সহমর্মিতার বোধ জাগ্রত করা না যায়, তাহ'লে সমাজ-জীবন ভেঙ্গে পড়বে। তাই শিক্ষালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ ক'রে গড়ে তুলতে হ'লে এই সহানুভূতির ভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। সহানুভূতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসবে একাত্মবোধ, যা সমাজ-জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে একদল হিসেবে কাজ করে, যাতে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী নিতে হবে। যেমন, শিক্ষালয়ে ব্যাজ ব্যবহার, শিক্ষালয়ের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ পোশাক ব্যবহার, সমবেত সংগীতের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সহানুভূতির ভাব জাগ্রত করা

[তিন] শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজ-চেতনা জাগাতে না পারলে শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এই সমাজ-চেতনা আসবে যদি সমাজ-ব্যবস্থা এবং শিক্ষালয়ের জীবনের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পার্থক্য দেখার সুযোগ শিক্ষার্থীদের না থাকে। তাই শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিরূপ করতে হ'লে তার পরিচালনা সমাজের মতই হওয়ার দরকার। জন ডিউই প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, শিক্ষালয়ের পরিচালনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীরা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মত শিক্ষালয়েও ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরিষদ তৈরি করতে হবে। এতে ক'রে ছাত্ররা সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবে এবং সমাজ ও শিক্ষালয়ের মধ্যে ব্যবধান কমে আসবে।

পরিচালন-ব্যবস্থার পরিবর্তন

[চার] সবশেষে, শিক্ষালয়ের আদর্শ সমাজ-জীবন প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয়ের জীবনের মাধ্যমেই জীবনের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো আয়ত্ত করবে। সুতরাং, শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষালয়ের মধ্যে আদর্শ জীবন গড়ে তোলা। যে সব সামাজিক গুণ—সহানুভূতি, যৌথ প্রচেষ্টার মনোভাব আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনতে চাই, তা শিক্ষকদের শিক্ষালয়ের জীবনের মাধ্যমে পরিস্ফুট হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক বা গুরুর ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক না হয়, তাহ'লে শিক্ষাদানের কাজ সম্পন্ন হবে না। তিনি বলেছেন—"শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে এই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নেই, সেখানে আদান-প্রদান সম্পর্ক কলুসিত হয়ে ওঠে।" তাই

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিরূপ ক'রে শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্থক করতে হ'লে শিক্ষককে ছাত্রদের সঙ্গে শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপন ক'রে প্রাচীন সেই মন্ত্রে আহ্বান ক'রে বলতে হবে—"সহবীর্যং করবাবহৈ"।

শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিরূপ হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে সেখানে সকল রকম সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করতে হবে ; সকল রকম সামাজিক কাজের অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ শিক্ষালয়ে গ্রহণ করতে হবে। যৌথভাবে সমস্যা-সমাধানের সুযোগ ক'রে দিতে হবে। তাছাড়া, জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষালয় পরিচালনা করলে তা ব্যক্তির কল্যাণ যেমন আনবে, অন্যদিকে ব্যক্তিকে সহজভাবে সমাজ-জীবনের সঙ্গে অভিযোজন করতে সহায়তা করবে।

মন্তব্য

॥ আলোচনা ॥

॥ শিক্ষালয়, ব্যক্তি ও সমাজ ॥
(School, Individual and Society)

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তি-জীবনের বিকাশসাধন করা। শিক্ষালয়ের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি তার বিশেষ দায়িত্ব হ'ল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়তা করা। মানবশিশু জন্মমুহূর্তে মাত্র কতকগুলো প্রবণতা নিয়ে জন্মায় ; আর থাকে তার কতকগুলো পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা। কিন্তু এই সামান্য কয়টি হাতিয়ার দিয়ে জীবন-যুদ্ধে টিকে থাকা মুশকিল, তাই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করার জন্য দরকার আরও অনেক নতুন নতুন কৌশল। শিক্ষালয় ব্যক্তিকে এইসব কৌশল আয়ত্ত করতে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষালয়ের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানো ও তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা।

শিক্ষালয় ও ব্যক্তি

আবার অন্য দিক্ থেকে বিচার করলে দেখি, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বলছেন, শিক্ষালয় হবে সমাজেরই প্রতিচ্ছবি এবং শিক্ষালয়ের মাধ্যমে ব্যক্তির সমাজীকরণ হবে। শিক্ষালয়ে সে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করবে এবং সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবে।

সমাজ ও শিক্ষালয়

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন এবং সমাজের প্রয়োজনের দিক্ থেকে শিক্ষালয়ের দায়িত্ব হ'ল ব্যক্তির সমাজীকরণ। কিছু কিছু শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, এই দু'ধরনের ক্রিয়া পরস্পরবিরোধী এবং শিক্ষালয়ের দ্বারা তা সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাঁরা মনে করেন, সমাজ হ'ল মানব-গোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠীভুক্ত হ'তে হ'লে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সমতা রেখে আচরণ সম্পাদন করতে হবে এবং এতে ক'রে ব্যক্তির নিজস্বতার বিকাশ ব্যাহত হয়।

ব্যক্তি, সমাজ ও শিক্ষালয়ের সম্পর্কে পরস্পর বিরোধ

কিন্তু আধুনিককালের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ নান্ (Nunn) এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দৃঢ় ভাষায় বলেছেন—**"The idea that a main function of the school is to socialize its pupils is no wise, contradicts the view that its true aim is to cultivate the individuality."**

মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, তার যে কোন সামাজিক আচরণ নিজের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত এবং এই অর্থে স্বার্থপর। আবার, তাঁর সকল রকম আত্মসুখমূলক আচরণ সামাজিক পরিবেশ ছাড়া ঘটে না। নান্ (Nunn) বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আচরণের মধ্যেও আত্মতৃপ্তির চাহিদা থাকে। তিনি বলেছেন, মা তাঁর ছেলেকে স্নেহ করেন তার ভবিষ্যৎ জীবনের চাহিদার কথা বিবেচনা ক'রে। তাই ব্যক্তির নিজস্বতা বা অহং সত্তাকে তার সামাজিক আচরণ থেকে পৃথক করা যায় না। তাছাড়া, মানুষের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মসুখের যে চাহিদা আছে, তাকে প্রত্যক্ষভাবে জৈবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পরিতৃপ্ত করতে দেওয়া সামাজিক মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। ফ্রয়েড্‌পন্থীরা মনে করেন, তার সকল রকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাহিদারই উদ্‌গমন (Sublimation) প্রয়োজন। সুতরাং এই উদ্‌গমন যাতে সমাজনির্দিষ্ট পথে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সুতরাং, সবকিছু বিচাব করে বলা যায় ব্যক্তি, শিক্ষালয় এবং সমাজ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষালয়ের ব্যক্তির প্রতি যেমন একটা দায়িত্ব আছে, সমাজের অন্তর্গত সংস্থা হিসেবে সমাজের প্রতিও তার একটা দায়িত্ব আছে। আর সেই ধরনের দায়িত্ব পরস্পরবিরোধী নয়। সমাজের প্রতি শিক্ষালয়ের দায়িত্বপালন সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। ঐ সব কার্যাবলী গ্রহণ করলে ব্যক্তিত্বেরও পরিপূর্ণ বিকাশ করা সম্ভব, তবে শিক্ষালয় যেন এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থেকে কাজ করে। কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুই আপাতঃ পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার সার্থক সমন্বয়সাধন করা সর্বক্ষেত্রে তারই দায়িত্ব।

মন্তব্য

॥ শিক্ষালয়ের শ্রেণীবিভাগ ॥
(Classification of School)

সমাজের কতকগুলো প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং ব্যক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষালয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান অনেক জটিল হয়ে গেছে, সমাজের চাহিদাও অনেক বেড়ে গেছে। ব্যক্তিকে এখন জীবন-পরিবেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে অভিযোজন করে চলতে হয়। তাছাড়া, যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, সমাজ-পরিচালনার বিভিন্ন দিকে বিশেষজ্ঞ (specialized) ব্যক্তির প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ফলে, একই ধরনের শিক্ষালয় বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সকল রকম চাহিদাকে মেটাতে পারে না। তাই আধুনিক কালে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয়ের উৎপত্তি হয়েছে—ব্যক্তি ও

সমাজ উভয়ের চাহিদা মেটানোর জন্য। বর্তমানে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় দেখতে পাই, তাদের বিশেষ কোন মানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীবিভাগ করা মুশকিল। শিক্ষাবিদ্ ফিন্ড্লে (Findlay) শিক্ষালয়গুলোকে বিভিন্ন দিক্ থেকে শ্রেণীবিভাগের প্রস্তাব করেছেন আলোচনার সুবিধার জন্য। তিনি বিভিন্ন মানের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষালয়ের শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছেন। তিনি সাতটি মানের কথা বলেছেন, যাদের দ্বারা আমরা শিক্ষালয়ে শ্রেণীবিভাগ করতে পারি—(১) মালিকানা (Ownership), (২) দৈনিক অসামর্থ্য (Physical disabilities), (৩) বয়স ও যোগ্যতা (Age and attainment), (৪) পাঠ্যক্রম (Curriculum), (৫) দায়িত্বের সীমা (Range of responsibility), (৬) সামাজিক মর্যাদা (Social upbringing or status) এবং (৭) শিক্ষার্থীর লিঙ্গ (Sex of the pupil)। এই সাতটি মানের পরিপ্রেক্ষিতে ফিন্ড্লে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয়ের কথা বলেছেন। তবে এই শ্রেণীবিভাগ যে সব সময় সম্পূর্ণ, তা বলতে পারি না। আমাদের দেশে বর্তমানে যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় দেখতে পাই, তার যে-কোন একটিকে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে সঠিকভাবে ফেলা যায় না। একই শিক্ষালয় শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত হতে পারে। সুতরাং, এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ একেবারে চরম হয়। যাই হোক, এই শ্রেণীবিভাগের ওপর ভিত্তি ক'রে আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় সম্পর্কে আলোচনা করব।

শ্রেণীবিভাগের মান

[এক] **মালিকানার দিক্ থেকে শ্রেণীবিভাগ (Classification on the basis of Ownership) :** আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় আছে, তাদের মোটামুটি কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। মালিকানার দিক্ থেকে আমাদের দেশের শিক্ষালয়গুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের শিক্ষালয় আছে, যেগুলো সম্পূর্ণভাবে সরকারের দ্বারা পরিচালিত, শিক্ষালয়ের সব ব্যয় এবং সকল রকম পরিচালনার দায়িত্ব থাকে সরকারের। এইসব শিক্ষালয়কে বলা হয় **সরকারী শিক্ষালয়**। সরকারী শিক্ষালয়গুলির মধ্যেও আবার মালিকানার তফাৎ আছে। কতকগুলি শিক্ষালয় আছে যেগুলি প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করেন। এদের বলা হয় রাজ্য সরকারী শিক্ষালয় (State Government Institution)। আবার, কতকগুলি শিক্ষালয় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। এদের বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষালয় (Central Government Institution)। যেমন—কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (Central School), সৈনিক বিদ্যালয়গুলি (Sainik School) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। সব মিলে, এই জাতীয় শিক্ষালয়ের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম। এছাড়া, কিছু শিক্ষালয় আছে, যেগুলোকে আধা-সরকারী বলা যেতে পারে। এদের কিছুটা ব্যয়ভার সরকার বহন করেন এবং পরোক্ষভাবে এদের পরিচালনার কিছুটা দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ করেন। এই জাতীয় শিক্ষালয়ের সংখ্যা বর্তমানে

বিভিন্ন মালিকানার শিক্ষালয়

আমাদের দেশে বেশী, এদের বলা হয় **সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষালয়**। খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষালয় আছে যেগুলো ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কোন ব্যক্তি বা কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই ধরনের শিক্ষালয়ের ব্যয়ভার বহন করেন। এবং পরিচালনার দায়িত্ব নেন, এদের বলা হয় **ব্যক্তিগত মালিকানার শিক্ষালয়**। এছাড়া, অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও কিছু শিক্ষালয় আছে, যেগুলো কোন সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত। এরা বিশেষভাবে দান বা সাহায্যের ওপর নির্ভর ক'রে চলে ; এরা সরকার থেকে কোন সাহায্য নেয় না। এদের বলা হয় **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষালয়**।

[দুই] **দৈহিক অসামর্থ্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ (Classification on the basis of physical disabilities) :** এই জাতীয় শিক্ষালয় আমাদের দেশে আগে বিশেষ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয়ের উদ্ভব হয়েছে, দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য। দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সেবা করার জন্য এবং যাতে ক'রে তারা সমাজে পিছিয়ে না পড়ে, তার জন্য আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয়ের সৃষ্টি হ'য়েছে। যেমন, বর্তমানে আমাদের দেশে **মূক ও বধিরদের** (Deaf and Dumb School) জন্য পৃথক শিক্ষালয় আছে, **খঞ্জ শিশুদের** (Crippled children) শিক্ষালয় আছে। এছাড়া, বিশেষ বিশেষ ধরনের অসামর্থ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের শিক্ষালয় আছে। এই শিক্ষালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল সেবামূলক কাজ। কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব প্রতিষ্ঠান সরকারী প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে ; আবার অনেকগুলো বিশেষভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

মূক, বধির, খঞ্জ ইত্যাদিদের জন্য শিক্ষালয়

[তিন] **পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ (Classification on the basis of Curricula) :** পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষালয়ের শ্রেণীবিভাগ প্রত্যেক দেশেই আছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় বিশেষ বিশেষ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। সমাজে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত (specialized) ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় সৃষ্ট হ'য়েছে। আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় আছে, তাদের কয়েকটা সাধারণ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—**সাধারণ শিক্ষাদানের শিক্ষালয়** (Institution for general education)-এর ভেতর বিশেষভাবে বিদ্যালয় (School), কলেজ (College) এবং বিশ্ববিদ্যালয় (University) ইত্যাদি পড়ে। এরা বিশেষভাবে এক ধরনের বিমূর্ত জ্ঞান-সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। এছাড়া আছে, **কারিগরী শিক্ষণ-সংক্রান্ত শিক্ষালয়** (Technical institution)-এর ভেতর, বিভিন্ন ধরনের কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো পড়ে। যেমন—পলিটেকনিক (জুনিয়ার ও সিনিয়ার) এঞ্জিনিয়ারিং

বিভিন্ন পাঠ্যক্রম অনুসরণকারী শিক্ষালয়

॥ বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষালয় ॥

শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তি	শিক্ষালয়ের নাম	প্রকৃতি
(১) মালিকানা	সরকারী শিক্ষালয়	(ক) রাজ্য সরকার পরিচালিত (খ) কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত
	সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষালয় ব্যক্তিগত মালিকানার শিক্ষালয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত শিক্ষালয়	
(২) দৈহিক অসমার্থ্য	মূক ও বধিরদের জন্য শিক্ষালয় অন্ধদের জন্য শিক্ষালয় খঞ্জদের জন্য শিক্ষালয় ইত্যাদি।	বিশেষ বিশেষ শিক্ষণ-কৌশল ব্যবহার করা হয়
(৩) পাঠ্যক্রম	সাধারণ শিক্ষার জন্য শিক্ষালয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য শিক্ষালয় স্বাস্থ্য ও ভেষজ বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান	বিশেষ বিশেষ পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়
(৪) বয়স ও যোগ্যতা	প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষালয়	
	প্রাথমিক শিক্ষালয়	বয়স ভিত্তিতে
	মাধ্যমিক শিক্ষালয় ঃ (ক) নিম্ন-মাধ্যমিক (খ) উচ্চ মাধ্যমিক (গ উচ্চতর মাধ্যমিক	পাঠ্যক্রমের এবং প্রশিক্ষণের ক্রমবিন্যাস
	বিশ্ববিদ্যালয় ঃ (ক) মহাবিদ্যালয় (খ) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণ-বিভাগ (গ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ভুক্ত স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান	
(৫) দায়িত্ব	সম্পূর্ণ আবাসিক শিক্ষালয় আংশিক আবাসিক শিক্ষালয় দিবা শিক্ষালয়	বিকাশের ক্ষেত্রে তারতম্য

শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তি	শিক্ষালয়ের নাম	প্রকৃতি
(৬) মর্যাদা	পাবলিক স্কুল (সঙ্গতিসম্পন্নদের জন্য) সাধারণের জন্য শিক্ষালয়	পাঠ্যক্রম এক হ'লেও আচরণ-বিধির পার্থক্য
(৭) শিক্ষার্থীর প্রকৃতি	ছেলেদের জন্য শিক্ষালয় মেয়েদের জন্য শিক্ষালয় মিশ্র শিক্ষালয়	পাঠ্যক্রম এক ; কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত

কলেজ ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক কৌশল শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (School of technical trade)। এইসব শিক্ষালয়ের পাঠ্যক্রমে বিশেষভাবে কারিগরী দক্ষতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর এক শ্রেণীর শিক্ষালয় আছে, যেখানে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (Institute of hygiene) সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন—মেডিক্যাল কলেজ ও ভেষজ বিজ্ঞান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের গবেষণাগার আছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ওপর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

[চার] **বয়স ও মানসিক যোগ্যতা অনুসারে শ্রেণীবিভাগ (Classification on the basis of age and attainment of the pupil) :** বর্তমান কালে মনোবিদ্‌রা মনে করেন, শিক্ষার্থীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক ক্ষমতারও বিকাশ হয় এবং তাঁরা মনে করেন, মানসিকতার দিক্‌ থেকে ব্যক্তির জীবনকে কয়েকটা বিশেষ পর্যায়ে ভাগ করা যায়। তাই আধুনিক কালে প্রায় সব দেশেই শিক্ষালয়গুলো শিক্ষার্থীর বয়সানুপাতে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা আছে। আমাদের দেশেও এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ বর্তমান। এই শ্রেণীবিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় সম্পর্কে আলোচনা করলে প্রায় সকল রকম শিক্ষালয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তাই আমরা এখানে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

বিভিন্ন বয়স ও মানসিক ক্ষমতার শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষালয়

(ক) নার্শারী বিদ্যালয় বা প্রাক্‌-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষালয় : এই জাতীয় শিক্ষালয় দু' থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের জন্য। এই বয়সের শিশুদের স্বাভাবিক স্থান হ'ল গৃহ-পরিবেশ। কিন্তু, আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতা-বৃদ্ধির ফলে এই জাতীয় শিক্ষালয়ের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে অনুভূত হ'চ্ছে। পিতা-মাতা উভয়কে আজকাল অর্থ-উপার্জনের জন্য বাড়ীর বাইরে যেতে হয়। তাই শিশুদের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই ধরনের শিক্ষালয়ের বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। আজকাল বিশেষ ক'রে শহরাঞ্চলে এই ধরনের শিক্ষালয় গড়ে উঠেছে। এইসব

প্রাক্‌-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষালয়

শিক্ষালয়ে কোন গতানুগতিক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় না। এখানে গৃহের মত স্নেহ-পরিবেশে শিশুদের সাধারণ অভ্যাস-গঠনের চেষ্টা করা হয়। নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি নানা রকম স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস এখানে গঠন করার চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া, শিশুদের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা বিকাশের জন্য এবং ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী অনুশীলন করা হয়। খেলাধুলা, ছবি আঁকা, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের প্রচেষ্টা চলে এইসব শিক্ষালয়ে। এই শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর ইন্দ্রিয়গুলোকে সক্রিয় করা, যাতে ক'রে সে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ম-মাফিক (formal) শিক্ষা-গ্রহণের উপযোগী হয়।

(খ) প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষালয়ঃ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষালয়ের দায়িত্ব হ'ল ছ' থেকে এগার বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের শিক্ষাদান করা। এই পর্যায়ে আসলে নিয়ম-মাফিক শিক্ষা (formal education) শুরু হয়। এখানে পঠন, লিখন, অঙ্ক (Reading, Writing and Arithmetic) ইত্যাদি শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। তবে এই পর্যায়ে শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর মধ্যে যে-সব অসামাজিক আচরণ আছে, সেগুলোকে মার্জিত করা। আমাদের দেশে এই পর্যায়ের শিক্ষালয় দু' শ্রেণীর আছে। এক ধরনের হ'ল চার-শ্রেণীযুক্ত সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় (Ordinary Four Class school) এবং অপরটি হ'ল পাঁচ-শ্রেণীযুক্ত নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় (Junior Basic School)। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্ররা ছ'বছর থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষালাভ করে। আর নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছ'বছর থেকে এগার বছর বয়স পর্যন্ত থাকে। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লিখন-পঠন ও অঙ্কের সঙ্গে কিছু অন্যান্য বিষয়ও পড়ানো হয়। প্রকৃতি-পরিচয়, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়েও এখানে শেখানো হয়। নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিশেষভাবে কর্মকেন্দ্রিক। এখানে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিশুদের জীবনের প্রয়োজনীয় তথ্য-সংগ্রহে সহায়তা করা হয়। সুতা কাটা, বাগান করা ইত্যাদি যৌথ কাজের মাধ্যমে শিশুর একদিকে যেমন সমাজ-চেতনার বিকাশসাধন করা হয়, তেমনি অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কৌশলাদি আয়ত্ত করতে সহায়তা করা হয়। বর্তমানে এই স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক এবং বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার রাজ্য সরকারগুলি বহন করেন।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষালয়

(গ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষালয়ঃ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষালয় থেকে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষালয়ে আসে। এই পর্যায়ে শিক্ষা সাধারণতঃ এগার বছর বয়স থেকে সতের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য স্বাধীনতার পর থেকে বহু প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমাদের দেশে যে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তা আংশিকভাবে মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল। সমাজ-জীবনের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেও এই বয়সের শিক্ষার্থীদের

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষালয়

বিশেষ চাহিদার কথা চিন্তা ক'রে এই স্তরের পাঠ্যক্রম-নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে কোঠারী কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক পুনর্বিন্যাস করা হ'য়েছে। এই পর্যায়ের শিক্ষাকে মূলতঃ দুটো পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর। এই প্রত্যেক স্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় আছে। মাধ্যমিক স্তরকে আবার দ'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথম স্তরকে নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর বলা যেতে পারে। এই পর্যায়ে দু'ধরনের শিক্ষালয় দেখা যায়—(১) জুনিয়ার হাই স্কুল (Junior High School) এবং (২) উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয় (Senior Basic School)। এখানে শিক্ষার্থীদের বয়স-সীমা হ'ল চোদ্দ বছর ; জুনিয়ার হাই স্কুলের পাঠ্যক্রম সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমতা রেখে রচনা করা হয়। আর উচ্চ-বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমতা রেখে রচনা করা হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান অসুবিধা হ'ল এর পরবর্তী স্তরে শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নেই। এই কারণে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এই শ্রেণীর সমস্ত বিদ্যালয়কে জুনিয়ার হাই স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই বয়সকাল পর্যন্ত শিক্ষাকে ভারতীয় সংবিধানে সাধারণের জন্য আংশিক বিবেচনা ক'রে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হ'য়েছে। সুতরাং এর পাঠ্যক্রম স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দরকার ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এই পর্যায়ের শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য হবে শিশুকে সমাজ-জীবনের উপযোগী সকল রকম জ্ঞানই দিতে হবে যাতে ক'রে সে সমাজের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

এর পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষাকে বলা হয় উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা একাদশ শ্রেণীর ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে আমাদের দেশে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে এক ধরনের শিক্ষালয় ছিল। সেখানে শিক্ষার্থীদের বয়ঃক্রম ছিল ষোল বছর পর্যন্ত। এই স্তর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—নবম ও দশম শ্রেণী। এইসব বিদ্যালয়েও পুঁথিগত গতানুগতিক শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং সব ছাত্রের জন্য একই রকম পাঠ্যক্রম ছিল। মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাঝে আর এক শ্রেণীর শিক্ষালয়ের সৃষ্টি হ'য়েছিল। এই জাতীয় শিক্ষালয়কে বলা হ'ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তবে 1974 সালের জানুআরি মাস থেকে আবার নতুন ব্যবস্থা চালু করা হ'য়েছে। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের (1964—66) সুপারিশক্রমে এই ব্যবস্থাতেও ১৬ বছর বয়স বা দশম মান পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে একই রকম পাঠ্যক্রমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পরবর্তী দু' বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা যা ১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে, তার জন্য কতকগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। সুতরাং, এই উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) আর এক শ্রেণীর শিক্ষালয় গড়ে উঠেছে। এই শিক্ষা-পরিচালনার জন্য একটি পৃথক কাউন্সিলও গঠন করা হয়েছে।

(ঘ) **বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষালয়ঃ** মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষ ক'রে ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করবে বা কোন বৃত্তিমূলক

শিক্ষালয়ের পাঠ গ্রহণ করবে। বাকী যারা থাকবে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে সাধারণ শিক্ষালাভ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষা বিশেষভাবে মহাবিদ্যালয় (College) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ-বিভাগগুলির (Teaching Departments of the University) মাধ্যমে হ'য়ে থাকে। সাধারণতঃ মহাবিদ্যালয়কে স্নাতক স্তরে শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণভাবে স্নাতক-স্তর তিন বছরের। এর পরের স্তর হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্নাতকোত্তর স্তর দু'বছরের।

মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়

এমনিভাবে বয়ঃক্রমের দিক্ থেকে সম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হ'য়েছে এবং প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয়েরও সৃষ্টি হ'য়েছে। কোঠারী কমিশনের রিপোর্টে অবশ্য সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে এবং এই রিপোর্ট বিভিন্ন পর্যায়ের বিদ্যালয় সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। রিপোর্টে প্রাথমিক স্তরকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্তরকে বলা হ'য়েছে নিম্ন-প্রাথমিক স্তর (Lower Primary stage) এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্তরকে বলা হ'য়েছে উচ্চ-প্রাথমিক স্তর (Upper Primary stage), পরে মাধ্যমিক স্তরকেও দু'পর্যায়ে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে—নবম ও দশম শ্রেণী নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর এবং একাদশ ও দ্বাদশ (অতিরিক্ত) শ্রেণীকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর বলা হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালু হ'লে আশা করা যায়, আমাদের দেশের শিক্ষালয়ের সংগঠনেরও যথাযোগ্য পুনর্বিন্যাস হবে। ইতিমধ্যে জাতীয় ভিত্তিতে এই পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

[পাঁচ] *দায়িত্ব-গ্রহণের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ* **(Classification on the basis of responsibility) :** শিক্ষালয় সমাজেরই গড়া এক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয়ে আসে কিছু সময়ের জন্য, সমবেত হ'য়ে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে আবার চলে যায়। স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজ তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব শিক্ষালয়ের ওপর দিয়েছে। শিক্ষালয় সেই দায়িত্ব কিভাবে পালন করছে, তার ওপর নির্ভর করছে শিক্ষালয়ের যোগ্যতা। আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় আছে, তারা সবাই সমান দায়িত্ব নেয় না। কিছু কিছু বিদ্যালয় আছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুশীলনের পর বাড়ী চলে যায়। এই ধরনের শিক্ষালয়কে বলা হয় আবাসিক বিদ্যালয় (Residential School)। স্বাভাবিকভাবে শিশুর বিকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্বই এইসব বিদ্যালয়ের ওপর থাকে। কারণ, শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন সমাজ-পরিবেশ বা গৃহ-পরিবেশ থেকে দূরে থাকে। এছাড়া, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা দিনের কিছু সময়ের জন্য সমবেত হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পাঠগ্রহণ করার পর নিজ নিজ স্থানে ফিরে যায়। এই জাতীয় শিক্ষালয়কে বলা হয় দিবা-বিদ্যালয় (Day School)। এইভাবে শিক্ষালয়কে আমরা শ্রেণীবিভাগ করতে

বিভিন্ন সুবিধাভিত্তিক শিক্ষালয়

পারি—আবাসিক বিদ্যালয়, যাদের দায়িত্ব খুব বেশী, আর দিবা-বিদ্যালয় যার দায়িত্ব খুব কম। তার কারণ, এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বেশীর ভাগ সময় পিতামাতার সঙ্গে বাড়ীতে থাকে। এমনিভাবে শিক্ষালয়কে আরও নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন—ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি।

[ছয়] **সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ (Classification on the basis of Social Status) :** এই ধরনের শিক্ষালয়ের শ্রেণীবিভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শবিরুদ্ধ। তবু প্রচলিত রীতি বা সংস্কারকে আমরা আজও মুছে ফেলতে পারিনি। তাই দেখা যায়, কিছু শিক্ষালয় আছে যেগুলো বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থ রক্ষা করে। এবং সেখানকার ছাত্রদের মধ্যে স্বাভাবিক আভিজাত্যের মনোভাবের সৃষ্টি হয় যা তাদের অন্যান্য শিক্ষালয়ের ছাত্র থেকে পৃথক ক'রে রাখে। পূর্বে এইসব বিদ্যালয়ে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের সন্তানদের পাঠের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সেরকম কোন বিধিনিষেধ না থাকলেও ঐ সব শিক্ষালয়ের ছাত্রদের থেকে পৃথক ক'রে গড়ে তোলে। এ জাতীয় শিক্ষালয়গুলোকে ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বর্তমানে অভিজাত শ্রেণীর জন্য না হোক শিক্ষালয় হিসাবে তাদের আভিজাত্য আছে।

মর্যাদাভিত্তিক শিক্ষালয়

[সাত] **লিঙ্গভেদে শ্রেণীবিভাগ (Clasification in the basis of Sex) :** সব দেশেই শিক্ষালয়কে শিক্ষার্থীদের লিঙ্গভেদে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। আমাদের দেশের শিক্ষালয়গুলোকে আমরা এদিক্ থেকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। পুরুষদের জন্য শিক্ষালয়, মহিলাদের জন্য শিক্ষালয় ও সহশিক্ষা-ব্যবস্থাযুক্ত শিক্ষালয়। এই শ্রেণীবিভাগ যে কোন ধরনের শিক্ষালয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদের স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হ'লেও এ কথা মনে রাখতে হবে, দু'একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন স্ত্রী-শিক্ষালয়েই তাদের উপযোগী পৃথক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় না।

পুরুষ ও মহিলাদের শিক্ষালয়

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, শিক্ষালয়ের এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণরূপে চরম নয়। কারণ, বর্তমানে আমাদের দেশে যে সব শিক্ষালয় আছে, তাদের পৃথক পৃথক ভাবে নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীতে স্থাপন করা যায় না। এই শ্রেণীবিভাগ কতকগুলো নির্দিষ্ট মানের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। এদের মধ্যে যে কোন একটির মান কোন বিদ্যালয়ের একক উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। একই বিদ্যালয় বিভিন্ন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কাজ করে। ফলে, তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হয়। তাছাড়া, এই মুহূর্তে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ, এ কথা বলা যায় না। অর্থাৎ, এখনও পর্যন্ত আমরা স্থিতাবস্থায় আসিনি। তাই যে কোনরকম শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করা হোক-না-কেন, তাকে চরম ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া যায় না।

মন্তব্য

সারসংক্ষেপ

যে সব সংস্থা শিক্ষাকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে থাকে, তাদের বলা হয় শিক্ষার সংস্থা। এই সংস্থাগুলি মূলতঃ সামাজিক। তাই বৃহত্তর অর্থে, যে সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের উন্নত সংস্কার ও কৃষ্টিকে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাদের বলা হয় শিক্ষার সংস্থা (Agency of education)।

এই অর্থে যে কোন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার সংস্থা। কিন্তু প্রত্যেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমভাবে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে না বা একই কৌশলে শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করে না। তাদের দায়িত্ব ও প্রকৃতিভেদে শিক্ষার সংস্থাগুলিকে নানা দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যেমন—(১) শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা; (২) শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা; (৩) শিক্ষার সক্রিয় সংস্থা ও (৪) শিক্ষার নিষ্ক্রিয় সংস্থা। যে সব সংস্থায় শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেগুলিকে শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা বলে। যেমন—বিদ্যালয়। যে সব সামাজিক সংস্থায় শিক্ষাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না, অথচ ব্যক্তি বা শিশুর মনের বিকাশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তাদের বলা হয় শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা। যেমন—পরিবার। যে সব শিক্ষা-সংস্থার মধ্যে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব, সেইসব সংস্থাকে বলা হয় শিক্ষার সক্রিয় সংস্থা। যেমন—বিদ্যালয়, ধর্মীয় সংস্থা ইত্যাদি। যে সব সংস্থার মধ্যে এই ধরনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া করার সুযোগ নেই, সেগুলিকে শিক্ষার নিষ্ক্রিয় সংস্থা বলা হয়। যেমন—বেতারসূচী।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান সংস্থা হ'ল শিক্ষালয়। শিক্ষালয়ের রূপ সমাজের বিবর্তন-ধারায় পরিবর্তিত হ'য়েছে। বর্তমানে শিক্ষালয় বলতে বোঝায়—এক বা একাধিক শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের তত্ত্বাবধানে, একটি নির্দিষ্ট আসবাবপত্র-যুক্ত ঘরে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুশীলনরত শিক্ষার্থী সমবায়কে।

সাধারণভাবে শিক্ষালয়ের কাজ শিক্ষা-প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হ'লেও, তার নির্দিষ্ট বিশেষধর্মী কতকগুলি কাজ আছে। এই কাজগুলি হ'ল—(১) সংরক্ষণ, (২) সঞ্চালন, (৩) সমন্বয়ন, (৪) উন্নয়ন, (৫) বিকাশ-সাধন, (৬) সংশোধন, (৭) সামাজিক শিক্ষণ ইত্যাদি।

শিক্ষালয় ও সমাজ আক্ষরিক অর্থে দুটি পৃথক সংস্থা, তাহ'লেও তাদের মধ্যে অনেক প্রকৃতিগত ও দায়িত্বগত সাদৃশ্য বর্তমান। তাছাড়া তারা পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ বলেছেন, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ককে যত নিবিড় করা যাবে, শিক্ষা-প্রক্রিয়ার পরিচালনা ততই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। তাই বিভিন্ন কৌশলে তাদের মধ্যে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার চেষ্টা করতে হবে। এমনকি, প্রয়োজনবোধে শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিরূপ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় আছে। এইসব শিক্ষালয়-গুলি প্রত্যেকটি শিশুর বা ব্যক্তির শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও তাদের কর্মপরিধির সীমা ও দায়িত্ব-গ্রহণের সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। এই কারণে, শিক্ষালয়-গুলিকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে শিক্ষালয়গুলিকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, সেগুলি হ'ল—(১) মালিকানা, (২) দৈহিক অক্ষমতা, (৩) পাঠ্যক্রম, (৪) বয়স ও মানসিক যোগ্যতা, (৫) দায়িত্ব, (৬) সামাজিক মর্যাদা ও (৭) শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্নাবলী

1. Distinguish between formal and informal agencies of Education. Discuss their significance in Education.

   [শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্থাগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাসংস্থাগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।]

2. Trace the development of school idea and discuss the main functions served by the school.

   [শিক্ষালয়ের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর এবং শিক্ষালয়ের মূল কাজগুলি উল্লেখ কর।]

3. Show how the functions of the school is both conservative and progressive.

   [শিক্ষালয় কিভাবে সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করে বুঝিয়ে দাও।]

4. Discuss the proper relationship which should exist between the school and society. Suggest a few concrete steps by which you can establish such relationship.

   [শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আলোচনা কর। প্রসঙ্গক্রমে এই সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, এমন কতকগুলি বাস্তব পন্থার কথা উল্লেখ কর।]

5. Suggest steps by means of which the gulf between the school and the society can be bridged and education can be made real and living to the child.

   [এমন কতকগুলি পন্থার কথা উল্লেখ কর যাদের দ্বারা শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে ব্যবধানকে সঙ্কুচিত ক'রে শিক্ষাকে শিশুর জীবনে বাস্তব ও ক্রিয়াশীল ক'রে তোলা যায়।]

6. Develop the idea that the School is a miniature society. What are the social instincts that manifest in a school society ?

   [শিক্ষালয় সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ, এই ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। বিদ্যালয়-সমাজে শিক্ষার্থীর কি কি সামাজিক প্রবণতা দেখায় ?]

7. Write an essay on "School is a society".

   ['শিক্ষালয় একটি সমাজ'—এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।]

8. Enumerate the different types of school and describe their distinctive functions.
[বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় সূচিত ক'রে তাদের বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পর্কে আলোচনা কর।]
9. Write notes on (টীকা লিখ):
((a) Development of school idea [শিক্ষালয়ের ধারণার বিকাশ।]
(b) School, Society & Individual [শিক্ষালয়, সমাজ ও ব্যক্তি।]
(c) Functions of school [শিক্ষালয়ের কার্যাবলী।]
10. What is a 'school'? How is it related to society? How does the school work as an agency of social welfare?

[বিদ্যালয় কি? সমাজের সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়? সমাজ-কল্যাণের মাধ্যম-রূপে বিদ্যালয় কিভাবে কাজ করে?]
11. How are the educational agencies classified? Why are they so classified?
[শিক্ষাবিষয়ক মাধ্যম / শিক্ষা-সংস্থাসমূহের শ্রেণীবিভাগ কিভাবে করা হয়? এভাবে শ্রেণীবিভাগ করার কারণ কি?]
12. Why is school called a society? How can the school be organised as a society?
[বিদ্যালয়কে 'সমাজ' বলার কারণ কি? বিদ্যালয়কে কিভাবে একটি সমাজ-জীবনে সংগঠিত করা যায়?]
13. Develop the idea that the school is a society?

[শিক্ষালয় একটি সমাজ এই ধারণাটি পরিস্ফুট কর।]
14. What do you mean by the agencies of education? How are these agencies classified? Discuss the necessity and functions of school as an agency of education.

[শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থা (ক্ষেত্র) বলতে কি বোঝ? এই সংস্থাগুলি কয় প্রকার? একটি সংস্থা বা মাধ্যম হিসেবে শিক্ষালয়ের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলী আলোচনা কর।]

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষার সংস্থা (২)
Agencies of Education

শিক্ষা-সংস্থা সম্পর্কে আলোচনার সূচনায় আমরা উল্লেখ করেছি শিক্ষার সংস্থাকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্থা। প্রত্যক্ষ সংস্থা হিসেবে আমরা শিক্ষালয় (School) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। আমরা জানি, শিক্ষালয় যদিও শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা, তাহ'লেও তা শিশুর সকল শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না। সামাজিক অন্যান্য সংস্থাগুলি (Social institutions) শিক্ষার আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। এই অর্থে এই সব সামাজিক সংস্থাগুলিকে শিক্ষার সংস্থা (Agencies of education) হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যদিও এগুলিকে শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা (Indirect agency) হিসেবে উল্লেখ করা হয়, তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আধুনিক যুগে এদের প্রভাব সব সময় পরোক্ষ নয়। অনেক সময় এরা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যেমন, শৈশবের শিক্ষার দায়িত্ব পরিবারই প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করে। রাষ্ট্র (State) প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করে এবং শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে আমরা গৃহ (Home) বা পরিবার (Family), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious institution) এবং রাষ্ট্রের (State) কথা উল্লেখ করব। এইসব প্রতিষ্ঠান সমাজের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সৃষ্ট হ'য়েছে। কিন্তু তারা কোন-না-কোন ভাবে ব্যক্তির শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। এই কারণে তাদের শিক্ষার সংস্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা

॥ গৃহ বা পরিবার ॥
(Home or Family)

সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হ'ল পরিবার। যে কোন সমাজ-ব্যবস্থাতেই গৃহ বা পরিবারের স্থান ছিল। পরিবারই সমাজের একমাত্র প্রতিষ্ঠান (Social institution), যার থেকে অন্যান্য সমাজ-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হ'য়েছে। বলার্ড (Ballard) বলেছেন—"Family is the original social institution, from which all other institutions developed." সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গৃহ বা পরিবারের ওপর নানারকম দায়িত্ব এসে পড়ে। পরিবারের মধ্যে বা গৃহ-পরিবেশেই শিশু প্রথম জন্মলাভ করে। আর এই গৃহ-পরিবেশেই শিশুরা প্রথম বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্কের (Social relations) সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সমাজ-জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সে লাভ করে। গৃহ-পরিবেশের মধ্যেই শিশু বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক আচরণ শেখে; কথা বলা,

গৃহের বিভিন্ন দায়িত্ব

হাঁটা, কাপড় পরা ইত্যাদি নানারকম অভ্যাস এখানে গঠন করে। তাই গৃহের দায়িত্ব হবে, শিশু যাতে যথার্থভাবে এইসব কৌশল আয়ত্ত করতে পারে, সেদিকে নজর দেওয়া। এছাড়া গৃহ-পরিবেশের মধ্যেই শিশুর নানা ধরনের সামাজিক সত্তা বিকাশলাভ করে, সহানুভূতির সঙ্গে কিভাবে অন্যের সঙ্গে মিশতে হয়, তা সে শেখে। শিক্ষাবিদ্ রেমণ্ট (**Raymont**) বলেছেন—"**The home is the social unit in which spring up those virtues of which sympathy is the common characteristic.**" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"**It represents the truth of human relationship, it reveals loyalty and love for the personality of man.**" এছাড়া, পরিবার বা গৃহের অর্থনৈতিক দায়িত্বও আছে। গৃহ-পরিবেশেই শিশুদের বৃত্তি-শিক্ষা হ'য়ে থাকে। প্রাচীনকালে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পরিবারের ওপরই ছিল। পরিবার এই দায়িত্ব আজকাল সম্পূর্ণভাবে পালন না করলেও আংশিকভাবে পালন করে। শিশুদের অবচেতন-মনে পিতামাতার প্রভাব নানা দিক থেকে ক্রিয়া করে। অনেক সময় বৃত্তি-নির্বাচন পিতামাতার প্রভাবেই হ'য়ে থাকে। এছাড়া, গৃহ-পরিবেশে শিশুরা কিছু সামাজিক গুণ (**social virtues**) আয়ত্ত করে। গৃহ এদিক্ থেকে সামাজিক দায়িত্বও পালন করে। শিশুর নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনও শিক্ষালয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পিতামাতার সঙ্গে থাকতে থাকতে তাদের জীবনের নৈতিক মান উন্নত হয় এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ

এই সকল দায়িত্ব ছাড়া শিক্ষার দায়িত্ব গৃহ পরোক্ষভাবে পালন করে। আর শিক্ষার সংস্থা হিসেবে তার উপযোগিতা মোটেই কম নয়, বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শিশু শিক্ষালয়ে আসার আগে পর্যন্ত গৃহই তার শিক্ষার দায়িত্ব নেয় এবং শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, গৃহই শিশুর প্রাক্-শিক্ষালয় পর্যায়ে শিক্ষার আদর্শ স্থান। এর কারণ হ'ল—

সহজ সম্পর্ক

[এক] আমরা জানি, শিক্ষা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষা দুটি ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয়। গৃহ হ'ল এমন এক ধরনের সংস্থা যেখানে এই পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্ক খুব সহজ এবং স্বাভাবিক। শিশু পিতামাতার সঙ্গে বাস করতে করতে জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস খুব সহজে শিখতে পারে।

শৈশবের নমনীয়তা

[দুই] শৈশবই শিশুর অভ্যাস গঠনের সময়। গৃহের জীবনে শিশু নানা ধরনের সু-অভ্যাস গঠন করতে পারে। এই বয়সে শিশুর মন অনেক বেশী নমনীয় থাকে, তাই তাকে খুব সহজেই অনেক কিছু শেখানো যায়। তাছাড়া, তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও তখন থাকে অনেক কম। তাই শেখা অনেক সহজ হয়।

[**তিন**] যে সব শিশু বেশী দূর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, যে সব পিতামাতার শিশুকে শিক্ষালয়ে পাঠানোর সংগতি নেই, তাদের পক্ষে শিশুকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া গৃহেই সম্ভব হয়। ছেলেরা পিতার কাছে থেকে তাঁরই বৃত্তিতে শিক্ষালাভ করে এবং মেয়েরা খুব সহজভাবে মায়ের কাছ থেকে গৃহ-পরিচালনার কাজ শিখতে পারে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ

[**চার**] পরিবারের মাধ্যমে সমাজ-জীবনের সঙ্গে শিশুর প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। শিশু পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন সভ্যদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে নানা ধরনের সামাজিক গুণের অধিকারী হয়। গৃহ-পরিবেশ থেকে সে যে সব সামাজিক আচরণ শিক্ষা করে, তাই সে ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগায়। এ কারণে শিক্ষাসংস্থা হিসেবে গৃহের গুরুত্ব সকলে স্বীকার করেন।

সামাজিক আচরণ শিক্ষা

[**পাঁচ**] সমাজের মধ্যেই শিশুর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয়, সে পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক লোকদের সঙ্গে সামাজিক বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এর ফলে তার আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয়। শিক্ষার একটা লক্ষ্য হল—ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ সাধন করা। সুতরাং, আমরা বলতে পারি গৃহ, এই দিক্ থেকে শিক্ষাসংস্থার কাজ অনেকটা এগিয়ে দেয়।

আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ

সুতরাং, সমস্ত দিক্ বিবেচনা ক'রে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, গৃহ-পরিবেশ তার অন্যান্য আদর্শ ছাড়াও শিক্ষার সংস্থা হিসেবে শিশুর প্রথম কয়েক বছরের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বর্তমান কালে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সংগঠনেরও অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে, তা সত্ত্বেও পরিবার অনেকাংশে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবারের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জর্জ হার্বার্ট (George Herbert) বলেছেন —"One good mother is worth a hundred school master." কারণ, শিশু পিতা বা মাতার আদর্শ বা নির্দেশ যত সহজভাবে মেনে নেয়, অন্য কারুর কথা অত সহজে গ্রহণ করে না। গৃহ-পরিবেশ মানুষের একান্ত আপন পরিবেশ এবং সেইজন্য তা শিশুকে সহজভাবে বিকশিত করতে সহায়তা করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর Creative unity-তে বলেছেন—"The permanent significance of home is not in the narrowness of its enclosure, but in an eternal moral idea." তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, শিক্ষা-সংস্থা হিসেবে সার্থকতা লাভ করতে হ'লে গৃহকে আদর্শ পরিবেশ রচনা করতে হবে। ভাল গৃহ-পরিবেশের জন্য যেমন আমরা অনেক সময় ভাল ফল পাই, তেমনি আবার খারাপ গৃহ-পরিবেশের জন্য মন্দ ফলের অভাব নেই। বিশেষ ক'রে আমাদের মত দেশে, যেখানে বেশীর ভাগ পিতামাতা অশিক্ষিত,

আলোচনা

সেখানে গৃহ-পরিবেশ থেকে আমরা বেশীর ভাগ সময়ে ভাল ফল আশা করতে পারি না। বলা যেতে পারে, শিক্ষার সংস্থা হিসেবে গৃহ বা পরিবারের অনেক সম্ভাবনা আছে। তবে তাকে পরিকল্পনার দ্বারা সুসংহত করতে না পারলে তার থেকে ভাল ফল পাওয়া মুশকিল। তাই রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন —"শিক্ষার জন্য বালক-বালিকাদের ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে, এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয়।" আধুনিক শিক্ষাবিদ্ ডিউই (Dewey) একই মত প্রকাশ করেছেন। তিনি আদর্শ গৃহ-পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—"An intelligent home differs from an unintelligent one chiefly in that the habits of life and intercourse which prevail are chosen or at least coloured, by the thought of our bearing upon the development of the children." অর্থাৎ যে গৃহ-পরিবেশে পিতামাতা বা অন্যান্যরা শিশুর বিকাশের আচরণ ক'রে থাকেন, তাকেই আমরা আদর্শ গৃহ-পরিবেশ বলব।

॥ গৃহ ও শিক্ষালয়ের সহযোগিতা ॥
(Co-operation between Home and School)

কোন শিক্ষালয়ই গৃহের সহযোগিতা ছাড়া সার্থকভাবে শিশুর শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে পারে না। আবার গৃহ বা পরিবারকে আমরা এককভাবে শিক্ষার দায়িত্ব দিতে পারি না। কারণ, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান অনেক জটিল হ'য়েছে এবং এই জটিল জীবনযাত্রার উপযোগী ক'রে শিশুকে তৈরি করতে হ'লে চাই সুষম শিক্ষাব্যবস্থা। এই দায়িত্ব গৃহের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয় এবং এই কারণেই শিক্ষালয়ের উদ্ভব হ'য়েছে। কিন্তু শিক্ষালয়েরও এককভাবে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়, যদি-না গৃহ-পরিবেশ তাকে সহায়তা করে। শিশু দিনের কিছুটা সময় মাত্র শিক্ষালয়ে থাকে এবং বেশীর ভাগ অংশই সে গৃহ-পরিবেশ বা পরিবারের মধ্যে কাটায়। তাই তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। ব্রাউন বলেছেন, শিক্ষালয়কে সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ সংস্থা হিসেবে গৃহ-পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সম্পর্ক-স্থাপনের দায়িত্ব নিতে হবে। এদিক্ থেকে তিনি শিক্ষালয়ের তিনটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। **প্রথমতঃ,** শিক্ষালয়কে শিশুর পরিবার সম্বন্ধে জানতে হবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। তিনি বলেছেন —"It should accordingly, so far as possible, develop its programme in such a way as to supplement but not to supplant the function of the family." **দ্বিতীয়তঃ,** শিক্ষালয়ের কাজ হবে শিশুদের মধ্যে পরিবারের উপযোগিতা সম্বন্ধে সমবেদনশীল মনোভাব গড়ে তোলা। এবং **তৃতীয়তঃ,** পরিবারের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করা। এই সহযোগিতার সম্পর্ক শিক্ষাক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রস্তাবনা

শিক্ষালয়ই সমাজের সক্রিয় প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে আমরা শিশুকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করি। এই কারণে গৃহের সঙ্গে যথাযোগ্য সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। শিক্ষালয় এবং পরিবারের মধ্যে সহযোগিতাকে সার্থক করতে শিক্ষালয়কে নিম্নরূপ কাজ গ্রহণ করতে হবে।

সম্পর্ক স্থাপনে শিক্ষালয়ের কর্তব্য

[এক] **শিক্ষক-অভিভাবক সংস্থা প্রতিষ্ঠা :** শিক্ষালয়ের পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হ'লে এবং তার জন্য পরিবারের সহযোগিতা লাভ করতে হ'লে শিক্ষক-অভিভাবক সংস্থা স্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষালয়েই এই ধরনের সংস্থা থাকবে। এর মাধ্যমে শিক্ষক এবং অভিভাবকরা পরস্পর ভাবের আদান প্রদান করতে পারবেন। এইসব সংস্থার মাধ্যমে অভিভাবকরা যে মতামত প্রকাশ করবেন, তার যথাযোগ্য মূল্য দিতে হবে। তাছাড়া, শিক্ষালয়ের বিশেষ কোন অসুবিধা থাকলে তা এই সংস্থার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। এই সংস্থার মাধ্যমে অভিভাবকদের শিক্ষালয়ের কার্যসূচীর সঙ্গে পরিচিত করতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি

[দুই] **অভিভাবক-দিবস পালন :** স্থায়ী শিক্ষক-অভিভাবক সংস্থা ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষালয়ে বছরে অন্ততঃ একদিন অভিভাবক-দিবস (Parent Day) পালন করা উচিত। বৎসরের বিশেষ এক দিন সমস্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে শিক্ষালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর সঙ্গে পরিচিত করানো দরকার। এই সময় শিক্ষালয়ে ছাত্রদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রধান শিক্ষক প্রয়োজন হ'লে এই উপলক্ষে অভিভাবকদের কাছে শিক্ষালয়ের অসুবিধার কথা বলতে পারেন এবং তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য তাঁদের সহযোগিতা প্রার্থনা করতে পারেন এবং সমবেত প্রচেষ্টায় তার সমাধান করতে পারেন। এতে ক'রে অভিভাবকদের শিক্ষালয়ের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবে।

অভিভাবক-দিবস

[তিন] **শিক্ষকদের দ্বারা গৃহ-পরিবেশ পরিদর্শন :** শিক্ষালয়ের সকল শিক্ষক না হ'লেও কিছু কিছু শিক্ষকের ওপর শিক্ষার্থীদের গৃহ পরিবেশ পরিদর্শন ক'রে দেখার ভার থাকা উচিত। তাঁরা মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের বাড়ী গিয়ে তাঁদের পিতামাতার সঙ্গে তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা শিক্ষার্থীর গৃহ-পরিবেশ সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এই শিক্ষকদের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি ক'রে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। শিক্ষকদের এই পরিদর্শনের ফলে শিক্ষালয় যেমন অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে, অন্যদিকে অভিভাবকদের সঙ্গেও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

গৃহ-পরিদর্শন

[চার] **নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা** : শিক্ষালয় থেকে গৃহে রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। তবে বর্তমানে প্রচলিত রিপোর্টদানের পদ্ধতি খুবই গতানুগতিক এবং তার দ্বারা অভিভাবকদের সক্রিয় করা যায় না। এইজন্য অপেক্ষাকৃত কম সময়ের ব্যবধানে শিক্ষার্থী সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করলে এবং ঐ রিপোর্টের ওপর অভিভাবকেব বক্তব্য লেখার সুযোগ থাকলে শিক্ষালয়ের সঙ্গে গৃহের সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির রিপোর্ট

মনে রাখা দরকার, শিক্ষালয়, সমাজ ও গৃহ পরিবেশের মধ্যে সার্থক সম্পর্ক স্থাপিত না হ'লে কোন শিক্ষা-পরিকল্পনারই সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ গৃহ-পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষা যেমন সর্বাঙ্গসুন্দর হ'তে পারে না, তেমনি গৃহ-পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষালয়ের শিক্ষাও সার্থক হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণভাবে গৃহ-পরিবেশের ওপর নির্ভর করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাই বলেছেন, " বালকরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণময় নয়।" আবার অন্যত্র সম্পূর্ণ শিক্ষালয়েব ওপর নির্ভরশীল শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও তিনি সমালোচনা করেছেন। তিনি চেয়েছেন, গৃহ ও শিক্ষালয়ের মধ্যে সার্থক সম্পর্ক-স্থাপনেব মাধ্যমে শিক্ষা। তাই তিনি চেয়েছেন এমন এক পরিবেশ যেখানে গৃহের স্বাভাবিক স্নেহময় পরিবেশ থাকবে এবং শিক্ষালয়ের সকল বৈশিষ্ট্যও থাকবে। তিনি তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়ে এই আদর্শ পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি তাই বলেছেন—"ছেলেদের এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য, যেখানে তাহাবা স্বভাবের নিয়মে বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।"

আলোচনা

॥ শিক্ষার দায়িত্ব-পালনে আধুনিক পরিবারের অক্ষমতা ॥
(Inefficiency of Modern family in the field of Education)

ইতিপূর্বে শিক্ষার সংস্থা হিসেবে পরিবারের বিশেষ কতকগুলি সুবিধার কথা বলা হয়েছে। পরিবার শিশুকে তার জীবনে অসহায় মুহূর্তগুলিতে যথোপযুক্ত নিরাপত্তা দান করে। শিশুও এই নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে থেকে তার অভিজ্ঞতা-গ্রহণের সীমাকে ক্রমশঃ বিস্তৃত করতে থাকে। ফলে, সে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নানারকম আচরণ আয়ত্ত করে পরিবারের মধ্যে। কিন্তু এই আদর্শ অবস্থা ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমাদের স্মরণ রাখার দরকার, পরিবার একটি পরিবর্তনশীল সংস্থা। তাই তার সাংগঠনিক পরিবর্তনের সঙ্গে দায়িত্বের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমানে ভারতীয় পরিবারের সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে

প্রস্তাবনা

গতানুগতিক ভারতীয় পরিবারের পরিবর্তন হ'তে শুরু করেছিল। এই পরিবর্তনের ধারায় ভারতীয় যৌথ পরিবার (Joint family) ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, শিল্পায়ন (Industrialization), পরিবহন-ব্যবস্থার (Transportation) উন্নয়ন, জনগণের শহরমুখী প্রবণতা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ইত্যাদি পরিবারের এই সংগঠনকে নতুন রূপ দিতে সহায়তা করেছে। এই পরিবর্তনের ফলে পরিবার তার শিক্ষা-সংক্রান্ত দায়িত্বগুলি আর পূর্বের মত সম্পাদন করতে পারছে না। আমরা এখানে আধুনিক পরিবারের বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার তাৎপর্য আলোচনা করব।

জীবনযাত্রার জটিলতা

প্রাচীন যৌথ পরিবারের মধ্যে শিশুরা জীবনের যা কিছু প্রয়োজনীয় কৌশল, পরিবারের মধ্যে বসবাস করেই শিখত। কারণ, তখন আমাদের পরিবারগুলি ছিল কৃষি-কেন্দ্রিক এবং গ্রামীণ। এই গ্রাম-কেন্দ্রিক পরিবার-গুলির আশা আকাঙ্ক্ষা সবই গ্রামের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে, জীবনের জন্য খুব বেশী উন্নত কৌশল আয়ত্ত করার দরকার ছিল না। কিন্তু বর্তমানে, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যার উন্নতির ফলে, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্ত কৌশল-গুলিও জটিল হয়ে উঠেছে। এই জটিল কলা কৌশল শিশুর পক্ষে পরিবারের বয়স্কদের কাছ থেকে শেখা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে পরিবার শিশুকে বাইরে পাঠাতে হচ্ছে, বিশেষ প্রশিক্ষণের মধ্যে। অর্থাৎ, সাধারণ জীবনযাপনের জটিলতা-বৃদ্ধি পরিবারকে বিশেষ বৃত্তিমুখী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় করে তুলেছে।

অর্থনৈতিক চাহিদা

ব্যক্তিজীবনে মানুষের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছে। এরজন্য তাকে দিনের বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। এর প্রভাব পরিবারের ওপর এসে পড়েছে। যে পিতা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অর্থ-উপার্জনের জন্য বাড়ির বাইরে থাকছেন, তাঁর পক্ষে শিশুর শিক্ষা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এই অবস্থা শিশুর সঙ্গে পিতামাতার সান্নিধ্যকালকে কমিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে পিতামাতার ব্যক্তিগত প্রভাবে শিশু পরিবারের মধ্যেও শিক্ষিত হচ্ছে না। অর্থাৎ, পরিবার শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত অভ্যাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না। তার কারণ, সমাজের অর্থনৈতিক চাহিদার পরিবর্তন।

শিল্প-কেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা

আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থার (Industrial society) সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে পরিবার অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে তার নিজের দায়িত্বকে লাঘব করার চেষ্টা করছে। শিশুদের বৃত্তিমুখী শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় যাতে তারা সফল হ'তে পারে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওরার জন্য বর্তমানে তাদের অনেককে অল্প বয়সেই পরিবারের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। অর্থাৎ, গতানুতিক সমাজ-ব্যবস্থায়, পরিবার শিশুর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বর্তমানে ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ

করছে না। এই ব্যবস্থায়, শিশু হয়ত কতকগুলি দক্ষতা ও কিছু পুঁথিগত জ্ঞান অতি তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু তার সামাজিক ও ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটেছে। পরিবারের সঙ্গে তার বন্ধনও ক্রমে শিথিল হয়ে আসছে। পরিবারের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, পরোক্ষভাবে আমাদের ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাকেও ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলছে। ফলে, বর্তমানে শিশুরা বাবামায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে, প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণীর বিভিন্ন নামধারী বিদ্যালয়ে লেখাপড়াই শিখছে; মানবিক গুণের বিকাশ তাদের হ'চ্ছে না।

আধুনিক জটিল জীবনে পরিবারের, বিশেষ করে পিতামাতার, পারস্পরিক সম্পর্কের (Relation) মধ্যেও টান পড়েছে। এই সম্পর্কের অবনতির মূল কারণ যদিও অর্থনৈতিক, তবুও এর মূলে অন্যান্য কারণও আছে। যে কারণেই হোক-না-কেন, পিতামাতার মধ্যে সম্পর্ক মধুর না হ'লে, শিশু পরিবারের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ করে। এই নিরাপত্তার অভাববোধ তার ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। শিশু পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাভাব হারিয়ে ফেলে বলে, পরিবারের মধ্যেকার অন্যান্য ভাল গুণগুলিও গ্রহণ করতে পারে না। এর ফলে তার ওপর পরিবারের প্রভাব কমে যায়।

পিতামাতার সম্পর্ক

সবশেষে এ কথা বলা যায়, বর্তমানে ভারতীয় পরিবারগুলি শিশুর সকল রকম চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হ'চ্ছে। সেই সঙ্গে ঠিক সমহারে সুযোগ-সুবিধা বণ্টন না হওয়ায়, বহিঃসমাজ ও পরিবারের মধ্যে একটা বৈষম্য সব সময়ই থেকে যাচ্ছে। ফলে, শিশু যখন বাইরের পরিবেশের সঙ্গে নিজের পরিবারের পরিবেশ মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, তখন সে দেখছে, তার পরিবার তার চাহিদা মেটাতে পারছে না। ফলে, শিশু পরিবারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। তার মধ্যে হীনমন্যতাবোধ জাগ্রত হ'চ্ছে। এই হীনমন্যতা-বোধ ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। অর্থাৎ, পরিবারগুলি শিশুর জীবনের সকল রকম চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারছে না বলেই শিশুর শিক্ষায় তাদের প্রভাব কমে যাচ্ছে।

শিশুর চাহিদার অতৃপ্ত

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক (Socio-economic) অবস্থা, পরিবারের শিক্ষামূলক গুরুত্বহ্রাসে বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, পরিবারের শিক্ষামূলক সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। সুতরাং শিক্ষা-প্রক্রিয়া সার্থক করে তুলতে হ'লে শিক্ষার ও পরিবারের শিক্ষামূলক ক্ষমতা-হ্রাস শিক্ষার দিক্ থেকে তো নয়ই, সমাজের দিক্ থেকেও কাম্য নয়। এই ব্যবস্থার অবস্থান ঘটাতে হ'লে আমাদের বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। সমাজের তাগিদেই পারিবারিক সংগঠনের পরিবর্তন হবে। কিন্তু সেই পরিবর্তনশীল পরিবেশে পরিবার যাতে তার শিক্ষামূলক

মন্তব্য

দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হ'তে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি উপযুক্ত মূল্যবোধ (values) গড়ে তুলতে পারি, তাহ'লেই এই অবনতিকে রোধ করা সম্ভব হবে। আর তা করা সম্ভব উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে। অর্থাৎ, বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবার ও শিক্ষার (Family & Education) পারস্পরিক নির্ভরতার কথা চিন্তা করতে হবে। অর্থাৎ, পরিবারে শিক্ষার দায়িত্ব তখনই সার্থকভাবে গ্রহণ করতে পারবে, যখন শিক্ষা পরিবার-জীবনকে উপযুক্ত মূল্যবোধ (Value system) দিয়ে সক্রিয় রাখতে সক্ষম হবে। তাই আধুনিক ধারণা অনুযায়ী, পরিবারের যেমন শিক্ষামূলক দায়িত্ব আছে, তেমনি শিক্ষারও পারিবারিক জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব আছে। এই ধরনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক শিক্ষা ও পরিবারের মধ্যে গড়ে তুলতে পারলে পরিবারে শিক্ষামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

॥ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ॥
Religious Institutions

সার্থক সমাজব্যবস্থা-স্থাপনে শিক্ষালয়, পরিবার এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান সমাজ-ব্যবস্থার তিনটি স্তম্ভ। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হ'ল সামাজিক মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে জাগ্রত ক'রা।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শিক্ষা-সংস্থা কেন ?

নৈতিক ও অধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ। সমাজবিদ্‌রা মনে করেন, ধর্ম (Religions) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (Social control) একটি বিশেষ উপযোগী কৌশল। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশসাধন করা। সুতরাং, শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে আমরা শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, প্রত্যেক দেশেই শিক্ষা শুরু হয়েছিল ধর্মপ্রচারের আনুষঙ্গিক হিসেবে। ভারতবর্ষে দেখতে পাই, প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা মন্দির, বৌদ্ধমঠ এবং মসজিদ ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারও আমাদের দেশে খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল। যদিও বর্তমান সমাজবিদ্‌রা মনে করেন, মানবজীবনে ধর্মের প্রভাব অনেক কমে আসছে যান্ত্রিক সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, তবুও ধর্মের মূল আদর্শগুলো

শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ

মানুষের জীবন থেকে একেবারে মুছে যায়নি। বিশেষ ক'রে ভারতবাসীরা এখনও অন্তরে ধর্মভাবাপন্ন। তাই শিক্ষাকে সার্থক করতে হ'লে এবং ব্যাপক করতে হ'লে ধর্মীয় আচার-আচরণের মাধ্যমে শিক্ষাদান-পদ্ধতির প্রসার করতে হবে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। তাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিতে

হবে। যেমন—যাত্রাগান, পাঁচালী, কীর্তন, কথকতা ইত্যাদির দ্বারা জনশিক্ষার প্রসার সহজ হবে। তাছাড়া, ধর্মের মূলনীতি শিক্ষার্থীদের নৈতিক মান উন্নত করে, আধ্যাত্মিক ভাব তাদের মধ্যে জাগ্রত করে। ধর্মের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম ক'রে তার মধ্যেকার সার্বজনীন মূল ভাবকে শিশুদের মধ্যে জাগ্রত করতে পারলে শিশুকে শিক্ষাদানের কাজ অনেক সহজ হবে। এই কারণে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের রিপোর্টে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর জীবন-বিকাশের কতকগুলি দিকের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ধর্মীয় কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে তার শিক্ষামুখী দায়িত্বগুলির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা কতকগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত প্রভাবের কয়েকটি দিকের কথা উল্লেখ করছি—

শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব

(১) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের ওপর কতকগুলি আচার-আচরণগত বিধিনিষেধ আরোপ করে। এই বিধিনিষেধ আরোপের উদ্দেশ্য হ'ল সাধারণ মানুষের আচরণকে আদর্শ দিয়ে পরিচালিত করা। সুতরাং, এর প্রভাবে মানুষের আচরণের উন্নয়নমুখী বিকাশ হয়। অর্থাৎ, শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়।

(২) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। এই সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মানুষ সমাজের কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়। নিজের কৃষ্টির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করা শিক্ষারই একটি লক্ষ্য।

(৩) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে মানুষকে মহাপুরুষদের জীবনযাপনের রীতি ও আদর্শ সম্পর্কে ধারণা দেয়। এর ফলে মানুষ আদর্শব্যক্তিদের আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি অনুকরণ করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, তার শিখন (Learning) হয় এবং সে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

(৪) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের নৈতিক মান-উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। মানুষের নৈতিক জীবনের বিকাশসাধন করা শিক্ষার একটি লক্ষ্য। তাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার এই নৈতিক লক্ষ্যে উপনীত হ'তে সহায়তা করে।

(৫) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কৃষ্টি-সম্পন্নমানুষ একত্রে মেলামেশা করার সুযোগ পায়। এর ফলে, তাদের সামাজিক বিকাশ সম্ভব হয়। ব্যক্তির সামাজিক জীবনের বিকাশসাধন করাও শিক্ষার লক্ষ্য।

(৬) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার সময় বিভিন্নভাবে মন্ডপসজ্জা করে। বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ধরনের মণ্ডপ সজ্জার রীতি আছে। এই সব কাজে অংশ গ্রহণ করলে মানুষের সৌন্দর্যবোধের বিকাশ (Aesthetic development) হয়। এটিও ব্যক্তিজীবনের বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা শিক্ষা করে থাকে।

সুতরাং এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার সকল রকম লক্ষ্য চরিতার্থ করতে সহায়তা করে। তবে একথা স্মরণ রাখার দরকার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এই সব কাজ অপেক্ষাকৃত পরোক্ষ। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মপ্রাণ মানুষের ওপর অপেক্ষাকৃত সহজভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যা শিক্ষালয়ের পক্ষে অনেক কষ্টসাধ্য।

মন্তব্য

॥ রাষ্ট্র ॥
(State)

রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনের আদর্শের রক্ষক। গার্নার (Garner)-এর মতে রাষ্ট্র হ'ল একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী একদল ব্যক্তির সমষ্টি যা একটি স্বাধীন সার্বভৌম সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। [The state is a community of person more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent of external control and possessing an organised Government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.] রাষ্ট্রের কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ বিভিন্ন ধরনের মতবাদ পোষণ করেন। রুশোর সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব (Social Contract Theory) অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাজ হ'বে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির সকল সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করা। কিন্তু আধুনিক কালে রাষ্ট্রের তাৎপর্যের অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার নীতি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে তার দায়িত্বেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের দু'ধরনের দায়িত্বের কথা বলেছেন বিখ্যাত দার্শনিক রাসেল (B. Russel)। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রের দায়িত্বকে আমরা দু'শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—

রাষ্ট্র কি ও তার দায়িত্ব

(১) অভ্যন্তরীণ কাজ Internal function) এবং

(২) বাহ্যিক কাজ (External function)।

অভ্যন্তরীণ দায়িত্বের মধ্যে সাধারণভাবে পড়ে যাতায়াত-ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ডাক-ব্যবস্থা, শিক্ষা ইত্যাদি। আর বাহ্যিক কাজের মধ্যে আসে আন্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ইত্যাদি। সুতরাং, আধুনিক কালে শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্গত করা হ'য়েছে। এর প্রধান কারণ হ'ল গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূল কথা – প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী কাজে নিয়োগ করতে হবে। সুতরাং, প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া এই ধরনের আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই আধুনিক কালে প্রত্যেক চিন্তাবিদ্ মনে করেন, রাষ্ট্রকে শিক্ষার দায়িত্ব অবশ্যই নিতে হবে। লাস্কি (H. Laski) বলেছেন—"Education of the citizen is the

heart of the modern state." ভারতবর্ষে এই দায়িত্বকে যথার্থ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই সংবিধানে ছ' থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে বলা হ'য়েছে। এইসব দিক্ বিবেচনা ক'রে আধুনিক কালে আমরা রাষ্ট্রকে শিক্ষার সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

।। রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক দায়িত্ব ।।
(Education function of the State)

রাষ্ট্রের হাতেই সব রকম নিয়ন্ত্রণ-কৌশল আছে। তাই তার নিয়ন্ত্রণযন্ত্র দিয়ে রাষ্ট্র শিক্ষাকে সহজভাবে সমাজ-নির্ধারিত পথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ ক'রে, অর্থসাহায্য ক'বে এবং যথাযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে রাষ্ট্র শিক্ষাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে পারে। এখন আলোচনা করা যাক্, রাষ্ট্র কি কি ভাবে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় সহায়তা করতে পারে।

রাষ্ট্র ও শিক্ষার লক্ষ্য

[**এক**] শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ের দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের ওপর। রাষ্ট্র শিক্ষালয়-গুলিকে পথ দেখিয়ে দেবে। সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হবে, শিক্ষার্থীর কোন্ কোন্ গুণের আমরা বিকাশ করতে চাই, এই সবকিছু শিক্ষালয়কে নির্দেশ ক'রে দেবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র তার অন্যান্য সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সমতা রেখে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করবে, যে শিক্ষাদর্শ সমাজের আদর্শের প্রতীক হবে। রাধাকৃষ্ণন বলেছেন - "আমাদের দেশের শিক্ষার লক্ষ্য রাষ্ট্র বা সমাজের লক্ষ্যের দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত" "Our educational system must find the guiding principle in the aim of the social order for which it prepares and in the nature of the civilization, it hopes to build up".)।

রাষ্ট্র ও শিক্ষা পরিচালনা

[**দুই**] রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য-নির্ণয়ে শেষ হ'য়ে যাবে না। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যবস্থাও করতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে নাগরিকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষালয় স্থাপন করতে হবে। শিক্ষালয়-গুলিকে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে, যাতে ক'রে তারা লক্ষ্যানুযায়ী শিক্ষা পরিচালনা করতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য যদি 14 বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তবে তার জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনমত শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী। কারিগরী ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করতে হবে। অর্থাৎ এক কথায়, সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের আয়োজন রাষ্ট্রকে করতে হবে।

[**তিন**] রাষ্ট্রের সংহতি বজায় রাখতে হ'লে নাগরিকদের সমাজ-আদর্শে শিক্ষা দিতে হবে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অংশের জন্য সমান হওয়া দরকার। সেইজন্য বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করতে হবে। আজকাল জাতীয় শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। কোঠারী কমিশনের রিপোর্টেও এই আদর্শের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। অবশ্য পাঠ্যক্রমের মধ্যে স্থানীয় অবস্থার প্রভাব ঠিকই থাকবে, তবে তা এক নির্দিষ্ট মূল ধারা অনুসরণ করে না চললে রাষ্ট্রে শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ

[**চার**] শিক্ষাকে জাতীয় সংহতির ও জাতীয় জীবনের বিকাশের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করলে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রকের মাধ্যমে সমগ্র দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাষ্ট্র যেমন এক দিক্ থেকে শিক্ষালয়ের অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেবে, অন্যদিকে শিক্ষালয়গুলো নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হ'চ্ছে কি না, তা দেখার জন্য বন্দোবস্ত রাখতে হবে রাষ্ট্রকে। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনে (কোঠারী কমিশন, 1966) স্নাতক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার তদারকের জন্য জেলা স্কুলবোর্ড (District School Board) গঠনের সুপারিশ করা হ'য়েছে।

জাতীয় সংহতির শিক্ষা ও রাষ্ট্র

[**পাঁচ**] সমাজের গতিশীলতার সঙ্গে তাল রাখার জন্য রাষ্ট্রকে শিক্ষা-সংক্রান্ত গবেষণার কাজ হাতে নিতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষালয়কে সহায়তা করার জন্য গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। জাতীয় শৈক্ষিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ-সংস্থা (National Council ot Educational Research and Training) এই বিষয়ে আমাদের দেশে বর্তমানে যথেষ্ট সাহায্য করছে। এই ধরনের গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান আরও আমাদের দেশে প্রয়োজন, যারা শিক্ষা নিয়ে নতুন গবেষণা করবে। এই কাজকে সুপরিকল্পিত আকারে রূপ দেওয়ার জন্য ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন রাজ্যশিক্ষা সংস্থা (State Institute of Education) প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেছেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষামূলক গবেষণা করা এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা-বিভাগের অফিসারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। ইতিমধ্যে অনেকগুলি রাজ্যে এই ধরনের সংস্থা স্থাপিত হ'চ্ছে।

শিক্ষামূলক গবেষণা ও রাষ্ট্র

[**ছয়**] সবশেষে, রাষ্ট্রকে আরও অনেক ছোটখাটো দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষার ব্যাপারে। মাঝে মাঝে শিক্ষকদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সমীক্ষা করার জন্য মাঝে মাঝে কমিটি ও কমিশন নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের নির্ধারিত পথে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

সমীক্ষা ও আলোচনা-চক্র

সুতরাং, আধুনিক রাষ্ট্রের শিক্ষার ব্যাপারে দায়িত্ব অনেকখানি। যদিও রাষ্ট্রকে আমরা শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করেছি, তাহ'লেও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবেই কাজ করতে হয়। রাষ্ট্র যদি শিক্ষার ব্যাপারে সক্রিয় না হয়, তবে কল্যাণময় রাষ্ট্র (Welfare State) স্থাপনের পরিকল্পনা কার্যকরী হবে না। রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনের সকল রকম নিরাপত্তায় যত্নবান হবে। জনগণের বৌদ্ধিক, নৈতিক ও দৈহিক বিকাশ-সাধন যদি না করা যায়, তবে তাদের কোনরকমেই নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না। তাই রাষ্ট্রকে শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন করতে হবে। ব্যক্তি যদি পিছিয়ে থাকে সে যদি অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ থাকে, তাহ'লে রাষ্ট্রের কোনরকম কল্যাণকামী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। তাই আধুনিক রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। এর মধ্য দিয়েই সমাজাদর্শ পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে যাবে।

মন্তব্য

সারসংক্ষেপ

প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত না হলেও কতকগুলি সামাজিক সংস্থা পরোক্ষভাবে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এইসব সংস্থার মধ্যে পরিবারের (family) নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। পরিবারে শিশু সামাজিক আচরণ, সামাজিক সম্পর্ক বৃত্তিমূলক দক্ষতা ধর্মীয় ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করে। এই শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সামাজিক ও স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে সংঘটিত হ'যে থাকে। তবে পরিবারের প্রভাবকে আরও কার্যকরী ও শিক্ষামুখী করে তুলতে হ'লে তার সঙ্গে শিক্ষালয়ের সম্পর্ককে আরও নিবিড় করতে হবে। শিক্ষালয় ও পরিবারের মধ্যে বন্ধনকে দৃঢ় করার দায়িত্ব শিক্ষালয়কেই নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষালয়গুলি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। যেমন—শিক্ষক-অভিভাবক সংস্থা প্রতিষ্ঠা, অভিভাবক দিবস পালন, গৃহ-পরিদর্শন, নিয়মিত শিক্ষার্থীদের রিপোর্ট দান ইত্যাদি। এইসব ব্যবস্থা অবলম্বনের পরেও দেখা যায় পরিবারের শিক্ষাগত গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন, পরিবারের ব্যক্তিদের অন্য কাজে অনেক বেশী বিব্রত ক'রে তুলছে। তাই পরিবার তার শিক্ষামূলক দায়িত্ব সঠিক-ভাবে সম্পাদন করতে পারছে না। এমন কি, এই সামাজিক পরিবর্তন, পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। পরিবারের শিক্ষামূলক এই ক্ষমতা-হ্রাসকে রোধ করতে হ'লে, শিক্ষার মাধ্যমেই সামাজিক মানুষের মধ্যে উপযুক্ত মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। অর্থাৎ, পরিবার ও শিক্ষাকে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে যাতে তারা পরস্পরের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হ'য়ে পড়ে।

শিক্ষার আর একটি সংস্থা হ'ল ধর্মীয় সংস্থা (Religious institution)। প্রত্যেক দেশের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা শুরু হয়েছিল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। যদিও আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা তার ধর্মীয় অবলম্বন থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে,

তাহ'লেও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি পরোক্ষভাবে সামাজিক মানুষের চারিত্রিক ও নৈতিক জীবন-বিকাশে সহায়তা করে থাকে। এই কারণে, আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার যুগেও শিক্ষার জন্য ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করা হয়।

আধুনিক যুগে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তা রক্ষা করে; রাষ্ট্রই ব্যক্তিজীবনের বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই আধুনিক সকল সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শিক্ষার আংশিক বা পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। রাষ্ট্র তার শিক্ষামূলক দায়িত্ব পালন করে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলীর মধ্যে। এইসব কার্যাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল—শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা, শিক্ষার পরিচালনভার গ্রহণ করা, শিক্ষামূলক গবেষণা, সমীক্ষা ইত্যাদি পরিচালনা করা এবং শিক্ষার আর্থিক ব্যয়ভার গ্রহণ করা।

শিক্ষার এইসব সংস্থাগুলিও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করে এবং শিক্ষালয়ের কর্ম-পরিচালনাকে প্রভাবিত করে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে, শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হবে না।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the importance of home as one of the most effective social agencies of education. How far can it be regarded as the first training ground of character ?

   [শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্থা হিসেবে গৃহের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। চরিত্র-গঠনের প্রারম্ভিক ক্ষেত্র হিসেবে গৃহকে বিবেচনা করা যায় কি ?]

2. Describe the role of home or family as an important agency of education.

   [শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে গৃহের ভূমিকা বর্ণনা কর।]

3. Discuss the complementary nature of home & school. What should the school do to ensure effective co-operation of the family ?

   [গৃহ ও শিক্ষালয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর। গৃহ বা পরিবারের সহায়তা শিক্ষাক্ষেত্রে পাওয়ার জন্য শিক্ষালয়ের কি কি করা উচিত ?]

4. How does the family fulfil its educational role ?

   [পরিবার কিভাবে শিক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে ?]

5. Discuss fully the role of the state as an agency of education with special reference to Indian setting.

   [বিশেষভাবে ভারতের রাষ্ট্রীয় পটভূমিকায় রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।]

6. Write an essay on : Home & School.
['গৃহ ও শিক্ষালয়' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর ।]
7. Write an essay on : Education & State.
['রাষ্ট্র ও শিক্ষা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর ।]
8. Discuss the nature and function of any two agencies of education.
[শিক্ষার যে কোন দুটি সংস্থার প্রকৃতি ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর ।]
9. How does family satisfy the needs of the child ? What role should the parents play in the education of a child ?
[পরিবার কিভাবে শিশুর চাহিদা পূরণ করে ? শিশুর শিক্ষায় পিতামাতার ভূমিকা কি হওয়া উচিত ?]
10. Bring ont the significance of the educative role that the family play in the life of a child
[পরিবার শিশুর জীবনে যে শিক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে, তার তাৎপর্য নির্ণয় কর ।]

শিক্ষার সংস্থা (৩)
Agencies of Education

শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যম হিসেবে পরিবার (family) এবং রাষ্ট্রের (state) ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এইগুলি ছাড়াও আরও কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন আছে, যেগুলির ভূমিকাকে বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। এগুলি পূর্বোক্ত সংস্থাগুলির মত স্থায়ী নয়। বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে, সমাজের মধ্যে সাময়িকভাবে গড়ে ওঠে। এইগুলিকে বলা হয় সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক সংস্থা। তাছাড়া, বর্তমানে কারিগরী বিদ্যার বিকাশের ফলে, নানা ধরনের গণসংযোগ (mass communication) সংস্থা গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, আধুনিক কালে অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, শিক্ষা-প্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার একটি প্রধান কৌশল হ'ল—সংযোগ-স্থাপন (communication)। যেমন, যে শিক্ষক যত সার্থকভাবে শিক্ষার্থীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, তিনি তত বেশী তাঁর কাজে সফল হন। তাই বর্তমানে ব্যবহৃত গণসংযোগের মাধ্যমগুলিও শিক্ষার মাধ্যম বা সংস্থা হিসেবে কাজ করে। আলোচ্য অধ্যায়ে এইরকম কয়েকটি সংস্থার শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে।

॥ বিভিন্ন সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক সংস্থা ॥
(Different Socio-cultural Organisation)

প্রত্যেক সমাজের মধ্যে আবার ছোট ছোট সংগঠন (organisation) বা সংঘ (group) সৃষ্টি। এইসব সংঘে কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষ কোন সামাজিক বা কৃষ্টিমূলক চাহিদা পরিতৃপ্ত করার জন্য মিলিত হয়। এক ধরনের একাত্মতাবোধ থেকে এইসব সংঘের সৃষ্টি হয়। এগুলিকে বলা হয় সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক সংস্থা (Socio-cultural Organisation)। এগুলি বিশেষভাবে ব্যক্তির কোন বিশেষ সামাজিক বা কৃষ্টিমূলক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। মানুষের যে যূথবদ্ধতার প্রবণতা সমাজ-গঠনে সহায়তা করে, সেই প্রবণতারই বশবর্তী হয়ে সে এই ধরনের দল গঠন করে, বা সমাজের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সংগঠন গড়ে তোলে। এইসব সংস্থাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ক্লাব (Club), পাঠাগার (Library) এবং ক্রীড়া-সংস্থা (Sports Organisation)।

[এক] শিক্ষার সংস্থা হিসাবে ক্লাব/সমিতি
(Club as an Agency of Education)

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, মানুষ যূথবদ্ধতার প্রবণতার তাগিদে দলবদ্ধ হয়ে সমাজের মধ্যে উপদল বা গোষ্ঠী গড়ে তোলে। এগুলিকে সমাজবিজ্ঞানীরা

বলেন, সামাজিক দল (Social group) শিশুদের বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্তর্নিহিত প্রবণতার দরুণ তারা ছোট ছোট দল গড়ে তোলে। সমাজবিজ্ঞানীরা এইসব দলের কাজ ও প্রকৃতি বিচার ক'রে বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। যেমন—ক্লিক্ (Clique), গ্যাং (Gang) ইত্যাদি। এইসব দলগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হয় এবং এর ওপর বয়স্কদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সাধারণভাবে এদের বলা হয় প্রাথমিক দল (Primary Social group)। এইসব দল খুব দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। অন্যদিকে, সমাজের মধ্যে অপর এক ধরনের দল গড়ে ওঠে, যেগুলির মধ্যে বয়স্কদের কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং যাদের বিশেষ সামাজিক বা কৃষ্টিমূলক উদ্দেশ্য থাকে। এগুলিকে বলা হয় মাধ্যমিক দল (Secondary group)। এগুলিকে মাধ্যমিক দল বলা হয় তার কারণ, এখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বয়স্কদের দ্বারা খুব বেশি হয় না। এগুলিকে স্বতস্ফূর্ত ও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত দলের মধ্যবর্তী অবস্থা বলা যায়। স্কাউট (Scout), গার্ল গাইড (Girl Guide) এবং বিভিন্ন ধরনের যুব সমিতি (Youth Club) এই শ্রেণীর সামাজিক দল। আমরা এখানে বিশেষভাবে ক্লাব বা সমিতি (Club) সম্পর্কে আলোচনা করব।

সমিতি কি ?

আমাদের দেশে বহু সাধারণ ধরনের সমিতি আছে। বিভিন্ন সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি গড়ে উঠেছে। এছাড়া কোন, বিশেষ স্থানে, ছোট ছোট সমিতিও গড়ে ওঠে। এইসব সমিতি তার সদস্যদের বিশেষ কোন সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। এই সমিতিগুলি মূলতঃ যে উদ্দেশ্যেই সংগঠিত হোক-না-কেন, পরোক্ষভাবে শিক্ষার দায়িত্বও পালন করে। যেমন—

সমিতির শিক্ষামূলক কাজ

(১) ছোট ছোট সমিতিগুলির মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত হয়। যখন কয়েকজন ব্যক্তি সংগঠিত হয়, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction) থাকে প্রবল। ফলে, এইরকম সংগঠনের মধ্যে সদস্যরা পরস্পরকে অনেক বেশি প্রভাবিত করতে পারে। সমবেদনা (Sympathy), সহযোগিতা (Co-operation), সহনশীলতা (Tolerance) ইত্যাদির মত যে সব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষার দ্বারা বিকাশ করতে চাই, সেগুলি সবই এই সমিতির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করতে পারে।

(২) সমিতিগুলির মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় (self-confidence) বাড়ে। এইসব সমিতিতে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে পরিচিত পরিবেশে প্রতিক্রিয়া করার সুযোগ পায়। এই কারণে, সে অপেক্ষাকৃত সহজ পরিবেশে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করার সুযোগ পায়। এই আত্মপ্রত্যয় ব্যক্তিজীবনে সর্বক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয় ; এমন কি, শিক্ষাক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হয়।

(৩) এই সকল সমিতির মধ্যে কতকগুলি আছে, যারা বিশেষভাবে আমোদ-প্রমোদ দানের জন্য গঠিত হয়। আমোদ-প্রমোদমূলক কাজেরও (Recreational

activities) শিক্ষাগত মূল্য আছে। বর্তমান শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের সার্থকভাবে অবসর-জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ দেওয়া। আমোদ-প্রমোদমূলক সমিতিগুলি শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে সহায়তা করে, শিক্ষার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

(৪) সমিতিগুলি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সৃজনাত্মক ক্ষমতা (Creative ability) বিকাশের সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন কর্মসূচী ও পাঠ্যক্রমের বাধ্যবাধকতার মধ্যে সব সময় শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক ক্ষমতা প্রকাশ করার সুযোগ থাকে না। আর এই সুযোগ না থাকায়, শিক্ষার্থীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশেও বাধা পায়। বর্তমানে বহু সমিতি গড়ে উঠেছে, যেগুলি বিশেষভাবে ব্যক্তির বিশেষ ধরনের ক্ষমতা বহিঃপ্রকাশের সুযোগ দেয় ; যেমন—সাহিত্যগোষ্ঠী (Literary club)। এর উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির সাহিত্য-প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ ক'রে দেওয়া। তাই বলা যায়, সমিতিগুলি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনাত্মক ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ ক'রে দিয়ে শিক্ষাব কাজকে সহায়তা করে।

৫ অনেক সমিতি আছে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামাজিক চেতনার বিকাশ হয়। এই সকল সমিতিতে, বিশেষভাবে, বর্তমান সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত না হ'লে, এইসব সমিতি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার পথও বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। ফলে, শিক্ষার যে উদ্দেশ্য ব্যক্তির মধ্যে উপযুক্ত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা, সে কাজে সহায়তা করে। তবে সংকীর্ণ রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা সমিতি পরিচালিত হ'লে তার কু-প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপর এসে পড়তে পারে।

৬) প্রত্যেক সমিতি তার সভ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলি নিয়ম নির্ধারণ করে। সদস্যদের ঐ বিধিনিষেধগুলি মেনে চলতে হয়, অর্থাৎ এইসব সমিতির সদস্যদের স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা থাকলেও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কাজ করতে হয়। এইভাবে কাজ করতে গিয়ে শৃঙ্খলাবোধের জন্ম হয়।

(৭) অনেক সময়, বিভিন্ন সমিতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও মতামত বিনিময়ের সুযোগ থাকে। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সামাজিক সমন্বয় হয়। আবার যেহেতু সমিতিগুলি উদ্দেশ্যমূলক ছোট ছোট গোষ্ঠী, সেহতু একই ব্যক্তি বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন সমিতির সদস্য হ'তে পারে। তার ফলেও জাতীয় সংহতির (National integration) পথ সুপ্রশস্ত হয়।

৮' সবশেষে, এই সমিতিগুলি সদস্যদের জ্ঞানমূলক বিকাশের জন্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। যেমন—বক্তৃতা, আলোচনাচক্র, ভ্রমণ ইত্যাদি। এই সকল কর্মসূচীর মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের সুযোগ আসে।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে দেখা আছে, সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক সংস্থা শিক্ষার কাজকে নানাভাবে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত নানা রকম বৈশিষ্ট্য-বিকাশে এই সমিতিগুলি কখনও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। এই কারণে, এইগুলিকে শিক্ষার সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

মন্তব্য

অনেক শিক্ষাবিদ্ এগুলিকে শিক্ষার সক্রিয় সংস্থা (Active agency of education) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষালয় (school) যদিও শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা, তাহ'লেও সেখানে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা খুব বেশি থাকে না, বা থাকলেও তা অনেকাংশে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু কোন সমিতির সদস্য হিসেবে ব্যক্তি যখন তার কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করে, তখন সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর এই স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা তার শিক্ষাকে অনেক বেশি কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত করে তোলে। এই কারণে বর্তমানে শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন (Learning) প্রক্রিয়াকে কার্যকরী ক'রে তোলার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ সমিতি গঠন করা হয়, যেমন—বিজ্ঞান-সমিতি (Science club), সাহিত্য-চক্র (Literary circle), উৎসব-সমিতি (Festival-club)।

[দুই] শিক্ষা-সংস্থা হিসেবে ক্রীড়া-সংস্থা (Sports Organisation as Agency of Education)

শৈশবে শিশুরা খেলার স্বাভাবিক প্রবণতায় একত্রিত হ'য়ে দল গঠন করে। সব দলগুলি খুবই সাময়িক। খেলাধুলার শেষে তাদের আর অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু কৈশোরে বা বয়সকালে ব্যক্তি এই প্রবণতার চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য স্থায়ী দল গঠন করে। এইগুলিকে বলা হয় ক্রীড়া-সংস্থা (Sports Organisation)। এই সংস্থাগুলি ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় ধরনের খেলাধুলার ব্যবস্থা করে। বর্তমানে আমাদের দেশে এ রকম বহু ছোট-বড় ক্রীড়া-সংস্থা আছে। এই সংস্থাগুলির মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে সামগ্রিক ক্রীড়া-ব্যবস্থার পরিচালনা করে। আবার কতকগুলি আছে, যেগুলি বিশেষ ক্রীড়া পরিচালনা করে।

ক্রীড়া-সংস্থা কি ?

সাধারণধর্মী বা বিশেষধর্মী যে কোন ধরনের ক্রীড়া-সংস্থাই হোক-না-কেন, এগুলি স্বাভাবিক নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে শিক্ষার কাজকে সহায়তা করে থাকে। তাই এগুলিকেও আধুনিক কালে শিক্ষার সংস্থা (Agency ot education) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সব ক্রীড়া-সংস্থাগুলি নিম্নলিখিত দিক থেকে শিক্ষাকে সহায়তা করে।

ক্রীড়া-সংস্থার শিক্ষাগত কাজ

(১) ক্রীড়া-সংস্থাগুলি বিশেষভাবে ব্যক্তির দৈহিক বিকাশে (Physical development) সহায়তা করে। শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ সাধন করা একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রীড়া-সংস্থাগুলি নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজন করে, তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বা সাধারণভাবে যে কোন ব্যক্তির দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

সুসমঞ্জস বিকাশ সম্ভব। সুতরাং, এই দিক্ থেকে বিবেচনা ক'রে বলা যায়, ঐ সংস্থাগুলি শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা হিসেবে কাজ করে।

(২) দৈহিক বিকাশ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে, তা পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতার বিকাশেও সহায়তা করে। দেহ সুস্থ থাকলে মানসিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এই মানসিক তৎপরতা শিখন-প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে।

(৩) ক্রীড়া-সংস্থাগুলির মাধ্যমে ব্যক্তির দলগত মনোভাব (Team-spirit) গড়ে ওঠে। দলবদ্ধভাবে খেলাধুলার সুযোগ দিলে ব্যক্তির মধ্যে দলের প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই দলগত মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার কাজকে ত্বরান্বিত করা যায়।

(৪) খেলাধুলার সময় ব্যক্তি তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে অনেকটা স্বাধীন-ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এর ফলে, তার মানসিক ভারসাম্য ঠিক থাকে। শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্তিসত্তার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ। ক্রীড়া-সংস্থাগুলি মানুষের অবচেতন আকাঙ্ক্ষাজনিত দ্বন্দ্বগুলি (conflict·) দূর ক'রে সুষম ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা ক'রে থাকে।

(৫) এই সকল সংস্থাগুলির মাধ্যমে অনেক সামাজিক গুণেরও বিকাশ হয়। এই প্রসঙ্গে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতার মনোভাব, নেতৃত্ব ইত্যাদি চারিত্রিক গুণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি।

(৬) ক্রীড়া-সংস্থার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়। প্রত্যেক সংস্থার কিছু নিয়মকানুন আছে, আবার প্রত্যেক খেলাধুলারও কিছু নিয়মকানুন আছে। এইসব নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থাকার ফলে ব্যক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়।

(৭) ক্রীড়া-সংস্থাগুলির প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক অনেক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয়। দলগত প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে দয়া, মমতা ইত্যাদি গুণগুলি সঞ্চারিত হয়। সাধারণতঃ যারা এইসব সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে, সামাজিক দৃষ্টিতে তাদের উন্নত নৈতিক মানের অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সুতরাং ক্রীড়া-সংস্থাগুলি পরোক্ষভাবে শিক্ষার কাজকে নানাভাবে সহায়তা করে। ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশে এই সংস্থাগুলি শিক্ষার কাজকে সহায়তা করে বলে, বর্তমানে শিক্ষাগুলিতে ক্রীড়াকে একটি আবশ্যিক সহপাঠ্যক্রমিক কাজ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধরনের সংস্থায় যেরূপ ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বা দলগতভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction) হয়, সেরূপ পারস্পরিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত আকারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য, বর্তমানে শিক্ষালয়ে অনুরূপ সংস্থা গঠন করা হয়। এই কর্মসূচী শিক্ষার কাজকে কিভাবে সহায়তা করে, তা বোঝাতে গিয়ে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন তাঁদের রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন—"It must be emphasised that such education contributes not only to physical fitness but also to physical

মন্তব্য

efficiency, mental alertness and development of certain qualities like perseverance, team spirit, leadership, obedience to rule, moderation in victory and balance in defeat." এই প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই আদর্শ শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে বিকশিত করার চেষ্টা করে।

[তিন] শিক্ষার সংস্থা হিসেবে গ্রন্থাগার (Library as an Agency of Education)

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-অর্জনের প্রক্রিয়ার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-অর্জনের একটি মূল কেন্দ্র হ'ল গ্রন্থাগার। রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্বের কথা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন—"এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোকে কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।" এই ভাষাকে চলমান করতে হ'লে, তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে হ'লে ব্যক্তি বা পাঠকের প্রয়োজন, আর যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠাগারে যাবে, সে যেমন এই স্থির প্রবাহের মধ্যে জীবন সঞ্চার করবে, তেমনি তার দ্বারা নিজেও প্রভাবিত হবে। এই কারণে বর্তমানে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার রাখা আবশ্যিক। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাড়া বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক সংস্থা পরিচালিত অনেক গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারগুলি বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশে শিক্ষার দায়িত্ব পালন ক'রে থাকে। এই হিসেবে যে কোন সংস্থা দ্বারাই পরিচালিত হোক-না-কেন, গ্রন্থাগার একটি শিক্ষার সক্রিয় সংস্থা। গ্রন্থাগার নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষার কাজকে সহায়তা করে—

গ্রন্থাগারের শিক্ষামূলক কাজ

(১) গ্রন্থাগারে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত পাঠের সুযোগ পায় এবং এর মাধ্যমে আত্ম-শিক্ষণের প্রক্রিয়া বাস্তবরূপ লাভ করে; অর্থাৎ এর মাধ্যমে ব্যক্তির শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চয় করা যায়।

(২) গ্রন্থাগার ব্যক্তির জ্ঞানমূলক চাহিদা (Need for knowledge) পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হয়। অনেক সময় ব্যক্তি সাধারণ শিক্ষালয়ে যে জ্ঞান আহরণ করে, তা তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। আরও জানবার কৌতূহল তার মধ্যে থেকে যায়। এই কৌতূহল মেটাতে না পারলে তার পরিতৃপ্তি আসে না। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিভিন্ন পুস্তক-পাঠের মাধ্যমে তার এই কৌতূহল সে নিবৃত্ত করতে পারে।

(৩) সুস্থ ও সমাজসম্মতভাবে অবসর-যাপনের ক্ষমতার বিকাশ আধুনিক শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। অবসর সময়ে গ্রন্থাগারে পুস্তক পাঠ করা একটি ভাল অভ্যাস। এই অভ্যাস একদিকে ব্যক্তিকে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি অন্যদিকে অবসরকে শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করে।

(৪) বর্তমানে, পল্লী ও শহরাঞ্চলে এক-একটি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র ক'রে সেই অঞ্চলের

সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে। অভিনয়, চিত্রপ্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, শিক্ষামূলক সভা ইত্যাদির আয়োজন এই গ্রন্থাগারগুলি ক'রে থাকে। এর মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিমানসের কৃষ্টিমূলক উন্নতি হয়।

(৫) গ্রন্থাগারে ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষামূলক আগ্রহের সঙ্গে বৃত্তিমূলক আগ্রহও সঞ্চার করতে পারে। এই বৃত্তিমূলক আগ্রহ পরবর্তী জীবনে কর্মসম্পাদনে ব্যক্তিকে সহায়তা করে।

(৬) গ্রন্থাগার পরোক্ষভাবে ব্যক্তির মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করে। গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সময় কতকগুলি বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। এই বিধিনিষেধগুলি বিশেষভাবে পাঠকদের সুবিধার্থেই রচনা করা হয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মস্বার্থে নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস এখানে গঠন করতে পারে। শৃঙ্খলা তাই এখানে স্বতঃস্ফূর্ত।

সুতরাং, গ্রন্থাগারের এই সকল শিক্ষামূলক কাজের কথা বিচার করে বলা যায়, এটি একটি শিক্ষার সংস্থা। ব্যক্তির যে কোনরকম শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাকে গ্রন্থাগার সহায়তা করতে পারে। তাছাড়া, গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক ও চারিত্রিক অনেক বৈশিষ্ট্য বিকাশ করা সম্ভব। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ মন্তব্য করেছেন—"All thinking people who are informed about the purposes of education, the nature of learning process and the curriculum and instructional procedures in today's school, are argreed upon the contribution which library service makes to the character and quality of the educational programme." গ্রন্থাগার শিক্ষার লক্ষ্যে পেঁছোতে সাহায্য করে, শুধু তাই নয়, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়েও তার ভূমিকা যথেষ্ট। স্বল্প-শিক্ষিত, উচ্চ-শিক্ষিত, সাক্ষর, নিরক্ষর, সকল সামাজিক ব্যক্তির কাছে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা একমাত্র গ্রন্থাগারই পেঁছে দিতে পারে।

মন্তব্য

॥ গণসংযোগমূলক ব্যবস্থা ॥
(Mass Media)

আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু গণ-সংযোগের মাধ্যমের সৃষ্টি হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণচেতনা সৃষ্টি করার বিষয়ে এদের কার্যকরী ভূমিকার কথা বর্তমানে অস্বীকার করা যায় না। এইসব গণসংযোগ ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল—সংবাদপত্র (Newspaper), বেতার (Radio), চলচ্চিত্র (Cinema) এবং টেলিভিশন (Television)। এইসব সংস্থাগুলি পরোক্ষভাবে শিক্ষার কাজকেও সহায়তা করে। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য সকল রকমের তথ্য এদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়।

এরা গণমনকে খুব সহজভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তাই এদের শিক্ষামূলক সম্ভাবনা প্রচুর। এই ধরনের মাধ্যমগুলি মানুষের অবসরকালে, তাকে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দেয় এবং সেই অভিজ্ঞতাগুলি সে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে বলে, অনেক শিক্ষাবিদ্ এগুলিকে **শিক্ষার অবসরকালীন মাধ্যম** (Leisure time agency of education) আখ্যা দিয়েছেন।

[এক] শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র (Newspaper as an agency of Education)

সংবাদপত্রের শিক্ষামূলক উপযোগিতা

আধুনিক যুগে সংবাদপত্র সবচেয়ে পরিচিত এবং বহুল-প্রচারিত একটি গণমাধ্যম। এই গণমাধ্যমে শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশিত হয় না, এর দ্বারা সাধারণভাবে সামাজিক ব্যক্তির মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা ইত্যাদি জাগ্রত করাও হয়। এই গণসংযোগ মাধ্যমের শিক্ষামূলক উপযোগিতাগুলি খুবই সার্মগ্রিক ধরনের। এর প্রভাব কোন বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের সীমাকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। এই প্রচার-মাধ্যমের শিক্ষামূলক উপযোগিতাগুলি হ'ল—

[১] আদর্শ দলমতগঠনে সংবাদপত্র সহায়তা করে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে নাগরিকদের চিন্তাধারার ঐক্য ও সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করে। সংবাদপত্রে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়। এইসব মতামত ও মন্তব্য ব্যক্তিদের মধ্যে, সামগ্রিক মত-গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। ফলে, সংবাদপত্র নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ক'রে শিক্ষার কাজকে সহায়তা করে।

[২] সংবাদপত্রে সংবাদ পরিবেশনের একটা নিজস্ব কৌশল আছে। এই মাধ্যমে সংবাদ এমনভাবে পরিবেশন করা হয়, যাতে তা সর্বজনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে ওঠে। যে কোন তথ্য ও ঘটনা পরিবেশনার এটাই হ'ল আদর্শ রীতি। নিয়মিত সংবাদপত্রপাঠে ব্যক্তির মধ্যে তথ্য পরিবেশন করার আদর্শ কৌশল সঞ্চারিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি সঠিকভাবে কোন ঘটনার বিবরণ দিতে বা অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে শেখে।

[৩] সংবাদপত্র ব্যক্তির চিন্তন-প্রক্রিয়াকে (Thinking process) সক্রিয় ক'রে তুলতে পারে। সংবাদপত্রে যে সকল সংবাদ পরিবেশন করা হয়, তা বিভিন্ন দিক্ থেকে ব্যক্তিজীবনে গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্বে ব্যক্তিকে চিন্তা ও বিচার-বিবেচনা করতে হয়। এই বিশ্লেষণধর্মী চিন্তন-প্রক্রিয়া ব্যক্তির শিখন-প্রক্রিয়াকেও সহায়তা করে।

[৪] সংবাদপত্র ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষামুখী আগ্রহ (Interest) সঞ্চার করতে পারে। বর্তমানে সংবাপত্রে সংবাদ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এইগুলি পাঠ করলে, প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ সব বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। এই আগ্রহ সামগ্রিকভাবে শিক্ষার কাজকে সহায়তা করে।

[৫] সংবাদপত্র অনেক সময় শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণে সহায়তা করে। যে কোন রাষ্ট্র শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে সংবাদপত্রের মতামতের ওপর গুরুত্ব দেন।

[৬] সংবাদপত্র অনেক সময় ব্যক্তির আচরণধারাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এর একটা সংস্কারমূলক কাজ (Corrective function) আছে। কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান যদি কোন বিসদৃশ আচরণ করে, সংবাদপত্র তাকে সে বিষয়ে সচেতন ক'রে দিতে পারে এবং আদর্শ আচরণ-গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

[৭] সংবাদপত্রপাঠের মাধ্যমে ব্যক্তি বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় (Curricular subject) অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান চর্চা করার সুযোগ পায়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের প্রয়োগও তারা পরিবেশিত সংবাদের মধ্যে দেখতে পায়। এর ফলে, প্রত্যক্ষ শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের বিস্তৃত তাৎপর্য শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পারে।

সংবাদপত্র শিক্ষার একটি নিষ্ক্রিয় মাধ্যম। কারণ, এই শিক্ষামাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। তাহ'লে এই মাধ্যম, শিক্ষার্থীর চিন্তাধারা ও নৈতিক ও সামাজিক মানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র মূলতঃ তিন ধরনের কাজ করে—(১) শিক্ষার্থীদের আনন্দ দান করে। কারণ, এখানে পাঠের সময় কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় না। (২) বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভিত্তিক সঠিক ধারণা-গ্রহণে সহায়তা করে এবং (৩) বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে শিক্ষাদান ক'রে সামগ্রিক মনোভাব গড়ে তোলে। তবে প্রসঙ্গক্রমে এ কথা স্মরণ রাখা দরকার, সংবাদপত্র যে সব সময় শিক্ষা-অভিমুখী প্রভাব বিস্তার করে তা নয়, অনেক সংবাদপত্র শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ মনোভাবও সৃষ্টি করতে পারে। নানারকম কু-অভ্যাস গঠন, শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাব, সামাজিক কোন আদর্শের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং খারাপ জিনিসের প্রতি আগ্রহ সংবাদপত্রের মাধ্যমে সঞ্চারিত হ'তে পারে। এই কারণে সংবাদপত্রের কু-প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের সচেতন থাকা উচিত।

মন্তব্য

[দুই] শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র
(Cinema as an agency of Education)

বর্তমান জগতে চলচ্চিত্র শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। গণসংযোগের এই মাধ্যম একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আনন্দ দান করতে পারে এবং শিক্ষাও দিতে পারে। শিক্ষাবিদ্ চ্যার্টার্স (W. Charters) বলেছেন—"Children know so little and are so anxious to learn. They seek information, stimulation and guidance in every direction. They are often confused, frequently maladjusted and

চলচ্চিত্রের শিক্ষাগত মূল্য

sometimes without confidence. In this situation, the motion picture seems to be a godsend to them." এই বক্তব্যের মধ্যেই চলচ্চিত্রের শিক্ষাগত গুরুত্ব ব্যক্ত হয়েছে। তবে বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌গণ চলচ্চিত্রের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে ভাল, এ কথা স্বীকার করেন না। তার অনেক কু-প্রভাবও শিক্ষার্থীদের ওপর পড়ে। তাই এখানে আমরা তার ভাল ও খারাপ উভয় দিক্‌ সম্পর্কে উল্লেখ করব।

চলচ্চিত্র শিক্ষার কাজকে নিম্নলিখিত দিকে সহায়তা করে।

[১] চলচ্চিত্র শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুতে অনেক বেশী বাস্তবসম্মত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে সহায়তা করে। এখানে ভাষা, শব্দ, গতি ও মাত্রা (Dimension) সব কিছুর সার্থক সমন্বয় হয়। তাই শিক্ষার্থীর বস্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয় পরিপূর্ণ। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে এক ধরনের শিক্ষামূলক প্রদীপন (Teaching aid) বলা হয়।

[২] চলচ্চিত্র শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী ক'রে তোলে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে সকল তথ্য পরিবেশন করা হয়, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের সম্পর্ক থাকে। বা, প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক'রেই এই সকল বিষয়বস্তু পরিবেশন করা হয়। যেহেতু শিক্ষার্থী বা পাঠ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে দেখার সুযোগ পায়, সেহেতু এই ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ থাকে সবচেয়ে বেশী।

[৩] চলচ্চিত্র, শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করে। পরিবেশিত তথ্য তাদের জ্ঞান (Knowledge) বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কোন বিশেষ কর্ম-পর্যবেক্ষণ তাদের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। কোন ঘটনার চিত্রভিত্তিক বিবৃতি মনোভাব-গঠনে সাহায্য করে।

[৪] চলচ্চিত্র, সাধারণভাবে নিম্ন ও উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করতে পারে। বিষয়বস্তু বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের দিক্‌ থেকে বিশেষ কোন অসুবিধা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুরা বোধ করে না। তবে কোন্‌ চিত্র কোন্‌ শিক্ষার্থীকে কতটা চিন্তাশীল করে তুলবে তা নির্ভর করছে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার ওপর। তাই পর্যবেক্ষণমূলক জ্ঞান যেখানে প্রধান সেখানে চলচ্চিত্রের প্রভাব অনেক বেশী।

(৫) চলচ্চিত্র বিশেষ কোন সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি আদর্শ মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এই কারণে বর্তমানে জনশিক্ষার ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র ব্যবহার করা হয়।

(৬) চলচ্চিত্র শিক্ষার জন্য এক পরিবেশ রচনা করে। এই পরিবেশে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগও (Attention) বেশী থাকে। এর ফলে মনোযোগেরও প্রশিক্ষণ হয়।

(৭) চলচ্চিত্র অনেক সময় শিক্ষার্থীদের নানা রকম ব্যক্তিগত চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। তাদের অহং সত্তা (Ego) পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং এর ফলে অপসঙ্গতি দূর হয়।

(৮) প্রয়োজনবোধে চলচ্চিত্রের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে, শিক্ষার্থীদের অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণ করতে সহায়তা করা যায়।

চলচ্চিত্র অনেক সময় শিক্ষার কাজকে ব্যাহত করে। কারণ তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কু-অভ্যাস গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চলচ্চিত্রের এই খারাপ দিকগুলি হ'ল—

চলচ্চিত্রের অসুবিধা

[এক] চলচ্চিত্র দেখে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় বিরূপ মতাদর্শ গঠন করতে পারে। সাধারণতঃ ব্যবসায়িক কাহিনী চিত্রে অনেক সময় এমন সব ঘটনা দেখানো হয়, যেগুলি সামাজিক জীবনের দিক্ থেকে কাম্য নয়। শিশুদের ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা কম। যা তাদের অহং সত্তাকে পরিতৃপ্ত করে, তাকেই তারা গ্রহণ করে। ফলে, এর প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মনে বিকৃত সমাজাদর্শের ছাপ পড়তে পারে।

[দুই] অনেক শিক্ষার্থী চলচ্চিত্র দেখার পর, বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে, বা তারা ভুল শেখে। যেহেতু চলচ্চিত্রে একমুখী সংযোগ (one-way communication) হয়, সেহেতু এই ভুল শোধরানোর কোন সুযোগ থাকে না।

[তিন] ব্যবসায়িক-ভিত্তিক যে সব চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়, তার মধ্যে নির্দিষ্ট কোন শিক্ষাগত উদ্দেশ্য থাকে না। ফলে, সামগ্রিকভাবে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চিত্র কতটুকু শিক্ষার কাজে লাগবে, তা সঠিক ক'রে বলা যায় না। যে পরিমাণ সময় এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীরা ব্যয় করছে, সে অনুপাতে শিক্ষাগত ভাল ফল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ফলে, এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের শক্তির অপচয় হয়।

[চার] চলচ্চিত্রের প্রভাবে শিক্ষার্থী নানা রকম কু-অভ্যাস গঠন করে। এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই মুশকিল।

চলচ্চিত্রের শিক্ষামূলক উপযোগিতা ও তার কু-প্রভাবের কথা বিবেচনা ক'রে আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌গণ তাকে অনেক বেশী নিয়ন্ত্রিত আকারে ব্যবহারের কথা বলেছেন। ফলে, ব্যবসায়িক-ভিত্তিতে যে সব কাহিনী-চিত্র তৈরি করা হয়, সেগুলিকে আর শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয় না। বর্তমানে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র (Educational Film) তৈরি করা হ'চ্ছে। শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাঠ্য বিষয়কেন্দ্রিক যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়, তাকেই বলে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রগুলি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কাজকে পরিপূর্ণভাবে সহায়তা করে।

মন্তব্য

[তিন] শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বেতার
(Radio as an Agency of Education)

বেতারের মত অন্য কোন গণসংযোগ-ব্যবস্থা এত দ্রুত জনপ্রিয় হয়নি। বেতার বর্তমানে একটি গণশিক্ষার মাধ্যম। বেতার নানা দিক থেকে শিক্ষাদানের কাজকে সহায়তা করে এবং নিজেও শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বেতারের শিক্ষাগত উপযোগিতা হ'ল—

বেতারে শিক্ষামূলক উপযোগিতা

(১) বেতার মৌখিক শিক্ষণকে (verbal teaching) সহায়তা করে। আমাদের শিক্ষালয়ে পাঠদানের কাজ বিশেষভাবে শিক্ষকের বক্তৃতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বেতারের মাধ্যমে শিক্ষণ দিলে বিষয়বস্তু অনেক হৃদয়গ্রাহী হয়।

(২) বেতারের মাধ্যমে কোন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে বাস্তবতা খুঁজে পায়। ফলে, শিক্ষার্থীরা ঐ বিষয়বস্তু গ্রহণে বেশী আগ্রহী হয়।

(৩) বেতারের মাধ্যমে কোন ঘটনা, ঘটমান অবস্থায় বিবৃত করা যায়। ফলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিক ছাপ ফেলতে পারে।

(৪) বেতারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যায়। ফলে, বিষয়বস্তু নির্ভুল ও তথ্যসমৃদ্ধ হয়।

(৫) বেতার-প্রচারের মাধ্যমে অনেক শিক্ষার্থীকে একই সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায়। এমন কি, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এত ব্যক্তিকে এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায় না।

বেতারে শিক্ষার এইসব সুবিধা আছে বলে, বর্তমানে বেতারের মাধ্যমে শিক্ষামূলক কর্মসূচী প্রচার করা হয়। যেমন—সংগীত-শিক্ষার আসরের মাধ্যমে সংগীতের শিক্ষাদান করা হয়; 'বিদ্যার্থীদের জন্য' প্রচার-সূচীর মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়ের পাঠ প্রচার করা হয়। 'পল্লীমঙ্গলের আসরে'র মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও কৃষিকাজমূলক পাঠ প্রচার করা হয়। বেতার-পাঠের প্রধান অসুবিধা হ'ল এখানেও শিক্ষামুখী সংযোগ একমুখী (one-way communication) হয়। ফলে, শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন থাকলে, তা তারা বক্তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে না। তাছাড়া, এই ধরনের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা পরিচলনা করার খুব অসুবিধা আছে। কারণ, আমাদের দেশে বেতার প্রচার-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে, শিক্ষার্থীর উপযোগী শিক্ষামূলক বিষয়ের প্রচারের ব্যবস্থা তাদের পক্ষে সব সময় করা সম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্ধারিত সূচীই বিদ্যালয়কে অনুসরণ করতে হয়। ফলে, বিদ্যালয়ে অন্যান্য কাজ পরিচালনার অসুবিধা হ'য়ে পড়ে।

মন্তব্য

[চার] শিক্ষার সংস্থা হিসেবে টেলিভিশন
(Television as an Agency of Education)

বর্তমানে টেলিভিশনও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হ'চ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে টেলিভিশন-চলচ্চিত্র ও বেতারের চেয়ে অনেক বেশী জনপ্রিয় গণসংযোগ-মাধ্যম। এমন কি, অনেক দেশে বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব টেলিভিশন কেন্দ্র থাকে। এইসব টেলিভিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে পাঠ প্রচার করা হয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যে সব টেলিভিশন প্রচার-সংস্থাগুলি আছে, তারাও শিক্ষামূলক কার্যসূচী গ্রহণ করে। টেলিভিশনে বেতার এবং চলচ্চিত্রের ভাল গুণগুলিকে সমন্বিত ক'রে একই আদর্শ শিখনের মাধ্যমে রচনা করা যায়।

॥ আলোচনা ॥

শিক্ষার সংস্থাগুলি সম্পর্কে পরপর তিনটি অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। এইসব সংস্থাগুলির মধ্যে কোন একটি সংস্থাকে এককভাবে বেছে নেওয়া যায় না বা যে কোন একটির ওপর প্রধান গুরুত্ব দেওয়া যায় না। গতানুগতিক ধারণায় আমরা শিক্ষালয়কে শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা হিসেবে শিক্ষার পরিপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে থাকি, কিন্তু পৃথিবীব্যাপী বর্তমানে শিক্ষালয় বর্জনের (De-schooling) যে আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষালয়ের ওপর আর এত বেশী নির্ভর করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার কোন একটি সংস্থা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারে না। শিক্ষার অন্যান্য যে সব পরোক্ষ সংস্থাগুলির কথা আমরা উল্লেখ করেছি, তারা সমাজের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে গড়ে উঠলেও প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে তাদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তিজীবনই এইসব সামাজিক সংস্থাগুলির বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করতে পারে। তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষালয় এককভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আধুনিক অর্থে শিক্ষা কেবলমাত্র শিক্ষালয়ে সংঘটিত হয় না, বৃহত্তর সমাজের প্রতি অংগে প্রতি মুহূর্তে তা চলতে থাকে। তাই শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে এই সংস্থাগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

॥ সারসংক্ষেপ ॥

শিক্ষার মূল কতকগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্থা ছাড়াও বর্তমানে আরও কতকগুলি সংস্থার কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে। এই সব সংস্থাগুলির কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন, আবার কতকগুলি বিশেষ ধরনের গণসংযোগ (Mass Communication) ব্যবস্থা। বর্তমানে এইসব সংস্থাগুলির শিক্ষামূলক গুরুত্বকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। যেমন—ক্লাব (Club), ক্রীড়া-সংস্থা (Sports organisation), গ্রন্থাগার (Library), সংবাদপত্র (Newspaper), চলচ্চিত্র (Cinema), বেতার (Radio) ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি সংস্থা, বিভিন্ন দিক থেকে এদের কর্মসূচী ও কার্যাবলীর মাধ্যমে শিশুর সামাজিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক জীবনের বিকাশে সহায়তা করে থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the importance of the Newspaper, Library and Sports Organisation as agencies of education.
   [শিক্ষার সংস্থা হিসেবে সংবাদপত্র, গ্রন্থাগার ও ক্রীড়াসংস্থাগুলির ভূমিকা বিবৃত কর।]
2. What is meant by active agencies of education? Write in details about any one of them?

[শিক্ষার সক্রিয় সংস্থা বলতে কি বোঝ ? তাদের যে কোন একটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর ।]

3 What is meant by leisure-time agencies of education ? Write an eassy on their educational values
[শিক্ষার অবসরকালীন মাধ্যম বলতে কি বোঝায় ? এইসব সংস্থাগুলির শিক্ষাগত মূল্য সম্পর্কে আলোচনা কর ।]

4 Write an essay on "Cinema as an agency of education".
["শিক্ষার সংস্থা—চলচ্চিত্র" এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর ।]

5. What are the values of clubs, library and sports organisations in our society ? Discuss their impacts on the children's education
[আমাদের সমাজে ক্লাব, গ্রন্থাগার এবং ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠানগুলির মূল্য কি ? শিশু-শিক্ষায় এদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর ।]

6 Write notes on [টীকা লিখ] :
(a) Radio as an agency ot education [শিক্ষার সংস্থা হিসেবে বেতার]
(b) Club as an agency of education. [শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ক্লাব]
(c) Nespaper as an agency of education. [শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র]
(d) Role of Library in education. [শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা]

7. What is meant by the term 'Mass Media' ? Name some important educative media and show their influences upon the life of a child.
[গণমাধ্যম বলতে কি বোঝায় ? এ ধরনের কয়েকটি গণসংযোগ মাধ্যমের নাম উল্লেখ কর এবং শিশুর জীবনে তাদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর ।]

8. What do you understand by socio-cultural Organisation ? Mention any two of such organisations and discuss their impact on child's education.
[সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা বলতে কি বোঝ ? যে কোন দুটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থার উল্লেখ কর এবং শিশুর শিক্ষার ওপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর ।]

9. What is meant by Leisure-time agencies of education ? Write an essay on their educative values.
[শিক্ষার 'অবসরকালীন মাধ্যম' বলতে কি বোঝায় ? এই মাধ্যমগুলির শিক্ষাগত মূল্য আলোচনা কর ।]

পাঠ্যক্রম
Curriculum

শিক্ষার উপাদান হিসেবে আমরা ইতিপূর্বে শিক্ষার্থী (Educand বা child) এবং শিক্ষার সংস্থা (Agencies of Education) সম্পর্কে আলোচনা করেছি ; আলোচনা-প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা হ'য়েছে, আধুনিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক, তাই এখানেই শিক্ষার্থীই প্রধান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখার দরকার, শিক্ষা (Education) একটি জটিল প্রক্রিয়া। একে আমাদের দেহ-যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দৈহিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন সময়ে কোন একটি তন্ত্রের (system) প্রাধান্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাই বলে অন্যান্য তন্ত্র (system) অপ্রয়োজনীয় বা গৌণ, এ কথা বলা যায় না। সেইরূপ আধুনিক শিক্ষার প্রধান অংগ শিশু হ'লেও, অন্যান্য উপাদান অপ্রয়োজনীয় বা গৌণ, তা সত্য নয়।

প্রস্তাবনা

প্রকৃতপক্ষে, পাঠ্যক্রম (curriculum) শিক্ষার একটি আবশ্যিক ও প্রয়োজনীয় অংশ। পাঠ্যক্রম ছাড়া শিক্ষা-প্রক্রিয়া স্পন্দনহীন অবাস্তব কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ধারণের পর পাঠ্যক্রম সম্পর্কেই বেশী আলোচনা করা হয়। শিক্ষার লক্ষ্যনির্ণয়-সংক্রান্ত আলোচনা মূলতঃ তাত্ত্বিক এবং দর্শনভিত্তিক। কিন্তু শিক্ষা-বিজ্ঞানে পাঠ্যক্রম-সংক্রান্ত আলোচনায়, আমরা তাত্ত্বিক বা দার্শনিক ভাবধারার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার এক সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করি। এর কারণ, পাঠ্যক্রম শিক্ষার আদর্শগত লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার কথা চিন্তা করে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ দিক্ সম্পর্কে আলোচনা করব।

॥ পাঠ্যক্রম কি ? ॥
(What is Curriculum ?)

আমরা সাধারণ অর্থে, শিক্ষার্থীদের করণীয় কাজ বা গ্রহণীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে বোঝানোর জন্য নানা রকম বাংলা শব্দ ব্যবহার করে থাকি। কখনও বলি 'পাঠ', কখনও বলি 'পাঠ্যসূচী', আবার কখনও বা বলি 'জ্ঞান-সামগ্রী'। কিন্তু শিক্ষা-বিজ্ঞানে 'পাঠ্যক্রম' শব্দটি এরকম বহু অর্থ বা বহু তাৎপর্যে ব্যবহার করা হয় না। একে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলা 'পাঠ্যক্রম' শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হ'ল কারিক্যুলাম (curriculum)। ব্যুৎপত্তিগত দিক্ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, ইংরাজী curriculum শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ক্যুরিয়র (currere) থেকে যার অর্থ হ'ল—'দৌড়' (race) আর কারিক্যুলাম (curriculum) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল—বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য দৌড়ের পথ (course to be run for reaching a certain goal)। অর্থাৎ, শিক্ষাক্ষেত্রে 'কারিক্যুলাম' কথা ব্যবহার ক'রে, শিক্ষাকে

পাঠ্যক্রম সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা

দৌড়ের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে যার শেষ হ'ল শিক্ষার লক্ষ্যে (aim of education)। আমাদের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার (**Formal educational system**) কাজ হ'ল শিক্ষার্থীকে পূর্বনির্ধারিত পথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া। আর এই পথ হ'ল—পাঠ্য বিষয়-কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা (**Subject centred experience**)। এই অর্থে আমরা ইংরাজী কারিকুলাম (curriculum)-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করছি পাঠ্যক্রম। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে' বলা হ'য়েছে—পাঠ্যক্রম হ'ল বিভিন্ন স্তরের শিক্ষালয়ে অনুশীলিত পাঠ্যবিষয়সমূহের সমবায়।[1] এই সংজ্ঞায় শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ও পাঠ্যক্রমকে সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু, এই সংজ্ঞাও গতানুগতিক। পাঠ্যবিষয়সূচী (**syllabus**) এবং পাঠ্যক্রম বলতে এক জিনিস হিসেবে বিবেচনা করলে ভুল করা হবে। কিন্তু বহু শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। পাঠ্যক্রম-সংক্রান্ত এই ধারণা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের প্রচেষ্টাকে পাঠ্য বিষয়সমূহের অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। তাই পাঠ্যক্রম-সংক্রান্ত এই ধারণাকে প্রাচীন মতবাদ বলা হয়, যার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের নীতির কোন সামঞ্জস্য নেই।

আধুনিক কালে শিক্ষা-বিজ্ঞানে শিক্ষাকে একটি গতীয় প্রক্রিয়া (Dynamic process) হিসেবে বিবেচনা করা হ'য়েছে। এই গতিশীল প্রক্রিয়ার লক্ষ্যও গতিশীল। তাই নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়-কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা কখনই পরিবর্তনশীল লক্ষ্যে উপনীত হ'তে সহায়তা করতে পারে না। জীবনকে গতিবান ক'রে তোলার জন্য শিশুদের বহুমুখী অভিজ্ঞতা-অর্জনের প্রয়োজন। অর্থাৎ, এই আধুনিক তাৎপর্য অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়সমূহ পাঠ্যক্রমের অংশ মাত্র। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক ক্রিয়া মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যা কিছু শেখে, তাই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ পেনি (**Payne**) বলেছেন—শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও আচরণগত পরিবর্তন আনার জন্য বিদ্যালয়ে যে সকল কর্মসূচী নির্বাচন করা হয় এবং সচেতনভাবে পরিচালনা করা হয়, তাদের সমবায় হ'ল পাঠ্যক্রম।[2] মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের (Secondary Education Commission—Mudaliar) প্রতিবেদনে[3] পাঠ্যক্রম-সম্পর্কিত এই

পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আধুনিক ধারণা

---

1. 'Curriculum—a course of study laid down for the students of a University or school, or in wider sense, for schools of certain standard.' Encyclopaedia Britanica.

2. "Curriculum consists of all the situations that school may select and consciously organise for the purpose of developing the personality of its pupils and for making behaviour change in them."—Payne

3. According to best modern educational thoughts, curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in schools but includes the sum total of experiences that a pupil receives through the manifold activities that go on in the school, in the classroom, library, laboratory, workshop, play ground and in the numerous informal contacts between teachers and pupils."—Secondary Education Commission.

ধারণাকে আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কমিশন বলেছেন, পাঠ্যক্রম কেবলমাত্র কতকগুলি জ্ঞানমূলক পাঠ্যবিষয়ের সমন্বয় নয়। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে, গ্রন্থাগারে, পরীক্ষাগারে, খেলার মাঠে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে সাধারণ মেলামেশার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তারই সমন্বয় হ'ল পাঠ্যক্রম। শিক্ষার লক্ষ্য হল—শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা; আর তার জন্য চাই বহুমুখী প্রচেষ্টা। পাঠ্যক্রম-সংক্রান্ত এই বিস্তৃত ধারণার মধ্যেই আমরা এই ধরনের বহুমুখী প্রচেষ্টা তথা সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ইঙ্গিত পাই। সুতরাং আধুনিক এই ধারণা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম হ'ল—জীবনের বিকাশ-উপযোগী সুনির্বাচিত অভিজ্ঞতাসমূহের সার্থক সমন্বয়। (Curriculum is an organised and integrated pattern of experiences, necessary for development.)

পাঠ্যক্রম-সংক্রান্ত এই আধুনিক ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। **প্রথমতঃ**, পাঠ্যক্রম এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমবায় যেগুলি অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের সাবিক বিকাশ হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, যেহেতু, ব্যক্তিজীবনের সার্বিক বিকাশ কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সেহেতু পাঠ্যক্রমের মধ্যে জ্ঞানমূলক বিষয় ছাড়াও, অন্যান্য অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তির চারিত্রিক বিকাশ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তির মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলী বিকাশ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, তার সামাজিক অভিযোজন-সহায়ক অভিজ্ঞতা এবং তার জীবিকা-অর্জনে সহায়ক অভিজ্ঞতা, সবই এই পাঠ্যক্রমের ধারণার অন্তর্ভুক্ত। **তৃতীয়তঃ**, পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতাগুলি কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষের (class-room) মধ্যে দেওয়া সম্ভব নয়। শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা শ্রেণীকক্ষের গতানুগতিক পাঠের মাধ্যমে দেওয়া গেলেও, সামাজিক, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর বিকাশের জন্য উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সকল সময়ে শ্রেণীকক্ষে দেওয়া যায় না। তাই এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন সব অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে, যেগুলি কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষের বাইরে দেওয়া সম্ভব। এই কারণে, বর্তমানে অনেক শিক্ষাবিদ্ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতাসমূহকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন—(১) **শ্রেণীকক্ষের-অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতাসমূহ** (Within-class activities); এবং (২) **শ্রেণীকক্ষ-বহির্ভূত অভিজ্ঞতাসমূহ** (out-of-class-room activities)। এখনও অনেক শিক্ষাবিদ্ দ্বিতীয় ধরনের অভিজ্ঞতাসমূহকে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী (co-curricular activities) নামে অভিহিত করেন। তাই এদের সম্পর্কে আলোচনা আমরা পৃথক অধ্যায়ে করব। **চতুর্থতঃ**, পাঠ্যক্রম-সংক্রান্ত আধুনিক ধারণা শিক্ষার মতই গতিশীল বা পরিবর্তনশীল। পাঠ্যক্রমের এই ধারণা শিক্ষার লক্ষ্যের (aims of education) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এখন, শিক্ষার লক্ষ্য যেমন জীবনাদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, তেমনি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত

আধুনিক তাৎপর্যে পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

অভিজ্ঞতাসমূহেরও পুনর্বিন্যাস করতে হয়। তাই পাঠ্যক্রম-সংক্রান্ত আধুনিক ধারণাও গতীয় (Dynamic)। **পঞ্চমতঃ,** পাঠ্যক্রম হ'ল শিক্ষার লক্ষ্যে পেঁছোনোর উপায়। পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা নামক জীবন-প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা যায়। তাই এর যেমন একটি তাত্ত্বিক বা দার্শনিক ভিত্তি আছে, তেমনি এর ব্যবহারিক উপযোগিতাও বর্তমান।

॥ 'পাঠ্যক্রম' সম্পর্কে আধুনিক ও প্রাচীন ধারণার পার্থক্য ॥

প্রাচীন ধারণা	আধুনিক ধারণা
১। পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক বিকাশ।	১। পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ।
২। পাঠ্যক্রমের উপাদান ছিল কেবলমাত্র জ্ঞানমূলক বিষয় বা পাঠ্যবিষয়।	২। পাঠ্যক্রমের উপাদান শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক কার্যাবলীর সমন্বয়।
৩। পাঠ্যক্রমের উপাদানগুলিকে কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষে অনুশীলনযোগ্য ছিল।	৩। পাঠ্যক্রমের উপাদানগুলি শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে অনুশীলনযোগ্য।
৪। পাঠ্যক্রম ছিল অপরিবর্তনীয়	৪। পাঠ্যক্রম গতিশীল বা পরিবর্তনসাপেক্ষ।
৫। পাঠ্যক্রম ছিল সম্পূর্ণরূপে তাত্ত্বিক আদর্শ-কেন্দ্রিক	৫। আধুনিক পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর জীবন-কেন্দ্রিক।

॥ বিভিন্ন প্রকারের পাঠ্যক্রম ॥
(Different types of Curriculum)

সমাজ-ব্যবস্থা ও জীবন-পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। জীবনের আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যও পরিবর্তিত হ'চ্ছে, এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিভিন্ন যুগে মানুষের কর্ম-প্রেরণার উৎস হিসেবে বিভিন্ন ধরনের জীবনাদর্শ (Philosophy of life) প্রচারিত হ'য়েছে। এইসব জীবনাদর্শ সমসাময়িক কালের শিক্ষা-চিন্তাকেও প্রভাবিত করেছে। ফলে, গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিক্ষা-দর্শন (Educational philosophy)। এইসব শিক্ষাদর্শন বিভিন্ন কালে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যক্রমের তাৎপর্যের পুনর্মূল্যায়ন করেছে। শিক্ষার লক্ষ্য যেমন বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হ'তে হ'তে বর্তমানে এক নতুন সমন্বয়ের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে, তেমনি পাঠ্যক্রমও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপ পরিবর্তন ক'রে আধুনিক পর্যায়ে এসে পেঁছেছে। তাই পাঠ্যক্রম সম্পর্কে

পাঠ্যক্রমের শ্রেণীবিভাগ

আলোচনা করতে গেলে তার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতে হয়। আদর্শগত দিক্ থেকে বা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ থেকে পাঠ্যক্রমকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Traditional Subject centred curriculum), (২) কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity curriculum), (৩) অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম (Experience curriculum), (৪) অবিভাজ্য বা সমন্বয়িত পাঠ্যক্রম (Undifferentiated curriculum) ইত্যাদি। আমরা এখানে এদের সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করব এবং এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক শিক্ষাদর্শের উপযোগী জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম-নির্ধারণের নীতি কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার, শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্যভেদে শিক্ষাক্ষেত্রে স্তরভেদ করার রীতি পৃথিবীর সমস্ত দেশেই আছে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের জন্য পৃথক পৃথক পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করার রীতিও বর্তমান। যেমন—প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম (Curriculum for Primary stage), মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম (Curriculum for Secondary stage), উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম (Curriculum for Higher Secondary stage), স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রম (Curriculum for Degree stage) ইত্যাদি। এছাড়া বিশেষ বিশেষ শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়। এখানে এই জাতীয় শিক্ষাস্তরভিত্তিক বিভিন্ন পাঠ্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবুও যতটুকু সম্ভব, সংক্ষেপে এইসব পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে।

[এক] গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম
(Traditional subject centred Curriculum)

পূর্বে উল্লেখ করেছি, পাঠ্যক্রম বলতে সাধারণ অর্থে আমরা বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়-সমূহকে বুঝি। এই জাতীয় ধারণার মূল কারণ হ'ল দীর্ঘদিনের অভ্যাস। আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দীর্ঘদিন ধরে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল, শিক্ষার্থীকে কিছু বিষয়কেন্দ্রিক তাত্ত্বিক জ্ঞান-আহরণে সহায়তা করা। ফলে, পাঠ্যক্রমের মধ্যে শুধুমাত্র কতকগুলি তাত্ত্বিক জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষালয়ের কাজ ছিল শিক্ষার্থীকে ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা, ইংরাজী ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানদান করা। এই জাতীয় পাঠ্যক্রম যার মধ্যে কেবলমাত্র বিষয়কেন্দ্রিক (Subject centred) জ্ঞানমূলক তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাকেই বলা হয় গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Traditional subject centred curriculum)। এই জাতীয় পাঠ্যক্রমে সাধারণতঃ কতকগুলি ভাষা (language), গণিত (Mathematics), বিজ্ঞান (Science), ইতিহাস (History), ভূগোল (Geography) ইত্যাদি বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক [illegible] নির্দিষ্ট করা থাকে। শিক্ষার্থীরা এই

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম কি ?

পাঠ্যসূচীগুলি বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের নির্দেশনায় পৃথক পৃথক ভাবে অনুশীলন করে থাকে।

এই ধরনের বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম রচনার মূলে কয়েকটি সাধারণ নীতি ক্রিয়াশীল—**প্রথমতঃ**, শিক্ষার সংকীর্ণ লক্ষ্য থেকে এই ধরনের পাঠ্যক্রম রচনার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগে আমাদের দেশে সাধারণ লোকের কাছে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ছিল বৃত্তি সংগ্রহ করা। দু'এক কলম লিখতে পারলে এবং কিছু পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু আবৃত্তি করতে পারলে একটা চাকরি সংগ্রহ করা যেত। তাই শিক্ষার এই সংকীর্ণ লক্ষ্যে পেঁছোনোর জন্য যে পাঠ্যক্রম রচনা করা হ'ত, তা ছিল সম্পূর্ণ বিষয়কেন্দ্রিক এবং জ্ঞানমূলক। **দ্বিতীয়তঃ**, এই ধরনের পাঠ্যক্রম মনোবিদ্যার (Psychology) এক ভ্রান্ত তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই তত্ত্বকে বলা হয় **মানসিক শক্তিবাদ** (Faculty psychology)। এই তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিদ্‌রা মনে করতেন, মানুষের মন (Mind) কতকগুলি পরস্পরনিরপেক্ষ ক্ষমতা বা শক্তি (Facullty) দ্বারা গঠিত। অন্যদিকে, এমন কতকগুলি পাঠ্যবিষয় (Curr'cular subject) আছে, যেগুলি মনের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাকে বিকাশ করতে সক্ষম। যেমন, যুক্তি-শক্তি (Faculty of reasoning) মনের একটি ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতাকে গণিতের (Mathematics) চর্চার মাধ্যমে বাড়িয়ে তোলা যায়। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য যখন ছিল কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ, তখন সেই বিকাশে সহায়তা করার জন্য পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন সব বিষয় নির্বাচন করা হ'ত যার দ্বারা মানসিক শক্তিগুলিকে বাড়ানো সম্ভব হয়। শিক্ষা-সংক্রান্ত এই নীতিকে বলা হয় **মানসিক শৃঙ্খলাবাদ** (Theory of formal discipline)। কিন্তু মানুষের মন-সংক্রান্ত এই মতবাদ (Faculty psychology) এবং তার অনুষঙ্গ হিসেবে মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Theory of formal discipline) উভয়ে বর্তমানে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু, ঐ ভ্রান্ত ধারণাগুলি থেকে গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উদ্ভব। **তৃতীয়তঃ**, পাঠ্যক্রম সম্পর্কে যে আধুনিক ধারণার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হ'য়েছে, তা শিক্ষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক পরে এসেছে। কিন্তু পূর্বে পাঠ্যক্রম বলতে পাঠ্য বিষয়সমূহের সমষ্টিকেই বোঝাত। পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত ঐ সংকীর্ণ ধারণা গতানুগতিক পাঠ্যক্রম নির্ধারণের একটি মূল কারণ। সুতরাং এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম-সম্পর্কিত ধারণা সংকীর্ণ শিক্ষাদর্শ, ভ্রান্ত মনোবৈজ্ঞানিক নীতি ও জড় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। কেন আমরা এই মন্তব্য করেছি, তা বোঝা যাবে, যদি এই জাতীয় পাঠ্যক্রমের ত্রুটিগুলি উল্লেখ করা হয়। তবে এটাই ছিল আমাদের দেশে দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতি।

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মূল ভিত্তি

।। গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের ত্রুটি ।।
(Defects of Traditional Subject Centred Curriculum)

গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম আধুনিক শিক্ষাদর্শের পরিপন্থী, এ কথা বর্তমানে সকল মনোবিদ্‌ ও শিক্ষাবিদ্‌ স্বীকার করেছেন। এই পাঠ্যক্রমের অনুশীলন

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সহায়তা তো করেই না, বরং স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে ব্যাহত করে। এই ধরনের পাঠ্যক্রমের যে মৌলিক ত্রুটিগুলির কথা আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা উল্লেখ করেন, সেগুলি এখানে আলোচনা করা হ'ল।

[এক] বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে পৃথক পৃথক পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞানের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়; এইসব বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য সময় নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া থাকে পাঠ্যক্রমে। কিন্তু পাঠ্য বিষয়সমূহের জ্ঞানের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, সেটি তুলে ধরা হয় না। এর ফলে জ্ঞানের সমন্বয় হয় না। এই বিচ্ছিন্ন জ্ঞান জীবনে কোন প্রয়োজনে আসে না। তাছাড়া, এই সমন্বয়ের ব্যবস্থা না থাকার দরুন বা জ্ঞানের বিচ্ছিন্নতার দরুন অনেক সময় শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির অপচয় হয়। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে একই মৌলিক ধারণার পুনরাবৃত্তি হ'য়ে থাকে। তাই জ্ঞানের সামগ্রিক বিচ্ছিন্নকরণ এই পাঠ্যক্রমের একটি প্রধান ত্রুটি।

জ্ঞানের বিচ্ছিন্নতা

[দুই] এই ধরনের পাঠ্যক্রমে সাধারণতঃ অত্যধিক ভাষা-শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই নীতি অনুযায়ী কোন কোন সময় একজন শিক্ষার্থীকে তিন থেকে চারটি ভাষা শিখতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এমন ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, যার ব্যবহারিক মূল্য একেবারে নগণ্য। এই ভাষা-শিক্ষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ, এই জাতীয় পাঠ্যক্রমের একটি প্রধান ত্রুটি।

ভাষার ওপর মাত্রাধিক গুরুত্ব

[তিন] বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে কি কি অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তা পূর্বনির্দিষ্ট থাকে। এই পাঠ্যক্রম যাঁরা পরিচালনা করেন, প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন করার তাঁদের কোন সুযোগ নেই। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব রুচি, আগ্রহ ও মানসিক ক্ষমতাগত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তাকে পূর্বনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অনুশীলন করতে হয় না। এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নীতিকে কার্যকরী করা হয় না। ফলে, এর দ্বারা ব্যক্তিরও যেমন উন্নতি হয় না, সমাজেরও তেমনি উন্নতি হয় না। অর্থাৎ অপরিবর্তনশীলতা বা অনমনীয়তা বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের একটি প্রধান ত্রুটি। মুদালিয়র কমিশনের প্রতিবেদনে এই ত্রুটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনমনীয়তা

[চার] গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে, শিশুমনস্তত্ত্বের নীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শিশুমন বিকাশমুখী। ফলে, এই বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুমনের গ্রহণ-ক্ষমতা থাকে ভিন্ন রকমের। কিন্তু বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে বয়স্ক মনের (Adult-mind) প্রভাবই বেশী লক্ষ্য করা যায়। বয়স্করা যেভাবে চান, সেইভাবে পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিষয় ও বিষয়সূচী নির্ধারণ করেন। প্রকৃতক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে, যাঁরা পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেন, অনেক সময় শিশুমনের প্রকৃতি, তাদের রুচি ও আগ্রহ সম্পর্কে তাঁদের কোন ধারণা থাকে না। ফলে,

অমনোবৈজ্ঞানিক

এই ধরনের পাঠ্যক্রম শিশুমনের গ্রহণযোগ্য হয় না। সকল শিশুকে একই ধাঁচে বিকাশের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অমনোবৈজ্ঞানিক।

[**পাঁচ**] এই ধরনের পাঠ্যক্রম খুবই সংকীর্ণ শিক্ষাদর্শের ভিত্তিতে রচনা করা হয়। পরীক্ষায় পাশ করা এবং জীবিকা-অর্জনের জন্য একটি বৃত্তি গ্রহণ করা এই শিক্ষার লক্ষ্য। ফলে, এই পাঠ্যক্রমে জ্ঞানমূলক বিষয়ের ওপরই কেবলমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার ব্যবহারিক দিককে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হয়। মুদালিয়র কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পাঠ্যক্রমে কোন বিষয়ের গুরুত্ব পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে তার স্থান পাওয়ার সম্ভাব্যতার ওপর নির্ভর করে। ফলে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক ক্ষমতার বিকাশের সুযোগ এই পাঠ্যক্রমে থাকে না।

পরীক্ষা-কেন্দ্রিক

[**ছয়**] এই ধরনের বিষয়কেন্দ্রিক গতানুগতিক পাঠ্যক্রম শিক্ষকের কর্মপদ্ধতিকেও খারাপ দিক থেকে প্রভাবিত করে। এই পাঠ্যক্রম অনুশীলন করতে গিয়ে শিক্ষকরা তাঁদের পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। মুখস্থের ওপরই কেবল গুরুত্ব দেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাজ থেকে আবৃত্তির কৌশল শেখে পরীক্ষা পাশের জন্য, সমস্যা-সমাধানের কৌশল আয়ত্ত করতে পারে না। এই পাঠ্যক্রম তাই শিক্ষণ-পদ্ধতির (Teaching Method) উন্নয়নে সহায়তা করে না।

শিক্ষণ-সহায়ক নয়

[**সাত**] গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে এক স্তরের শিক্ষাকে পরবর্তী উন্নতস্তরের শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীকে কলেজীয় শিক্ষাস্তরের জন্য তৈরি করে দেওয়া। ফলে, এই ধরনের পাঠ্যক্রমে যে বিষয়সমূহ ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করা হয়, তার মাধ্যমে আমাদের প্রকৃত সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পুনরুত্থান সম্ভব হয় না। কারণ এইসব অভিজ্ঞতাবলীর সঙ্গে প্রকৃত জীবন-অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক থাকে না। কেবলমাত্র কতকগুলি অবাস্তব তাত্ত্বিক জ্ঞান, শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তুলে ধরতে পারে না। 'বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষা' যে শিক্ষার্থীর জীবন-বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, এ কথা এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে স্বীকার করা হয় না। তাই এই জাতীয় পাঠ্যক্রমে এদের কোন স্থান নেই।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের অভাব

[**আট**] এই পাঠ্যক্রম শিক্ষার সংস্থা (Agency of Education) সম্পর্কে ধারণাকেও সংকীর্ণ অর্থে বিচার করে। কেবলমাত্র শিক্ষালয়ে, বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের অধ্যয়নের মাধ্যমে যে জ্ঞান আহরণ করা হয়, তাকেই প্রকৃত শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, গতানুগতিক পাঠ্যক্রমে যে বিষয়সমূহ, তাকে অনুশীলন করার একমাত্র ক্ষেত্র হ'ল শিক্ষালয়। কিন্তু, শিক্ষালয় ছাড়াও যে শিক্ষার অন্যান্য সংস্থা আছে, যেমন—গৃহ বেতার, চলচ্চিত্র, রাষ্ট্র ইত্যাদি তাদের কথা এই পাঠ্যক্রমে স্বীকার করা হয় না। কারণ, এইসব

শিক্ষা-সংস্থা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

শিক্ষাসংস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সেগুলিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয় না।

[নয়] মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন (মুদালিয়র) বলেছেন, এই জাতীয় পাঠ্যক্রমে কেবলমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞানের মৌখিক চর্চার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে কর্মপ্রবণ। পাঠ্যক্রমে তাদের সক্রিয়তার কোন সুযোগ না থাকায়, শিক্ষার্থীরা পাঠ-অনুশীলনে আনন্দ পায় না। সম্পূর্ণ শিক্ষার কাজ পরিচালিত হয়, এমন এক কৃত্রিম পরিবেশে, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের হৃদয়বৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি বিকাশের কোনরকম সুযোগ পায় না।

কৃত্রিম পরিবেশ

সুতরাং এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে সম্পূর্ণভাবে অমনোবৈজ্ঞানিক। এই পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক জীবন-বিকাশে সহায়তা করে না। এই পাঠ্যক্রম যদিও বা কিছু বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করে, তবে তাও সম্পূর্ণ নয়। তাই এই ধরনের পাঠ্যক্রমকে বর্তমানে পরিত্যাগ করার সুপারিশ করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন, পাঠ্যক্রম যদি শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হ'তে সহায়তা না করে, তবে তার কোন মূল্য থাকতে পারে না। তাই শিক্ষার আধুনিক লক্ষ্য ও পাঠ্যক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা চলছে। আর এর ফলে আধুনিক কালে নানা ধরনের পাঠ্যক্রম-রচনার রীতি গড়ে উঠেছে।

[দুই] কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity Curriculum)

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি অনেক বাস্তবসম্মত। জীবনের সঙ্গে যে শিক্ষার যোগ নেই, তা মূল্যহীন। গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Subject Centred Curriculum) জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র-স্থাপনে অক্ষম। তাই গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের আন্দোলন। রুশো (Rousseau), মন্তেস্বরী (Montessori), ডিউই (Dewey), গান্ধীজি (Gandhiji) প্রভৃতি চিন্তাবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্‌গণ সকলে এ কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, শিক্ষাকে যদি শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা না যায়, তবে সে শিক্ষা ফলপ্রসূ হবে না। যে শিক্ষা মানুষের চারিত্রিক উন্নয়ন করতে পারে না, তা শিক্ষা নামের যোগ্য নয়। এই শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন, শিক্ষার্থীর চারিত্রিক বিকাশ কেবলমাত্র তাদেরই এ বিষয়ে সচেতনতা (conscious) ও সক্রিয়তার (active) মাধ্যমে সংঘটিত হওয়া সম্ভব। রুশো বলেছেন—"শিশুকে বইয়ের কীট তৈরি না করে, আমি তাকে কর্মশালায় ব্যস্ত রাখতে চাই। কর্মশালায় দৈহিক কাজের মাধ্যমে তার মানসিক বিকাশ সম্ভব হবে।"[4]

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের ভিত্তি

4. "Instead of making the child stick to his books I keep him busy in the workshop, where his hand will work to the profit of his mind."—Rousseau.

গান্ধীজি 'হরিজন' পত্রিকায় তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যা বলেছেন, তা উল্লেখ করলে এই চিন্তা-প্রবাহের মূল সূত্রটি ধরা পড়বে। তিনি বলেছিলেন—"আমার শিক্ষা-ব্যবস্থায় 'হাত' গতানুগতিক লেখা শেখার আগে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করবে; শিশুর 'চোখ' জীবন-পরিবেশের অন্যান্য জিনিসেরে সঙ্গে সঙ্গে ছবি, অক্ষর, শব্দ ইত্যাদি চিনবে, জীবন-পরিবেশ থেকে পৃথকভাবে নয়; আর ঐ পরিবেশেই তার 'কান' সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ নাম ও শব্দ-সামগ্রীর সঙ্গে পরিচিত হবে।[5] এই সকল চিন্তাবিদ্‌দের চেষ্টায়, শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক কালে এক নতুন নীতির উদ্ভব হয়েছে, যাকে বলা হয় **সক্রিয়তার নীতি** (Activity principle in education)। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সক্রিয়তার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

সক্রিয়তার নীতি সম্পর্কে আমরা অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এই নীতির মূল কথা হ'ল শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হ'লে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। অর্থাৎ, যে কাজ শিক্ষার্থী আত্মসক্রিয়তায় সম্পাদন করবে, তাই তার কাছে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এনে দেবে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity Curriculum) সংক্রান্ত নীতি, সক্রিয়তার তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই পাঠ্যক্রমের মূল কথা হ'ল —শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে পরিবেশন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করবে। জ্ঞান, মুখ্য হলেও এই ব্যবস্থায় তা সংগৃহীত হবে পরোক্ষভাবে। পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন কার্যাবলী বা কর্মের নির্দেশ করা হয় এবং ঐ সব কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞান-আহরণে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা হয়। এই ধরনের পাঠ্যক্রমকে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম বলে। অর্থাৎ, যে পাঠ্যক্রমের মধ্যে কেবলমাত্র জ্ঞানমূলক বিষয়সমূহের তালিকার পরিবর্তে ধারাবাহিক উদ্দেশ্যমুখী কর্মতালিকা নির্দেশ করা হয়, তাকেই **কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম** (Activity Curriculum) বলা হয়। এই ধরনের পাঠ্যক্রমে কর্মকে (Activity) শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোনোর উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বিশিষ্ট শিক্ষা দার্শনিক জন ডিউই বলেছেন—

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম কি?

"Activity Curriculum is a continuous stream of child's activities unbroken by systematic subjects and springing from the interest and personally felt needs of the child." অর্থাৎ, শিশুর অনুরাগ ও চাহিদাপ্রসূত অবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহ বা গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক ধারণার দ্বারা ব্যাহত হয় না, তাই হ'ল কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম। এই অর্থে, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মনো-বৈজ্ঞানিক তৎপর্য আছে।

---

5. "In my scheme of things, the hand will handle tools before it draws or traces the writing. The eyes will read the pictures of letter and words as they will know other things in life. The ears will catch the name and meanings and sentence."—Gandhiji.

মনোবিদ্‌গণ বলেছেন, শিশু তার সংস্কারগত চাহিদাগুলি চরিতার্থ করার জন্য আশে-পাশের সমস্ত জিনিসকে হাতে-কলমে বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়। বিমূর্ত জ্ঞান তার কাছে অর্থহীন বোঝা ছাড়া কিছুই নয়। সৃজনীস্পৃহা (creativeness), কৌতূহল Curiosity ইত্যাদির মত প্রবণতাগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ পেলে, শিশুর স্বাভাবিক বৌদ্ধিক বিকাশ সম্ভব হবে। মনোবিদ্‌গণ বলেছেন, সক্রিয়তার দ্বারা শিশুর সংস্কারগত প্রবণতাগুলি শুধুমাত্র চরিতার্থ হয়, তাই না, তাদের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে নতুন চাহিদারও সৃষ্টি হয়; তাদের অনুসন্ধিৎসা বাড়ে। আধুনিক প্রজেক্ট পদ্ধতিতে (Project Method) এই ধরনের কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম অনুসরণ ক'রে শিশুর জ্ঞান-আহরণে সহায়তা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের চাহিদার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করা হয়। গান্ধীজি তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রেও কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন (মুদালিয়র কমিশন)-এর প্রতিবেদনে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম ও গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমকে বেশী মনোবিজ্ঞানসম্মত হিসেবে বিবেচনা করা হ'য়েছে। কমিশনের প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে সবশেষে মন্তব্য করা হয়েছে "গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের পরিবর্তে 'কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম' আমাদের দেশে বিদ্যালয়-গুলিতে প্রবর্তন করতে হবে। তার কারণ, 'বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম' প্রয়োজনীয় প্রেষণা (Motivation) বা আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে না।"[6] অর্থাৎ মনোবৈজ্ঞানিক দিক্ থেকে আরও বলা যায়, শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের যে প্রেষণা (Motivation) ও অনুরাগের (Interest) প্রয়োজন, তা সহজেই সৃষ্টি করা যায় কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর চাহিদা ও প্রবণতাগুলিকে চরিতার্থ করা যায় এবং তার মধ্যে শিক্ষাভিমুখী প্রেষণা ও অনুরাগ সঞ্চার করা যায়।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক উপযোগিতা

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম রচনা করলে যে শুধুমাত্র শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তা করা হয় তাই নয়, তার সামাজিক বিকাশেও সহায়তা করা হয়। অর্থাৎ কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের সামাজিক উপযোগিতাও বর্তমান। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কর্মসম্পাদন করতে গিয়ে, শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরতা (Self reliance) বৃদ্ধি পায়, তাদের সব কিছুর জন্য শিক্ষকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। প্রকৃত কর্ম-পরিবেশে, সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা সামাজিক বিকাশের (Social development) সহায়ক।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের সামাজিক উপযোগিতা

6. "These (activities) should replace the formal lessons which lack proper motivation and therefore fail to arouse real interest."—Report of the Secondary Education Commission.

এইরূপ কর্ম-পরিবেশে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে জীবন-যাপনের রীতির সঙ্গেও পরিচিত হয়।

যদিও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষানীতি ও কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম, শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তাধারার প্রতীক, তাহ'লে এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় না যে, তা একেবারে ত্রুটিহীন। অনেকে এই ধরনের পাঠক্রমের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন, জীবনযাপনের জন্য 'সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা' (Complete education) কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের দ্বারা সার্থকভাবে দেওয়া যায় না। কারণ কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের নীতিতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বর্তমান (Present) এবং ভবিষ্যতের (Future) পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছে। মানুষের অতীত অভিজ্ঞতাকে কোন রকম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মানুষের অতীত অভিজ্ঞতাও তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে একেবারে বাদ দিলে শিশুর শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কর্মকেন্দ্রীয় শিক্ষার নীতিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা মনে করেন, অতীত সংস্কৃতি-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা শিশুদের প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া যায় না, তাই তাদের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে প্রকৃত আগ্রহ সঞ্চার করা যায় না। এই কারণে এই মতবাদে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে অতীত অভীজ্ঞতার কোন মূল্য নেই। কিন্তু, এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া যায় না। শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে শিশুকে তার সামাজিক ঐতিহ্যের মধ্যেই শিক্ষা দিতে হবে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমে এই দিক্‌কে বিশেষভাবে অবহেলা করা হয়েছে।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের ত্রুটি

[দুই] কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনের ওপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। সক্রিয়তাপ্রাণ শিশুর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনেক সময় চরিতার্থ হয় না।

[তিন] এই জাতীয় পাঠক্রম পরিচালনা করার জন্য বিশেষ শিক্ষণ-প্রাপ্ত (Trained) শিক্ষকের প্রয়োজন। এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মত প্রতিষ্ঠানের যেমন অভাব আছে, তেমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরও অভাব আছে।

[চার] কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানের (Modern knowledge) সব কিছুকে পরিবেশন করা যায় না। ফলে, জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশেষের জন্য আবার বিকল্প পাঠক্রম রচনা করার প্রয়োজন হয়। এইভাবে একের বেশী পাঠক্রম বিদ্যালয়ে পরিচালনা করারও যথেষ্ট অসুবিধা আছে।

[পাঁচ] কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমকে ঠিকমত পরিচালনা করতে না পারলে এবং মধ্যে মধ্যে অন্যভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতা আসবে না। এইরূপ বিক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ জ্ঞান শিক্ষার্থীদের জীবনে সার্থক অভিযোজনে সহায়তা করবে না। তাই এই বিচারেও বলা যায় কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

[ছয়] উন্নত শিক্ষাস্তরে এই কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম পরিচালনার জন্য অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়। এত সময় উচ্চস্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় করা যায় না। কারণ, সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনেক বেশী জ্ঞান পরিবেশন করতে হয়।

উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলি থাকার জন্য কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমকে (Activity-curriculum) নিঃশর্তভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। যদিও এ কথা ঠিক যে, এই পাঠ্যক্রমের মূল ভিত্তি আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাহলেও এর ব্যবহারিক অসুবিধা থাকার জন্য একে সার্থকভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। বিকল্প হিসেবে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ আরও নানা ধরনের পাঠ্যক্রমের কথা বলেছেন। যেমন—অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম (Experience Curriculum), যার মূল কথা হ'ল শিক্ষার জীবন-অভিজ্ঞতাই হবে পাঠ্যক্রমের উপাদান। তবে অভিজ্ঞতা (Experience) প্রত্যক্ষ কর্মসম্পাদন (activity) ছাড়া আসতে পারে না ; তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। পাঠ্যক্রমের মধ্যে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার সংযোজন করলে তা অনেক ক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মত আংশিক জ্ঞানধর্মী হয়ে পড়ে। আবার কোন কোন শিক্ষাবিদ্‌ গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের বিচ্ছিন্নধর্মিতাকেই বড় করে দেখেছেন। এর মধ্যে বিষয়গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে। অথচ আধুনিক ধারণা অনুযায়ী জ্ঞানের সামগ্রীর সমন্বয়ন প্রয়োজন। পাঠ্যবিষয়গুলির (School subj ct) মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে যে পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়, তাকে বলে **সমন্বয়িত পাঠ্যক্রম** (undifferentiated curriculum)। এই পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়সমূহকে মূল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যাস করা হ'য়ে থাকে। যেমন—মানবীয় বিদ্যা (Humanities), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science), সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science) ইত্যাদি। এই ধরনের পাঠ্যক্রম রচনা করে গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের একটি ত্রুটিকে দূর করা গেলেও অন্যান্য ত্রুটিগুলি থেকে যায়। তাই পাঠ্যক্রম রচনার কোন একটি বিশেষ রীতিকে এককভাবে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, তাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু ত্রুটি আছে। বর্তমান পর্যায়ে সুষ্ঠু পাঠ্যক্রম রচনা করতে হ'লে, এইসব পাঠ্যক্রমের আদর্শ বৈশিষ্ট্যগুলির সার্থক সমন্বয় সাধন করতে হবে।

॥ পাঠ্যক্রম রচনার মূল নীতি ॥
(Basic Principles of Curriculum Construction)

পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব থেকে এটা বোঝা যায় যে, আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা পাঠ্যক্রম-সংক্রান্ত গতানুগতির ধারণার মধ্যে পরিবর্তন আনতে আগ্রহী। তাঁদের এই আগ্রহ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে কর্মকেন্দ্রিক (Activity Curriculum), অভিজ্ঞতাভিত্তিক (Experience Curriculun) বা সমন্বয়িত পাঠ্যক্রমের। কিন্তু

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, ঐ সব আধুনিক পাঠ্যক্রমের কোন একটিকে এককভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, তাদের প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু ত্রুটি আছে। বর্তমানে এদেরও সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পাঠ্যক্রমের কাজ শিক্ষণ-পদ্ধতির (Teaching method) গতি নির্ধারণ করে দেওয়া এবং শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হ'তে সহায়তা করা। তাই পাঠ্যক্রম সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হ'লে শিক্ষার লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা করতে হবে। এখানে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, শিক্ষার কোন্ লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করব। ইতিপূর্বে, আমরা 'শিক্ষার লক্ষ্য' শীর্ষক অধ্যায়ে শিক্ষার বহুবিধ লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছি। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে আমাদের অনেকটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর যে কোন দেশের আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কল্যাণে সহায়তা করাই হ'ল শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। আপাতঃদৃষ্টিতে মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিকল্যাণ (Individual well being)। আর এই ব্যক্তি কল্যাণের সঙ্গে সমাজ-কল্যাণের সামঞ্জস্য বিধান করতে হ'লে শিক্ষার লক্ষ্যকে ত্রিমুখী হ'তে হবে। [এক] শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে হবে। অর্থাৎ, তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে চারিত্রিক দিক্ থেকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, সে বিষয়ে শিক্ষাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। আর তা সম্ভব হবে যখন ব্যক্তি তার একান্ত নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা (Desires), চাহিদা (needs) ও অনুরাগ (interest) ইত্যাদি পরিপূর্ণ-ভাবে চরিতার্থ করতে পারবে। [দুই] প্রত্যেক একক ব্যক্তি যাতে সমাজ-জীবনে অন্যান্য সকলের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করে, সামাজিক জীবনের (Social life) প্রবাহকে সজীব রাখতে পারে, সেদিকেও শিক্ষাকে নজর দিতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীকে বৃহত্তর সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করা। এটা করা সম্ভব, যদি শিক্ষার দ্বারা তাদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলীর সংযোজন করা যায়। [তিন] প্রত্যেক শিক্ষার্থী বা ব্যক্তিকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য উপার্জনশীল করে তুলতে হবে। আধুনিক অর্থনৈতিক ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic status) তার ব্যক্তিজীবন (individual life) এবং সামাজিক জীবনের (Social life) ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ব্যক্তির উপার্জন-ক্ষমতার (Earning efficiency) পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা বাস্তবসম্মত। শিক্ষার এই তিন লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের চেষ্টাই করছেন আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষা কোন তাত্ত্বিক ধারণা (Theoretical concept) নয়, শিক্ষা একটি বাস্তবানুগ প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জীবন-প্রক্রিয়ার (Life process) কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। তাই আধুনিক শিক্ষা যেমন শিশুকেন্দ্রিক (child centric), তেমনি জীবনকেন্দ্রিকও (life centric) বটে। শিক্ষা যে জীবনকেন্দ্রিক হবে, এ বিষয়ে আধুনিক শিক্ষা-

প্রস্তাবনা জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা

বিদ্‌দের মধ্যে মতবিরোধ নেই। **যে শিক্ষা ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশসাধন করে, তাকে সার্থক সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করে এবং তাকে উপার্জনক্ষম করে তোলে, তাই হ'ল জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা** (life-centred education)। আমাদের পাঠ্যক্রম রচনার মৌল নীতি নির্ধারণ করতে হ'লে এই জাতীয় শিক্ষার কথাই ভাবতে হবে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ জন ডিউই (Dewey) এই ধরনের বাস্তবসম্মত শিক্ষানীতির সপক্ষে মত দান করেছেন। তিনি বলেছেন—"শিক্ষাই জীবন" (Education is life)।

আধুনিক কালে জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষাকে যখন শিক্ষাদর্শ হিসাবে মেনে নেওয়া হ'য়েছে, তখন তার জন্য সার্থক পাঠ্যক্রমও আমাদের রচনা করতে হবে। কারণ, গতানুগতিক পাঠ্যক্রম এই শিক্ষাদর্শের পথে পরিচালিত করতে পারে না। এই শিক্ষাদর্শ চরিতার্থ করার জন্য যে পাঠ্যক্রম হবে, তা শিক্ষার্থীর জীবন প্রক্রিয়া (Life process) এবং জীবনযাপনের পদ্ধতি (Living method) উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। শিশুর প্রকৃতিকে যথোযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে এবং প্রকৃতির ধারা অনুশীলন করে আদর্শ পাঠ্যক্রম রচনা করতে হ'লে নিম্নলিখিত নীতিগুলির কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

জীবনকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম

[এক] **উদ্দেশ্যের নীতি (Principle of Objectivity) :** পাঠ্যক্রম রচনা করতে গেলে, প্রথমেই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হ'তে হবে। পাঠ্যক্রমের প্রধান কাজ হ'ল শিক্ষার লক্ষ্যগুলি লাভে সহায়তা করা। তাই লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে পাঠ্যক্রম রচনা হ'তে পারে না। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পাঠ্যক্রমের আধুনিক অর্থ পাঠ্যসূচী (Syllabus) নয়। পাঠ্যসূচী পাঠ্যক্রমের অংশ মাত্র। বিচ্ছিন্ন পাঠ্যসূচীর সমন্বয় কখনই পাঠ্যক্রম হ'তে পারে না। তাদের একক সূত্রে আবদ্ধ করতে পারে একটি আদর্শ। সেই আদর্শকে সামনে রেখেই পাঠ্যক্রম রচনার কাজে হাত দিতে হবে। তাই পাঠ্যক্রম রচনা করতে হ'লে শিক্ষার প্রচলিত উদ্দেশ্যগুলিকে প্রথমতঃ তালিকাভুক্ত করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থার কতকগুলি চরম (ultimate) এবং কতকগুলি তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য (immediate aim) থাকে। পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের লক্ষ্যের ওপরই গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন, কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন করা, সে ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন বিষয় বা অভিজ্ঞতা রাখতে হবে যা শিক্ষার্থীর চরিত্র-বিকাশের সহায়ক। আবার, যদি শিক্ষার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হয় জ্ঞান (Knowledge) বা দক্ষতা (skill) বৃদ্ধি করা, তাহ'লে পাঠ্যক্রমে বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান বা দক্ষতা-বৃদ্ধির উপযোগী উপাদান রাখতে হবে। অর্থাৎ, এক কথায়, উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে পাঠ্যক্রম রচনার কাজে হাত দেওয়া যায় না। এই কারণে পাঠ্যক্রমের একটি দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical basis) আছে। উপযুক্ত শিক্ষাদর্শন (Educational philosophy) নির্বাচন ক'রে তার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে।

[দুই] **চাহিদার নীতি (Principle of need) : পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে**

শিশু বা শিক্ষার্থীর নিজস্ব চাহিদাকে যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। শিশুর চাহিদা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিশুর জন্মাবস্থায় কতকগুলি চাহিদা থাকে, তার মধ্যে কতকগুলি সম্ভাবনাও থাকে। তাছাড়া, কতকগুলি বস্তুর প্রতি তার স্বাভাবিক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। শিশুর এইসব চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির কথা না ভেবে পাঠ্যক্রম রচনা করলে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। তার আগ্রহ, তার বর্তমান চাহিদা ইত্যাদিকে জীবন-পরিবেশের পরিপ্রক্ষিতে বিচার করে তাদের অনুকূল পাঠ্যক্রম রচনা না করলে জীবনবিকাশ সম্ভব হবে না। তাই শিশুর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। তার ওপর বাইরে থেকে কিছু অভিজ্ঞতার বোঝা চাপিয়ে দিলে, তা সহজে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। পাঠ্যক্রমকে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক জীবনী-শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচনা করতে হবে। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন শিক্ষা কেবলমাত্র শিশুর কতকগুলি তাৎক্ষণিক চাহিদা ও আগ্রহের পরি-প্রেক্ষিতে রচিত হবে, এ কথা ঠিক নয়। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে নতুন নতুন চাহিদা ও আগ্রহ সৃষ্টি হবে, এটাও কাম্য। তাই পাঠ্যক্রম রচনায় চাহিদার নীতি বলতে শুধুমাত্র চাহিদা মেটানোকে বোঝায় না। এই নীতির প্রকৃত তাৎপর্য হ'ল—পাঠ্যক্রম এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর বর্তমান চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির মাধ্যমে তার মধ্যে আরও অনেক নতুন শিক্ষামুখী চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং নতুন নতুন বস্তুকে কেন্দ্র করে আগ্রহের ক্ষেত্র সৃষ্ট হয়।

[তিন] **সামাজিক চাহিদার নীতি (Principle of Social need)** ঃ আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের সংজ্ঞাখ্যানে একক ব্যক্তির (individual personality) বিশেষ কোন মূল্য নেই। তাকে সমাজ-জীবনের মধ্যে বসবাস করতে হয়। শিক্ষার লক্ষ্য যেমন একদিকে ব্যক্তি-জীবনের উন্নতিসাধন করা, অন্যদিকে সমাজজীবনের উন্নতিসাধন করাও তার লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি-জীবনের উন্নতির কোন পরিকল্পনাই সার্থক হবে না যদি না তা সামাজিক চাহিদার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই পাঠ্যক্রম রচনা করার সময়, সামাজিক চাহিদাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা কতক-গুলি ভবিষ্যৎ পরিবর্তন বা পরিমার্জনের চিন্তা করে। পাঠ্যক্রম রচনার সময়, তাই ঐ সব ভবিষ্যৎ প্রত্যাশাগুলির কথা বিবেচনা করতে হয়। যদি সমাজ মনে করে, আজ থেকে দশ বছর পরে, কোন বিশেষ কাজের জন্য অধিক পরিমাণে দক্ষ নাগরিক প্রয়োজন, তাহ'লে বর্তমান পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ, পাঠ্ক্রম রচনার ক্ষেত্রে সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা বিবেচনা করতে হবে।

পাঠ্যক্রম রচনার পূর্বোক্ত দুটি নীতি পরস্পরবিরোধী নয়। আদর্শ পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির চাহিদা এবং সমাজের চাহিদার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা। এই দুই শ্রেণীর চাহিদাকে যদি পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ করা না যায়, তা'হলে শিক্ষার

প্রকৃত লক্ষ্যও বিফল হবে। পরিপূর্ণ জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে যখন ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং সমাজ-জীবনের বিকাশ উভয়ে সমান গুরুত্বপূর্ণ, তখন পাঠ্যক্রমের ভেতরেও দুই উপাদানকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন (Secondary Education Commission—Mudaliar) ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম নির্ধারণের নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে এই ধরনের সমন্বয়ের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। কমিশনের প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে—"যে কোন আদর্শ ও যুক্তিসম্মত পাঠ্যক্রম হবে দুটি বলের (উপাদানের) ফলশ্রুতি। এই দুটি বল হ'ল—শিশুর নিজস্ব প্রকৃতি এবং সমাজের প্রয়োজনীয়তা।"[7] এই নীতি অনুসরণ করে পাঠ্যক্রম রচনা করলে, সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা তার প্রকৃত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার সমন্বয়

[চার] **সমন্বয়ের নীতি (Principle of Integration)**: পাঠ্যক্রমের মধ্যে একদিকে যেমন শিশুর চাহিদা ও সমাজের চাহিদার মধ্যে সমন্বয় করতে হবে, অন্যদিকে তার ঐ সকল চাহিদার সঙ্গে অভিজ্ঞতাগুলি (experience) সমন্বয় সাধন করতে হবে। মানব মন (Human mind) স্বাভাবিক সমন্বয়ধর্মী, একথা মনোবিদ্‌গণ বলেছেন। কোন পরস্পরবিরোধী ধারণাকে সে আত্মস্থ করতে পারে না। তাছাড়া, বিচ্ছিন্ন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে ধারণ করাও (Retention) তার পক্ষে মুশকিল। তাই পাঠ্যক্রমের মধ্যে যদি পরস্পরবিরোধী বিচ্ছিন্ন বিষয় থাকে বা সেখানে যদি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা (Isolated experience) থাকে, তবে তা ব্যক্তি-মনের বিকাশের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করবে। পাঠ্যক্রম রচনার সময়ে এই ধরনের সমন্বয় একান্তভাবে প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন (মুদালিয়র) পাঠ্যক্রম রচনার এই নীতিকে অবিভাজ্যতার নীতি (Principle of indivisibility) আখ্যা দিয়েছেন। এই নীতিকে কার্যকরী করতে হ'লে, পাঠ্যক্রম রচনার সময়, বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রের (area of experience) উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশগুলোকে পারস্পরিক সাদৃশ্য ও সম্পর্কের ভিত্তিতে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং শিক্ষণের (Teaching) সময় ঐ সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

[পাঁচ] **সংরক্ষণের নীতি (Principle of Conservation)**: শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য সামাজিক রীতি ও মূল্যবোধের সংরক্ষণে সহায়তা করা। তাই পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন বিষয় ও কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে যার দ্বারা সমাজের কৃষ্টি এবং সংস্কার সংরক্ষিত হয় এবং যার মাধ্যমে সংস্কারকে যথাযথভাবে ব্যক্তি-জীবনে

7. 'A rationally conceived curriculum must be the resultant of two forces—the nature of the child and requirements of the community'.—Secondary Education Commission.

সঞ্চালিত করা যায়। সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় মানবগোষ্ঠী যে সব অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তার কিছু অংশ স্থায়িভাবে কৃষ্টির উপাদান হিসেবে সমাজে প্রবহমান। এইসব অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ মানব-সমাজকে দিতে না পারলে, শিক্ষা সমাজ-জীবনে তার গুরুত্ব হারাবে। তাই পাঠ্যক্রম-রচনার সময় বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতা-নির্বাচনের সময় আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বা কৃষ্টি থেকে এইসব উপাদান বেছে নিতে হবে, যার মাধ্যমে সামাজিক প্রবাহ সহজভাবে সংঘটিত হ'তে পারে এবং যার মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মানব সমাজের সার্থক উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

[ছয়] **সৃজনশীলতার নীতি (Principle of creativeness :** শিক্ষা যেমন, একদিকে সমাজ-সংরক্ষণের দায়িত্ব নেবে, অন্যদিকে ব্যক্তির নিজস্ব সম্ভাবনার বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তা নাহ'লে সমাজ-জীবনের উন্নতি সংঘটিত হবে না; সমাজ স্থবির হ'য়ে পড়বে। তাই পাঠ্যক্রমেও শুধুমাত্র অতীত অভিজ্ঞতার বিচার-বিবেচনাহীন পুনরাবৃত্তি হবে না; ব্যক্তির সৃজনাত্মক প্রবণতার (creativeness) বিকাশ সম্ভব হয় এমন সুযোগও সেখানে রাখতে হবে। এই নীতিকে কার্যকরী করতে হ'লে, পাঠ্যক্রমে তথ্যের সঙ্গে তাৎপর্যকে তুলে ধরতে হবে। যেমন ধরা যাক, ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে গতানুগতিক ব্যবস্থায় আমরা কেবলমাত্র অতীত তথ্য পরিবেশন করি। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সৃজনস্পৃহাকে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। কিন্তু যদি ইতিহাসের পাঠ্যসূচীকে বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বিন্যাস করা হয়, তা হলে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে যে কোন সামাজিক ঘটনা বা অভিজ্ঞতার ঐতিহাসিক পটভূমি শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করানো যেতে পারে। এইভাবে পাঠ্যক্রম রচনা করলে শিশুর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার প্রবণতা আসবে এবং তার সৃজনাত্মক প্রবণতা চরিতার্থ হবে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ রেমণ্ট (Raymont) পাঠ্যক্রম রচনার এই নীতির ওপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন—"যে পাঠ্যক্রম বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার অনুকূল, তার মধ্যে অবশ্যই সৃজনাত্মক বিষয়সমূহ বেশী পরিমাণে দিতে হবে।"[8]

[সাত] **সক্রিয়তার নীতি (Principle of Activity) :** আধুনিক নীতি অনুযায়ী পাঠ্যক্রম গতানুগতিকভাবে বিষয়কেন্দ্রিক হবে না। বিষয়কেন্দ্রিক বিমূর্ত জ্ঞান শিশুমনে কোন প্রভাব বিস্তার করে না; তাদের মনে আগ্রহ-সঞ্চারও করতে পারে না। এর ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় না। তাই শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোতে হ'লে এমন পাঠ্যক্রম নির্বাচন করতে হবে যার প্রতি শিশুরা স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয়। মনোবিদ্‌গণ বলেছেন, যে অভিজ্ঞতা শিশুরা আত্মসক্রিয়তার মধ্য দিয়ে পায়, তার প্রতি তারা আকৃষ্ট হয় এবং সেই অভিজ্ঞতা শিশুমনের ওপর অনেক বেশী

8. 'In a curriculum that is suited to the needs of to-day and of future, there must be a definitely creative subject."—Raymont.

স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে। ইতিপূর্বে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। তাই আধুনিক এই মনোবিদ্যাসম্মত ধারণাকে পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। পাঠ্যক্রম রচনার সময়, তার মধ্যে শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমন্বয় করলে চলবে না। তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় করতে হবে। তবেই পাঠ্যক্রম শিশুর মনোধর্মী হবে। সুতরাং এই নীতির মূল কথা হ'ল— বিষয়কেন্দ্রিক তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। যে কোন পাঠ্যক্রমের মধ্যে প্রত্যেক তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলার জন্য যদি উপযুক্ত নির্দেশিকা থাকে, তবে সার্থক হ'য়ে উঠবে। কর্মপ্রবণ শিশু নিজস্ব প্রবণতার তাড়নায় যা কিছু কর্মসম্পাদন করবে, তাই হবে তার জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার উৎস। একটি জিনিস লক্ষ্য করার আছে, সক্রিয়তাও এখানে সমন্বয়ধর্মী। শুধুমাত্র কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা যেহেতু পরিপূর্ণ নয়, সেহেতু এখানে বিশেষভাবে কর্ম ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সমন্বয় শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে। জন ডিউই বলেছেন- "মানুষের জীবন হ'ল কর্মের উপজাত ফল এবং শিক্ষা এই কর্মের মধ্য দিয়েই আসে।"[৭]

[আট] অগ্রমুখিতার নীতি (Principle of forward looking): আদর্শ পাঠ্যক্রমের অনেক দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বিস্তৃত হবে। সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রম রচিত হওয়া উচিত। যেহেতু প্রত্যেক শিশুই ভবিষ্যতে সমাজ-জীবনের অধিকারী হবে, সেহেতু পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হবে তাকে সমাজ-জীবনের উপযোগী অভিজ্ঞতা সরবরাহ করা। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা স্মরণ করার দরকার, কোন সমাজই চায় না গতানুগতিকভাবে এগিয়ে যেতে। স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজ-জীবনের বিবর্তন হচ্ছে এবং চিরদিন হবে। তাই পাঠ্যক্রম যদি উন্নতিকামী না হয়, তা'হলে এই স্বাভাবিক বিবর্তনের হারকে ত্বরান্বিত করা যাবে না। পাঠ্যক্রম রচনার সময় এদিকে নজর রেখে, প্রত্যেকটি জ্ঞানের ক্ষেত্রের সর্বাধুনিক অভিজ্ঞতা তাতে সংযোজিত করতে হবে। তবেই বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপাদান ও অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

[নয়] পরিবর্তনশীলতার নীতি (Principle of Variability): যে পাঠ্যক্রমের মধ্যে পরিবর্তনশীলতার উপাদান নেই, তার দ্বারা জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ সফল হ'তে পারে না। জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল কথা হ'ল—শিশুর চাহিদা ও আগ্রহ এবং সমাজের চাহিদার সমন্বয়। কিন্তু, ব্যক্তির চাহিদা পরিবর্তনশীল; সমাজের চাহিদাও তাই। এই দু'ধরনের পরিবর্তনশীল সত্তাকে সার্থকভাবে পরিচালনা করার জন্য পরিবর্তনশীল পাঠ্যক্রম প্রয়োজন। শিশুর চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

৭. 'Life is a by-product of activities and education is born out of these activities.'—Dewey.

পাঠ্যক্রম নির্বাচন করতে হবে। অন্যদিকে সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস দরকার ; অর্থাৎ, কিছু সময় অন্তর পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং তার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন প্রয়োজন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (University Education Commission—Radhakrishnan) প্রতিবেদনে পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে এই নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেছেন। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হ'য়েছে—'যে পাঠ্যক্রমকে বৈদিক যুগে বা রেনেশাঁস যুগে একান্ত প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হ'ত, বিংশ শতাব্দীতে তাকে অপরিবর্তিত অবস্থায় চলতে দেওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিককে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চিন্তার অধিকারী করে তুলতে হবে, এই লক্ষ্য সামনে রেখে পাঠ্যক্রমের মধ্যে যথাযথ সময়ে উপযুক্ত পরিবর্তন আনতে আমাদের হবেই।"[10]

[দশ] ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নীতি (Principle of Individual differences) : আধুনিক মনোবিদ্‌গণ বলেছেন, বিভিন্ন মানবীয় বৈশিষ্ট্যের দিক্ থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার জৈব-মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলীর সমন্বয়ে একটি একক সত্তা। পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ করতে হ'লে এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে পরিবর্তনশীল করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্বতা যাতে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়, সেই সুযোগ পাঠ্যক্রমের মধ্যে রাখতে হবে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজন করতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজেদের আগ্রহ ও অনুরাগ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে পারে, তার সুযোগ রাখতে হবে। পাঠ্যক্রম রচনার এই নীতিকে তাই বহুমুখী বিস্তারের নীতি (Multilateral principle) বলা হ'য়ে থাকে। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (Secondary Education Commission) আমাদের দেশে বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের (Indian Education Commission—Kothari) প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের (+2 stage) পাঠ্যক্রমে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হ'য়েছে।

[এগার] বৃত্তিমুখী নীতি (Principle of Job orientation) : আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে হ'লে, তার দ্বারা জীবনের প্রয়োজন মেটাতে হবে। জীবনের একটি প্রধান প্রয়োজন জীবিকা-অর্জন। এই প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা মেটাতে পারে, তার জন্য পাঠ্যক্রমকে বৃত্তিমুখী করতে

10. "A curriculum which has vitality in the Vedic period or the Reniassance cannot continue unaltered in the twentieth century. Realizing that the vision of free man in a free society is the living faith and inspiring guide of democratic institution, we must move towards the goal adapting wisely and to changing conditions."—Report of the Unversity Education Commission.

হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন এ সম্পর্কে সুপারিশ করলেও আমাদের দেশে তা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয়নি। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন তাই মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্রম রচনা করার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে বলেছেন। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে পৃথকভাবে একটি বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়েছে। পাঠ্যক্রম রচনার সময় এই নীতিকে কার্যকরী করতে হ'লে সামাজিক চাহিদা ও বিবর্তনের ধারাকে অনুশীলন ক'রে প্রয়োজনীয় বৃত্তিগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। পরে ঐ সব বৃত্তি-সংক্রান্ত দক্ষতাগুলি যাতে শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে, সেই উপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

[বার] **অবসর যাপনের নীতি (Principle of Leisure) :** পাঠ্যক্রম রচনার সময় অবসর-যাপনের প্রশিক্ষণের দিকেও নজর রাখার দরকার। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যার অগ্রসরতার যুগে, মানুষেব কর্মজীবনে অনেক অবসর সময়ের সংস্থান হয়েছে। এই অবসরকাল প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার দরকার। বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অবসর যাপনের প্রশিক্ষণ হয়। শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীদের কতকগুলি সুঅভ্যাস ও আদর্শ গঠন করতে পারলে এই কাজে সহায়তা করা যায়। তাই পাঠ্যক্রম রচনার সময় তার মধ্যে এমন সব কাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেগুলি শিক্ষার্থীদের স্থায়ী জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

পাঠ্যক্রম রচনার উপরি-উক্ত নীতিগুলির আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে কোন আদর্শ পাঠ্যক্রম গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের আদর্শগত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্যের সার্থক সমন্বয়ে গড়ে উঠবে। তাছাড়া আধুনিক মনোবিদ্যাসম্মত নীতিগুলিকেও পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। এই ধরনের আদর্শ পাঠ্যক্রমে একদিকে যেমন ব্যক্তির বিকাশের সুযোগ থাকবে, অপরদিকে সমাজের চাহিদাও যেন তার মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। পাঠ্যক্রম বিষয়কেন্দ্রিক (Subject Centred) হ'লে চলবে না। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান, প্রত্যক্ষ কর্ম এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই ধরনের জীবনকেন্দ্রিক সমন্বয়পূর্ণ পাঠ্যক্রমকেই আদর্শ বা **সুষম পাঠ্যক্রম** (Balanced Curriculum) বলা হ'য়ে থাকে। সুষম পাঠ্যক্রমে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার সুষম সমন্বয়ের জন্য বিষয় বা অভিজ্ঞতা-সামগ্রীকে সাধারণতঃ দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। এখানে কতকগুলি বিষয় বা অভিজ্ঞতা থাকে যেগুলি সার্বজনীনভাবে সকলের জন্য প্রয়োজন, একে বলা হয় **কেন্দ্রীয় বিষয়** (Core subjects); আর অন্যান্য কতকগুলি বিষয় থাকে, যেগুলি শিক্ষার্থীরা নিজেদের চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী নির্বাচন করে। এইসব বিষয়গুলিকে বলা হয় **উপান্ত বিষয়** (Peripherial subjects)। শিক্ষার প্রথম স্তরের পাঠ্যক্রমে কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং যতই শিক্ষাস্তর এগিয়ে যায়, ততই এইসব বিষয়ের

মন্তব্য

ওপর গুরুত্ব কমতে থাকে এবং উপান্ত বিষয়গুলির গুরুত্ব বাড়তে থাকে। এমনিভাবে সামঞ্জস্য-বিধানের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম রচনা করলে, শিশুর জীবনবিকাশের পথ সুগম হবে।

॥ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রম ॥
(Curriculum in different Stages of Education in West Bengal)

পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচলিত পাঠ্যক্রমের বিরুদ্ধে চিরদিন আন্দোলন হয়েছে, সে অনুন্নত দেশই হোক্ বা উন্নত দেশই হোক্। পাঠ্যক্রম শিক্ষাবিদ্‌গণের কাছে এক চিরন্তন সমস্যা, তাই আমাদের দেশেও দেখি একই অবস্থা। স্বাধীনতা-লাভের পর রাজ্য পর্যায়ে বা জাতীয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রম নির্ধারণের জন্য বহু কমিটি ও কমিশন স্থাপিত হয়েছে। এইসব কমিটি বা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে ; আবার পরিত্যক্তও হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে, তা মূলতঃ ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের Indian Education Commission—Kothari) প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে রচিত। এই পাঠ্যক্রমগুলি রচনার ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম রচনার মৌল নীতিগুলি কতখানি কার্যকরী করা হ'য়েছে, তা বিচার করতে হ'লে পাঠ্যক্রমগুলির সাংগঠনিক রূপ সম্পর্কে ধারণা থাকার দরকার। তাই তাদের মূল্যায়নের পূর্বে আমরা সংক্ষেপে তাদের সংগঠন (Structure, সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করব।

(ক) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রম
(Curriculum of Primary Stage)

স্বাধীনতা-লাভের পর ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই রাজ্যে একটি স্কুল এডুকেশন কমিটি (West Bengal School Education Committee) গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯৫০ সালে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি পাঠ্যক্রম রচনা করেন। ঐ পাঠ্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে মোটামুটি অপরিবর্তিতভাবে এই রাজ্যের প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে অনুসৃত হ'য়ে আসছিল। ইতিমধ্যে ১৯৬৬ সালে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়েছিল। সেজন্য ১৯৭৪ সালে এক সরকারী আদেশ বলে "প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। দীর্ঘদিন পর এই কমিটি পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার একটি পাঠ্যক্রম রচনা করেছেন, যে পাঠ্যক্রম ১৯৮১ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকরী হয়েছে। এই পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়েছে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এই পাঠ্যক্রমে প্রধান চারটি অনুশীলনের ক্ষেত্রে বা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে।

পটভূমি

[এক] খেলাধূলা ও শরীরচর্চা
[দুই] উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ
[তিন] প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ
[চার] পঠন-পাঠননির্ভর কাজ।

খেলাধূলা ও শরীর-চর্চার মাধ্যমে শিশুদের দৈহিক বিকাশ ঘটাতে চাওয়া হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইসব কাজের জন্য প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে মোট সময়ের শতকরা ২২ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে শতকরা ১৮·২ ভাগ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে শতকরা ১৬ ভাগ সময় ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীতে যে সব কাজকে পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে নাচ, গান, আবৃত্তি থেকে শুরু করে নানা রকম দলবদ্ধ ও একক খেলাধূলা আছে। তাছাড়া স্বাস্থ্যাভ্যাস গঠনের জন্য নিয়মিত স্নান, আহার, মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদির মত কাজও আছে। স্বাস্থ্যবিধির তাত্ত্বিক শিক্ষারও কিছু ব্যবস্থা আছে মনে হয়। কারণ, তাত্ত্বিক কিছু জ্ঞান ছাড়া সংক্রামক রোগ সম্পর্কে ও তার প্রতিষেধক সম্পর্কে কিভাবে ধারণা দেওয়া যাবে বা সুষম খাদ্য সম্পর্কে কিভাবে ধারণা দেওয়া যাবে?

খেলাধূলা ও শরীরচর্চা

পাঠ্যক্রমে উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হ'ল শিশুদের উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ ও যথোপযুক্ত মানসিকতা গড়ে তোলা এবং তাদের সৃজনশীলতাকে বিকশিত হ'তে সাহায্য করা। এই অংশে পাঠ্যক্রমটিকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে—(ক) সৃজনাত্মক কাজ এবং (খ) উৎপাদনাত্মক কাজ। সৃজনাত্মক কাজের মধ্যে শ্রেণী ও বয়স অনুযায়ী চিত্রাঙ্কন, কোলাজ, মাটির কাজ, কাগজের কাজ, পাতার কাজ, নারকেল দড়ির কাজ, খেলনা তৈরির কাজ ইত্যাদি রাখা হয়েছে। এছাড়া, বিশেষভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত মডেল তৈরির কথাও বলা হয়েছে। উৎপাদনাত্মক কাজ হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বাগানের কাজ, সুতা কাটা, বয়ন ও বুনন, বই বাঁধাই, বাঁশ ও কাঠের কাজ, কাগজ তৈরি, পুষ্টি-প্রকল্প, গৃহশিল্প ও সূচীশিল্প ইত্যাদি কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই জাতীয় কাজের জন্য প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে মোট শতকরা ১৬ ভাগ সময় ও অন্যান্য শ্রেণীতে শতকরা ১৫ ভাগ সময় ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ

শিক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলির সার্থকতার জন্য বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাইরে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা শিশুরা সংগ্রহ করে, সেগুলিকে সুসংবদ্ধ, সাঙ্গীকৃত, মার্জিত ও পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রমে 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক' কাজ সংযোজিত করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমের এই অংশের কাজগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—(১ শিশুর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনভিত্তিক কাজ; (২) বিদ্যালয়-জীবনের প্রাত্যহিক, নৈমিত্তিক

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-মূলক কাজ

কাজ ও উৎসব-অনুষ্ঠানের কাজ। এই শ্রেণীর কাজের জন্য বৎসরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শতকরা ১৬ ভাগ ও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শতকরা ১৭ ভাগ সময় ব্যয় করা হবে।

পাঠ্যক্রমে পঠন-পাঠননির্ভর কাজকে মূল তিনটি ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। যথা—(১) মাতৃভাষা ; (২) গণিত ও (৩) পরিবেশ-পরিচিতি। ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে মূলতঃ মাতৃভাষা শিক্ষার কথা বলা হ'য়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে পঠন, লিখন, লৌখিক প্রকাশভঙ্গীর বিকাশ ও ব্যবহারিক ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গণিতের পাঠ্যসূচীতে পাটীগণিত সংক্রান্ত সকল ধারণাই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, চতুর্থ শ্রেণী থেকে জ্যামিতির প্রাথমিক ধারণা দেওয়া ও সেইসব ধারণার প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। পরিবেশ-পরিচিতি অংশে আবার দুটি ভাগ লক্ষ্য করি—(ক) ইতিহাস ও ভূগোল ; খ) প্রকৃতি-বিজ্ঞান। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে এই ভাগ করা হয়নি। পরবর্তী শ্রেণীগুলিতে কোন নিয়মমাফিক ইতিহাস বা ভূগোলের পাঠ নেই। প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কেবলমাত্র মৌখিক পাঠ দেওয়া হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে নিয়মতান্ত্রিক পাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমের পঠন পাঠননির্ভর কাজের জন্য মোট ৫০ ভাগ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

পঠন পাঠননির্ভর কাজ

পাঠ্যক্রমের সাধারণ এই সংগঠন ছাড়া, সিলেবাস কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত করেছেন। এর মধ্যে মূল্যায়ন সংক্রান্ত মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—"প্রাথমিক শিক্ষার শেষে কোন বহিঃপরীক্ষা থাকবে না। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন শ্রেণীতে কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবর্ষান্তে আটকে রাখা হবে না। সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে কাম্য উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোন শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণীতে অতিরিক্ত এক বছর রাখা যেতে পারে।" এছাড়া, বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষণ-সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিটি সুপারিশ করেছেন।

অন্যান্য সংযোগী ব্যবস্থা

নব-প্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের এই পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন করতে গেলে আমাদের পাঠ্যক্রম রচনার মৌলিক নীতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে করার দরকার। **প্রথমতঃ**, শিক্ষার লক্ষ্যের কথা ধরা যাক্। সিলেবাস কমিটি প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন তিনটি পর্যায়ে—জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যাবলী, দক্ষতা ও অভ্যাসমূলক উদ্দেশ্যাবলী এবং দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা সংক্রান্ত উদ্দেশ্যাবলী। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায়, পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন অংশে (চারটি অংশে) পৃথক পৃথক ভাবে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে শেষোক্ত উদ্দেশ্যগুলির সব ক্ষেত্রে মিল নেই। ফলে, পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন অংশে যে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে, তার সঙ্গে উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্যের অভাব ঘটেছে। প্রত্যেকটি বিষয়-

বস্তুর পাশে পাশে যদি উদ্দেশ্যগুলির উল্লেখ করা হ'ত, তাহ'লে এই অসুবিধার সৃষ্টি হ'ত না। দ্বিতীয়তঃ, পাঠ্যক্রমের মৌলনীতিতে শিক্ষার্থীর চাহিদার কথা বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক ও সক্রিয়তার চাহিদা ছাড়াও আরও অনেক চাহিদা থাকে। আমরা লক্ষ্য করি, পাঠ্যক্রমে কেবলমাত্র সক্রিয় সৃজনাত্মক চাহিদা ও জ্ঞানমূলক চাহিদার কথাই বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যক্রম যদি আরও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচনা করা হ'ত, তাহ'লে ভাল হত। তৃতীয়তঃ, সমাজের চাহিদাও এখানে সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হয়েছে, এ কথা বলা যায় না। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের বেশীর ভাগ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষাস্তরেই নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা শেষ করে। এই শিক্ষান্তে ঐ সব শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সমাজ কি আশা করতে পারে? কারণ বিশেষ কর্মসূচীতে কর্মদক্ষতার বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা নেই, বা স্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার কোন উপাদান নেই। চতুর্থতঃ, প্রাথমিক শিক্ষার মত প্রারম্ভিক শিক্ষাস্তরে, ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞানকে পৃথক করা উচিত হয়নি। এতে সমন্বয়ের অভাব দেখা দিয়েছে, যদিও পাঠ্যক্রমে ইতিহাস ও ভূগোলের একক নাম আছে, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে কিছু পাঠ্যসূচী পৃথকভাবে রচনা করা হয়েছে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য। তাই পাঠ্যক্রমে আরও বেশী বাস্তবসম্মত সমন্বয়ের নীতি প্রয়োগ করা উচিত ছিল। পঞ্চমতঃ, পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন বিশেষ নতুনত্ব নেই। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়নি। যেমন, গণিতের কথা ধরা যাক্। সেখানে নতুন কোন ধারণার অবতারণা করা হয় নি, যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা আধুনিক যুগের সঙ্গে সমতা রাখতে পারে। অথচ, উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তাই করার কথা বলা হয়েছে। ষষ্ঠতঃ, ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারেও খুব বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ করা হয়নি। শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে আমাদের মত বহুভাষাভাষী দেশে একটিমাত্র ভাষার জ্ঞান অন্যের মনের ভাব বুঝতে সব সময় সাহায্য করে না। অন্য যে কোন একটি সংযোগকারী ভাষা এই স্তরে পাঠের ব্যবস্থা করলে ভাল হ'ত। এইসব কারণে, প্রাথমিক শিক্ষার এই পাঠ্যক্রমকে একটি পরিপূর্ণ আদর্শ পাঠ্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তবে এ কথা ঠিক, এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে অনেক নতুন ধারণার সংযোজন হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, প্রত্যক্ষ 'অভিজ্ঞতামূলক কাজ'-এর (Direct purposeful activity) অংশ সংযোজন করে একে বিজ্ঞানসম্মত করা হয়েছে। আশা করা যায়, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে এই পাঠ্যক্রমের আরও উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে।

মূল্যায়ন

॥ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রম ॥
(Curriculum of Secondary Stage)

1972 সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় (Central Ministry of Education) সারা দেশের শিক্ষার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর উদ্দেশ্য

ছিল, সকল রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে একই ছকে বাঁধা এবং শিক্ষাকে জাতীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্বিন্যাস করা। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের (Indian Education Commission—Kothari) শিক্ষার সংগঠন সংক্রান্ত সুপারিশগুলিকে কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু হয়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৫ বছরের শিক্ষাকে বলা হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং পরবর্তী দু' বছর—একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাকে বলা হয়েছে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা (Higher Secondary Education)। দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ (West Bengal Board of Secondary Education) এবং উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেন উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল (Council of Higher Secondary Education)। আমরা এখানে দুটি স্তরের পাঠ্যক্রমকে একত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম হিসেবে বিবেচনা ক'রে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব এবং পৃথকভাবেও তাদের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব।

পটভূমি

[এক] ॥ দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ॥
[Curriculum for Madhyamik Stage (Class X)]

দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম বর্তমানে প্রচলিত আছে, তা প্রথম প্রবর্তন করা হয় ১৯৪৭ সালে। পরবর্তী কয়েকটি বছরে এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করা হ'য়েছে। বর্তমান অবস্থায় এই পাঠ্যক্রমের যে সংগঠন দাঁড়িয়ে, তা হ'ল—

সংগঠন

(ক) ভাষা (Language) বিভাগ :

(১) প্রথম ভাষা (1st Language)

(২) দ্বিতীয় ভাষা (2nd Language)

(৩) তৃতীয় ভাষা (3rd Language)—কেবলমাত্র সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য

(খ) বিজ্ঞান (Science) বিভাগ :

(১) ভৌত বিজ্ঞান (Physical Science)—সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য

(২) জীবন বিজ্ঞান (Life Science)—ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত

(৩) গণিত (Mathematics)

(গ) সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science) বিভাগ ঃ
(১) ইতিহাস (History)
(২) ভূগোল (Geography)
(ঘ) কর্মশিক্ষা (Work Education) বিভাগ ঃ
(১) কর্মশিক্ষা (Work Education)
(২) শারীর শিক্ষা (Physical Education)
(৩) সামাজিক শিক্ষা (Social Education)

এই পাঠ্যক্রম অনুযায়ী দশম শ্রেণীর শেষে একটি বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। এই পরীক্ষার সর্বোচ্চমান ৯০০। তাছাড়া, শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করলে একটি অতিরিক্ত বিষয়ও পড়তে পারে। এইসব অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাষাও আছে।

বৈশিষ্ট্য

এই পাঠ্যক্রমের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলে বলা যায়, পূর্ববর্তী দশম শ্রেণীর শিক্ষার ও একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের সঙ্গে এর কিছু মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। এখানে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করা হ'য়েছে ; শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যাভ্যাস ও সামাজিক চেতনা বিকাশের কথাও বিবেচনা করা হ'য়েছে। কারণ পাঠ্যক্রমে এই সকল বিষয় অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। তাছাড়া, এখানে দুটি বিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যক্রমটিকে ভাষা (Language), বিজ্ঞান (Science), সামাজিক বিজ্ঞান (Social science) এবং কর্মশিক্ষা (Work education) নামে কয়েকটি মূল বিভাগে (Group) ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও এই পাঠ্যক্রমে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মৌখিক ও লিখিত, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। সুতরাং আপাতঃদৃষ্টিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলে বলা যায়, মাধ্যমিক স্তরের এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বসম্মত অনেক নীতিকেই কার্যকরী করা হ'য়েছে। এখানে আমরা সক্রিয়তার নীতি (Principle of activity), সমন্বয়ের নীতি (Principle of integration) ইত্যাদির প্রয়োগ দেখতে পাই।

মূল্যায়ন

কিন্তু, আরও একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, নীতিগত দিক্ থেকে অনেক ত্রুটি এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে বর্তমান। **প্রথমতঃ**, এই পাঠ্যক্রমে সব বিষয়গুলিকে আবশ্যিক করা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, তাকে নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে এখানে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে নীতি পাঠ্যক্রমে নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত, তা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি ! কেবলমাত্র কর্মশিক্ষার পাঠ্যসূচীতে কিছুটা কর্মনির্বাচনের স্বাধীনতা শিক্ষার্থীদের দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাও আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষালয়গুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছে। **দ্বিতীয়তঃ**, এখানে শিশুর চাহিদাকে

যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কারণ, এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল রকম সমস্যার সমাধান করতে পারে না। **তৃতীয়তঃ**, সমাজের চাহিদার কথাও এখানে সার্থকভাবে বিচার করা হয়নি। আধুনিক ভারতীয় সমাজ ক্রমেই কৃষিভিত্তিক থেকে শিল্পভিত্তিক হ'তে চলেছে। এই ধরনের প্রগতিশীল সমাজের উপযোগী অভিজ্ঞতাসমূহ এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে নেই। এখানে প্রাচীন অভিজ্ঞতাগুলির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে মাত্র। গতানুগতিক জ্ঞান দিয়ে শিক্ষার্থীরা আধুনিক ক্রমবিবর্তমান ভারতীয় সমাজে চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে না। **চতুর্থতঃ**, দাবি করা হয়েছে, এই পাঠ্যক্রমে কর্মশিক্ষার মত বিষয় অন্তর্ভুক্ত ক'রে একে কর্মকেন্দ্রিক করা হয়েছে। এই দাবিও ঠিক নয়। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল কথা হ'ল জ্ঞান ও কাজের সমন্বয়। সেই সমন্বয়, এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে করা হয়নি। কর্ম-অভিজ্ঞতা পৃথক একটি বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে মাত্র। কিন্তু তার দ্বারা শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য মনোভাব গড়ে উঠেছে বা কর্মের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার হ'চ্ছে, এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা খুব ভাল নয়। তাছাড়া, আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলিতে যে কর্মগুলি নির্বাচন করা হয়, সেগুলির এমন কোন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নেই, যার দ্বারা সমাজের উপকার হ'তে পারে। তাই বলা যায়, এই পাঠ্যক্রম কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কোন ভাল গুণই শিক্ষার্থীর মধ্যে এনে দিতে পারে না। **পঞ্চমতঃ**, এই পাঠ্যক্রম আধুনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে পারছে না, বা তা গ্রহণ করার উপযোগী বৌদ্ধিক বিকাশেও সহায়তা করতে পারছে না। কারণ এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সূচী আলোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে কোন জ্ঞানের শাখারই সর্বাধুনিক অভিজ্ঞতাকে স্থান দেওয়া হয়নি। **ষষ্ঠতঃ**, এই পাঠ্যক্রমে কোন আচরণগত উদ্দেশ্য (Behavioural objectives) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তাছাড়া, বিভিন্ন বিষয়ে পাঠের যে সব উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে, তাও খুব স্পষ্ট নয়। এই পাঠ্যক্রমে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে দার্শনিক ভাষায় যতদূর সম্ভব অস্বচ্ছভাবে প্রকাশ করা যায়, তারই চেষ্টা করা হ'য়েছে। আবার কোন কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও স্থাপন করা হয়নি। অথচ, বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই পাঠ্যক্রমে বিষয়-নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আচরণগত বহিঃপ্রকাশের দিক্ বা আচরণগত উদ্দেশ্যের (Behavioural objectives) কথা চিন্তা করা হয়। কারণ, আচরণগত উদ্দেশ্য পাঠ্যক্রম-নির্ণয়ের সহায়ক। এই নীতি অনুসরণ না করায়, সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমটি একটি উদ্দেশ্যবিহীন কতকগুলি বিষয়তালিকায় পরিণত হয়েছে। সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। **সপ্তমতঃ**, পাঠ্যক্রম রচনার আর একটি মৌল নীতি হ'ল পরিবর্তনশীলতার (Variability) ধর্ম সংযোজন করা। কিন্তু এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে তার কোন ব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র কর্মশিক্ষা ও শরীর-শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, এই সমস্ত দিক্ বিচার করে বলা যায়, এই পাঠ্যক্রম সর্বাঙ্গসুন্দর হয়নি। এরও সংস্কারের প্রয়োজন আছে। এই পাঠ্যক্রমে দৃষ্টিভঙ্গী ও

উদ্দেশ্যের পারস্পরিক বিরোধ প্রতিফলিত হয়েছে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও বিষয়ের মধ্যে সামগ্রিক সম্পর্ক স্থাপন কবার কোন চেষ্টা করা হয়নি। ফলে, এই পাঠ্যক্রম গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের মতই কতকগুলি বিষয়ের সমষ্টি হয়েছে মাত্র ; এর দ্বারা সামগ্রিক জীবনবিকাশ সম্ভব হবে না।

॥ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ॥
(Curriculum for Higher Secondary Stage XI & XII)

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্থা Higher Secondary Council) এই রাজ্যে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য 1976 সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে এক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করেছেন। এই পাঠ্যক্রম রাজ্যের অনুমোদিত শিক্ষালয়গুলিতে (বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়) বর্তমানে অনুসরণ করা হ'চ্ছে। এই পাঠ্যক্রমের সংগঠন নিম্নরূপ—

সংগঠন

[এক] উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রকৃতপক্ষে দুটি পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়েছে। এই স্তরের শিক্ষাকে মূলতঃ দুটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে—একটি সাধারণ শাখা (General Stream) এবং অপরটি বৃত্তিমূলক শাখা (Vocational Stream)। এই প্রত্যেক শাখার জন্য পৃথক পৃথক পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়েছে।

[দুই] **সাধারণ বিভাগের পাঠ্যক্রমকে** মোটামুটি চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগ এবং এদের অন্তর্গত বিষয়গুলি নিম্নরূপ—

1 **ভাষা** Languages) : এখানে দুটি বিভাগ করা হ'য়েছে। প্রথম বিভাগে আছে—ভারতীয় ভাষাসমূহ এবং ইংরাজী ও তিব্বতী ভাষা। দ্বিতীয় বিভাগে আছে—ইংরাজী, বাংলা, হিন্দি ও বিকল্প ইংরাজী।

বিভাগ—ক (Group A)		বিভাগ—খ (Group B)
বাংলা	তেলেগু	ইংরাজী
নেপালি	মালয়ালম্	বাংলা
সাঁওতালী	মারাঠী	হিন্দি
হিন্দি	গুজরাটী	বিকল্প ইংরাজী
উর্দু	পাঞ্জাবী	
অসমীয়া	ইংরাজী	
ওড়িয়া	তিব্বতী	
তামিল		

এই দুটি বিভাগের প্রত্যেকটি থেকে শিক্ষার্থীদের একটি ক'রে মোট দুটি ভাষা পড়া আবশ্যিক। ভাষার এই পাঠ্যসূচীর মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানে ইংরাজীকে আবশ্যিক করা হ'য়েছে। কোন শিক্ষার্থী যদি ক-বিভাগে ইংরাজী পড়ে, তবেই তার ক্ষেত্রে খ বিভাগে বাংলা, হিন্দী বা বিকল্প ইংরাজী পড়ার সুযোগ আছে, অন্যথা খ-বিভাগ

থেকে তাকে ইংরাজী পড়তেই হবে। আবার মাতৃভাষার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য যে সব শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরে (দশম শ্রেণী পর্যন্ত) বাংলা প্রথম ভাষা হিসেবে পড়েছে, ক-বিভাগে তাদের ক্ষেত্রে বাংলাকে আবশ্যিক করা হয়েছে। দুটি ভাষার প্রত্যেকটির জন্য 200 নম্বর ক'রে ধরা হয়েছে।

2 **আবশ্যিক ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ** (Compulsory Elective Subjects): দুটি ভাষা ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তিনটি ক'রে ঐচ্ছিক বিষয় পড়তে হবে। পাঠ্যক্রমে এই অংশে মোট 41টি বিষয় আছে। এই 41টি বিষয়ের মধ্য থেকে শিক্ষার্থীরা ইচ্ছানুযায়ী যে কোন তিনটি বিষয় বেছে নিতে পারে। তবে এই অংশের ভাষাগুলি (Language Subjects) নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখানে সেইসব ভাষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্বাচন করতে পারে, যেগুলি তারা ভাষা বিভাগে (1নং) গ্রহণ করেনি। এই অংশের 41টি বিষয়কে আবার দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হ'য়েছে - (ক) যে সব বিষয়পাঠে পরীক্ষাগার প্রয়োজন (Laboratory-based subjects) এবং (খ) যে সব বিষয়-পাঠে পরীক্ষাগারের প্রয়োজন নেই (Non-laboratory based subjects)। এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত বিষয়গুলি নিম্নরূপ -

(ক) **পরীক্ষাভিত্তিক বিষয়** (Laboratory based Subjects): পদার্থবিদ্যা, (Physics), রসায়নবিদ্যা (Chemistry), জীববিদ্যা (Biological Science), কৃষি-অর্থনীতি (Agronomy), ভূগোল (Geography), গৃহ-পরিচালনা ও সেবা (Home Management & Nursing), পুষ্টিবিদ্যা (Nutrition), চারুকলা ও হস্তশিল্প (Fine Arts & Crafts), সঙ্গীত (Music), মনোবিদ্যা (Psychology) এবং ভূতত্ত্ববিদ্যা (Geology)।

(খ) **পরীক্ষাগারহীন বিষয়**: (Non-laboratory based Subjects): গণিত (Mathematics), রাশিবিজ্ঞান (Statistics), অর্থনীতি (Economics), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), ইতিহাস (History), গণ প্রশাসন (Public Administration), নৃতত্ত্ব বিদ্যা (Anthropology), সামাজিক বিজ্ঞান (Sociology), দর্শনশাস্ত্র (Philosophy), ব্যবসায়িক অর্থনীতি ও গণিত (Business Economics including Business Mathematics), ব্যবসায়িক সংগঠন (Business Organisation), হিসাবশাস্ত্র (Accountancy), অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic Geography), শিক্ষাবিজ্ঞান (Education)।

এছাড়া, এই অংশে যে ভাষাগুলি আছে, তা হল—

(i) প্রাচীন ভাষাসমূহ (Classical languages)—সংস্কৃত (Sanskrit), পালি (Pali), ফার্সি (Persian) ও আরবি (Arabic)।

(ii) আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ (Modern Indian Languages)—বাংলা (Bengali), হিন্দি (Hindi), উর্দু (Urdu), নেপালী (Nepali), সাঁওতালী (Santhali), ওড়িয়া (Oria) এবং অসমীয়া (Assamese)।

(iii) আধুনিক বিদেশী ভাষা—(Modern Foreign Language)—ফরাসী (French), জার্মান (German), রাশিয়ান (Russian) এবং চৈনিক (Chinese)।

পাঠ্যক্রমের এই অংশে প্রত্যেক ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য 200 নম্বর, অর্থাৎ মোট 600 নম্বর ধরা হয়েছে।

৩. **অতিরিক্ত বিষয়** (Additional Subjects): প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষার পরবর্তী স্তরে সুবিধা পায়, সেজন্য পাঠ্যক্রমে অতিরিক্ত বিষয় নির্বাচনের সুবিধা আছে। পাঠ্যক্রমে এই অংশে বিষয়গুলিকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে— সাধারণ পর্যায়ের বিষয় (Ordinary level) এবং উন্নত পর্যায়ের (Advanced level)। এখানে, পূর্বোক্ত ঐচ্ছিক বিষয়ের (Compulsory elective subject) সবগুলিকেই রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির জন্য **সাধারণ পর্যায়ে** (Ordinary level) ও **উন্নত পর্যায়ের** (Advanced level) পাঠ্যসূচী রচনা করা হয়েছে। পূর্বোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কেবলমাত্র জীববিদ্যা (Biological sciences) এবং কৃষিনীতির (Agronomy) জন্য উন্নত পর্যায়ে কোন পাঠ্যসূচী নেই। আবার জীববিদ্যাকে ভেঙ্গে উদ্ভিদবিদ্যা (Botany), প্রাণীবিদ্যা (Zoology) এবং শারীর বিদ্যার (Physiology) জন্য কেবলমাত্র উন্নত পর্যায়ে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীরা এই অংশের বিষয়গুলির মধ্যে সাধারণ পর্যায়ের যে কোন একটি বিষয় অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পড়তে পারে, যদি সে ঐ বিষয় আবশ্যিক ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইতিপূর্বে নির্বাচন না ক'রে থাকে। এখানে তাকে 200 নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা দিতে হবে।

আবার কোন শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে বিকল্প হিসেবে একটি বা দুটি উন্নত পর্যায়ের (Advanced level) বিষয় ও অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে নিতে পারে। তবে এই বিষয় দুটি শিক্ষার্থীর আবশ্যিক ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকা উচিত। এই উন্নত পর্যায়ের বিষয়গুলির জন্য 400 নম্বর ধরা হয়েছে।

4. **সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী** (Co-curricular Activities): প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যে কোন একটি সহপাঠ্যক্রমিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। এখানে যে চারটি কর্মক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হ'ল— (ক) কর্মশিক্ষা (Work Education), (খ) শারীর শিক্ষা (Physical Education), (গ) এন. সি. সি. (N. C. C.) এবং (ঘ) সমাজসেবা (Social and Community Services)। এইসব বিষয়গুলির বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা নেই।

[**তিন**] **এখন পাঠ্যক্রমের বৃত্তিমূলক অংশ** (Vocational Stream) **সম্পর্কে** আলোচনা করা যাক। এখানেও সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমটিকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই চারটি অংশের বিন্যাস নিম্নরূপ :

1. **ভাষাসমূহ** (Languages : এই পাঠ্যক্রমে ভাষাগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে— প্রথম ভাষা (1st Language) এবং দ্বিতীয় ভাষা 2nd Language)। এখানে দুই অংশেই ভাষার সংখ্যা সাধারণ বিভাগের (General stream) থেকে কম। যে ভাষাগুলিকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা হ'ল—

বিভাগ—ক	**বিভাগ—খ**
বাংলা (Bengali)	ইংরাজী (English)
নেপালী (Nepali	বাংলা (Bengali)
হিন্দি (Hindi)	হিন্দি (Hindi)
উর্দু (Urdu)	
ইংরাজী (English)	

বৃত্তিমূলক বিভাগে ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ বিভাগের মত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মাধ্যমিক স্তরে যাদের প্রথম ভাষা বাংলা ছিল, তাদের এখানেও বাংলা পড়তে হবে এবং দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরাজী পড়তে হবে। যারা প্রথমে ভাষা হিসেবে ইংরাজী পড়ছে, তাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা অথবা হিন্দি পড়তে হবে। এখানে প্রত্যেক ভাষার জন্য 100 নম্বর ধরা হয়েছে। অর্থাৎ পাঠ্যক্রমের এই অংশের জন্য মোট 200 নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

2. **আবশ্যিক ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ** (Compulsory Elective Subjects) : এখানেও ভাষা ছাড়া শিক্ষার্থীদের তিনটি ক'রে আবশ্যিক ঐচ্ছিক বিষয় পড়তে হবে। সাধারণ বিভাগের (General Stream মত এখানে বিষয়গুলি দু' পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে— ক) পরীক্ষাগার-ভিত্তিক বিষয় (Laboratory subject) এবং খ) পরীক্ষাগারহীন বিষয় (Non-Laboratory subjects)। এই প্রত্যেক পর্যায়ে বিষয়ের সংখ্যা সাধারণ পাঠ্যক্রম থেকে অনেক কম। যেমন—

ক) পরীক্ষাগার-ভিত্তিক বিষয়ের মধ্যে আছে—পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়নবিদ্যা (Chemistry) এবং জীববিদ্যা (Biological Sciences)।

(খ) পরীক্ষাগারহীন বিষয়ের মধ্যে আছে—গণিত Mathematics, ব্যবসায়িক অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক গণিত (Business Economics including Business Mathematics, হিসাবশাস্ত্র (Accountancy এবং অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic Geography)।

অর্থাৎ, এখানে মোট আটটি বিষয়ের নাম উল্লেখ করা হ'য়েছে। শিক্ষার্থীরা এদের মধ্য থেকে যে কোন তিনটি বেছে নিতে পারে। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য 100 নম্বর ক'রে এই অংশে মোট 300 নম্বর রাখা হয়েছে।

৪ **বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ** (Vocational Subjects) : বৃত্তিমূলক বিভাগে (Vocational stream)-এর পাঠ্যক্রমের এই অংশের সঙ্গে সাধারণ বিভাগের (General stream)-এর পাঠ্যক্রমের কোন মিল নেই। এখানে মূল পাঁচটি বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রের (Vocational area) কথা উল্লেখ করা হয়েছে—**কৃষি** (Agriculture, **শিল্প [বয়ন]** (Industry Textile Group), **কারিগরী শিক্ষা** (Technical Education), **ব্যবসা ও বাণিজ্য** (Trade and Commerce) এবং **প্যারা-মেডিক্যাল শিক্ষা** (Para-Medical Education)। এই পাঁচটি বৃত্তিমূলক ক্ষেত্র থেকে শিক্ষার্থীদের যে কোন একটি নির্বাচন করতে হয়। পাঠ্যক্রমের এই অংশের জন্য মোট 500 নম্বর রাখা হয়েছে। এই প্রত্যেকটি বিস্তৃত বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে আবার কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজের উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বিশেষে কোথাও একটি বা কোথাও দুটি সীমিত ক্ষেত্র নির্বাচন করতে হয়। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে কি কি অংশ আছে, প্রতি ক্ষেত্রে কয়টি অংশ নির্বাচন করতে হবে এবং পাঠ্যক্রমের এই অংশে তাত্ত্বিক (Theoretical ও ব্যবহারিক (Practical) বিভাগের নম্বরের বণ্টন কেমন, তা নীচে দেওয়া হ'ল।

(ক) কৃষি-বিভাগ Agriculture)—যে কোন একটি অংশ নির্বাচন করতে হবে। নম্বরের বণ্টন—তাত্ত্বিক বিভাগ (Theoretical)—200 এবং ব্যবহারিক বিভাগ (Practical)—300।

(i) Hoticulture and Preservation of Fruts and Vegetables.
(ii) Crop Cultivation.
(iii) Pisciculture.
(iv) Poultry farming.

(খ) বয়ন-শিল্প (Industry—Textile Group) : এখানে সব অংশগুলিই পড়তে হবে। সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচীকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নম্বরের বণ্টন—তাত্ত্বিক বিভাগ (Theoretical)—300 এবং ব্যবহারিক বিভাগ—200।

(i) Textile Spinning and Weaving.
(ii) Textile processing, designing, bleaching, dying and finishing.

(গ) কারিগরী বিভাগ (Technical Education) : এই বিভাগে কোন একটি অংশ নির্বাচন করতে হবে। নম্বরের বণ্টন—তাত্ত্বিক বিভাগ (Theoretical)—200 এবং ব্যবহারিক বিভাগ (Practical)—300)।

(i) Mechanical servicing & Maintenance.
(ii) Automobile servicing & Maintenance.
(iii) Farm equipment servicing & Maintenance.
(iv) Fabrication Practice.

(v) Electrical servicing & Maintenance.
(v) Radio and Electronics servicing & Maintenance.
(vii) Civil Engineering Maintenance.
(v:i) Water supply an1 sanitary services.

ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগ (Trade & Commerc( ) : এই বিভাগে শিক্ষার্থীদের যে কোন দ্বটি অংশ নির্বাচন করতে হয়। নম্বরের বণ্টন—তাত্ত্বিক বিভাগ—300 এবং ব্যবহারিক বিভাগ—200।

(ı) Office Procedure & Routıne.
(ii) Stenography.
(iii) Co-operative Organisation & Operation.
(i\) Banking.
(v) Insurance.
(v) Import-Export Procedure.
(vii) Stores-Purchase and Stores-Maintenance.
(viii) Salesmanship and Advertising and Display.
(ix) Cost Accounting.
(x) Taxation laws (Income tax, Sales tax, Municipal tax, Octroi).
(xi) Accountancy.

(ঙ) **প্যারা-মেডিক্যাল বিভাগ** (Para-Medıcal Education) : এখানে শিক্ষার্থীদের যে কোন একটি অংশ নির্বাচন করতে হয়। নম্বরের বণ্টন—তাত্ত্বিক বিভাগ -.(0 এবং ব্যবহারিক বিভাগ—3(0।

[এই বিভাগটি বর্তমানে তুলে দেওয়া হয়েছে ।]

(i) Pharmacy.
(ii) Multipurpose Health Education.
(iii) Medical laboratory technology.

4 সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী (Co curricular) :

সাধারণ বিভাগের পাঠ্যক্রমের মত বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রমেও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা আছে। এই অংশের বহিঃপরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। নিম্নলিখিত কাজগুলির মধ্যে যে-কোন একটি শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক।

(i) কর্মশিক্ষা (Work Education)
(ii) শারীর শিক্ষা (Physical Education)
(iii) এন. সি সি. (N. C. C.)
(iv) সমাজসেবা (Social & Community Services)

[চার] এই পাঠ্যক্রমে সাধারণ বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের কলা (Arts), বিজ্ঞান (Science ইত্যাদির মত শ্রেণীতে ভাগ করার কোন ব্যবস্থা পূর্বে ছিল না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ইচ্ছামত বিষয়-নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হ'ত। অর্থাৎ, 41টি বিষয়ের মধ্য থেকে শিক্ষার্থীর যে-কোন তিনটি বিষয় ইচ্ছামত নির্বাচন করতে পারত। কিন্তু বর্তমানে এই সুযোগ আর দেওয়া হয় না, বিষয়গুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হ'য়েছে। শিক্ষার্থীদের এইরকম তিনটি শ্রেণী থেকে এক-একটি বিষয় নির্বাচন করতে হয়। ফলে, নির্বাচনের স্বাধীনতা বর্তমানে অনেক কম।

[পাঁচ] বৃত্তিমূলক বিভাগের Vocational Stream) শিক্ষার্থীদের উন্নত স্তরে শিক্ষার জন্য এই পাঠ্যক্রমের একটি সংযোগী অংশের (Bridge Course) ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কোন শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে বৃত্তিমূলক বিভাগের পাঠ্যক্রম কৃতকার্য হওয়ার পর এই অংশ গ্রহণ করতে পারত। পাঠক্রমের এই অংশে প্রথম, দ্বিতীয় দুটি ভাষা এবং তিনটি ঐচ্ছিক বিষয় ছিল। এই 5টি বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য 100 নম্বর ধার্য করা হয়েছিল। বর্তমানে এই ব্যবস্থাও তুলে দেওয়া হয়েছে।

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের এই পাঠ্যক্রমে অনেক নতুনত্ব আছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পাঠ্যক্রমের মধ্যে দু'টি বিভাগ। যে সকল শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরের পর আর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে না, তাদের কর্মজীবনের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিশেষভাবে দক্ষতা-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটি একটি পাঠক্রমের ভাল দিক্।

মৌলিক বৈশিষ্ট্য

সাধারণ বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচন করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের ওপর আংশিক বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ফলে, বিষয়গুলি নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের অপেক্ষাকৃত বেশ স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত স্তরে (Advanced level) পড়াশুনা করার ব্যবস্থা থাকায়, এই পাঠক্রম অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। তাছাড়া, এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশে সহায়তা করার জন্য সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীকেও আবশ্যিক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই পাঠক্রমে সমস্ত বিষয়ে শতকরা দশ নম্বর শিক্ষালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ভিত্তিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং, এই সকল দিক্ বিবেচনা ক'রে বলা যায়, উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম সর্বাধুনিক শিক্ষানীতিগুলিকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এর কতকগুলি সাধারণ অসুবিধার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। **প্রথমতঃ**, সাধারণ বিভাগে (General strem) যতগুলি ঐচ্ছিক বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে ন'-দশটির বেশী পড়ানোর ব্যবস্থা খুব কম শিক্ষালয়েই আছে। ফলে, শিক্ষার্থীদের বিষয়-নির্বাচনের ক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবেই সীমিত হ'য়ে পড়ে। পরে সমগ্র পাঠক্রমকে পরিচালনা করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না ক'রে শুধুমাত্র লিখিতভাবে পাঠ্যক্রম রচনা করার কোন তাৎপর্য থাকতে পারে না। **দ্বিতীয়তঃ**, বৃত্তিমূলক বিভাগে ভাষাকে

পাঠ্যক্রমে রেখে শিক্ষার্থীদের ওপর অযথা চাপসৃষ্টি করা হয়েছে। যেখানে উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক দক্ষতা-অর্জনে সহায়তা করা, সেখানে ভাষার ওপর গুরুত্ব না দিলেও চলত। **তৃতীয়তঃ**, সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীকে আবশ্যিক করা হলেও সর্বশেষ পরীক্ষায় এর কোন মূল্যায়নের ব্যবস্থা না থাকায়, শিক্ষালয়গুলি এই অংশকে যথাযথ গুরুত্ব দেন না। ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছিল, পূর্ববর্তী উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের (একাদশ শ্রেণীর) হস্তশিল্পের (Craft) ক্ষেত্রে। পাঠ্যক্রম-রচয়িতারা সেই অভিজ্ঞতাকে কেন বিচার করেননি, বোঝা গেল না। **চতুর্থতঃ**, এই পাঠ্যক্রমের পূর্ববর্তী নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমকে যে অনুপাতে সহজ করা হয়েছে, এই পাঠ ক্রমকে সেই অনুপাতে কঠিন করা হয়েছে। ফলে, বহু ছাত্র-ছাত্রী এই পাঠ্যক্রমে সফলতা লাভ করতে ব্যর্থ হ'চ্ছে।

উপসংহারে বলা যায় নতুন-প্রবর্তিত এই উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম আরও যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ রাখে। তাই এর সঠিক মূল্যায়ন এত শীঘ্র করা সম্ভব নয়, করার চেষ্টা করলে তা হবে সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক।

॥ আলোচনা ॥

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে, এই পুনর্বিন্যাস অনুযায়ী পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্পূর্ণ কালই মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এখন, আমরা যদি সামগ্রিকভাবে এই মাধ্যমিক স্তরের (১০ + ২) পাঠ্যক্রমের মূল্যায়নের চেষ্টা করি, তাহ'লে দেখব, এই যৌগ পাঠক্রমেরও অনেক ত্রুটি থেকে গেছে। **প্রথমতঃ**, দুই স্তরকে একত্রে বিচার করলে দেখা যায়, মাধ্যমিক (দশম মান) স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করা হয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, এই দুই স্তরের পাঠ্যক্রম পৃথক পৃথক সংস্থার দ্বারা রচিত হওয়ায়, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটেছে। অর্থাৎ দুটি পাঠ্যক্রমকে একত্রে বিচার করতে গেলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে। **দ্বিতীয়তঃ**, অনেকে দাবী করেন, এই পাঠ্যক্রমকে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে, একে আমরা বহুমুখী পাঠ্যক্রম বলতে পারি এবং এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা পরিতৃপ্ত করা যায়। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই পাঠ্যক্রম বহুমুখী হলেও পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে সংকীর্ণ করে ফেলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছা বা আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করার স্বাধীনতা পায় না। বিষয়-নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষও বর্তমানে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন। তাই এই পাঠ্যক্রম ব্যক্তির চাহিদা সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারছে, এ কথাও মেনে নেওয়া যায় না। **তৃতীয়তঃ**, এই পাঠক্রমকে বৃত্তিমুখী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে ঠিকই কিন্তু সেখানেও শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে বৃত্তি নির্বাচন করতে পারে না। কয়েকটি নির্দিষ্ট বৃত্তিতে প্রশিক্ষণ নেওয়া

ছাড়া তাদের উপায় থাকে না। ফলে, এই বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের চাহিদা মেটাতে সমর্থ নয়। চতুর্থতঃ, সম্পূর্ণভাবে (১০+২) মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমটি জীবনকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারেনি। সামগ্রিকভাবে এই পাঠ্যক্রমে তাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। উন্নয়নশীল সমাজে বসবাসকারী মানুষের বর্তমান ও ভবিষৎ জীবনের সমস্যাগুলির কথা বিচার করে এই পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়নি। পঞ্চমতঃ, এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থীদেব অবসরযাপনের শিক্ষা এবং পরিপূর্ণ নাগরিকতার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে, আমাদের আশঙ্কা, এই পাঠ্যক্রম অনুশীলনের পর যে সব শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয় থেকে বেরিয়ে আসবে, তারা পরিপূর্ণ সামাজিক মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই জাতীয় স্বার্থে মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি সাধন করতে হ'লে এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে নাগরিকতা শিক্ষার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর হিসেবে উন্নীত করতে হ'লে অবিলম্বে এই দুই স্তরের (১০ + ২) পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস ক'রে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগসূত্রে আবদ্ধ কবতে হবে।

সারসংক্ষেপ

পাঠ্যক্রম (Curriculum) শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আধুনিক অর্থে পাঠ্যক্রম আর কতকগুলি পাঠ্য বিষয়ের সমষ্টি নয়। জীবনের বিকাশ-উপযোগী অভিজ্ঞতাসমূহের সার্থক সমন্বয় হ'ল পাঠ্যক্রম। এই অর্থে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে, সবই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

পাঠ্যক্রমের ধারণার যেমন বিবর্তন হয়েছে, তেমনি তার সংগঠনেরও পরিবর্তন হয়েছে। গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের সঙ্গেই আমরা বেশী পরিচিত। কিন্তু ঐ পাঠ্যক্রমের নানা রকম অসুবিধা থাকায় এবং বিকল্প শিক্ষানীতির বিকাশ হওয়ায় শিক্ষাবিদ্গণ বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম রচনার প্রস্তাব করেছেন। যেমন—কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম, অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম ইত্যাদি। কিন্তু এই নতুন পাঠ্যক্রমগুলির যেমন সুবিধা আছে, তেমনি অসুবিধাও কিছু কিছু আছে। এককভাবে একটি নীতির দ্বারা রচিত কোন পাঠ্যক্রম শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হ'তে সহায়তা করে না। তাই সর্বাঙ্গসুন্দর একটি পাঠ্যক্রম রচনা করতে হ লে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিদ্যার নীতিগুলিকে কাজে লাগাতে হবে।

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য ও শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, শিক্ষা ও জীবন-প্রক্রিয়া সহগামী, তাই পাঠ্যক্রমকে জীবনকেন্দ্রিক করতে পারলে, শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। এই জীবনকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম-রচনার কতকগুলি মৌল নীতি আছে। এই নীতিগুলি হ ল—(১) উদ্দেশ্যের নীতি, (২) চাহিদার নীতি, (৩) সামাজিক চাহিদার নীতি, (৪) সমন্বয়ের নীতি, (৫) সংরক্ষণের নীতি, (৬) সৃজনশীলতার নীতি, (৭) সক্রিয়তার নীতি, (৮) অগ্রমুখীতার নীতি, (৯) পরিবর্তনশীলতার নীতি, (১০) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি, (১১) বৃত্তিমুখী নীতি, এবং (১২) অবসর-যাপনের নীতি।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করা হ'য়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (১০+২) শিক্ষাস্তরের প্রবর্তন। তাই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ২টি পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়েছে। একটি দশম মান পর্যন্ত এবং অপরটি একাদশ দ্বাদশ মানের জন্য। এই দুটি পাঠ্যক্রমকে পৃথক পৃথক ভাবে মৌল নীতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। আবার, দুটি পাঠ্যক্রমকে একত্রে বিচার করলেও দেখা যায়, তাতে পাঠ্যক্রম রচনার মৌলনীতিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

প্রশ্নাবলী

1. What is modern concept of Curriculum ? How does this concept differ from the old one ? What basic consideration shculd be made in constructing ?

   [পাঠ্যক্রমের আধুনিক ধারণা কি ? এর সঙ্গে প্রাচীন ধারণার পার্থক্য কোথায় ? পাঠ্যক্রমের সংগঠনের জন্য বিবেচ্য মৌল বিষয়গুলি কি ?]

2. Define your principles of curriculum construction for the education of whole man.

   [পরিপূর্ণ মানুষ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রম নির্ধারণের নীতিগুলি ব্যক্ত কর।]

3. Describe critically the principles that should operate in construction of curriculum.

   [পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে নির্ধারক নীতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর]

4. What is meant by subject centred curriculum ? Discuss its advantages and disadantages.

   [বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম বলতে কি বোঝায় ? এই পাঠ্যক্রমের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

5. What is meant by activity curriculum ? Explain in some deiails.

   [কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম বলতে কি বোঝায় ? বিস্তারিত আলোচনা কর।]

6. "In the early stages the curriculum should be thought in terms of activities rather than subject matter." Do you agree ? Give reasons for your answer.

   ['প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যক্রম বিষয়কেন্দ্রিক না হ'য়ে কর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত।" তুমি কি এই যুক্তি সমর্থন কর ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।]

7. Critically discuss the curriculum at present in the primary stage.
[বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যে পাঠ্যক্রম আছে, সে সম্পর্কে আলোচনা কর।]

8 Evaluate the curriculum of present Class X school in your state.
[তোমার রাজ্যে দশম শ্রেণী বিদ্যালয়ে যে পাঠ্যক্রম আছে, তার মূল্যায়ন কর।]

9. Evaluate the present Higher Secondary curriculum in the light of the basic principles of curriculum construction.
[পাঠ্যক্রম রচনার মৌল নীতির ভিত্তিতে বর্তমান উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন কর।

10. Write notes on (টীকা লেখ) :
   (a) Activity curriculum (কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম)
   (b) Principles ot curriculum construction (পাঠ্যক্রম রচনার নীতি)
   (c) Modern concept of curriculnm (পাঠ্যক্রমের আধুনিক ধারণা)

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষক ঃ তাঁর কাজ ও গুণাবলী
The Teacher : His Functions and Qualifications

শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে শিক্ষক (Teacher) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একজন আদর্শ শিক্ষক সমস্ত রকম অসুবিধার মধ্যেও শিক্ষার কাজ এমন সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন যে, সম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সার্থকতা আসে। আবার সকল রকম সুবিধা ও সুযোগ পেয়েও শিক্ষকের যোগ্যতা না থাকার জন্য সম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন (কোঠারী, ১৯৬৬) তাঁদের রিপোর্টে শিক্ষকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। শিক্ষকদের মর্যাদা (Teacher status)-শীর্ষক অধ্যায়ে কমিশন এই বলে শুরু করেছেন—"Of all the different factors which influence the quality of education and its contribution to national development, the quality, competence and character of teachers are undoubtedly the most significant." শিক্ষকের এই গুরুত্বের কথা চিন্তা ক'রে তাঁর কাজ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করব।

॥ প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান ॥
(Place of Teacher in the scheme of Education)

শিক্ষার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উল্লেখ করেছি – শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যবস্তু বা পাঠ্যক্রম। প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন শিক্ষার কেন্দ্র। শিক্ষাকে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হ'ত। এর এক প্রান্তে থাকতেন শিক্ষক, অপর প্রান্তে শিক্ষার্থী। জ্ঞান বা বিষয়বস্তু ছিল তাদের মধ্যে সংযোগের মাধ্যম। অর্থাৎ, জ্ঞান শিক্ষকের দিক্ থেকে ছাত্রাভিমুখে প্রবাহিত হ'ত। এই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকই ছিলেন সক্রিয় উপাদান, আর শিক্ষার্থী ছিল নিষ্ক্রিয় বা গ্রহণাত্মক (receptive) উপাদান মাত্র। শিক্ষক ছিলেন জ্ঞানের আধার, আর সেই আধার থেকে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করতেন। শিক্ষার্থীর কি শেখার যোগ্যতা আছে, কি কি জিনিস সে শিখতে চায়, এ নিয়ে শিক্ষককে ভাবতে হ'ত না। তিনি পূর্ব-পরিকল্পিত গতানুগতিক রীতিতে শিক্ষার্থীর জীবন-ধারণের জন্য যে সব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অপরিহার্য মনে করতেন, সেই তাকে দিতেন। শিক্ষকের উদ্দেশ্য ছিল আদর্শ জীবন-গঠনে সাহায্য করা। হয়ত তাঁর পদ্ধতি ভুল হ'তে পারে। তাঁর যে তত্ত্বমূলক দিক্ আছে, তা ভ্রান্ত হ'তে পারে। তবে তিনি ছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শিক্ষার্থীর জীবনকে গড়িয়ে পিটিয়ে তৈরি

শিক্ষক কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

করার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। তাই একজন বিখ্যাত চিন্তাবিদ্ বলেছেন—"It is the teacher about whom the whole educational system rotates." কিন্তু এই ধারণার পরিবর্তন হ'য়েছে আধুনিক কালে। শিক্ষার তাৎপর্য আধুনিক কালে নতুন সংব্যাখ্যান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গতানুগতিক রীতিতে শিক্ষকের যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে আদান-প্রদান বা দাতা-গ্রহিতার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছিল, তাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করা হয়েছে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক তাঁর স্থান পরিবর্তন করেছেন, শিক্ষার তাৎপর্যের সঙ্গে সমতা রেখে।

॥ আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান ॥
(Place of Teacher in modern Education)

শিক্ষাবিদ্‌রা আধুনিক শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 'শিশুকেন্দ্রিক' কথার তাৎপর্যই সহজে প্রকাশ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান কোথায়। শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে, প্রাচীন চিন্তাধারার বিরুদ্ধে একদিন যে ঝড় উঠেছিল, তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আজকে আমরা এই পর্যায়ে এসে পড়েছি। ব্যাপক মনোবিদ্যার তত্ত্বের প্রয়োগ এবং শিক্ষা-দার্শনিকদের প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে এই আন্দোলনকে স্থায়ীভাবে স্থান ক'রে দিয়েছে।

আধুনিক শিক্ষার তাৎপর্য

সুতরাং আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ'ল শিক্ষার্থী; শিক্ষক নয়, পাঠ্যক্রম নয়। শিক্ষার্থীর চাহিদা, অনুরাগ, ক্ষমতা ইত্যাদি প্রধান। সে তার নিজস্ব মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করবে। শিক্ষকের কাজ হবে তাকে সহায়তা করা। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক এখন পেছনে। তিনি শিক্ষার্থীর ওপর জোর ক'রে তার নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব চাপিয়ে দেবেন না। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে থাকবেন শিক্ষার্থীর পাশে তার সহায়ক হিসেবে।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের গুরুত্ব ও দায়িত্ব

প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক ছিলেন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার উৎস এবং শিক্ষার্থীকে জ্ঞান বিতরণ করাই ছিল তাঁর কাজ। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর এই অবস্থিতি জ্ঞান-আহরণে সহায়তার চেয়ে বাধা সৃষ্টি করত বেশী। বর্তমানে তিনি শিক্ষার্থীকে সুযোগ দেবেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে। শুধু প্রয়োজনবোধে তিনি তাকে নির্দেশনা (Guidance) দেবেন। তাঁর পরিপক্ব মন শিশুকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে না, পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই অর্থে আধুনিক শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর নির্দেশক (Guide) মাত্র।

শিক্ষকের কাজ

আবার শিক্ষকের এই নতুন দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের নতুন ক'রে চিন্তা করতে হবে। গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায়, শিক্ষক জ্ঞান

দান করতেন এবং শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করত। ধারণা এই ছিল যে, সেই আদান-প্রদানের পরিবেশ হবে গাম্ভীর্যপূর্ণ। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব এমন হবে যাতে ক'রে তাঁর অবস্থিতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে পারে। এই ধারণা অনুযায়ী "ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে।" কিন্তু আধুনিক শিক্ষার ধারণা অনুযায়ী শিক্ষক হবেন শিশুর নির্দেশক। আদর্শ নির্দেশক তিনিই হ'তে পারেন, যিনি তার সঙ্গীকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন এবং আদর্শ নির্দেশনা তখনই সম্ভব, যখন গ্রহিতা নির্দেশকের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ হবে। তাই আধুনিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে বলিতে হয়, শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। তিনি সব সময় শিক্ষার্থীর পাশে বন্ধুর মত থাকবেন। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের সহজ সম্পর্ক গড়ে না উঠলে শিক্ষা সার্থক হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন—"গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যায়, তাহ'লে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। · আমাদের গুরুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান · । তাই পাকাশাখার কচিশাখায় ফুল ফোটাবার, ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হ'য়ে থাকে।" সুতরাং আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু (Friend। বন্ধুত্বের সহজ সম্পর্ক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে তুলতে না পারলে শিক্ষার কাজ সার্থক হবে না।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক

সবশেষে, আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ ক'রে তাঁর চারিত্রিক গুণের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থান শিক্ষার্থীর পাশে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। শিক্ষক কোনকিছু কৃত্রিম উপায়ে শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেবেন না। শিক্ষার্থী পারস্পরিক সহযোগিতা ও বসবাসের মাধ্যমে শিক্ষকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে। তিনি হবেন শিক্ষার্থীর জীবনের আদর্শ। শিক্ষককে কেন্দ্র ক'রেই শিশু তার জীবনাদর্শ গড়ে তুলবে। তাই তিনি হবেন, শিক্ষার্থীর কাছে আদর্শ পুরুষ। তিনি শিক্ষার্থীর মনে জীবনাদর্শ জাগিয়ে তুলবেন, তিনিই তার মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করবেন।

শিক্ষকের দায়িত্ব

সুতরাং, আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের অবস্থানের যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি তার দায়িত্বেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি সব সময় শিক্ষার্থীর পাশে থেকে তাঁর নিজের আদর্শ জীবনের প্রভাবের দ্বারা শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত ক'রে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তার জীবনবিকাশের সহায়তা করবেন। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের এই গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ পার্সিভেল রেন

(P. Wren) বলেছেন—"The teacher is not merely the fountain of facts, the working encyclopaedia, and the universal provider of useful and useless information to the young, but their guide, philosopher, and friend, the skilled builder of their character, trainer of their bodies and developer of their intellect." শিক্ষা-ব্যবস্থার সামগ্রিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে শিক্ষকের কর্তব্য ও দায়িত্বের যে পরিবর্তন হ'য়েছে, তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই। শিক্ষক যদি তাঁর এই নতুন দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তবেই তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা কি হ'বে, তা তুলে ধরার জন্য নীচে তুলনামূলক তালিকাটি উপস্থাপন করা হ'ল।

প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক	আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক
১। প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা ছিল মুখ্য।	১। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের গুরুত্ব শিক্ষার্থীর পরে।
২। প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের কাজ ছিল প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করা।	২। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের কাজ হ'ল পরোক্ষভাবে শিশুর আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করা।
৩। প্রাচীন শিক্ষার সফলতা নির্ভর করতো সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকের সক্রিয়তার ওপর।	৩। আধুনিক শিক্ষার সফলতা নির্ভর করে শিক্ষক কতটা শিক্ষার্থীকে সক্রিয় ক'রে তুলতে পারেন তার ওপর।
৪। প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক ছিলেন একমাত্র সর্বময় নিয়ামক, তিনি ছিলেন কঠোর প্রশাসক।	৪। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষক হ'লেন একটি গণতান্ত্রিক সংস্থার প্রকৃত নেতা।
৫। প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষকের কাজ ছিল তৈরী অভিজ্ঞতা প্রদান করা বা আরোপ করা।	৫। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষক সহায়ক ও নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন।
৬। প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে অবদমন করতেন।	৬। আধুনিক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলি প্রকাশের সুযোগ দেন।
৭। প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কৃত্রিম আচরণ করে তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতেন।	৭। আধুনিক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করেন।

॥ সার্থক শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ॥
(Characteristics of Competent Teacher)

প্রাচীন চিন্তাধারাই হোক, কি আধুনিক চিন্তাধারাই হোক, শিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্রেই এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সার্থক করার জন্য যেমন চাই আদর্শ পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি, শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, তেমনি চাই সুশিক্ষক। আদর্শ শিক্ষক ছাড়া যে কোন আদর্শ শিক্ষা-পরিকল্পনাই ব্যর্থ হবে। আদর্শ শিক্ষক যে কোন পরিস্থিতির ভেতর নিজের কুশলতায় শিক্ষার্থীকে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আবার, শিক্ষক যদি ভাল না হন, তাহ'লে যতই পরিবেশ ও পদ্ধতি ভাল হোক-না-কেন, শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। তাই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হ'লে চাই যোগ্য শিক্ষক।

প্রস্তাবনা

আবার মনোবিদ্যার জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, প্রত্যেক মানুষের তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (দৈহিক এবং মানসিক) আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য বা গুণ দিয়ে সে একটা বিশেষ বৃত্তির চাহিদা সার্থকভাবে মেটাতে পারে। অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সংলক্ষণ Traits আছে, তার ভিত্তিতেই বৃত্তি নির্বাচন করা উচিত। তাহ'লেই জীবনে সফলতা আসবে, সমাজও উপকৃত হবে। শিক্ষকতাকে যদি আমরা বৃত্তি হিসেবে ধরি, তাবও নিশ্চয়ই ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু চাহিদা থাকা স্বাভাবিক। কোন্ কোন্ বিশেষ গুণ থাকলে এই বৃত্তির চাহিদা সার্থকভাবে মেটানো যায়. বা শিক্ষকের কি কি গুণ থাকা আদর্শগত দিক্ থেকে দরকার. সে সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব।

শিক্ষকের গুণ-বিবেচনা কেন ?

কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে সুশিক্ষক হওয়া যায়, এ নিয়ে মনোবিদ্, শিক্ষাবিদ্ এবং চিন্তাবিদ্‌রা বহুদিন ধরে আলোচনা ক'রে আসছেন। তার বিশেষ কয়েকটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা ক'রব। আলোচনার সুবিধার জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

শিক্ষকের গুণাবলীর শ্রেণীবিভাগ

[ক] ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য (Subjective or Personal Characteristics)।

[খ] বস্তুগত বা পেশাগত বৈশিষ্ট্য (Objective & Professional Characteristics)।

অনেকে অবশ্য এই শ্রেণীবিভাগ অন্যভাবে করেন। যেমন—কেউ বলেছেন, অর্জিত ও অনর্জিত গুণ ; আবার কেউ বলেছেন, ব্যক্তিগত গুণ ও বৃত্তিগত গুণ ইত্যাদি। যে কোন ধরনের শ্রেণীবিভাগই হোক-না-কেন শিক্ষকের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকার প্রয়োজন, সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

॥ [ক] ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ॥
(Personal Characteristics)

যে সব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য শিক্ষার সহায়ক, তাকে বলা হচ্ছে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। এই গুণগুলোর মধ্যে কতকগুলো আছে দৈহিক, কতকগুলো মানসিক, আবার কতকগুলো জন্মগতভাবে পাওয়া, কতকগুলো অর্জন করা। অর্জিত এবং অনর্জিত এই দু'ধরনের শ্রেণীবিভাগের অসুবিধা আছে। অনর্জিত গুণের ওপর ভিত্তি ক'রেই অর্জিত গুণ বিকাশলাভ করে। আবার অনেক অনর্জিত বৈশিষ্ট্যের পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিবর্ধন হয়। তাই সেই ধরনের শ্রেণীবিভাগ আমরা এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করব না।

প্রস্তাবনা

[এক] সুশিক্ষক আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন। ব্যক্তিত্ব বলতে সাধারণ অর্থে আমরা যা বুঝি তা নয়। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা আমাদের বদলে ফেলতে হবে। আমাদের ধারণা ছিল, শিক্ষক সব সময় গম্ভীর থাকবেন, ছাত্রদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করা তাঁর উচিত নয়। তাঁর বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া (Emotional Reaction) যাতে প্রকাশ না পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্বের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু এবং সমাজেরও বন্ধু। তাই বন্ধুভাবাপন্ন হওয়ার জন্য ব্যক্তিত্বের যে সব সংলক্ষণ (Personality traits) থাকা উচিত, তা তাঁর মধ্যে থাকবে। তাঁর ব্যক্তিত্ব এমনভাবে সংগঠিত হবে, যাতে ক'রে তিনি স্বাভাবিকভাবে ছাত্রদের আকর্ষণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তিনি সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারবেন, সেরকম ব্যক্তিত্ব যেন তাঁর থাকে।

ব্যক্তিসত্তার সংরক্ষণ

[দুই] সুশিক্ষকের বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি সাধারণ যে কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশী হওয়া দরকার। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত করতে হবে। শিশুর আচরণকে মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং আধুনিক কালে শিক্ষা-পরিস্থিতি একেবারে পূর্ব-নির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত ধারায় চলবে, এ কথা বলা যায় না। শ্রেণীকক্ষে নানা রকম সমস্যার উদ্ভব হ'তে পারে, সেই সমস্যাকে সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিক্ষকের মানসিক যোগ্যতা থাকার দরকার। তিনি যাতে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন, তার জন্য তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি বেশি হওয়ার দরকার। আধুনিক পরিমাপের ভিত্তিতে ঠিক কত বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) হ'লে সুশিক্ষক হ'তে পারবেন, তা মনোবিদ্‌রা সঠিক ক'রে বলতে পারেননি। তবে তাঁরা মনে করেন, সুশিক্ষকের বুদ্ধ্যঙ্ক 1 0-র বেশী হওয়া দরকার।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচারশক্তি

[তিন] সুশিক্ষকের যথেষ্ট দায়িত্ববোধ থাকবে। তিনি সব সময় সচেতন থাকবেন ; ব্যক্তি হিসেবে সমাজ তাঁর ওপর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সমাজ তাঁর

ওপর ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলার ভার দিয়েছে। তাঁর আচরণের দ্বারাই শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে প্রবাহিত হয়। আদর্শ শিক্ষক শিশুর মনে এমন এক ছাপ রেখে যান যা তার পরবর্তী জীবনে সব রকম আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষক যদি তাঁর এই গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না থাকেন, তবে তিনি কোনদিনই সুশিক্ষক হ'তে পারেন না। সুশিক্ষক তিনি, যিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার গঠনে সাহায্য করবেন, তাঁর নিজস্ব আচরণ, চিন্তাধারা, মন্তব্য ইত্যাদির দ্বারা।

দায়িত্ববোধ

[চার] সুশিক্ষক তাঁর চিন্তায় এবং আচরণে প্রগতিশীল হবেন। গতি-প্রবণতা হ'ল আধুনিক যুগের ধর্ম। যে মানুষ এই গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না, সে জীবন-সংগ্রামেও পিছিয়ে পড়বে। তাই মানুষকে বাঁচতে হ'লে যুগের সঙ্গে তাল রেখে বাঁচতে হবে। যুগধর্মের সমস্ত গুণ ও মানকে ব্যক্তিজীবনে গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য একান্ত প্রয়োজন। তিনি যদি আধুনিক ধারার সঙ্গে পরিচিত না হন, তিনি যদি আধুনিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী না হন, তাহ'লে তিনি আধুনিক জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার অযোগ্য ব'লে বিবেচিত হবেন। জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনিই প্রথম সারিতে প্রথম পা বাড়াবেন। তবেই শিক্ষার্থীরা তাল মেলাতে পারবে। তিনি আধুনিকতার সৃষ্টিকর্তা হবেন, তিনি তার রক্ষক হবেন। এডওয়ার্ড থ্রিং (Edward Thring) বলেছেন—"The work of the teacher is two-fold, producing thought and retaining it."

প্রগতিশীল ধারার
স্রষ্টা ও রক্ষক

[পাঁচ] সুশিক্ষকের আর একটা লক্ষণ হ'ল তাঁর প্রক্ষোভমূলক জীবনের পরিণমন (Emotional maturity)। তিনি অল্পে নিরাশ হবেন না। কোন ব্যর্থতা যেমন সহজভাবে নেবেন, তেমনি আবার কোন সাফল্যকে সংযমের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। অত্যধিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ মানুষকে বিচলিত করে। তাই আত্মসংযম, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কাজ চালিয়ে যাওয়ার মত মানসিক স্থৈর্য শিক্ষকের থাকা উচিত।

প্রক্ষোভমূলক
পরিণমন

[ছয়] সুশিক্ষকের আর একটা বড় গুণ হ'ল যে, তিনি উন্নত জীবনাদর্শ গ্রহণ করবেন। শিক্ষার্থীরা তাঁকে দেখেই অনুকরণ করতে শিখবে। তিনি উন্নত ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। দয়া, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি বিমূর্ত নৈতিক ধারণা (Moral Concept) শিশুকে পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে দেওয়া যায় না। জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমেই এদের অনুশীলন সম্ভব। মনের সঙ্গে মনের, জীবনের প্রত্যক্ষ সম্মেলন না হ'লে শিশুদের মধ্যে জীবনাদর্শ গড়ে তোলা যায় না। তাই সঠিক জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে হ'লে শিক্ষককে তার অধিকারী হ'তে হবে।

জীবনাদর্শ

[**সাত**] সুশিক্ষকের আর এক বৈশিষ্ট্য হ'ল স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা। আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় আদর্শ নাগরিক হ'তে হ'লে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা থাকার দরকার। শিশুদের মধ্যে এই ক্ষমতাকে জাগাতে হ'লে শিক্ষককেও সেই ক্ষমতার অধিকারী হওযার দরকার। তিনি যে কোন সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে যেন তাঁর স্বাধীন চিন্তা ব্যক্ত করতে পারেন। অন্যের চিন্তার দ্বারা ভারক্রান্ত হ'লে, তিনি সেই ধারণাই শিক্ষার্থীদের ওপর জোর ক'রে চাপানোর চেষ্টা করবেন। এতে ক'রে ব্যক্তির স্বাভাবিক চিন্তার বিকাশ ব্যাহত হবে; সে ক্রমে মানসিক দিক্ থেকে পঙ্গু হ'বে যাবে।

স্বাধীন নিরপেক্ষ চিন্তার ক্ষমতা

[**আট**] শিক্ষকতা হ'ল মহান বৃত্তি (Teaching is a noble profession)। এই মহান্ বৃত্তি মানুষকে তার যোগ্যতা ও সেবার গুরুত্বের উপযোগী ফল সব সময় দেয় না। অর্থের চেয়ে আদর্শই এই বৃত্তি-নির্বাচনের মূল কথা। তাই সুশিক্ষককে সেবাধর্মী মন নিয়ে আসতে হবে। সেবার মনোবৃত্তি যদি না থাকে, তিনি যদি মনে না করেন যে, তিনি কর্মের দ্বারা মানুষের সেবা করেছেন, তাহলে তিনি শিক্ষকতা কাজে তৃপ্তি পাবেন না এবং তাঁর দ্বারা শিক্ষার আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হবে না। অর্থের বা কোন স্বার্থের বিনিময়ে বিদ্যাদান শিক্ষকতা-বৃত্তির পক্ষে কাম্য নয়। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরুর মধ্যে আমরা এই আদর্শ দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথও এই আদর্শকে বড় ক'রে দেখেছেন। তিনি বলেছেন—"একদিন বুদ্ধদেব বলেছিলেন—'আমি সমস্ত মানুষের দুঃখকে দূর করিব।' দুঃখ তিনি সত্যিই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড় কথা নয়, বড় কথা হ'চ্ছে তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।" এই ধরনের আদর্শ না থাকলে সুশিক্ষক হওয়া যায় না।

সেবাধর্মী মনোভাব

[**নয়**] সুশিক্ষকের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল তাঁর জ্ঞান-পিপাসা। শিক্ষক জ্ঞান পিপাসু হবেন। জ্ঞানের শেষ নেই। সেই জ্ঞানকে জীবন পরিসরের মধ্যে অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পড়া শেষ করলেই সব জানা হয় না। শিক্ষক জ্ঞানের জন্য তপস্যা করবেন। আজীবন জ্ঞান-আহরণে ব্যাপ্ত থাকবেন, তবেই তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই তৃষ্ণা জাগ্রত করতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর Creative Unity-তে বলেছেন—"A most important truth which we are apt to forget, is that a teacher can never truely teaches unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to blow its own flame." সুতরাং শিক্ষকের মধ্যে যদি জ্ঞান-আহরণের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে জ্বলতে না থাকে, তিনি কখনই ছাত্রদের জ্ঞান-আহরণে উৎসাহিত করতে পারবেন না।

জ্ঞানের পিপাসা

[দশ] শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার কাজকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষকের আর যে গুণ থাকবে, তা হ'ল রসজ্ঞান (Sense of humour)। রসসৃষ্টি (Humour) বলতে একজন আধুনিক মনোবিদ্ বলেছেন—"To laugh at a thing one loves and still to love." যে জিনিসকে আমরা ভালবাসি, তার প্রতি কোন রকম মানসিক বিকার না এনে, তাকে উপহাস করার ক্ষমতা। এই ধরনের সূক্ষ্ম রসজ্ঞান শিক্ষকের না থাকলে, তিনি শ্রেণীকক্ষে রসসৃষ্টি করতে পারবেন না। শ্রেণীকক্ষের ভাবগম্ভীর বিষয়বস্তুকে সরস করার জন্য এই ধরনের রসজ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তা না হ'লে গতানুগতিক আলোচনা শিশুদের কাছে নীরস হয়ে পড়ে এবং তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না।

রসজ্ঞান

[এগার] ছাত্রপ্রীতি সুশিক্ষকের আর একটি গুণ। অনেক শিক্ষক আছেন, যাঁরা ছাত্রদের এড়িয়ে চলেন। তাঁরা শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশা করা পছন্দ করেন না। কিন্তু আধুনিক মনোবিদ্‌রা মনে করেন, যে সব ব্যক্তি খুব সহজভাবে ছাত্রদের বা শিশুদের সঙ্গে মিশতে পারেন না, তাঁরা শিক্ষকতা-কাজের অযোগ্য। শিক্ষা পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের সাহচর্য একান্ত প্রয়োজন। এখন তারা পরস্পর যদি পরস্পরকে সহ্য করতে না পারেন, তা'হলে শিক্ষা-কাজ চলতে পারে না। সেই যে শিক্ষক ছাত্রদের সাহচর্যে আনন্দ পান না, তাঁর দ্বারাও শিক্ষার কাজ চলতে পারে না।

ছাত্রপ্রীতি

[বার] সবশেষে, সুশিক্ষকের কয়েকটা বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য যে সব সময় গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা স্পষ্ট ক'রে বলা যায় না। তবে শিক্ষকদের মধ্যে এই গুণগুলো থাকলে ভাল হয়। যেমন—

দৈহিক বৈশিষ্ট্য

(ক) শিক্ষক সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন। তাঁকে বিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময় থাকতে হয়। তাঁর শারীরিক পরিশ্রমের কথা বিবেচনা ক'রে বলা যায়, তিনি যদি ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী না হন, তাহ'লে তাঁর পক্ষে এই বৃত্তিতে থাকা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

(খ) শিক্ষক দৈহিক দিক্ থেকে সুশ্রী হ'লে ভাল হয়। তার কারণ, ছাত্ররা এতে তাঁর প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়। যাঁদের এই গুণ নেই, তাঁদের অন্য কৌশলে ছাত্রদের আয়ত্তে আনার প্রয়োজন হয়। তবে শুধুমাত্র দৈহিক দিক্ থেকে সুশ্রী হ'লেই যে ছাত্ররা আকৃষ্ট হবে, তার কোন স্থিরতা নেই। শিক্ষকের অন্যান্য গুণের সঙ্গে তার যদি সার্থক সমন্বয় হয় তবেই তা কার্যকর হয়।

(গ) শিক্ষকের গলার স্বর ও বাচনভঙ্গী ভাল হওয়ার দরকার। এতেও ছাত্ররা শিক্ষকের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং এইসব দৈহিক বৈশিষ্ট্য শিক্ষকের থাকলে ভাল হয়।

[তের] সামগ্রিকভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের (Mental health) অধিকারী হওয়া শিক্ষকের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশসাধন করা শিক্ষকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাই তিনি নিজে যদি মানসিক দিক্ থেকে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, তাহ'লে কখনই শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করতে পারবেন না। যে সব মানসিক বৈশিষ্ট্য থাকলে শিক্ষক মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন, সেগুলি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন—ছাত্রদের সঙ্গে আদর্শ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা, প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, নিজের দোষ ত্রুটির সঠিক মূল্যায়নের ক্ষমতা ইত্যাদি এবং সর্বোপরি মানসিক সন্তুষ্টি।

মানসিক স্বাস্থ্য

॥ পেশাগত বৈশিষ্ট্য ॥
(Professional Characteristics)

শিক্ষকের ব্যক্তিগত—চারিত্রিক, দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া আরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষভাবে তাঁর বৃত্তিকেন্দ্রিক। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা বলছি পেশাগত বৈশিষ্ট্য। এগুলো সব বাহ্যিক। তবে শিক্ষকতা-বৃত্তিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্ব কম নয়।

প্রস্তাবনা

[এক] সুশিক্ষক যিনি হবেন, তাঁর শিক্ষণীয় বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকবে। শিক্ষক যদি অগাধ জ্ঞানবান না হন, তা'হলে তিনি শিক্ষার্থীর জ্ঞান-পিপাসাকে তৃপ্ত করতে পারবেন না। তাঁর জ্ঞান যে কেবলমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়টিতে থাকবে তা নয়; জ্ঞানের সমস্ত শাখার সঙ্গে তাঁর পরিচিত থাকার দরকার। ছাত্রদের জ্ঞানস্পৃহা বা কৌতূহলকে তৃপ্ত করার জন্য তার সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। তাছাড়া, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যও জ্ঞান প্রয়োজন। সীমিত জ্ঞান নিয়ে শিক্ষকতা-বৃত্তি গ্রহণ করলে, শিক্ষক কোনদিন তাঁর বৃত্তিতে সফল হ'তে পারবেন না এবং ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাবেন না।

বিষয়বস্তুর জ্ঞান

[দুই] শুধুমাত্র বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান থাকলেই সুশিক্ষক হওয়া যায় না, সেই জ্ঞানকে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করার দক্ষতা তাঁর থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, আধুনিক মনোবিদ্যাসম্মত শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা থাকা চাই এবং সেগুলিকে কিভাবে কার্যকরী করা যায়, সে সম্বন্ধে তাঁর প্রশিক্ষণ পাওয়া একান্ত দরকার। এই কারণেই ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন শিক্ষক-প্রশিক্ষণের (Teacher Education) ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশন তাঁদের রিপোর্টে এই প্রসঙ্গে পরিষ্কারভাবে বলেছেন—"A sound programme of professional education of teachers is essential for the qualitative improvement of education. Investments in teacher education can

শিক্ষা-পদ্ধতির জ্ঞান

yield very rich dividends because the financial resources required are small when measured against the resulting improvement in the education of millions."

[তিন] সুশিক্ষকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল পরীক্ষামূলক মনোভাব। তিনি যে শুধু গতানুগতিক শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তা নয়, বিশেষ শিক্ষা-পরিস্থিতিতে শিক্ষণ-পদ্ধতিকে পরিবর্ধন করাও তাঁর কাজ। কারণ, কোন পদ্ধতিই সার্বজনীনভাবে সব রকম পরিস্থিতির জন্য স্থির নয়। আবার বিশেষ বিশেষ শিক্ষালয়ের বিশেষ বিশেষ শিক্ষণ ও আচরণমূলক সমস্যা দেখা দিতে পারে, সেই সমস্যাকে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ক'রে সমাধান খুঁজে বের করার মত স্পৃহা সুশিক্ষকের থাকার দরকার। জাতীয় শিক্ষামূলক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ-সংস্থা (National Council of Educational Research and Training ; N. C. E. R T.) শিক্ষকের এ বিষয়ে উৎসাহদানের জন্য এক ধরনেব কার্যসূচী পরিচালনা করেন, যাকে বলা হয় Experimental Project in School এই ধরনের ছোটখাটো গবেষণা করার জন্য শিক্ষকদের অর্থসাহায্য করা হয়।

পরীক্ষামূলক মনোভাব

[চার] সুশিক্ষকের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করার জন্য শিশু-মনোবিদ্যার (Child Psychology) জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি শিশুদের মানসিকতা সম্বন্ধে যদি কিছু না জানেন, তবে তাদের পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হ'য়ে পড়ে। এছাড়া, সামাজিক মনোবিদ্যা (Social Psychology) সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকার প্রয়োজন। দলগত মন (Group mind) কিভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা না থাকলে শিক্ষার্থীদের দলগত আচরণকে তিনি যথাযথভাবে শিক্ষার কাজে লাগাতে পারবেন না।

মনোবিদ্যার জ্ঞান

[পাঁচ] আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে হলে শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের প্রদীপনের 'aids ব্যবহার সম্পর্কে জানার দরকার। কিভাবে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টি ও শ্রুতিনির্ভর প্রদীপন (audio-visual aids, তৈরি করতে হয়, সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকা দরকার। কারণ, আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির একটা বড় কথা হ'ল—"teach through the senses". ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই শিশুদের কাছে একমাত্র অভিজ্ঞতা। সুতরাং শিক্ষাদানের জন্য ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাতে হ'লে বিমূর্ত জ্ঞানকে প্রদীপনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক'রে তুলবার চেষ্টা করতে হবে। সুশিক্ষকের যেমন এইসব প্রদীপন ব্যবহার করার মত মানসিক প্রস্তুতি থাকবে, তেমনি তাদের প্রস্তুতিকরণ ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কেও তাঁর ধারণা থাকা দরকার।

শিক্ষামূলক প্রদীপনের ব্যবহার সম্বন্ধে

[ছয়] আধুনিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা বা পরিমাপের (Examination or Measurement) ধারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গতানুগতিক পরীক্ষার বদলে

আমরা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাকে (Object test) বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। সাধারণ ধরনের পরিমাপের (Measurement) পরিবর্তে আমরা ব্যক্তির পরিপূর্ণ মূল্যায়নের (Evaluaticn) ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। সুশিক্ষক এই দুই আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবেন। কিভাবে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective test) তৈরি করতে হয়, কিভাবে ব্যক্তির মূল্যায়ন করা হয়, এ সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া, শিশুদের বিকাশের ক্রমিক ধারা অনুশীলন করার জন্য কিভাবে সর্বাত্মক পরিচয়-লিপি (Cumulative Record Carc) রাখতে হয়, সে সম্পর্কেও তাঁর ধারণা থাকা দরকার।

মূল্যায়ন সম্পর্কে জ্ঞান

[সাত] শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের গুরুত্ব আধুনিক কালে সকল শিক্ষাবিদ্ই স্বীকার করেন। বিভিন্ন ধরনের সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজ কিভাবে পরিচালনা করতে হয়, এবং তাদের কিভাবে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কেও সুশিক্ষকের ধারণা থাকা একান্ত কর্তব্য।

সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের পরিচালনা

শিক্ষকের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য-গুলি সংক্ষিপ্ত আকারে নীচে পরিবেশন করা হ'ল

॥ শিক্ষকের গুণাবলী ॥

- শিক্ষকের গুণাবলী
  - ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য
    - জন্মগত বৈশিষ্ট্য —
      1. দৈহিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
      2. বৌদ্ধিক ক্ষমতা
      3. বিচারকরণের ক্ষমতা
    - অর্জিত বৈশিষ্ট্য —
      1. ব্যক্তি সত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণ
      2. দায়িত্ববোধ
      3. প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী
      4. প্রক্ষোভমূলক বৈশিষ্ট্য
      5. উন্নত জীবনাদর্শ
      6. নিরপেক্ষ চিন্তার ক্ষমতা
      7. সেবামূলক মনোভাব
      8. জ্ঞানের পিপাসা
      9. রসবোধ
      10. ছাত্র প্রীতি
      11. মানসিক স্বাস্থ্য
  - পেশাগত বৈশিষ্ট্য —
    1. বিষয় জ্ঞান
    2. শিক্ষণপদ্ধতির জ্ঞান
    3. গবেষণামূলক মনোভাব
    4. শিশু মনোবিদ্যার জ্ঞান
    5. প্রদীপণ ব্যবহারের দক্ষতা
    6. মূল্যায়নের দক্ষতা
    7. সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনা
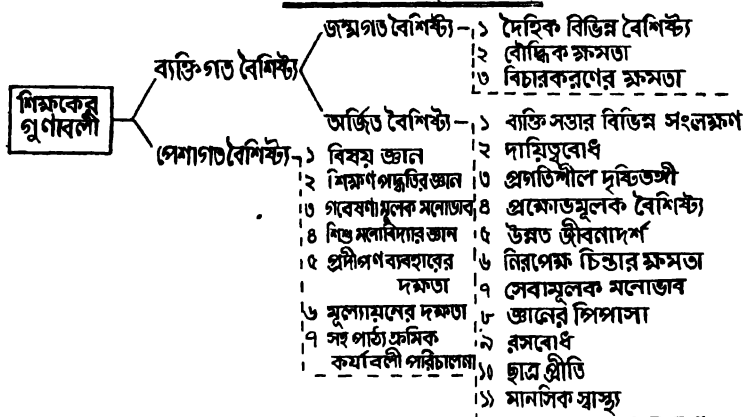
॥ আলোচনা ॥

শিক্ষকের গুণাবলী বিশ্লেষণ করার পর একটা প্রশ্নই স্বভাবতঃ মনে আসে, সেটা হ'ল শিক্ষকের এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন একটাকে সঠিক ক'রে বেছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্দেশ করা খুবই মুশকিল। তাই এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া খুব দুরূহ। শিক্ষণ-পরিস্থিতি খুবই জটিল। সেই জটিল পরিস্থিতিতে শিক্ষকই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিভার দ্বারা যে কোন

শিক্ষকের কোন্ গুণগুলি প্রধান

পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেন। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে যে বৈশিষ্ট্যকে গৌণ মনে হ'চ্ছে, আবার অন্য পরিস্থিতিতে তাকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হ'তে পারে। তাই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গুণের সমবায়ে একক এক মনুষ্য সত্তা। গুণের তাৎপর্য এবং পরিমাণকে পৃথকভাবে ওজন ক'রে দেখতে গেলে তাঁর ক্ষেত্রে ভুল করা হবে। সুশিক্ষক তিনিই হবেন, যাঁর মধ্যে উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সুসমন্বিত হয়েছে; যিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে নিজেকে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন।

আবার অনেকে প্রশ্ন করবেন, এই বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শিক্ষকতাকে জন্মগত ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল বলব, না অর্জিত দক্ষতা বলব। খুব সাধারণভাবেই উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, এ ধরনের চিন্তা খুবই অপ্রাসঙ্গিক। তার কারণ, সুশিক্ষকের কতকগুলো গুণের কথা আমরা বলেছি, যেগুলো জন্মগতভাবে পাওয়া। আবার কতকগুলোর কথা বলেছি, যেগুলো তিনি পরবর্তী কালে অর্জন করবেন। এখন এদের কারও গুরুত্বই কম নয়। জন্মগত যতই বৈশিষ্ট্য থাক-না-কেন, তাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিছু কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। তা নাহ'লে তিনি তাঁর জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলি কাজে লাগাতে পারবেন না। আবার, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা যতই তাকে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান দিই-না-কেন, তাঁর মধ্যে যদি জন্মগত কোন অনুপ্রেরণা না থাকে, তিনি আদর্শ শিক্ষক হ'তে পারবেন না। সুতরাং জন্মগত এবং অর্জিত উভয়প্রকার গুণই তাঁর কাজের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়। তাই সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষক একদিকে যেমন জন্মানও বটে, তেমনি তাঁকে তৈরিও করা হয়। জন্মগত সম্ভাবনাকে যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যদি বিকশিত করা না যেত, তাহ'লে শিক্ষারই প্রয়োজন থাকত না। তাই তাঁর কর্মক্ষেত্রের যে মূল সূত্র, তার দ্বারা তিনিও পরিচালিত।

শিক্ষকতা জন্মগত, না অর্জিত?

॥ শিক্ষকের কাজ ॥
(Function of a Teacher)

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী শিক্ষকের একমাত্র কাজ ছিল বিদ্যা দান করা। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি হবেন জ্ঞানের ভাণ্ডার (Storehouse of knowledge) এবং তাঁর সেই ভাণ্ডার থেকে ছাত্রদের জ্ঞান বিতরণ করাই হবে প্রধান কাজ। কিন্তু আধুনিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন হওয়ায়, তাঁর দায়িত্ব এবং কর্তব্যের পরিবর্তন হয়েছে। এখন শিক্ষকের কাজ শুধু জ্ঞান বিতরণ করা নয়। আধুনিক শিক্ষা শিশু-কেন্দ্রিক (child-centric)। অর্থাৎ, শিশুকে মুখ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা ক'রে তার চাহিদা, আগ্রহ, ক্ষমতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা রচিত হবে। তাই এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করবেন না। শিক্ষা যার

জন্য তাকেই আধিপত্য করতে দিতে হবে। সে তার ইচ্ছা, অনুরাগ ও মানসিক ক্ষমতানুযায়ী নিজের কর্মকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখবে। শিক্ষক তার ওপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। শিক্ষাদানের মূল কথা হ'ল—কিছুই শেখানো যায় না, সব কিছু শিখতে হয় (The essence of teaching is that nothing can be taught, everything is to be learnt.)।

প্রস্তাবনা

আধুনিক এই চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের কোন দায়িত্ব নেই বা তাঁর দায়িত্ব অনেক কমে গেছে, তাহ'লে খুবই ভুল করা হবে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাঁর দায়িত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানার্জন নয়, পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ করা। সুতরাং এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের গুরু দায়িত্ব শিক্ষকের ওপর এসে পড়েছে। পরিপূর্ণ বিকাশে শিশুকে সহায়তা করার জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁকে কাজ করতে হয়। তাঁর কাজ আজকে শ্রেণী-কক্ষের মধ্যে বা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর কাজ জীবনের সর্বস্তরে। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে কি কি দায়িত্ব পালন করবেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

শিক্ষকের দায়িত্বের পরিবর্তন

[**এক**] আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক কোন জ্ঞানের বোঝা শিশুর ওপর চাপিয়ে দেবেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকবেন না। শিশুরা কর্মকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান অর্জন করবে। শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হ'বে শিক্ষণ-পরিস্থিতির পরিকল্পনা রচনা করা, কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করা, যার মাধ্যমে শিশুরা জ্ঞান আহরণ করবে। তাঁর দায়িত্ব হবে এমন সুযোগ ক'রে দেওয়া যার মাধ্যমে তারা জ্ঞান আহরণ করবে। এর জন্য দরকার হ'লে পাঠ্যক্রম-রচনায় শিক্ষককে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

বিষয়বস্তু নির্বাচন

[**দুই**] বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করা। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক-ভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে হ'তে পারে না। ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের দায়িত্ব শিক্ষককে নিতে হ'লে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের চেষ্টা করতে হবে। বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual development), দৈহিক বিকাশ (Physical development), অনুভূতি ও প্রক্ষোভমূলক জীবনের বিকাশ (Emotional development), আধ্যাত্মিক বিকাশ (Spiritual development), সৌন্দর্যবোধের বিকাশ (Aesthetic development)—এ সবই ব্যক্তিসত্তা-বিকাশের অন্তর্গত। এই সমস্ত দিকের বিকাশের জন্য যোগ্য কর্মসূচী শিক্ষককে নির্বাচন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের ভেতরে তাদের সুপরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রচেষ্টা

[তিন] শিক্ষালয় আধুনিক ধারণা অনুযায়ী সমাজেরই প্রতিরূপ হবে। সমাজ-জীবনের সব রকম আঙ্গিকই তার মধ্যে থাকবে। সুতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষালয়কে সেই রূপে সাজানো। বিদ্যালয়ের জীবনকে সমাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ হাতে নিতে হবে এবং বিদ্যালয়ের সমাজের সদস্য হিসেবে সব রকম কাজে ছাত্রদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষালয়ের পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব

[চার] আধুনিক বিদ্যালয়ের কাজ সব সময় পরিবার বা গৃহ-পরিবেশের (Family or Home) সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষক বিদ্যালয় এবং পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবেন। বাবা, মা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা হবে তাঁর দায়িত্ব। তিনি বাবা, মা বা অভিভাবকের আস্থাভাজন যদি না হন, তবে কখনই আদর্শ শিক্ষক হ'তে পারবেন না। তাছাড়া, প্রয়োজন হ'লে সমাজ-শিক্ষামূলক পরিকল্পনাও তাঁকে হাতে নিতে হবে।

পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন

[পাঁচ] শিশুদের জীবনাদর্শ গঠন করাও শিক্ষকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। শিক্ষকই প্রত্যক্ষ প্রভাবের দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নৈতিক আদর্শ-গঠনে সহায়তা করতে পারেন এবং এইসব নৈতিক আদর্শ ধীরে ধীরে আরও সংগঠনের মাধ্যমে সমন্বয়িত জীবনাদর্শ (Unifying Philosophy of life) গঠনের পথে এগিয়ে যাবে। এই ধরনের নৈতিক আদর্শ এবং জীবনাদর্শ গঠন করা শুধুমাত্র মৌখিক উপদেশ দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন জীবনের ওপর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাব। এই প্রভাবিত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষকের।

জীবনাদর্শ গঠনের দায়িত্ব

[ছয়] এছাড়া, আধুনিক শিক্ষককে শিক্ষার ও জীবনের সঙ্গে জড়িত অনেক ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানের দায়িত্বও নিতে হয়। শিশুদের বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক নির্দেশনা (Education and vocational guidance), আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা গ্রহণ বা মূল্যায়ন এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য সংগঠনমূলক কাজের ভারও নিতে হয় শিক্ষককে।

আধুনিক শিক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক ধারা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের দায়িত্ব কিছু কমেনি, বরং অনেক বেড়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের ভিত্তিতে জ্ঞান বিতরণ করাই তাঁর কাজ নয়। তাঁর দায়িত্ব আরও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সম্পূর্ণ জীবন দিয়ে তাঁর বৃত্তিকে সেবা করবেন এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র শুধুমাত্র শিক্ষালয় নয়,

সমস্ত সমাজ-পরিবেশই তাঁর কর্মক্ষেত্র। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা নিষ্ক্রিয়তার নয়।

মন্তব্য।

তিনি ছাত্রদের অনুশীলন করবেন, তাদের কর্ম-পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনবোধেই তাদের সাহায্য করবেন। তাছাড়া, তাঁর জীবনের প্রভাব দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীর জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করবেন। সেইটাই হবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষকের এই ব্যক্তিত্বের প্রভাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন—"আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিবান করিবেন, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন।"

॥ প্রধান শিক্ষক ও তাঁর কাজ ॥

(Headmaster and his functions)

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের থেকে একটু স্বতন্ত্র। অন্যান্য শিক্ষকের তুলনায় তাঁর দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনেক বেশী। তিনি বিদ্যালয়ের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধান শিক্ষকের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে রেন (Wren) বলেছেন – "What the mainspring is to the watch, the fly wheel to the machine or the engine to the steamship, the headmaster is to the schools." শিক্ষকরা বিশেষভাবে ছাত্র বা শিক্ষার্থীদের নিয়েই কাজ করেন। কিন্তু

প্রস্তাবনা

প্রধান শিক্ষককে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই তাঁর কর্তব্যের সীমা অনেক বেশী। সুতারাং, তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে পৃথকভাবে আলোচনা করব।

প্রধান শিক্ষক প্রথমতঃ শিক্ষক, এ কথা তাঁকে মনে রাখতে হবে সাধারণ শিক্ষকের মত সমস্ত দায়িত্বই তাঁকে পালন করতে হবে। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে সহজভাবে মিশবেন; তাদের সমস্যা সহানুভূতির সঙ্গে বোঝাবার চেষ্টা করবেন এবং

শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব

তাদের সমস্ত রকম জীবন-বিকাশে সহায়তা করবেন। তিনি যদি শিক্ষার্থীর প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে পরিচিত না হ'তে পারেন, তাহ'লে বিদ্যালয়ের সুপরিচালনা করতে পারবেন না। তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব নিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবন-বিকাশে সহায়তা করবেন। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, সুশিক্ষকের যা গুণ থাকা উচিত, তার সব কয়টি গুণই তাঁর থাকবে। তবে সেইসব গুণাবলীর প্রয়োগ হবে অনেক বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সাধারণ শিক্ষক যেমন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর দিকে নজর রাখবেন, প্রধান শিক্ষককে কিন্তু বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের ওপর নজর রাখতে হবে। তিনি সব শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে

পরিচিত হবেন এবং তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং শিক্ষকদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করবেন।

এছাড়াও, প্রধান শিক্ষকের ওপর বিদ্যালয়-পরিচালনার ভারও এসে পড়ে। সেই বিষয়ে তাঁর ব্যবহারিক বুদ্ধি ও দক্ষতা থাকার একান্ত দরকার। বিভিন্ন ধরনের হিসেব রাখা এবং অন্যান্য রেকর্ড রাখা তাঁর পরিচালনামূলক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। মহীউদ্দীন প্রধান শিক্ষকের তিন রকম দায়িত্বের কথা বলেছেন —

পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব

(১) বিদ্যালয়ের মধ্যে এবং বাহিরে ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা,
(২) শিক্ষকদের সব রকম কাজ পর্যবেক্ষণ করা,
(৩) বিদ্যালয়-গৃহ, আসবাব, রেকর্ড ইত্যাদি তত্ত্বাবধান করা।

প্রধান শিক্ষক যদি শক্ত হাতে হাল না ধরেন, তাহ'লে বিদ্যালয়ের সব রকম উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তিনি যদি বিদ্যালয়ের সব বিভাগের ওপর ঠিক নজর রাখতে না পারেন, তাহ'লে এমন অনেক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, যার জন্য দায়ী হবেন তিনি। তাই প্রধান শিক্ষকের আর একটা বড় গুণ হবে, তিনি সুপরিচালক হবেন। সুপরিচালক হওয়ার জন্য যে সব মানসিক বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার, তার সব কটিই থাকবে। ধৈর্য, সহনশীলতা, অমায়িক ভাব, সমবেদনামূলক মনোবৃত্তি তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ ছাড়াও, তার প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার মত দৈহিক স্বাস্থ্যও থাকা দরকার।

প্রধান শিক্ষকের কর্তব্যের ভেতর আর একটা বিশেষ কাজ এসে পড়ে, তাহ'ল অভিভাবকের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপন। বর্তমান শিক্ষার মূল কথা হ'ল কোন একটি বিশেষ সংস্থার (Institution) একক প্রচেষ্টায় শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংস্থার সমবেত চেষ্টাতেই ভাবীকালের নাগরিকতার শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'তে পারে। তাই বিদ্যালয়ের সকল রকম প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হ'লে অভিভাবকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষককে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে অভিভাবকদের মধ্যে বিদ্যালয়ে কর্মসূচীর অভিমুখী মনোভাব গড়ে তুলবেন এবং যাতে তার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন, তার চেষ্টা করবেন। তিনি যদি অভিভাবকদের আস্থাভাজন না হন, তাহ'লে তাঁকে বিদ্যালয়ের পরিচালনা-সংক্রান্ত নানা রকম অসুবিধা এবং সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে।

অভিভাবকের সঙ্গে সংযোগ

সর্বশেষে, প্রধান শিক্ষকের আর একটা দায়িত্ব হ'ল বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন করা। বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ের ভার নিয়ে থাকবেন, বিভিন্ন

শ্রেণীর ভার নিয়ে থাকেন ; অফিসের বিভিন্ন কর্মচারী বিভিন্ন ধরনের কাজের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব হবে এইসব বিভাগের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। তাছাড়া, বিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচীর মাধ্যমে আমরা একই উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। তাই বিভিন্ন কার্যসূচীর মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে, তবে সে উদ্দেশ্যে আমরা পৌঁছুতে পারব না। অনেক সময় অনেক কাজ হয়ত এমনও হ'তে পারে যা আমাদের শিক্ষার লক্ষ্যের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রধান শিক্ষকের কাজ হবে, এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সমাজ, এদের পারস্পরিক চাহিদা এবং ক্রিয়ার মধ্যে তিনি সমন্বয় সাধন করবেন। এক কথায়, আমরা বলতে পারি, প্রধান শিক্ষক হবেন—বিদ্যালয়ের ভরকেন্দ্র (centre of gravity)।

সমন্বয়মূলক দায়িত্ব

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রধান শিক্ষকের সাধারণ শিক্ষকের বিভিন্ন গুণাবলী ছাড়াও আরও কিছু বিশেষ গুণ থাকবে যার দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক শিক্ষাদানের কাজও পরিচালনা করবেন এবং তাছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করবেন। অনেকে মনে করেন, প্রধান শিক্ষকের কাজ পরিচালনা করার জন্য দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজন। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই দক্ষতা আসে অভিজ্ঞতা থেকে। তবে সে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক দক্ষতা কাজের মাধ্যমেই আসবে। শিক্ষক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকলেই চলবে। সেই অভিজ্ঞতাকেই সম্বল ক'রে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ নিয়ে যদি একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করেন, তাহ'লেই তিনি প্রধান শিক্ষকরূপে তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারবেন।

মন্তব্য

সারসংক্ষেপ

শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে শিক্ষক (Teacher) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা লক্ষ্য করি—শিক্ষা ছিল একেবারে গুরুকেন্দ্রিক। অর্থাৎ, শিক্ষকের ইচ্ছার দ্বারা শিক্ষার অন্যান্য উপাদান নিয়ন্ত্রিত হ'ত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক। তাই বলে শিক্ষকের দায়িত্বের কোন হ্রাস ঘটেনি। তিনি হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু, জীবনাদর্শের প্রতীক এবং জীবনের পথ-প্রদর্শক (Friend, Philosopher and Guide)।

নতুন এই পরিস্থিতিতে শিক্ষককে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে হ'লে, বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হ'তে হয়। অর্থাৎ, শিক্ষকতা-বৃত্তিতে সফলতা লাভের জন্য ব্যক্তির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা একান্তভাবে দরকার।

শিক্ষকের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে মূল দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য (Personal characteristics) এবং (খ) পেশাগত বৈশিষ্ট্য (Professional characteristics) । ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—(১) ব্যক্তিসত্তার বিশেষ কয়েকটি সংলক্ষণ, (২) উন্নত বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি, (৩) দায়িত্ববোধ, (৪) প্রগতিশীল চিন্তন-ক্ষমতা, (৫) প্রক্ষোভমূলক পরিণমন, (৬) জীবনাদর্শ, (৭) নিরপেক্ষ চিন্তন ক্ষমতা, (৮) সেবামূলক মনোভাব, (৯) জ্ঞান-পিপাসা, (১০) রসজ্ঞান, (১১) ছাত্রপ্রীতি ও (১২) দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য। পেশাগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল—(১) বিষয়বস্তুর জ্ঞান, (২) শিক্ষণ-পদ্ধতির ধারণা, (৩) পরীক্ষণ-সংক্রান্ত জ্ঞান, (৪) প্রদীপন ব্যবহারের জ্ঞান (৫) সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনা-সংক্রান্ত জ্ঞান, এবং (৬) মূল্যায়ন-সংক্রান্ত কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা। এইসব বৈশিষ্ট্যগুলির কোন একটিকে প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। শিক্ষক হিসেবে সার্থকতা লাভ করতে হ'লে এই সকল বৈশিষ্ট্যের সার্থক সমন্বয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিসীমা অনেক বিস্তৃত হ'য়েছে, শিক্ষককে বর্তমানে বহু দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন—শিক্ষার্থীদের উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনবিকাশ-উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ, শিক্ষালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, শিক্ষামূলক নির্দেশনা দান ইত্যাদি। এই সকল দায়িত্ব ছাড়া, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যিনি থাকেন, তাঁকে আরও কতকগুলি প্রশাসন ও সমন্বয়মূলক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

প্রশ্নাবলী

1. What is the place of 'teacher' in modern education ? How does a teacher provide educational guidance of his pupils ?

[আধুনিক শিক্ষায় 'শিক্ষক'-এর স্থান কোথায় ? শিক্ষক কিভাবে শিক্ষামূলক নির্দেশনার কাজ সম্পন্ন করতে পারেন ?]

2. "The teacher is concerned more with character building than with the mere informative of a information."—Elaborate this statement and consider the teacher's task in this regard.

["জ্ঞান-দান অপেক্ষা শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন করাই শিক্ষকের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ"—এই বিবৃতি ব্যাখ্যা কর এবং এ সম্পর্কে শিক্ষকের দায়িত্ব আলোচনা কর।]

3. Discuss the teacher's role in the modern child centered education.

[আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

4. Describe the marks of a good teacher.

[আদর্শ শিক্ষকের গুণগুলি বর্ণনা বর।]

5. "A teacher should be compact of all virtues."—Discuss the statement.

["একজন শিক্ষক সবল রবম আদর্শের অধিকারী হবেন।" – আলোচনা কর।]

6. What, according to you are the essential qualifications of a teacher ?

[তোমার মতে শিক্ষকের আবশ্যিক গুণাবলী কি কি ?]

7. What, according to you, should be the qualifications, duties and functions of an ideal teacher ?

[তোমার মতে একজন আদর্শ-শিক্ষকের কি কি গুণ থাকা উচিত ? তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হওয়া উচিত ?]

8. "The teacher is the child's fri nd, philosopher and guide'.' —Elaborate the statement.

["শিক্ষক হ'লেন শিশুর বন্ধু, জীবন-দর্শনের প্রতীক এবং পথ-নির্দেশক"—বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

9. Write notes on (টীকা লিখ) :

(a) The functions of Headmaster [প্রধান শিক্ষকের কাজ]

(b) Professional qualification of teacher [শিক্ষকের পেশাগত গুণ]

(c) Place of teacher in modern education [আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান]

(d) Personal characteristics of teacher [শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলী ।]

10. What role does a teacher play in modern education ? What are the marks of an ideal teacher ?

[আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষক কি ভূমিকা পালন করে থাকেন ? আদর্শ শিক্ষকের লক্ষণগুলি কি কি ?]

11. Delineate the essential qualities and major functions of a teacher.

[শিক্ষকের অপরিহার্য গুণ ও প্রধান করণীয় কাজগুলি বর্ণনা কর ।]

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব আর শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ভিত্তিতে শিক্ষার বিষয়বস্তু আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে একত্রিতভাবে শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে অনুশীলন করাই তার উদ্দেশ্য, তাই আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বকে বস্তুনির্ভর বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষাতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, তার ফলে শিক্ষার বিভিন্ন অংশ সংস্কারমুক্ত হয়েছে, এমনি একটি প্রভাবিত গুরুত্বপূর্ণ দিক্ হ'ল বিদ্যালয় পরিচালন-ব্যবস্থা।

শিক্ষা-পরিচালনা পদ্ধতি

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা

বিদ্যালয়ে পাঠদান করতে হ'লে প্রথমতঃ দরকার শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণা আধুনিক কালে পরিবর্তিত হ'য়েছে। সামাজিক ব্যক্তি-স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী-স্বাধীনতার আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার এই পরস্পরবিরোধী ধারণার সার্থক সমন্বয়ে আধুনিক বিদ্যালয়-শৃঙ্খলার ধারণা গড়ে উঠেছে, এই সমন্বয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা শীর্ষক অধ্যায়ে।..................

আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের যে পরিবর্তন হ'য়েছে, তাতে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য জ্ঞানসর্বস্ব পাঠ্যক্রমের অনুশীলনই যথেষ্ট নয়, বিদ্যালয়ে শিশুর দৈহিক, মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশ-উপযোগী পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে এবং তা করতে হবে শিক্ষার্থীদের আত্মনক্রিয়তার ওপর ভিত্তি ক'রে। অনেক বিষয়ের পাশাপাশি অন্যান্য যে সব কাজ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাদের বলা হয় সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী। এই সব কাজের গুরুত্ব ও পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে।... .. ..

সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী

সর্বশেষে বিদ্যালয়-পরিচালনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক্ হ'ল পরীক্ষা-গ্রহণ। শিক্ষক এই দায়িত্ব যত সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন, তত সুন্দরভাবে তিনি শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করতে পারবেন। পরীক্ষা-গ্রহণের রীতি -- প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান। কিন্তু বর্তমানে তার অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। গতানুগতিক পরীক্ষার পরিবর্তে মূল্যায়নের নীতিকে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেওয়া হ'য়েছে। শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ দিক্ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে পরীক্ষা-গ্রহণ শীর্ষক অধ্যায়ে।................

পরীক্ষা-গ্রহণ

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা
Discipline and Freedom

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পরস্পর-বিরোধী ধারণা প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষা-নায়কদের চিন্তার রসদ যুগিয়ে আসছে। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা, শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষা, পাঠ্যক্রম-কেন্দ্রিক শিক্ষা, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শ, সমাজ-কেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শ ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর-বিরোধ ও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের প্রচেষ্টা শিক্ষাবিদ্‌রা ক'রে আসছেন। ঠিক এমনিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা (Discipline) এবং স্বাধীনতার মধ্যে পরস্পর-বিরোধের মনোভাব এবং তাদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়াস প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন মনীষীর চিন্তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার যেমন সামঞ্জস্যমূলক সমাধান হ'য়েছে, তেমনি শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্যমূলক প্রয়োগবিধিও নির্ধারিত হ'য়েছে। আধুনিক চিন্তাধারার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে আমরা তাদের প্রাচীন অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

॥ শৃঙ্খলা কথার তাৎপর্য ॥
(Significance of the term discipline)

প্রাচীন ধারণানুযায়ী শৃঙ্খলা বলতে আমরা শাসন বা দমনকে বুঝি। সমাজের পক্ষে যা প্রয়োজনীয়, অভিভাবক বা শিক্ষকদের বিচারে যা কাম্য, তাকে যে-কোন কৌশলে প্রকাশ করা এবং যা অপ্রয়োজনীয় তাকে দমন করাই হ'ল শৃঙ্খলার প্রকৃত তাৎপর্য। মানুষের মনে অনেক আদিম প্রবৃত্তি আছে, যার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ, ব্যক্তি-জীবন এবং সমাজ-জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক। সুতরাং, যে-কোন প্রকারে তাকে দমন করতে হবে; এই ধরনের মনোভাব ভাববাদী দার্শনিকদের (Idealistic Philosopher) সমর্থন পেয়েছে। ফলে, আমরা যে-কোন দেশের প্রাচীন ধর্মীয় সংস্থা-কেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে এই ধরনের শৃঙ্খলার অনুশীলন লক্ষ্য করি। বিভিন্ন খ্রীস্টান মিশনারীদের পরিচালিত বিদ্যালয়ে আমরা এই ধরনের শৃঙ্খলার অনুশীলন দেখতে পাই। আমাদের দেশে প্রচলিত প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতিতেও গুরুদের কঠোর বিধিনিষেধের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ঐ সব বিধিনিষেধের দ্বারা গুরু বা শিক্ষক ছাত্রদের চারিত্রিক শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করতেন। ব্রহ্মচর্যের যে কঠোর বিধিনিষেধ, তা এই ধরনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার পন্থা মাত্র। অর্থাৎ, প্রাচীন মতানুযায়ী শৃঙ্খলা হ'ল বাইরের অবস্থা, শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং বিভিন্ন বিধিনিষেধের বা নিয়মের দ্বারা শিক্ষার্থীর ওপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেবেন। তবে তার পেছনে উদ্দেশ্য মহৎ—ছাত্রকে উন্নত জীবনাদর্শের উত্তরাধিকারী ক'রে গড়ে তোলা। এই ধারণা

শৃঙ্খলা কথার প্রাচীন তাৎপর্য

অনুযায়ী শৃঙ্খলা আনতে হ'লে তার মধ্যেকার সমস্ত রকম অসামাজিক প্রবণতাগুলিকে দমন (Repress) করতে হবে। সুতরাং, শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কথার প্রাচীন তাৎপর্য—Spare the rod and spoil the child—এই প্রবাদ-বাক্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

আধুনিক চিন্তাবিদ্‌দের কাছে শৃঙ্খলার এই তাৎপর্য বদ্‌লেছে। তাঁরা বলেন, শৃঙ্খলা আন্তরিক অবস্থা; বাইরে থেকে তাকে কারোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তির অন্তর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার যে স্পৃহা আসে, তাই হ'ল শৃঙ্খলা। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা প্রাচীন চিন্তাধারাকে যান্ত্রিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে অবদমনের দ্বারা বা শাসনের দ্বারা যে শৃঙ্খলা আসে, তা খুবই সাময়িক এবং তাকে আমরা শৃঙ্খলা (Discipline) না ব'লে বিধান (Order) বলতে পারি। আধুনিক কালের শিক্ষাবিদ্‌রা বলেন—স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীর অন্তর থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার স্পৃহা থেকে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ, তাই হ'ল শৃঙ্খলা। নান্ (Nunn) বলেছেন—"It (discipline) consists in the submission of one's impulses and powers to a regulation which imposes from upon their chaos, and brings efficiency and economy where there would otherwise be ineffectiveness and waste."। আপনা থেকেই আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার যে স্পৃহা জাগে, তাই হ'ল শৃঙ্খলা। এই সংব্যাখ্যানকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শৃঙ্খলার দু'টো পর্যায় আছে। প্রথমতঃ, যা অসৎ, যা মন্দ, তাকে স্বাভাবিক-ভাবে, স্বতস্ফূর্তভাবে ত্যাগ করার প্রচেষ্টা; দ্বিতীয়তঃ, যা কিছু গ্রহণযোগ্য, তাকে সহজভাবে গ্রহণ করার স্পৃহা। শিক্ষার্থীরা, জীবন-কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা কিছু ভাল, তা গ্রহণ করবে এবং যা মন্দ তাকে ত্যাগ করতে শিখবে। এর মাধ্যমেই আসবে শৃঙ্খলা। এর প্রথম পর্যায়কে ধনাত্মক পর্যায় (Positive phase) এবং পরবর্তী পর্যায়কে বলা যায় ঋণাত্মক পর্যায় (Negative phase)। সুতরাং বলা যেতে পারে, আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী শৃঙ্খলা হ'ল মানুষের চিন্তাধারা, আচরণ ও স্বভাব এবং অনুভূতির আত্মনিয়ন্ত্রণ। এই অর্থে, আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ গতানুগতিক শৃঙ্খলার সঙ্গে পার্থক্য করবার জন্য শুধুমাত্র 'শৃঙ্খলা'র পরিবর্তে 'স্বতঃস্ফূর্ত' শৃঙ্খলার (Spontaneous discipline) কথাটা ব্যবহার করেছেন।

শৃঙ্খলা কথার আধুনিক তাৎপর্য

॥ শৃঙ্খলা ও বিধান ॥

(Discipline and Order)

শৃঙ্খলার আধুনিক এবং প্রাচীন তাৎপর্য থেকে একটা কথাই স্পষ্ট হ'য়েছে যে, দু'যুগের ধারণার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। আধুনিক কালের শিক্ষাবিদ্‌রা শৃঙ্খলার গতানুগতিক সংব্যাখ্যানকে বা বহিরাগত শৃঙ্খলাকে বিধান (Order) নামে অভিহিত করেছেন। তাঁরা মনে করেন, বাইরে থেকে জোর ক'রে অনুশাসনের

দ্বারা যা চাপিয়ে দেওয়া যায়, তাকে শৃঙ্খলা বলা যায় না। তাকে বিধানই (order) বলতে হয়। এই পদ্ধতিতে কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। শৃঙ্খলার দ্বারা আমরা ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করতে চাই। সুতরাং, ব্যক্তিত্বকে প্রভাব বিস্তার করতে হ'লে যে শক্তির প্রয়োজন, তা যদি আত্মজ না হয়, তার দ্বারা কোন ভাল ফল পাওয়া যাবে না। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, বাইরে থেকে জোর ক'রে নানারকম কৌশলের দ্বারা আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করার যে প্রক্রিয়া, তাকেই বলব বিধান (order) এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীরা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আচরণের মধ্যে যে সংহতি আনে, তাই হ'ল শৃঙ্খলা (Discipline)। সুতরাং, আধুনিক অর্থে, শৃঙ্খলার গতানুগতিক ব্যবহারের মধ্যে শৃঙ্খলা শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য নেই। বিধান (order) সব সময় নেতিবাচক এবং তা মানুষকে শৃঙ্খলিত করে। ফলে, জীবনের ওপর তার প্রভাব খুবই নগণ্য। অপরদিকে শৃঙ্খলা নেতিবাচক এবং অস্তিবাচক প্রতিক্রিয়ার ফল। স্যার পার্শি নান্ (Nunn) বিধানের সঙ্গে শৃঙ্খলার তফাৎ করতে গিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তার মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের মনোভাব পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন—'শৃঙ্খলা' বিধানের মত বাহ্যিক কোন ব্যাপার নয়, শৃঙ্খলা মানুষের আচরণের অন্তরতম উৎস-উদ্ভূত ('Discipline is not an external thing like order, but something that touches the inmost springs of conduct')। এ ছাড়া, শৃঙ্খলার ভিত্তি হ'ল মানবতাবোধ আর বিধানের মূলে আছে অবজ্ঞা এবং হিংস্রতা। গতানুগতিক বিধানের ধারার সমালোচনা করতে গিয়ে একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—"Countless men have I known who are rapidly making names for themselves as successful school masters, who under any system of education would have been sacked after their first day." অপরদিকে শিক্ষার আধুনিক ভাবধারার প্রবর্তকদের একজন পূর্বসুরী পেস্টালাৎসী শৃঙ্খলা সম্পর্কে বলেছেন—"শৃঙ্খলা ভালবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং ভালবাসার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।" ("Discipline must be based on and controlled by love".)

শৃঙ্খলা ও শাসনের পার্থক্য

॥ শৃঙ্খলা ও বিধানের পার্থক্য ॥

শৃঙ্খলা (Discipline)	বিধান (Order)
১। শৃঙ্খলা অন্তর্জাত	১। বিধান বহিঃ-আরোপিত
২। শৃঙ্খলা সব সময় উন্নয়নকামী	২। বিধান সব সময় সংস্কারকামী
৩। শৃঙ্খলার ভিত্তি মানবতাবাদ	৩। বিধানের ভিত্তি অবজ্ঞা এবং হিংস্রতা
৪। শৃঙ্খলা স্থাপিত হ'লে তা স্থায়ী হয়	৪। বিধান দ্বারা যে আচরণ উৎপাদিত হয়, তা অস্থায়ী।
৫। শৃঙ্খলা-স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব ভূমিকা প্রধান	৫। বিধানে নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির ভূমিকা প্রধান

॥ শিক্ষায় শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা ॥
(Importance of Discipline in Education)

বিদ্যালয় এক ধরনের সামাজিক সংস্থা (Educational Institution)। শিক্ষার্থীরা এখানে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে। শিক্ষার্থীর এই সমষ্টিকে আমরা সামাজিক গোষ্ঠী (Social group) হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। যে-কোন সামাজিক গোষ্ঠীকেই কতকগুলো নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় বা বিশেষ এক শৃংখলার অধীনে থাকতে হয়। সাধারণভাবে যদি বিচার করা যায়, একটা ফুটবল দলের বিভিন্ন খেলোয়াড় যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না। তাদের আচরণ সব সময় কতকগুলো নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঠিক এমনিভাবে বিদ্যালয়ে শিশুদের আচরণকে যদি বিশেষ নিয়মের মধ্যে রাখা না যায়, তা'হলে উচ্ছৃংখলতা দেখা দেবে। শিক্ষণ-পদ্ধতি ও শিক্ষা-পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হ'লে বিদ্যালয়ে শৃংখলার একান্ত প্রয়োজন। শৃংখলার মাধ্যমে মানুষের জীবনের ছন্দোময়তা উপলব্ধি করা যায়। তাই ব্যক্তি-জীবনের বিকাশসাধন করতে হ'লে বিদ্যালয়-জীবনেও শৃংখলার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের গোষ্ঠী-জীবন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর উভয়ের সমবায়ে গঠিত। সুতরাং, তাদের প্রত্যেকের জন্য কিছু কিছু বিধিনিষেধ আছে। তাঁরা যদি সেগুলো মেনে না চলেন, তাহ'লে বিদ্যালয়ের কাজ পরিচালনা করা মুশকিল হবে। শিক্ষার্থী যদি পাঠে মনোনিবেশ না করে, কঠোরভাবে অনুশীলন না করে, তাহ'লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষার্থী যাতে এই ধরনের আচরণ করে, তার জন্য বিদ্যালয়ে শৃংখলা একান্ত প্রয়োজন। ইংরাজী 'Discipline' কথাটাই শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তার গুরুত্বের কথা কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রহ্মচর্যের মধ্যে তাই কঠিন শৃংখলার ব্যবস্থা দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আশ্রমিক ব্রহ্মচর্যের আদর্শকে আধুনিক কালে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছেন,—

দলগত ও ব্যক্তিগত জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব

" বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য ব্রত, অর্থাৎ আত্ম-সংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া সমাহিত-ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা—ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার পথ।" আধুনিক কালে শিক্ষা-ব্যবস্থায় ও বিদ্যালয়ে যে নানা ধরনের উচ্ছৃংখলতা সর্বদা দেখা যাচ্ছে, তা শিক্ষাকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে দিন দিন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাকে জাতি-গঠনের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করতে হ'লে বিদ্যালয়-জীবনে শৃংখলা আনার জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে। বিদ্যালয়-জীবনের মধ্যে গোষ্ঠীজীবনের নিয়ম-কানুন মেনে চলার যে অভ্যাস শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করবে, তা সমাজ-জীবনেও সঞ্চারিত হবে। এর ফলে সমাজ-জীবনে অবশ্যই শান্তি আসবে।

॥ শিক্ষার স্বাধীনতা ॥
(Freedom in Education)

শিক্ষণ-পদ্ধতিকে সার্থক করার জন্য শৃঙ্খলা (Discipline) যেমন অপরিহার্য, তেমনি শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য স্বাধীনতারও বিশেষ প্রয়োজন।

প্রস্তাবনা

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার গুরুত্ব প্রাচীনকাল থেকে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। তবে, আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব অনেক বেড়েছে এবং তার ওপর নতুন তাৎপর্য আরোপ করা হয়েছে।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল, ব্রিটিশ দার্শনিক কমিনিয়াস, রোমান শিক্ষাবিদ্ কুইন্টিলিয়ান—এঁরা প্রত্যেকে শিক্ষায় স্বাধীনতার নীতি প্রয়োগের কথা বলেছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী। প্রাচীন মনীষীদের এই চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে ব্যক্ত করলেন প্রকৃতিবাদী 'রুশো' তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে। গতানুগতিক

প্রাচীন ধারণা

ধারণার মূলে তীব্রভাবে আঘাত করেন রুশো তাঁর এমিলের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে। তিনি বলেছিলেন, মানবশিশু স্বাভাবিকভাবেই নির্মল এবং নিষ্পাপ ; সমাজের বিধিনিষেধ বা তথাকথিত শৃঙ্খলাবিধি তাকে কলুষিত করে। সে স্বভাবতঃই স্বাধীনভাবে জন্মায়, কিন্তু সমাজ তাকে বিবিধ বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং এই বন্ধন বা শৃঙ্খলা তার জীবন-বিকাশের পক্ষে খুবই খারাপ। তাই রুশো শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলেছেন। রুশোর এই চিন্তাধারা আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হ'য়েছে। বর্তমান কালে যে-কোন প্রগতিশীল শিক্ষক অবাধ স্বাধীনতার নীতিতে বিশ্বাস করেন। আর এটাই হ'ল আধুনিক শিক্ষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়ার নীতি শিক্ষাদর্শনের যুক্তির দ্বারাও সমর্থিত। শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে নানা ধরনের সম্ভাবনা। তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে তার আত্মার পূর্ণ পরিণতি। তার সেই অপ্রকাশিত আত্মাকে বিকশিত

স্বাধীনতার নীতির মূলে শিক্ষাদর্শন

করতে হ'লে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। ফ্রয়বেল, মন্তেসরী, পেস্টালাৎসী প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌রা শিশুর স্বাধীন ক্রিয়াকলাপের ওপর ভিত্তি ক রে শিক্ষা-পদ্ধতি রচনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন যে, শিশুকে যদি তার স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে দেওয়া না হয়, তাহ'লে তার আত্মবিকাশ সম্ভব হবে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন,—"প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যে বিদ্যালাভ করা যায়, তা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।"

অন্য একদিক্ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, শিক্ষায় স্বাধীনতার নীতি মনোবিদ্যার তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার প্রধান কাজ হ'ল শিশুর মধ্যে যে বিকাশের ক্রমাগত প্রচেষ্টা চলছে, তার পরিপূর্ণতা ঘটানো। জন্ম-অবস্থায় তার মধ্যে থাকে কতকগুলো

প্রবণতা ; সেই প্রবণতার পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে আসে জীবনের পরিপূর্ণতা। ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজে যেমন তৃপ্ত হবে, অপরদিকে সমাজ-জীবনও সার্থক হবে। সুতরাং, তার মধ্যেকার চিরন্তন বিকাশের প্রয়াসকে কোনমতেই বাইরের কোন শক্তি বা অনুশাসন দিয়ে চেপে রাখা উচিত হবে না। অর্থাৎ, তাকে নিজ ধর্মে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, অনুরাগ ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠবে। কারণ, এদের দ্বারাই তাকে সক্রিয় ক'রে তোলা সম্ভব। সুতরাং শিক্ষার গতিনির্ণয় বাইরে থেকে করা সম্ভব নয়। শিক্ষাকে সার্থক করতে হ'লে শিশুর সক্রিয়তার ধর্মকে কাজে লাগাতে হবে ; তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের প্রস্তাবিত বিভিন্ন শিক্ষণ-পদ্ধতির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ তাই 'আশ্রম সম্মিলনী' গঠনের কথা বলেছেন। ডাল্টন প্ল্যান, প্রোজেক্ট মেথড, কিণ্ডারগার্টেন ইত্যাদি আধুনিক পদ্ধতিরও প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানে স্বাধীনতার নীতিকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। তাহ'লে বলা যেতে পারে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করতে হ'লে বা শিক্ষার লক্ষ্যকে চরিতার্থ করতে হ'লে স্বাধীনতার নীতিকে গ্রহণ করতে হবে।

স্বাধীনতার নীতি মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি

॥ শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা ॥
(Discipline and Freedom)

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা দুই-ই শিক্ষার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে সার্থক করতে হ'লে বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ রচনা করতে হ'লে, শৃঙ্খলার একান্ত প্রয়োজন। আবার শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হ'লে, ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ সাধন করতে হ'লে, শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা এই দুটি ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরস্পর-বিরোধী। একটির দ্বারা আমরা ব্যক্তি-জীবনের ওপর কতকগুলো নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-নিষেধের বাঁধন দিই ; অপরটির দ্বারা ব্যক্তি-জীবনকে প্রকাশ করার অবাধ স্বাধীনতা ঘোষণা করি। এখন প্রশ্ন হ'ল, আমরা কিভাবে এই দু'ধরনের পরস্পর-বিরোধী ধারাকে শিক্ষায় স্থান দিয়েছি। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার মধ্যে এই ধরনের কোন দ্বন্দ্ব নেই। আপাতঃভাবে আমরা যে পরস্পর-বিরোধী ভাব লক্ষ্য করছি, তা সম্পূর্ণভাবে এই দুই শব্দের সংকীর্ণ অর্থকে কেন্দ্র ক'রে সৃষ্ট হ'য়েছে। শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

প্রস্তাবনা

শিক্ষার শৃঙ্খলা বলতে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার (Spontaneous discipline) কথাই বোঝাই। যে শৃঙ্খলা স্বাভাবিক নিয়মে ব্যক্তির আন্তরিক তাগিদ এবং চাহিদা থেকেই আসে, তাকেই আমরা বলছি স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা বা অন্তর্জাত শৃঙ্খলা

(Sponteneous discipline বা inner discipline)। এই ধরনের শৃঙ্খলা ব্যক্তির ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ, আগ্রহ ইত্যাদিকে শৃঙ্খলিত করে না, বরং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃ-প্রকাশের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। আত্মার আপন নিয়মে, আত্মার আপন তৃপ্তিতে তার সৃষ্টি। একে আমরা শুধু শৃঙ্খলা না ব'লে আত্মশৃঙ্খলা (self-discipline) বলতে পারি।

আত্মশৃঙ্খলা

যে শিল্পী ছবি আঁকেন, তাঁকে কতকগুলো নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। কারণ ছবি আঁকার কতকগুলো নিয়ম আছে। কোন্ রেখা কোথায় দিলে ছবির গভীরতা (Depth) ঠিক বোঝা যাবে; কোন্ রঙ কোথায় ব্যবহার করলে আলোছায়ার (Light and Shade) প্রভাব ঠিকমত ছবিতে প্রকাশ পাবে, এ সবই তাঁকে নিয়মমাফিক করতে হয়। শিল্পী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সব নিয়ম মেনে চলেন। তার কারণ পেছনে সৃষ্টির প্রেরণা বা প্রয়াস কাজ ক'রে চলছে। সুতরাং, যদিও তিনি নিয়মে বাঁধা, যে নিয়ম তাঁকে পীড়া দেয় না। এই দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, শৃঙ্খলা তাঁর সৃষ্টির প্রেরণাকে আদৌ ব্যাহত করেনি বরং উৎসাহিত করছে।

আবার, সেই শিল্পীর কথা যদি অন্য দিক্ থেকে বিচার করি তাহ'লে দেখব, তাঁর কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। যদিও তিনি ছবির সংগঠনের নিয়মের দিক্ থেকে বাঁধা, তবুও তাঁর মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সম্পূর্ণ অবকাশ রয়েছে। ছবির 'ফর্ম' (form) কিরকম হ'বে, সে ব্যাপারে চিন্তা করার অবাধ স্বাধীনতা তাঁর রয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি, যে-কোন ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা উভয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ প্রয়োজন। স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে স্বাধীনতার কোন দ্বন্দ্ব নেই। শিল্পী তাঁর স্বাধীন চিন্তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করছেন ছবির মাধ্যমে; শিল্পসৃষ্টি তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারারই অভিব্যক্তি। সুতরাং যে-কোন সার্থক সৃষ্টির জন্য শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা উভয়েরই প্রয়োজন। তাদের মধ্যে বৈপরীত্যের সম্পর্ক নেই। তবে শৃঙ্খলাকে

মুক্ত-শৃঙ্খলা

যেমন আমরা আধুনিক অর্থে গ্রহণ করব, শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতাকেও সেইভাবে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখা দরকার, স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয় বা স্বেচ্ছাচার নয়। উচ্ছৃঙ্খলতার কোন উদ্দেশ্য নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে যে স্বাধীনতার কথা বলছি, তা উদ্দেশ্যমূলক এবং সে উদ্দেশ্য ব্যক্তি-জীবনের কল্যাণের পথে নিয়োজিত। সুতরাং শিক্ষাকে সার্থক করতে হ'লে শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার সমন্বয়িত প্রয়োগ শিক্ষাক্ষেত্রে করতে হবে। বন্ধন এবং মুক্তি—এ দু'য়েরই প্রয়োজন মানুষের বিকাশের জন্য। তাই আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌রা স্বতস্ফূর্ত শৃঙ্খলার মধ্যে স্বাধীনতার মৌলিক উপাদানের সংযোজনের পক্ষপাতী। বর্তমানে তাঁরা এই বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে ব্যক্ত করার জন্য শৃঙ্খলার পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহার করছেন, তা হ'ল 'মুক্ত-শৃঙ্খলা', অর্থাৎ, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা।

॥ মুক্ত-শৃঙ্খলা ॥
(Free-discipline)

শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলার সম্পর্কে ধারণার অভিব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই ধারণার অগ্রগতি মানুষের চিন্তাধারার অভিব্যক্তির সঙ্গে সমান তালে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়েছে। একেবারে প্রাচীন যুগে ছিল শারীরিক নির্যাতনমূলক শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা। অর্থাৎ, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য শারীরিক নির্যাতন করা হ'ত। তারপরে দ্বিতীয় স্তরে লক্ষ্য করা যায় অবদমনের সাহায্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা। শিশুর মধ্যে যে সব সুপ্ত অসামাজিক ইচ্ছা আছে, সেগুলোকে দমন ক'রে রাখতে পারলে শৃঙ্খলার কোন সমস্যা থাকে না। তাই কিছু কিছু শিক্ষাবিদ্ বলেছেন, শিশুদের কাজ দিয়ে সব সময় ব্যস্ত রাখতে পারলে তাদের মনে অসামাজিক চিন্তা আসবে না। কিন্তু এ ধরনের অবদমনের কুফল সম্বন্ধে আজকে আমাদের সকলেরই ধারণা আছে। এই অবদমনের ফলেই নানারকম মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয় এবং সেই সব মানসিক অসুস্থতা আবার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে প্ররোচিত করে। তৃতীয় পর্যায় হ'ল ঃ ব্যক্তিগত প্রভাবের

শিক্ষার শৃঙ্খলার ধারণার বিবর্তন

শিক্ষায় শৃঙ্খলার ধারণার বিকাশ
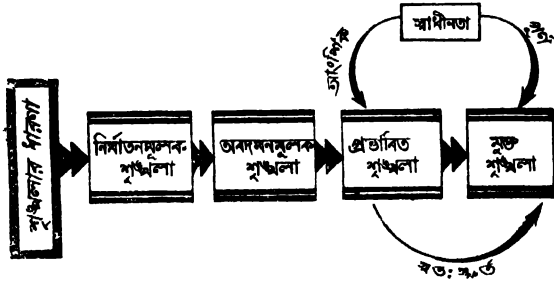
দ্বারা শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই মতবাদ অনেক প্রগতিশীল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিশু শিক্ষকের ব্যক্তিগত আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে শৃঙ্খলা অনুশীলন করবে, তাঁদের অনুভাবনের দ্বারা প্রভাবিত হবে। এক্ষেত্রে শিশুদের অনুকরণ করার বা অনুভাবিত হওয়ার কিছুটা স্বাধীনতা থাকে। অর্থাৎ, শৃঙ্খলার ধারণার বিকাশে এই পর্যায়ে, আংশিকভাবে হ'লেও, স্বাধীনতার গুরুত্বকে স্বীকার করা হ'য়েছে। কিন্তু এই ধরনের শৃঙ্খলার একটা বড় অসুবিধা হ'ল এর কোন স্থিরতা নেই। তা'ছাড়া, ব্যক্তিত্বের প্রভাবের দ্বারা যে শৃঙ্খলা আসে, তাকেও আমরা ঋণাত্মক শৃঙ্খলা বলতে পারি। তার মধ্যেও কিছু অবদমনের প্রচেষ্টা আছে।

আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে সমন্বয়িত হবে। স্বাধীনতা ছাড়া শৃঙ্খলার কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

স্বাধীনতার উপাদান যে শৃঙ্খলার মধ্যে নেই, তার থেকে আমরা ঋণাত্মক শৃঙ্খলা পেতে পারি, যার কোন চিরস্থায়ী প্রভাব নেই ব্যক্তি-জীবনে। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—"Negative discipline is powerless". এই কারণে আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌রা ধনাত্মক শৃঙ্খলার (Positive discipline) কথা বলেছেন এবং তাঁরা মনে করেন, প্রত্যক্ষ শিশু-স্বাধীনতার মাধ্যমে শৃঙ্খলা আনতে না পারলে, সে শৃঙ্খলা চিরস্থায়ী হবে না। শিক্ষাবিদ্ অ্যাডামস্ (Adams) বলেছেন—"The freedom of the pupil is to be positive not merely negative". ম্যাক্‌নান (MacNunn) তাই এই ধরনের শৃঙ্খলাকে বললেন মুক্ত-শৃঙ্খলা (Free discipline)। এই ধরনের শৃঙ্খলার মূল কথা হ'ল—শৃঙ্খলা আসবে শিশুর আত্মচেতনার মধ্য দিয়ে। কোনরকম আদর্শ, তা যতই প্রয়োজনীয় হোক-না-কেন, আমরা জোর ক'রে তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারি না। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে গিয়ে শিক্ষককে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমরা প্রত্যেক শিশুকে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধী করতে চাই না, আর তাই যদি আমাদের প্রচেষ্টা হয়, তা'হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। আমরা চাই প্রত্যেক শিশু তার নিজের মতই হবে; তার নিজস্ব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলে তবেই তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে। তাই শৃঙ্খলা-স্থাপনের উদ্দেশ্য যেন না ব্যাহত হয় পদ্ধতির দ্বারা। এই হিসেবে মুক্ত-শৃঙ্খলা ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সুযোগ দিয়ে ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব ধারায় বিকাশে সহায়তা করে।

ধনাত্মক শৃঙ্খলা বা মুক্ত-শৃঙ্খলা

মুক্ত-শৃঙ্খলার মূল কথা হ'ল—শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবেন। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য পালন করবে বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর মাধ্যমে। তারা ভাল অভিজ্ঞতাও যেমন পাবে খারাপও পাবে। ধীরে ধীরে ভালমন্দের মধ্যে তফাৎ করতে শিখবে, পরে তারা স্ব-ইচ্ছায় মন্দকে ত্যাগ ক'রে ভালকে গ্রহণ করতে শিখবে। এইভাবে যে নিয়মানুবর্তিতার সম্মুখীন তারা হবে, তা তাদের কাছে বোঝাস্বরূপ মনে হবে না এবং এই ধরনের শৃঙ্খলা সমাজ-জীবনেও তারা স্বাভাবিকভাবে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। নান্ (Nunn) বিদ্যালয়ে এই ধরনের শৃঙ্খলা-চর্চার কয়েকটা স্তরের উল্লেখ করেছেন—(১) ব্যক্তির আন্তরিক ইচ্ছা প্রথম জাগরিত হওয়ার দরকার। এই ধরনের ইচ্ছা যদি স্বাভাবিকভাবে না জাগে বা শিশুর মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে না আসে, তাহ'লে শিক্ষক বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে সেই ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলবেন। (২) নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতনতাও এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত বা মুক্ত শৃঙ্খলা-চর্চার জন্য প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর মধ্যে হীনমন্যতা (Negative self-feeling) না জাগলে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কাজে প্রবৃত্ত হবে না। শিক্ষক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির বা জীবনে যাঁরা সফল হয়েছেন, এ রকম ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে তাদের মধ্যে ঐ হীনমন্যতার ভাব জাগ্রত করবেন। (৩) বিশেষ অক্ষমতার প্রতি মনোযোগ। শিক্ষার্থী যখন নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হবে, তখনই সে তার প্রতি মনোযোগ দেবে। (৪) এর পর শিক্ষার্থী

বিদ্যালয়ের মুক্ত-শৃঙ্খলার চর্চা

সেই অক্ষমতাকে দূর করার জন্য বারবার চেষ্টা করবে। তার বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হবে, তাকেই সে গ্রহণ করবে। এমনিভাবে শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েও বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করা যায়। তবে শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, শৃঙ্খলা-স্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের কোন দায়িত্ব নেই। শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে শৃঙ্খলা-স্থাপনের কাজে অগ্রসর হবেন না ঠিকই, কিন্তু সব সময়ই পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন। তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপর বিস্তার না ক'রে, বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের মধ্যে যথাযোগ্য আগ্রহ সৃষ্টি করবেন। তাদের নিজেদের অক্ষমতা সম্পর্কে তাদের সচেতন ক'রে তুলবেন এবং তাদের কর্মপদ্ধতি-নির্বাচনেও বন্ধুর মত সাহায্য করবেন। এই ধরনের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে শৃঙ্খলা আসবে, তাকে শিক্ষার্থীরা খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আপনার জিনিস বলে গ্রহণ করবে। তাই অ্যাডাম্‌স্‌ বলেছেন—"The real value of free discipline is that pupils have a chance to go wrong in their own way, to make their own mistakes, and to find the way to remedy them on their own account".

এই ধরনের মুক্ত-শৃঙ্খলার ব্যবহারিক প্রয়োগ আজকাল বিভিন্ন শিক্ষণ-পদ্ধতির মধ্যে দেখা যায়। ডাল্টন প্ল্যান, প্রোজেক্ট মেথড্‌ ইত্যাদি পদ্ধতিতে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার একদিকে আছে যেমন অবাধ স্বাধীনতা, তেমনি অপরদিকে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণের (শৃঙ্খলা) চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে 'আশ্রম-সম্মিলনীর' মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বকেই ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে এই ধরনের ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সুতরাং আধুনিক কালে প্রায় সব শিক্ষাবিদ্‌ই এই মুক্ত শৃঙ্খলা বা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলায় আস্থাবান এবং একই শৃঙ্খলার প্রকৃত তাৎপর্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন। যে মানুষ নিজের গড়া আইন নিজে মেনে চলেছে, তার আনুগত্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। গ্রীন (T. H. Green) বলেছেন—"That man is free who is conscious of himself as the author of the law which he obeys." শিক্ষায় মুক্ত-শৃঙ্খলার মতবাদ শিক্ষার্থীদের সেই স্বাধীনতাই এনে দিয়েছে।

মন্তব্য

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনের সমস্যা

॥ আলোচনা ॥

(Problem of maintaining discipline in School)

যদিও মুক্ত বা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাকে আমরা আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছি, তবুও আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনের নানারকম অসুবিধা আছে। এই সব অসুবিধাগুলোর মধ্যে কতকগুলো বস্তুগত বা পরিবেশগত, আবার কতকগুলো ব্যক্তিগত। এই সব কারণের সবগুলো যে বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণের

সীমার মধ্যে আসে, তা নয়। তবুও সমবেত চেষ্টায় এদের সমাধান করতে না পারলে, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার সমস্যা সমাধান করা যাবে না। বিদ্যালয়, শিক্ষক, গৃহ, অভিভাবক ও সমাজ-সংস্কারক অর্থাৎ এক কথায়, বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্থা (Educational agencies) এবং ব্যক্তি যদি সমবেতভাবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা না করেন, তাহ'লে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা এখানে প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনের পথে যে বাধাগুলি আছে, সেগুলির উল্লেখ করবো। পরবর্তী পর্যায়ে এই সব বাধাকে অতিক্রম করে কি ভাবে শৃঙ্খলা স্থাপন করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করবো।

প্রস্তাবনা

॥ [ক] বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনে পরিবেশগত বাধা ॥
(Environmental factors against maintainance of discipline)

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনে বর্তমানে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত কারণ। এই সব পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে কিছু আছে বিদ্যালয়-পরিবেশ সংক্রান্ত, কিছু আছে সমাজ-পরিবেশ সংক্রান্ত। যেমন—

[এক] বিদ্যালয়ের অবস্থান অনেক সময় শৃঙ্খলা-রক্ষার কাজকে ব্যাহত করে। বিদ্যালয়কে যদি সমাজের কোলাহল থেকে দূরে সরিয়ে রাখা না যায়, তাহ'লে সমাজ-জীবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতা মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়, তার প্রভাব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর এসে পড়বে। বিদ্যাভ্যাসের সময় যদি তাদের মনোযোগের পরিবর্তন হয়, তা'হলে সমস্ত দিক্ থেকে অসুবিধা হয়। তাই আধুনিক কালে অনেক শিক্ষাবিদ্ প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষার আদর্শ পরিবেশকে বর্তমানে প্রতিস্থাপন করার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতন' এই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন, "আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করতে হয়, তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।" এই ধরনের পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মনের যে উদারতা আসবে, তার থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা-স্থাপনের কোন সমস্যা থাকবে না।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ

[দুই] অনেক সময় শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন অবস্থা শৃঙ্খলা-স্থাপনের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। যেখানে বসে শিক্ষার্থীরা দিনের বেশ কিছু সময় কাটায়, তার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ যদি ভাল না হয়, তা শিক্ষার্থীদের মনে প্রভাব বিস্তার করবে, সেটাই স্বাভাবিক। এজন্য শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার দরকার। নোংরা দেওয়াল, ভাঙ্গা জানালা-দরজা, অস্বাস্থ্যকর অন্ধকার ও ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনে এক বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া, শ্রেণীকক্ষের আয়তনও শিক্ষার্থী অনুপাতে যথেষ্ট বড় হওয়ার দরকার। চেয়ার, বেঞ্চ ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকার দরকার। শিক্ষার্থীর উচ্চতা অনুযায়ী ক্রমানুসারে বসার

শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ

ব্যবস্থা করার দরকার। তা না হ'লে শিক্ষককে দেখার অসুবিধা হয়, বোর্ডে লেখা দেখার অসুবিধা হয়, এতে ক'রে শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। এই সব কারণে, শিক্ষক ও বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষকে সচেতন হতে হবে, যদি বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়। শুধুমাত্র সমস্ত দোষ শিক্ষার্থীদের উপর আরোপ ক'রে শাস্তির ব্যবস্থা করলে চলবে না। তার ফলে শৃঙ্খলা ত' আসবেই না, বরং তারা বিদ্যালয়ের প্রতি এবং শিক্ষকের প্রতি অসন্তোষমূলক মনোভাব পোষণ করবে এবং ক্রমে তা উচ্ছৃঙ্খল আচরণের মধ্যে প্রকাশ পাবে।

[তিন] বিদ্যালয়-পরিচালনার পদ্ধতি অনেক সময় শৃঙ্খলা-স্থাপনের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। যেমন, বিদ্যালয়ের সময়-তালিকা (Time-table) মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত না হওয়ার জন্য শৃঙ্খলা-স্থাপনের অসুবিধা হয়। যদি সময়-তালিকায় কোন কঠিন পাঠ্য বিষয় শেষের দিকে থাকে, তাতে ক'রে সেই বিষয়ের পাঠের সময় ছাত্ররা অমনোযোগী হ'য়ে পড়ে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, সময়-তালিকায় ঠিকমত বিষয় সংযোজন করতে না পেরে হালকা বিষয় দেওয়া হয়, তাতে ক'রে ছাত্রদের মানসিক প্রস্তুতি নষ্ট হ'য়ে যায় এবং শৃঙ্খলাহীন আচরণ করে। সুতরাং শিক্ষালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য সময়-তালিকা মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরি করতে হয়।

বিদ্যালয় পরিচালন-পদ্ধতি ও শৃঙ্খলার সমস্যা

[চার] বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম রচনার ব্যাপারেও শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনসিক ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব না দিলে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব নয়। পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু যদি ছাত্রদের আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী নির্ধারণ করা না হয়, তা'হলে অনেক সময় সে সব বিষয় তার কাছে বোঝাস্বরূপ মনে হয়। এই সকল বিষয় আলোচনা-কালে সে অমনোযোগী হয়, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করারও সুযোগ খোঁজে। আবার, বিষয়বস্তু যদি খুব কঠিন বা খুব সোজা হয়, তাতেও তার বিরক্তি উৎপাদন করে। আমাদের বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠ্যক্রম তাই অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য দায়ী হ'য়ে পড়ে। যে পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি পরিপূরণে সমর্থ নয়, সে পাঠ্যক্রম শৃঙ্খলা-স্থাপনে সহায়তা করতে পারে না।

পাঠ্যক্রম ও শৃঙ্খলার সমস্যা

[পাঁচ] শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী না থাকার জন্য অনেক সময় ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের নায়ক। তিনি শ্রেণীকে পরিকল্পিত ধারায় পরিচালনা করেন। শ্রেণীকে আদর্শগত দিকে পরিচালনা করার মত মানসিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য যদি তাঁর না থাকে, তিনি যদি আধুনিক শিক্ষাদান-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত না হন, তা'হলে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখা তাঁর পক্ষে খুবই মুশকিল হ'য়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নানারকম অন্যায় আচরণ করে। তাই শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলার জন্য অনেকাংশে দায়ী শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর শিক্ষণ-পদ্ধতি।

শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শৃঙ্খলার সমস্যা

॥ [খ] বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনের ব্যক্তিগত বাধা ॥
(Subjective factors against maintainance of discipline)

পূর্বোক্ত সব বাহ্যিক কারণ বা বিদ্যালয়ের পরিবেশগত কারণ ছাড়াও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আরও নানারকম ব্যক্তিগত কারণও কাজ করে। ব্যক্তিগত কারণ বলতে আমরা শিক্ষার্থীর নিজস্ব নানারকম অসুবিধার কথাই বলছি।

[এক] বিদ্যালয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের দৈহিক অসুস্থতা থেকে আসে। শরীর খারাপ থাকলে কোন কাজ করার ইচ্ছা থাকে না। আবার, অনেকের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত অসুস্থতা আছে, সেগুলোও বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায়। বিশেষ বিশেষ ছাত্রের অসুবিধার কথা বিবেচনা ক'রে যদি উপযুক্ত শ্রেণীবিন্যাস না করা যায়, তাহ'লে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

শিক্ষার্থীর দৈহিক অসামর্থ্য

[দুই] শিক্ষার্থীর মানসিক অসুস্থতা অনেক সময় বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা-স্থাপনের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। এমন অনেক অসামাজিক আচরণ আছে যা শিক্ষার্থীরা বিশেষ মানসিক সংগঠনের জন্য সম্পাদন ক'রে থাকে। বাইরে থেকে আপাতঃভাবে আমরা এই সব আচরণকে সাধারণ শৃঙ্খলাগত সমস্যা ব'লে ভুল করি। কিন্তু তাদের আসল কারণ মনের অবচেতন-স্তরে কোন সংগঠনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। যেমন, কোন ছেলে সব সময় কলম মুখে দেয়। এটাকে আমরা সাধারণ সমস্যা হিসেবে নিয়ে উপদেশ বা তিরস্কারের দ্বারা দূর করতে চাই। কিন্তু তা ভুল, এই ধরনের চোষণের জন্য দায়ী তার বিশেষ এক মানসিক সংগঠন। এটা এক ধরনের মানসিক অসুস্থতাও বলা যেতে পারে। তাই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা-স্থাপনে অনেক সময় এই ধরনের সাধারণ মানসিক অসুস্থতা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষার্থীর মানসিক অসুস্থতা

[তিন] শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার অভাব (Emotional insecurity) বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনের প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায়। শিশুরা গৃহ-পরিবেশ বা সমাজ-পরিবেশে যদি তাদের মানসিক অনুভূতিমূলক নিরাপত্তা না পায়, সব সময় যদি তাদের এই কোমল অনুভূতিগুলোকে বড়রা উপেক্ষা করেন, তাহ'লে তারা ক্রমশঃ নিজেদের অসহায় (insecured) মনে করতে থাকে এবং যেখানে সুযোগ পায় সেখানে তারা তাদের অসহায় অবস্থার প্রতিবন্ধকস্বরূপ নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রভাব শিক্ষার্থীর ওপর কমে যাওয়ায়, তাদের এই প্রক্ষোভ-অসহায়তার প্রকাশ তারা বিদ্যালয়ে করছে। ফলে, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে।

শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভিক নিরাপত্তার অভাব

[চার] বিচার-বিবেচনাহীন কাজ বা স্বাভাবিকভাবে অপরিণত বুদ্ধির ফল অনেক

সময় বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে বাধা দেয়। বালকসুলভ চাপল্য ও বুদ্ধিহীনতার জন্য শিক্ষার্থী এমন অনেক কাজ করে যেগুলোকে আমরা উচ্ছৃংখল আচরণ বলতে পারি। এ ব্যাপারে শিক্ষক যদি সতর্ক না থাকেন এবং শিক্ষার্থীদের যদি ঠিকমত নির্দেশনা না দেন, তা হ'লে শৃংখলা রক্ষার কাজ ব্যাহত হবে।

শিক্ষার্থীর স্বভাব

[পাঁচ] শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাবের অভাব বিদ্যালয়ে শৃংখলা-স্থাপনের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। সামাজিক কাঠামো বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মানুষের সহনশীলতার ভাব অনেক কমে গেছে। বর্তমানে মানুষ অল্পেই অসহনীয় হ'য়ে পড়ে। এই মানসিকতার প্রভাব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপরও এসে পড়ছে। ফলে, সামান্য কিছু কারণেই তারা উচ্ছৃংখল আচরণ করে।

সহযোগিতামূলক মনোভাবের অভাব

[ছয়] সবশেষে বলা যায়, বিদ্যালয়ের শৃংখলার সমস্যা বিশেষভাবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার (Economic security) ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব বা দারিদ্র্য অনেক অসামাজিক আচরণের মূলে কাজ করে। অন্য অনেক ব্যক্তিগত কারণ এর থেকেই সৃষ্ট হয়। রাষ্ট্র যদি ঠিকমত নজর না দেয়, বিদ্যালয়ের শৃংখলা-স্থাপনের কাজ খুবই কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়বে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব

উপরি-উক্ত কারণে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে নানারকম উচ্ছৃংখল আচরণ দেখা দেয় এবং বিদ্যালয়ের পক্ষে শৃংখলা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ কি কি ধরনের উচ্ছৃংখল আচরণ দেখা যায়, তার তালিকা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ তৈরি করেছেন। ডেক্সটার এবং গার্লিক (Dexter and Garlick) আঠারো ধরনের আচরণের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্য দিয়ে শৃংখলাহীনতা প্রকাশ পায়। অধ্যাপক অনাথনাথ বসু ও জ্ঞানচন্দ্র দাশগুপ্ত এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রায় পঁয়ত্রিশ রকম উচ্ছৃংখল আচরণের কথা বলেছেন। বিদ্যালয়ে আমরা এই সব আচরণকে যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে না পারি, তাহ'লে ক্রমেই উচ্ছৃংখলতার সমস্যা বেড়ে যাবে।

মন্তব্য

॥ বিদ্যালয়ে শৃংখলা-স্থাপনের উপায় ॥

(Means of Maintaining discipline in School)

আধুনিক কালে বিদ্যালয়ে শৃংখলা-স্থাপনের সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রে বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, বিদ্যালয়ে শৃংখলা-স্থাপনের দায়িত্ব সমবেতভাবে সব শিক্ষা ও সমাজ-সংস্থাকে গ্রহণ করতে হবে, কারও একক প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হবে না। বিদ্যালয়ের শৃংখলা-স্থাপনের যে সমস্যার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, তাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এমন অনেক পরিস্থিতি আছে যার ওপর বিদ্যালয়ের কোন কর্তৃত্ব নেই। তাই সব পরিস্থিতিকে

প্রস্তাবনা

আয়ত্তে আনার জন্য যথাযোগ্য সংস্থাকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে হবে। তাহ'লেও বিদ্যালয়ের নিজস্ব দিক্ যেটুকু করার আছে, সে সম্পর্কে আমরা এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করব।

শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব

[ক] বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হ'লে শিক্ষককে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে তাঁর নেতৃত্বকে মেনে নেয়; তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ ক'রে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। সুতরাং, শিক্ষক নিজে যদি মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হন এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ না হন, তা'হলে শিক্ষার্থীরা কখনই তা হ'তে পারে না। সময়মত শ্রেণীতে যাওয়া এবং তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা ইত্যাদি কাজ তাঁকে সচেতনভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তবে ছাত্ররা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুকরণ ক'রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শৃঙ্খলা-রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

ত্রুটিমুক্ত বিদ্যালয় পরিচালনা

[দুই] বিদ্যালয়-পরিচালনার কোন দোষত্রুটি যাতে না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পক্ষপাতহীন আচরণ ছাত্রদের প্রতি করতে হবে। যথাযোগ্য উপকরণ শ্রেণীতে ব্যবহার করতে হবে শিক্ষাদানের সময়। ছাত্রদের মধ্যে এই ধারণা আনতে হবে যে, বিদ্যালয়-পরিবেশের মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নিষ্ঠাবান এবং বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য আগ্রহশীল।

শিক্ষার্থীদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা

[তিন] শিক্ষকরাও ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবেন; এতে ক'রে ছাত্রদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগবে এবং তখনই তারা স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলা-রক্ষার দায়িত্ব নেবে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে তাদের ওপর যদি কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়, তবে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা পালন করবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"ছাত্রদের ভক্তি না করলে তাদের নিকট হ'তে ভক্তি কেউ সহজে পায় না"।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের প্রচলন

[চার] বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনের কাজ সহজ করতে হ'লে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় এবং এই কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে তাদের সব সময় কাজে নিয়োজিত রাখা সম্ভব হবে। শিক্ষার্থীদের অলসভাবে বসিয়ে রাখলে অসৎ চিন্তা তাদের মাথায় আসবে। তাই বিদ্যালয়ে যতক্ষণ তারা থাকবে, তাদের স্বাধীনতাকে ব্যাহত না ক'রে যতদূর সম্ভব তাদের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। এতে ক'রে দ্বিমুখী ফল পাওয়া যাবে। শিক্ষাদানের কাজও হবে এবং একই সঙ্গে শৃঙ্খলা-স্থাপনের কাজও অনেক সহজ হবে।

[পাঁচ] শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হওয়ার দরকার এবং তাঁরা

পরস্পর সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে যাতে কাজ করেন, সেদিকে প্রধান শিক্ষককে নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাঁদের অনুকরণ ক'রে শিখবে। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক (Teacher-teacher relation), শিক্ষক-প্রধান-শিক্ষক সম্পর্ক (Teacher-Headmaster relation) এবং সবশেষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (Teacher-pupil relation) আদর্শস্থানীয় না হ'লে আদর্শ শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (Pupil-pupil relation) গড়ে উঠতে পারে না। আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে না উঠলে শৃঙ্খলা-রক্ষা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। এই সম্পর্কের মাধ্যমেই বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ জাগে এবং তা শৃঙ্খলা-স্থাপনে অনেক সহায়তা করে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপন

[ছয়] বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা আনতে হ'লে, শিক্ষার্থীদের ওপর তার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে, সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে। অর্থাৎ, পরোক্ষ তত্ত্বাবধানমূলক স্বাধীনতা দিতে হবে। বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের (School Self-government) ব্যবস্থা ক'রে বিদ্যালয়-পরিচালনার ভার তাদের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা-রক্ষায় প্রবৃত্ত হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে এই ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব প্রদান

[সাত] অনেক সময় বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য শাস্তি ও পুরস্কারের প্রয়োজন হয়। যদিও স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলায় এদের কোন স্থান নেই, তবু অনেক সময় বিদ্যালয়ের কাজকে সহজ করার জন্য এ'দের সাময়িক নিয়ন্ত্রিত শাস্তি-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এখানে, শাস্তি বলতে আমরা বিশেষভাবে মনোবিজ্ঞানসম্মত শাস্তির কথাই বলছি।

নিয়ন্ত্রিত শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান

[আট] সবশেষে, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপন করতে হ'লে বিদ্যালয়কে শিক্ষার অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। বিশেষভাবে গৃহ বা পরিবার (Home or family), রাষ্ট্র (State), বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা (Religious institution) প্রভৃতির সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগাযোগ রাখতে হবে। এর ফলে তারাও বিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। কারণ শিক্ষার্থীরা দিনের বেশীর ভাগ সময় বিদ্যালয়ের বাইরে থাকে, সেই অবসরে সে যদি অন্যান্য সংস্থার দ্বারা একইভাবে প্রভাবিত হয়, তা হলে বিদ্যালয়ের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন

শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ আজকে বিশ্বব্যাপী সমস্যা। তাই পৃথিবীর সমস্ত দেশের চিন্তাবিদ্‌রা এই সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। বহু গবেষক

শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। তাঁদের গবেষণার যে সব ফলাফল আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হ'য়েছে, তার থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁরা একটি বিষয়ে একমত। তাঁরা সকলে মনে করেন, শিক্ষালয়গুলিতে শৃঙ্খলা-ভঙ্গের মূলে আছে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ (Socio-economic condition)। সুতরাং, শুধুমাত্র শিক্ষা-পরিবেশের সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলাস্থাপনের সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধান করা যাবে, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিক্ষার্থী যে জীবন-পরিবেশে বসবাস করে, তার মধ্যে সাংগঠনিক পরিবর্তন আনতে হবে এবং শিক্ষাকে জীবনের বাস্তব ও আসল প্রয়োজনগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। তবেই শিশুরা সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা বোধ করবে। শিক্ষা তাদের কাছে জীবনের প্রয়োজন হিসেবে দেখা দেবে। আর তখনই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। স্বাভাবিক নিয়মে আচরণও আত্মনিয়ন্ত্রণাধীন হবে।

মন্তব্য

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী শৃঙ্খলা (Discipline) বলতে দমনকে (Order) বোঝাত। কিন্তু বর্তমানে শৃঙ্খলা কথাটিকে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের অন্যান্য ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, শৃঙ্খলা কথার তাৎপর্যের পরিবর্তন হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীর অন্তর থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার স্পৃহা থেকে যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, তাই আধুনিক অর্থে শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলাকে তাই বলা হয় স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা (Spontaneous discipline)। শৃঙ্খলা (Discipline) দমনের (Order) মত বহিঃআরোপিত নয়। স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা মানুষের সুষম জীবন-বিকাশের সহায়ক। সুষম বিকাশ বলতে বিশেষ ভাবে ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের বিকাশের কথাই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, সামগ্রিক জীবন-বিকাশের প্রক্রিয়া যাকে আমরা শিক্ষা বলি, সেই প্রক্রিয়াকে শৃঙ্খলা সহায়তা করে।

শৃঙ্খলা সম্পর্কে এই নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা (Freedom) দানের নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আধুনিক কালে শিক্ষা-ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে প্রতিক্রিয়া করার অবাধ স্বাধীনতা দানের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এই স্বাধীনতা দিলে, শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায়। ফলে, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানসম্মত হয়। তাই শৃঙ্খলা শব্দকে আধুনিক তাৎপর্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্গণ মুক্ত শৃঙ্খলার (Free discipline) ধারণার প্রবর্তন করেছেন। এই ধারণার মূল কথা হল মুক্ত পরিবেশে শিশুরা স্বাধীনভাবে কাজ করে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মন্দকে ত্যাগ করে ভালকে গ্রহণ করে। এই শৃঙ্খলা আসবে শিশুর আত্ম-সচেতনতার মাধ্যমে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা নানা কারণে দেখা যায়। এই কারণগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) পরিবেশ ও কর্মপরিচালনাগত কারণ—বিদ্যালয়-পরিবেশ, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ, পরিচালন-ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম, শিক্ষকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। (২) ব্যক্তিগত কারণ শিক্ষার্থীর দৈহিক অসামর্থ্য, মানসিক অসুস্থতা, প্রক্ষোভিক নিরাপত্তার অভাব, বৌদ্ধিক সামর্থ্যের অভাব, সহযোগিতা-মূলক মনোভাবের অভাব, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপন করতে হলে যে কারণে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে দূর করতে হবে। পরিচালন-ব্যবস্থাকে ত্রুটি-মুক্ত করতে হবে। শিক্ষককে উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে, উপযুক্ত শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের ওপর কর্মভার অর্পণ করে তাদের কাজের স্বাধীনতা দিতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. How is discipline defined? How is it distinguished from order? What is meant by the concept of free discipline?

[শৃঙ্খলার সংজ্ঞা কি? আদেশ বিধির (শাসন) সঙ্গে এর তফাত কোথায়? মুক্ত শৃঙ্খলা ধারণাটির তাৎপর্য কোথায়?]

2. Discuss the modern concept of discipline and indicate the importance of the idea of free discipline.

[শৃঙ্খলার আধুনিক ধারণা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং মুক্ত শৃঙ্খলার গুরুত্ব নির্দেশ কর।]

3. What is the place of discipline in child centered education?

[শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শৃঙ্খলার স্থান সম্পর্কে আলোচনা কর।]

4. Distinguish between order and discipline. What do you understand by free discipline?

[শৃঙ্খলা ও শাসনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। মুক্ত শৃঙ্খলা বলতে কি বোঝ?]

5. What is freedom movement in education? To what extent is it desirable and possible in schools?

[শিক্ষায় স্বাধীনতা-আন্দোলন বলতে কি বোঝ? বিদ্যালয়ে এই আন্দোলন কতটা বাঞ্ছনীয় এবং কতটা করা সম্ভব?]

6. "Don't govern too much is a good rule in Education as in Politics." Elucidate this statement in the light of the modern concept of discipline.

["অতিরিক্ত শাসন ভাল নয়, এটা রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, শিক্ষার ক্ষেত্রেও সত্য"—শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত আধুনিক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।]

7. What are the causes of indiscipline amongst school children? Suggest some remedies.

[বিদ্যালয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণগুলি কি? এই অবস্থা নিরাময়ের কতকগুলি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ কর।]

8. Write notes on (টীকা লিখ): (a) Discipline and order (শৃঙ্খলা ও শাসন); (b) Free discipline (মুক্ত শৃঙ্খলা); (c) Theories and modern concept of discipline (শৃঙ্খলার আধুনিক ধারণা ও তত্ত্বাবলী)।

9. What is the necessity of discipline in the life of a child? Discuss the significant points of difference between the old and modern concepts of discipline. What is meant by free discipline?

[শিশুর জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা কি? শৃঙ্খলার প্রাচীন ও আধুনিক ধারণার মধ্যে মূলগত পার্থক্য কি আলোচনা কর। মুক্ত শৃঙ্খলা বলতে কি বোঝ?]

বিদ্যালয়-শৃঙ্খলা ও স্বায়ত্তশাসন

School Discipline & Self-Government

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনের যে কৌশলগুলির কথা বলা হ'য়েছে, তার মধ্যে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার প্রচলন হ'ল গুরুত্বপূর্ণ। গতানুগতিক শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিদ্‌গণ শৃঙ্খলা-স্থাপনের এই কৌশলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ, মুক্ত শৃঙ্খলার (Free discipline) ধারণা স্বায়ত্তশাসনের নীতির পরিপূরক। স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা কখনই আরোপিত নয়; শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাজাত। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ব্রাউন (Brown) বলেছেন—"Discipline is the outcome of activities and experiences that indicate in the individual virtues of self control based on reason and not on force. It is the outcome of persuation and not of compulsion. Like religion it cannot be taught but can only be caught and practised". সুতরাং বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপন করতে হ'লে শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলামূলক অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুযোগ ক'রে দিতে হবে। আর এই কাজ সম্ভব, শিক্ষার্থীদের নিজেদের শাসন করার সুযোগ দিয়ে। অর্থাৎ, বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার (Self-Government) প্রবর্তন ক'রে বিদ্যালয়-পরিচালনার আংশিক দায়িত্ব যদি তাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে শৃঙ্খলা-স্থাপনের কাজ অনেকটা স্থায়ীভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনও (মুদালিয়র) এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। এখন দেখা যাক, এই স্বায়ত্তশাসন কি এবং কিভাবে তা বিদ্যালয়ে স্থাপন করা যায়।

প্রস্তাবনা

॥ বিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা কি ? ॥
(What is self-government in School)

সাধারণভাবে, যেখানে নাগরিকদের উপর শাসনের ভার ন্যস্ত থাকে, তাকেই বলে স্বায়ত্তশাসন। বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন বলতে আমরা বুঝি, সেই ধরনের পরিচালন-ব্যবস্থা, যেখানে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে বিদ্যালয়-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে। প্রাচীন গ্রীস দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থায় এবং প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় আমরা লক্ষ্য করি, শিক্ষক বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সাহায্য নিতেন। একে বলা হয় 'মনিটর প্রথা'। মনিটর শিক্ষকের অবর্তমানে শ্রেণীর শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করত। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ টমাস আর্নল্ড ইংলণ্ডে এই ব্যবস্থার পুনঃপ্রচলন করেন। ইউরোপীয় শিক্ষা-বিস্তারের প্রথম যুগে এণ্ড্রু বেলও দক্ষিণ ভারতে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই প্রথায় শাসনের ভার গ্রহণ করলেও এর উদ্দেশ্য ছিল খুবই

মনিটর প্রথা

সংকীর্ণ। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের দায়িত্বটুকু দেওয়া হ'ত, কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হ'ত না। ফলে, মনিটরদের পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া প্রকৃতভাবে শাসনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ ছিল না। তাছাড়া, এ ব্যবস্থার মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতির কোন অস্তিত্ব ছিল না। মনিটন নির্বাচন করতেন শিক্ষক। শিক্ষকের আস্থাভাজন শিক্ষার্থীকেই মনিটর করা হ'ত। ফলে, মনিটর-এর প্রতি অন্যান্য শিক্ষার্থীদের বিরূপ মনোভাব থাকা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

তাই বিদ্যালয়-স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বলতে মনিটর প্রথাকে বোঝায় না। গণতান্ত্রিক রীতিতে বিদ্যালয়-পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের অংশ দেওয়াই বিদ্যালয়-স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মূল নীতি। তাই গুড (C. Good) শিক্ষাবিজ্ঞানের অভিধানে বিদ্যালয়-স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"It is the maintenance of order and the regulation of matters of conduct in school by elected representatives chosen from among the student themselves" অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিচালনা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার যে ব্যবস্থা, তাকেই বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা (Self Government in School) বলা যেতে পারে।

বিদ্যালয়-স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা-স্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা স্বায়ত্ত-শাসন কথাটা ব্যবহার করলেও ঠিক স্বায়ত্তশান বলতে যা বোঝায়, তা বিদ্যালয়ে কখনই প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। কারণ, শিক্ষার্থীদের জীবন-অভিজ্ঞতা এতই কম থাকে যে, প্রকৃতভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য যে বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হয়, তা তারা প্রয়োগ করতে পারে না। তাছাড়া, সামাজিক দিক্ থেকে শিক্ষা এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (Social Control) কৌশল। এই নিয়ন্ত্রণের যে সামাজিক দায়িত্ব শিক্ষকের ওপর দেওয়া আছে, তা তিনি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের ওপর ছেড়ে দিতে পারেন না। ফলে, আক্ষরিক অর্থে, স্বায়ত্তশাসন বিদ্যালয়ে স্থাপন করা যায় না। শিক্ষাবিদ্ ম্যাকওন (Mckwon) বলেছেন—"Educationally and legally, the expression 'Student self-government' is an incorrect designation. It has been widely used because of its somewhat attractive and idealistic implication." তাই বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন বলতে আমরা মোটামুটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকে বুঝি। স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন তার বিভিন্ন দিক্ সম্পর্কে আলোচনা করব।

॥ বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ॥
(Aims of self-Government in School)

শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করা।

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশে সহায়তা করবে, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করে, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনে সহায়তা করে, এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ রকম ইতস্ততঃ দু'একটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করলে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে ঠিক বলা হয় না। শৃঙ্খলা-স্থাপন ও সামাজিক বিকাশ ছাড়াও স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা নানা দিক থেকে ব্যক্তি-জীবনের বিকাশে সহায়তা করে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ এই ব্যবস্থা-প্রবর্তনের সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে যে সব উদ্দেশ্যগুলির কথা বলেছেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল—

সূচনা

[এক] স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার একটি লক্ষ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ক'রে তোলা। শিক্ষার্থীদের পরিচালন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে তারা ঐ সব কাজের মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সক্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে তাদের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দেওয়া যায়। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ-সাধনও এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধিক বিকাশ

[দুই] আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের কিছু কিছু বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করা প্রয়োজন। আর এই কৌশলগুলি আয়ত্ত করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের নাগরিকতার প্রশিক্ষণ citizenship training) দেওয়া। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় সমাজ-জীবন গঠন ও পরিচালনার মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ লাভ ক'রে থাকে।

নাগরিকতার প্রশিক্ষণ

[তিন] ব্যক্তি-জীবনে প্রক্ষোভিক বিকাশ ঘটানো আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের লক্ষ্যও অনুরূপ। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার বিকাশসাধন করা বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্য। সহপাঠী ও অন্যান্যদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশার সুযোগের মাধ্যমে তাদের প্রক্ষোভিক বিকাশ সংঘটিত হয়।

প্রক্ষোভিক বিকাশ

[চার] বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের আর একটি উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভর ক'রে তোলা। আত্মনির্ভরতা আসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজেরা বিভিন্ন ধরনের কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এই কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে।

আত্মনির্ভরতা

[পাঁচ] স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থায় কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বিশেষ ক্ষমতাগুলি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তাদের নিজস্ব ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। তাই বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা-প্রবর্তনের একটি উদ্দেশ্য হ'ল—শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করা, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনবিকাশে সহায়তা করা।

আত্মসচেতনতা

[ছয়] বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার আর একটি উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার কাজে

শিক্ষার্থীদের প্রেষণা (motivation) সৃষ্টি করা। যে কোনরকম কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য ব্যক্তির আন্তরিক তাগিদ বা প্রেষণা একান্তভাবে প্রয়োজন। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হয়; তারা বিষয়বস্তুকে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার সুযোগ পায়; নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়ে গর্বিত বোধ করে। এই সকল অবস্থা শিক্ষা-উপযোগী প্রেষণা-সঞ্চারে সহায়তা করে।

প্রেষণা সঞ্চার

[সাত] শিক্ষার্থীরা স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের কৌশল আয়ত্ত করে। এই আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবণতা একদিকে যেমন শৃঙ্খলা-স্থাপনে সহায়তা করে, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তিজীবনে আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। অর্থাৎ, এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা অবস্থা অনুযায়ী নিজেদের চাহিদাগুলিকে পরিমার্জন করার কৌশল আয়ত্ত করে। ফলে, তার সমস্ত রকম জৈবিক ও মানসিক চাহিদা স্বনিয়ন্ত্রিত হয়। তাই স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের চাহিদার সংবোধনের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

চাহিদার সংবোধন

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের এই উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক জীবন-বিকাশে সাহায্য করার জন্যই এর প্রয়োগ। তাছাড়া, এই শাসনব্যবস্থার পরোক্ষ উদ্দেশ্য হ'ল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সুষ্ঠুভাবে কর্ম-পরিচালনায় সহায়তা করা। অর্থাৎ, এক কথায় বলা যেতে পারে, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষালয় উভয়ের অভ্যন্তরীণ উন্নতিতে সহায়তা করাই হ'ল বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপক উদ্দেশ্য।

মন্তব্য

॥ বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা ॥
(Different types of School Self-Government)

বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সহায়তা গ্রহণ ক'রে বা তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ ক'রে বিদ্যালয় পরিচালনা করা যায়। উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই স্বায়ত্তশাসন প্রথাকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই সমস্ত দিক্ বিবেচনা ক'রে পি. ডবলু. টেরি (P. W. Tery) স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থাকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন—(১) **সাময়িক কর্মসাপেক্ষ শাসনব্যবস্থা** (Informal Type), (২) **নির্দিষ্ট কর্মসাপেক্ষ ব্যবস্থা** (Specific Service Type), (৩) **সরল পরিষদীয় ব্যবস্থা** (Simple Council Type), (৪) **জটিল পরিষদীয় ব্যবস্থা** (Complex Council Type) এবং (৫) **নগরানুরূপ ব্যবস্থা** (School City Type)। এই প্রত্যেক ধরনের শাসনব্যবস্থার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধা আছে।

সাময়িক কর্মসাপেক্ষ ব্যবস্থার নাম থেকেই বোঝা যায়, এটি এক ধরনের অত্যন্ত সাময়িক বা অস্থায়ী স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা। কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীর

শিক্ষার্থীদের বা বিশেষ গুণসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কোন কোন সময় পরিচালন-ব্যবস্থাকে সাহায্য করতে বলা হয়। যেমন, কোন উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয়ে উপস্থিত অতিথিদের আপ্যায়নের ভার শিক্ষার্থীদের দেওয়া যেতে পারে। এই সকল কাজে কোন্ কোন্ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে, তা শিক্ষকরাই ঠিক ক'রে দেন। এই ধরনের কাজে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার জন্য স্থায়ী কোন শিক্ষার্থী সংস্থা থাকে না। এই ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা যায় না। কারণ, এখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নির্বাচন হয় না। এই পদ্ধতিতে কাজ নির্বাচনের স্বাধীনতা'ও শিক্ষার্থীদের থাকে না। শিক্ষক-আরোপিত দায়িত্বই তাদের পালন করতে হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নেতৃত্ব বা অন্যান্য মানসিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের সুযোগ খুবই কম। কারণ এটি একটি স্বল্পস্থায়ী ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের খুবই সামান্য কাজে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। এই সব অসুবিধা থাকার জন্য একে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা বলা যায় না। তাছাড়া, এর দ্বারা শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা যায় না। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখলেও সামগ্রিকভাবে শৃঙ্খলার মনোভাব গঠন করতে পারে না।

সাময়িক কর্মসাপেক্ষ ব্যবস্থা

নির্দিষ্ট কর্মসাপেক্ষ ব্যবস্থায় নিয়মিত কোন নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্বভার শিক্ষার্থীদের ওপর অর্পণ করা হয়। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজ বেছে নেওয়া হয়। যেমন—শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি রেকর্ড করা, শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করা, খেলার মাঠ পরিচালনা করা, পাঠাগারের বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করা ইত্যাদি। এই সব কাজ দেখাশুনা করার জন্য শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মনোনীত করতে পারেন। অথবা, শিক্ষার্থীরা নিজেরাও নির্বাচন করতে পারে। নির্বাচিত বা মনোনীত শিক্ষার্থীরা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট কাজগুলি পরিচালনা করে। এই সব কাজ বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে পরিচালন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। ফলে, এই ধরনের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থায় একদিকে শিক্ষার্থীদের কিছু কিছু মানসিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের যেমন সুযোগ আছে, তেমনি অন্যদিকে আত্মনিয়ন্ত্রণেরও সুযোগ আছে। কিন্তু তাহ'লেও এই ব্যবস্থা পরিপূর্ণ নয়। এই ব্যবস্থারও কিছু কিছু ত্রুটি আছে। যেমন—এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা কিছু কিছু কাজ স্বাধীনভাবে করার সুযোগ পেলেও, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয় না। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নির্দেশমতই তাদের কাজ করতে হয়। নির্দিষ্ট কর্মসাপেক্ষ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ইচ্ছামত কাজ নির্বাচনেরও সুযোগ খুব কম। যে কাজ তারা পছন্দ করে, সে কাজ করার সুযোগ তারা নাও পেতে পারে। এখানে শিক্ষার্থীদের চাহিদার চেয়ে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনকেই বেশী ক'রে দেখা হয়। তাছাড়া, কাজগুলি বিচ্ছিন্নধর্মী হওয়ায় তাদের প্রভাব সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক

নির্দিষ্ট কর্মসাপেক্ষ ব্যবস্থা

বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশে সামগ্রিকভাবে পড়ে না। এই সকল কারণে নির্দিষ্ট কর্ম-সাপেক্ষ ব্যবস্থাকে আদর্শ স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কাজের মধ্যে অভিনবত্ব না থাকার দরুন এই ধরনের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদেরও অনুপ্রাণিত করতে পারে না।

সরল পরিষদীয় ব্যবস্থায় বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে গিয়ে গণতান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রথমতঃ একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী পরিষদ (Central Students' Council) গঠন করা হয়। এই শিক্ষার্থী পরিষদ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করা হয়। পরে এই শিক্ষার্থী পরিষদ বিভিন্ন কাজের ভার কতগুলি উপসমিতির মধ্যে বণ্টন ক'রে দেয়। সাধারণতঃ শিক্ষালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলি পরিচালনার ভার এই শিক্ষার্থী পরিষদের ওপর থাকে। শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে না। কেন্দ্রীয় পরিষদ উপসমিতিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। ফলে, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিদ্যালয়ের কাজগুলি পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচনা করতে সহায়তা করে বলে অনেক আধুনিক শিক্ষাবিদ্ একে আদর্শ স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার কিছু ত্রুটিও আছে। যেমন —(১) সরল পরিষদীয় ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সমস্ত রকম কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় না। ফলে, অন্যান্য নানা ব্যাপারে তাদের মনে ক্ষোভ সঞ্চারিত হ'তে পারে এবং তারা বিদ্যালয়ে শৃংখলা-স্থাপনের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। (২) যদিও এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী-প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ আছে, তাহ'লেও নির্বাচনকে কেন্দ্র ক'রে নানারকম বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া, এই নির্বাচনকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনোমালিন্যও দেখা দিতে পারে। (৩) শিক্ষার্থীদের ওপর সম্পূর্ণভাবে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার ভার দিলে ঐ সব কাজের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ শিক্ষার্থীরা কাজের শিক্ষামূলক গুরুত্বের দিকে নজর না দিয়ে আনন্দলাভের দিকেই বেশী ঝোঁক দেয়। (৪) এই ধরনের পরিষদীয় ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় অনেক সময় শিক্ষার্থীদের নানারকম ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত হ'য়ে পড়ে। ফলে, তার খারাপ প্রভাবও দেখা দেয়। এই সব কারণে সরল পরিষদীয় ব্যবস্থার অনেক সুবিধা থাকলেও এর মাধ্যমে নেতৃত্ব ও আত্মশৃংখলাবোধ জাগিয়ে তোলা গেলেও খুব সতর্কতার সঙ্গে এই ব্যবস্থা পরিচালনা করা উচিত।

সরল পরিষদীয় ব্যবস্থা

অনেক শিক্ষাবিদ্ গণতান্ত্রিক নীতিকে বিদ্যালয়-পরিচালনার ব্যাপারে আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে উৎসাহী। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-পরিচালনার কাঠামো অনুসরণ ক'রে বিদ্যালয়ে পরিষদ গঠন করা হয়। এই ব্যবস্থায় দুটি শিক্ষার্থী পরিষদ গঠন করা হয় ঠিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অনুকরণে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় **'জটিল পরিষদীয়'** ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য আইনকানুন গঠন করা

থেকে শুরু ক'রে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের দায়িত্বভার দুটি শিক্ষার্থী পরিষদ গ্রহণ করে। একটি পরিষদ বিশেষভাবে আইন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং অন্যটি দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করে। এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করলে, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়-জীবনের মধ্যেই রাষ্ট্র-পরিচালনার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। শৃঙ্খলা-স্থাপনের সমস্যা তারা নিজেরাই সমাধান করে। শিক্ষার্থীরা এই ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায় এবং অনেক বেশী সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। তবে এই ব্যবস্থারও কিছু কিছু অসুবিধা আছে। যেমন—(১) সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার মত যোগ্যতা সব সময় শিক্ষার্থীদের থাকে না। ফলে, গণতান্ত্রিক হ'লেও জটিল পরিষদীয় ব্যবস্থাকে অনেক অযোগ্য ব্যক্তির গণতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। এর প্রভাব অনেক সময় খুবই খারাপ হয়। (২) শিক্ষার্থীদের সব কিছু পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিলে ব্যক্তিত্বের সংঘাত অসম্ভব নয়। এই সংঘাত শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে হ'তে পারে বা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে হ'তে পারে। ফলে, পঠন-পাঠনের পরিবেশ নষ্ট হতে পারে এবং শৃঙ্খলাও বিঘ্নিত হ'তে পারে। (৩) এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ওপর বিচার ও শাস্তিদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির যেমন ভাল দিক্ আছে, তেমনি খারাপ দিক্‌ও আছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে রেষারেষি থাকার দরুন, অনেক সময় ন্যায়সম্মত বিচার তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। বিদ্যালয়-পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন পূর্বোক্ত কারণে খুবই সর্তকতার সঙ্গে করা উচিত। সমস্ত ব্যবস্থাটিকে শিক্ষকের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামতের যেমন যোগ্য মর্যাদা দেবেন, তেমনি অন্যদিকে সুকৌশলে তিনি কাজের প্রত্যেক পর্যায়ে তাদের মতামতকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য তাদের বাধা দেওয়া নয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল তাদের আদর্শ পথে পরিচালিত করা।

জটিল পরিষদীয় ব্যবস্থারই একটি বিশেষ রূপ হ'ল নগরানুরূপ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বিদ্যালয়-পরিচালনার ক্ষেত্রে নগর-পরিচালনার রীতি অনুসরণ করা হয়। সম্পূর্ণ বিদ্যালয়কে একটি নগর হিসেবে কল্পনা করা হয় এবং শিক্ষার্থীরা এই নগর-পরিচালনার বিভিন্ন দিকে অংশ গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের কতকগুলি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য নির্বাচন করা হয়। এই সদস্যরা পৌরসভার কাউন্সিলারদের মত। এই নির্বাচিত সদস্যরা একজন সভাপতি বা চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে। আবার, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য কতকগুলি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হয়। যেমন—অর্থ কমিটি, খেলাধূলা কমিটি, স্বাস্থ্য কমিটি ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি কমিটির একজন ক'রে সভাপতি থাকে। এই ধরনের পরিচালন-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনের প্রশাসন-পদ্ধতির সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে পরিচিত হয়। তবে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় বিদ্যালয়ে প্রথম পর্যায়েই খুব বেশী কাজ গ্রহণ করা উচিত নয়। ধীরে ধীরে এই পরিচালনার ক্ষেত্র বাড়ানো উচিত।

জটিল পরিষদীয় ব্যবস্থা

নগরানুরূপ ব্যবস্থা

যে সকল স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হ'ল, তাদের মধ্যে পরিষদীয় ব্যবস্থাগুলিই আমরা সবচেয়ে ভাল মনে করি। তবে জটিল পরিষদীয় ব্যবস্থায় বিদ্যালয় পরিচালনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের যে স্বাধীনতা দেওয়া দরকার, সে ধরনের স্বাধীনতা সব সময় দেওয়া সম্ভব নয়। তাই পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করার বিশেষ অসুবিধা আছে। আমাদের চেষ্টা করা উচিত, প্রয়োজন আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ শিক্ষকের হাতে রেখে যতদূর সম্ভব বেশী শিক্ষার্থীদের পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয় ক'রে তোলা যায়, তার ব্যবস্থা করা। আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ মনে করেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই হিসেবে সরল পরিষদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ভাল। এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে গেলে প্রাথমিক কাজ হিসেবে শিক্ষার্থী-পরিষদ গঠন করতে হয়।

মন্তব্য

॥ শিক্ষার্থী-পরিষদ ॥
(Students' Council)

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হ'লে প্রথমতঃ আমাদের শিক্ষার্থী-পরিষদ গঠন করতে হবে। এই শিক্ষার্থী-পরিষদ গঠনের ব্যাপারে কতকগুলি নীতি অনুসরণ করা উচিত। যে পরিষদ বিদ্যালয়ে পরিচালনার ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সেই পরিষদ যদি ঠিকভাবে গঠন করা না যায়, তা'হলে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাই এ বিষয়ে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করা উচিত।

পরিষদ-গঠনের নীতি

[এক] বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে প্রথমতঃ শিক্ষার্থীদের পরিষদের অভাব সম্পর্কে সচেতন ক'রে তুলতে হবে। তাদের ওপর জোর ক'রে একটি পরিষদের বোঝা চাপিয়ে দিলে চলবে না। অর্থাৎ, এ ব্যাপারে প্রস্তাব শিক্ষকের কাছ থেকে আসবে না, আসবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের আন্তরিক তাগিদে যাতে পরিষদ-গঠনের প্রস্তাব করে, তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে হবে।

[দুই] ব্যক্তির গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ হয় ধীরে ধীরে। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনার বিকাশ হয়। ফলে, বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গিয়ে হঠাৎ কিছু ক'রে ফেললে চলবে না। শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক চেতনা উন্মেষের সঙ্গে সমতা রেখেই কাজ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি আস্থাবান হবে, তখনই শিক্ষার্থী-পরিষদ গঠন করা উচিত, তার পূর্বে নয়।

[তিন] বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-পরিষদ গঠন ও স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের সচেতন থাকা উচিত। কোন কাজের উদ্দেশ্য না জেনে কাজ করা উচিত নয়। উদ্দেশ্য স্থির করে নিয়ে তারপর পরিষদ গঠন করা উচিত।

[চার] বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-পরিষদে যাতে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন অনুভব করে, তার স্বার্থরক্ষার জন্য তার নির্বাচিত প্রতিনিধি শিক্ষার্থী-সংস্থায় আছে।

[পাঁচ] শিক্ষার্থী-পরিষদে সদস্য-সংখ্যা খুব বেশী হ'লে কাজের অসুবিধা হয়। তাই পরিষদ খুব বড় হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ, সকলের প্রতিনিধিত্ব রেখে পরিষদের সদস্যসংখ্যা ন্যূনপক্ষে যা না হ'লে নয় তাই রাখতে হবে।

[ছয়] শিক্ষার্থী-পরিষদ নাম হ'লেও এই পরিষদে শিক্ষকদেরও প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার সমবেতভাবে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করবে, এটাই আমাদের কাম্য। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের নির্দেশে বিদ্যালয় চলতে পারে না। তাই শিক্ষকদের প্রতিনিধিও পরিষদে থাকা উচিত।

[সাত] প্রত্যেক শিক্ষার্থী-পরিষদের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র থাকা উচিত। শিক্ষার্থী-পরিষদ যদি যথেচ্ছ কাজ করে, তাহ'লে বিদ্যালয় প্রশাসন ভেঙ্গে পড়বে। তাই পরিষদ-গঠনের পর আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যকে তাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সম্পর্কে সচেতন ক'রে দেওয়া উচিত।

[আট] প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থী-পরিষদ বা যে কোন উপসমিতির পদাধিকার-বলে সদস্য থাকবেন। যে কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁর মতামতকে চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। তবে এই ক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগ করা উচিত নয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত বারবার প্রয়োগ করলে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই ভেঙ্গে পড়বে।

[নয়] শিক্ষার্থী-পরিষদ গঠন করার পর মাঝে মাঝে তার কাজের মূল্যায়ন করা উচিত। মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি ক'রে শিক্ষার্থী-পরিষদ নিজেদের কাজের পর্যালোচনা করবে এবং সেই অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

উপরি-উক্ত নীতিগুলি অনুসরণ ক'রে শিক্ষার্থী-পরিষদ গঠন ও পরিচালনা করলে, তবেই বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সফল হবে। এই নীতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের তাগিদ। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ে না চাইলে, শুধুমাত্র প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী অন্যকে প্রদর্শনের জন্য শিক্ষার্থী-পরিষদ গঠন করা উচিত নয়। আর তার দ্বারা কোন সমস্যারই সমাধান হয় না। শিক্ষাবিদ্ ম্যাকওন বলেছেন—

মন্তব্য

"Great care must be exercised in initiating a new students' council and no such attempt should be made to do this until both the teachers and students have been educated not only to appreciate its educational opportunities but also actually to desire its establishment." অর্থাৎ বিদ্যালয়ে পরিষদগঠন বা স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুফল নির্ভর করছে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের উপযুক্ত মনোভাবের ওপর।

॥ শিক্ষার্থী-পরিষদের কাজ ॥

Functions of Students' Council

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-পরিষদ গঠন করার প্রয়োজন একমাত্র শৃঙ্খলা স্থাপন নয়। শিক্ষার্থী-পরিষদের মাধ্যমে বিদ্যালয়-পরিচালনা সংক্রান্ত নানা ধরনের দায়িত্ব সম্পাদন

করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থী-পরিষদ, বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষালয় কর্তৃপক্ষকে, শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক জীবন-বিকাশের প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে পারে। যেমন —

(১) শিক্ষার্থী-পরিষদ, শিক্ষার্থীদের সাধারণ স্বাস্থ্য (General health) রক্ষার ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। পরিষদের একটি দপ্তর এজন্য পৃথকভাবে রাখা যেতে পারে। এই দপ্তর শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যাভ্যাসের দিকে নজর রাখতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশের উন্নতি সম্পর্কে প্রশাসনকে উপদেশ দিতে পারে।

(২) শিক্ষার্থী-পরিষদ শিক্ষার্থীদের খেলাধূলা ও চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। পরিষদের অধীনে ক্রীড়াদপ্তর এই কাজ পরিচালনা করতে পারে।

(৩) পরিষদ শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ-সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া, শিক্ষালয়ে যে সমস্ত বাৎসরিক অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে, সেগুলির দায়িত্ব শিক্ষার্থী-পরিষদ গ্রহণ করতে পারে। এই জাতীয় কাজ পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থী-পরিষদের অধীনে একটি পৃথক দপ্তর থাকা উচিত।

(৪) পরিষদ বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজ গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার্থী-পরিষদের নেতৃত্বে শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীরা সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশ হয় ; সমাজের প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়ে।

(৫) শিক্ষার্থী-পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয়-প্রশাসনের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। যেমন, শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিক্ষালয়ে উপস্থিত থাকছে কিনা, শ্রেণীতে পঠন-পাঠন হ'চ্ছে কিনা, সুযোগ-সুবিধার কিছু অভাব আছে কিনা,—এই সব দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থী-পরিষদ প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

(৬) শিক্ষার্থী-পরিষদ বিদ্যালয়ের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে ; সমাজের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা বক্তৃতা ও আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করতে পারে। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের অসুবিধাগুলির কথা বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে।

(৭) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক আচরণ করে। তাদের সংশোধনের জন্য অনেক সময় শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। শিক্ষকের প্রদত্ত শাস্তি শিক্ষার্থীদের মনের ওপর কু-প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এ ব্যাপারে শিক্ষার্থী-পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের বিচার ও শাস্তিদানের দায়িত্ব পরিষদ গ্রহণ করতে পারে।

উপরোক্ত কয়েকটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা ছাড়াও শিক্ষার্থী-পরিষদ বিদ্যালয়ের সকলরকম কাজের ভার গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা স্মরণ রখার দরকার, যেকোন দায়িত্ব শিক্ষার্থী-পরিষদকে দেওয়া হোক-না-কেন, তা সব সময় পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা উচিত। অর্থাৎ, শিক্ষকরা যদি পরিষদ-পরিচালনার ব্যাপারে সব সময় নির্দেশনা দেন, তবেই তার দ্বারা সম্পাদিত যে কোন কাজ শিক্ষামুখী হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপন, আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যার স্থায়ী ও সার্থক সমাধান করতে হলে বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিদ্যালয়-পরিচালনা ও শৃঙ্খলা-স্থাপনের যে ব্যবস্থা, তাকেই বলা হয় বিদ্যালয়-স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা (school self government)।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনই শুধু স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, চারিত্রিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়তা করা যায়। তাছাড়া, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা যায়।

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা নানাভাবে প্রবর্তন করা যায়। টেরি (Terry) এই স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থাকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—সাময়িক কর্মসাপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থা ; (২) নির্দিষ্ট কর্মসাপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থা ; (৩) সরল পরিষদীয় ব্যবস্থা ; (৪) জটিল পরিষদীয় ব্যবস্থা এবং (৫) নগরানুরূপ ব্যবস্থা। এই প্রত্যেকটি ব্যবস্থার কিছু কিছু অসুবিধা আছে। তবে এদের মধ্যে পরিষদীয় ব্যবস্থাগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল। এই ধরনের পরিষদীয় ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থী-সংসদের (Students' Council) প্রয়োজন। এই শিক্ষার্থী-সংসদ উপযুক্ত নির্দেশনা পেলে, যে কোন রকম শিক্ষামূলক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the importance of school-self-government as an aid to the development of the child.

[শিশুর জীবন-বিকাশে বিদ্যালয়-স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

2. What is meant by self-government in school ? What are the main objectives of school self-governments ?

[বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় ? বিদ্যালয়-স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যগুলি কি ?]

3. Consider the different forms of self-government that can be introduced in our school and show their advantages and disadvantages.

[আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে চালু করা যায়, এ রকম বিভিন্ন ধরনের স্বায়ত্তশাসন-প্রথা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং তাদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলির কথা উল্লেখ কর।।]

4. What is Students' Council ? What principles should govern the formation of a Students' Council ?

[শিক্ষার্থী-পরিষদ বলতে কি বোঝ ? শিক্ষার্থী-পরিষদ গঠনের নীতিগুলি উল্লেখ কর।]

5. Give your opinion for or against the existence of Students' Unions in Colleges. What should be functions of Students' Unions ?

[কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন থাকার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে তোমার অভিমত দাও, ইউনিয়নের কি কি কাজ করা উচিত ?]

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী

Co-curricular Activities

প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুর মানসিক বিকাশ বা জ্ঞান-আহরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'ত। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের মনে কিছু জ্ঞানসামগ্রী চাপিয়ে দেওয়া। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তির চিন্তাশক্তি, যুক্তিশক্তি ইত্যাদির বিকাশ-সাধন করা কয়েকটা নিয়ম-মাফিক পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমে। বিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যাপারেও এই ধারণা পোষণ করা হ'ত। 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'—এই ছিল মূল মন্ত্র। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হ'লে ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে সাধনা করতে হবে—'রুদ্ধ করি ইন্দ্রিয়ের দ্বার'। দৈহিক ক্রিয়া-কলাপকে সে যুগে শিক্ষার বিপরীতধর্মী বলে মনে করা হ'ত। খেলাধূলা, অভিনয় ইত্যাদি নানারকম চিত্তবিনোদনমূলক কাজকে (Recreational activities) মনে করা হ'ত শিক্ষার পথে অন্তরায়। তাই প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাদের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মানসিক গুণের চর্চা ছাড়া বিদ্যালয়ে আর কোন কিছুকেই স্থান দেওয়া হ'ত না।

শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রাচীন ধারণ

কিন্তু আধুনিক কালে শিক্ষার ভাবধারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি, শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রচেষ্টাকে। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ শুধুমাত্র মনের বিকাশের দ্বারা আসতে পারে না। দেহ-মনে সে সম্পূর্ণ জীব। দেহের বিকাশকে বাদ দিয়ে বা দূরে সরিয়ে রেখে মনের বিকাশ করলে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হবে না। তাই আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে হেনরি ম্যাক্‌কন্ (Henrey Mckown) বলেছেন—"...passing on the noble heritage as the main end of education gives way to developing a noble individual". এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বিভিন্ন দিক হ'ল—(১) মানসিক বিকাশ (Mental development), (২) দৈহিক বিকাশ (Physical development), (৩) আধ্যাত্মিক বিকাশ (Spiritual development), (৪) কর্মজীবনের বিকাশ (Vocational development), (৫) অবসরকালীন ক্রিয়াকলাপের বিকাশ (Development of leisure-time activities) এবং সর্বোপরি (৬) সামাজিক বিকাশ (Social development)। এই সমস্ত দিকের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে বিদ্যালয়ে সার্থক জীবন-যাপনের মাধ্যমে। আধুনিক শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান কালে শিক্ষাবিদ্‌রা খেলাধূলা, অভিনয়, বিতর্কসভা, বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিকেন্দ্রিক কাজকে বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। এইভাবে শিক্ষাবিদ্‌দের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ধরনের কাজকে বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অন্তর্গত করা হ'ল। তবে শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ্‌রা

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা

এদের প্রথমে সহজভাবে নিতে পারেননি। তাই পাঠ্যক্রমের বাইরে এদের অতিরিক্ত কার্যাবলী ব'লে বিবেচনা করা হ'ত এবং তাদের বলা হ'ত **বহিঃ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী** (Extra-Curricular activities)। ক্রমে দেখা গেল, নীতিগতভাবে এই ধরনের পাঠ্যবিষয়-বহির্ভূত কাজগুলোর প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাক্ষেত্রে মেনে নিলেও তাদের অনুশীলন ঠিকমত হ'ত না। ক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রে, এদের ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পাঠ্যক্রমের ধারণাও বদলালো। বর্তমানে পাঠ্যক্রম বলতে শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয়ভুক্ত ধারণার সমন্বয়কে বোঝায় না। বিদ্যালয়-জীবনের সমস্ত কিছু কাজ, সমস্ত কিছু অভিজ্ঞতাকেই পাঠ্যক্রমে ব্যাপক অর্থে অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। ক্রমে এদের গুরুত্বের কথা বিবেচনা ক'রে নামেরও পরিবর্তন হ'ল। অনেক শিক্ষাবিদ্ বললেন, এদের **সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী** (Co-curricular activities) বলাই ভাল। এর দ্বারা তারা একথাই বলতে চাইলেন, মানসিক প্রক্রিয়ার চর্চার সঙ্গে এই ধরনের বিষয়গুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই পাঠ্যক্রমে এদের সমান মর্যাদা দিতে হবে। কিন্তু তারও পরিবর্তন হ'ল— প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্‌দের এই নামও পছন্দ হ'ল না। তাঁরা মনে করেন, সহপাঠ্যক্রমিক বললেও এদের পাঠ্যক্রম থেকে পৃথক ক'রে দেখা হয় এবং তাদের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা হয়। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তই যদি এই সব বিষয় হয়, তবে সহপাঠ্যক্রমিক বলা উচিত হবে না। বরং পাঠ্যক্রমের নির্ধারিত কার্যাবলীকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; কিছু শ্রেণীকক্ষের অন্তর্গত বিষয়, আর কিছু শ্রেণীকক্ষের বাইরে চর্চার বিষয়। সুতরাং তাঁরা এদের **বহিঃশ্রেণীগত কাজ** (off the class activities) বলার পক্ষপাতী।

॥ সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্য ॥
(Objectives of Co-curricular activities)

কাজগুলির সাধারণ নামকরণ যে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে দ্বন্দ্ব, তা খুবই বাহ্যিক। প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ এই সব কাজের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। সুতরাং এর থেকেই এদের গুরুত্বের কথা প্রমাণিত হয়। এই ধরনের কাজ শিশুর যে শুধু দৈহিক বিকাশের সহায়তা করে তা নয়, তার মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশেও সহায়তা করে। সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন ধরনের উপকারিতার কথা বলেছেন। তাঁদের এই আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলির সার্থক রূপায়ণে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীর চাহিদা-ভিত্তিক বিকাশের সুযোগ

[এক] শিশুর মধ্যে জন্মগত কতকগুলো প্রবণতা থাকে। শিক্ষকের কাজ হ'ল তার সেই প্রবণতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে তার মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা আছে, তার পরিপূর্ণ বিকাশ করা। রাধাকৃষ্ণন বলেছেন— "The function of the teacher is to draw out the inner splendour of the student and to prove his practical utility to the world." সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলো শিক্ষককে এই

দিক্ থেকে সহায়তা করে। তাঁর শিক্ষণ-পদ্ধতিকে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহানুযায়ী গড়ে তুলতে তাঁকে সহায়তা করে। তিনি শিশুর প্রবণতাগুলোকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে শিক্ষণ পরিচালনা করতে পারেন।

[দুই] সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিশুর গণতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের উপযোগী মনোভাব গড়ে তোলা যায়। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল এক দিকে যেমন ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন, অন্য দিকে তেমনি সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে ব্যক্তিকে প্রস্তুত ক'রে দেওয়া। বিদ্যালয়ের জীবনে যদি শিক্ষার্থীরা সমাজ-জীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে পরিচিত না হয়, তবে ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের সম্যক্ অভিযোজন করতে অসুবিধা হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূল কথা হল মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ন না করে পারস্পরিক সহবাস। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের যৌথ কার্যাবলীর (Group-activities) মাধ্যমে শিশুর মধ্যে এই ধরনের মনোভাব গড়ে ওঠে। খেলাধূলা, যৌথ প্রজেক্ট (Group Project), অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা জাগিয়ে তোলা যায়। তাছাড়া, এন. সি. সি., স্কাউট, সমাজসেবা ইত্যাদির মাধ্যমেও সহযোগিতা ও সমবেদনা-মূলক মনোভাব গড়ে তোলা যায়।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য-গঠন

[তিন] সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা যায়। আর এই আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে আসে আত্মনির্ভরশীলতা। শিশু গৃহপরিবেশে পিতামাতার ওপর নির্ভরশীল থাকে। তার বিভিন্ন কাজের জন্য বিদ্যালয়ে এসেও যদি সে শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল জীবনযাপন করে, তাহ'লে ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনে সে সার্থক নাগরিক হিসেবে বাঁচতে পারবে না। তাই বিদ্যালয়ের মধ্যেই তাকে এমন কিছু কাজ দিতে হবে যে, সব কিছুর সমাধানের মধ্য দিয়ে তার আত্মবিশ্বাস আসে। সহপাঠ্যক্রমিক কাজ তাকে সেই সুযোগ দেয়। প্রত্যেক ছাত্র সব রকম কাজ যে করতে পারবে, এমন কোন কথা নেই ; কিন্তু যেটাকে কেন্দ্র ক'রেই তার জীবন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তার জীবনের গতি নির্ণয় করতে হবে।

আত্মবিশ্বাস জাগরণ

[চার] বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিমূলক মনোভাবের বিকাশ হয়। এই সহযোগিতা সমাজ-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ছাত্র-সংস্থার সভ্য হিসেবে, খেলার মাঠে, অভিনয়ে সে অন্যান্যদের সঙ্গে সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করবে। এমনিভাবে ধীরে ধীরে অন্যের সঙ্গে বাস করতে হ'লে যে ধরনের সহযোগিতামূলক মনোভাব দরকার, তার মধ্যে তা বিকাশলাভ করে।

সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি

[পাঁচ] সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে বিদ্যালয়-জীবনকে ছাত্রদের কাছে সরস এবং সজীব ক'রে তোলা যায়। গতানুগতিক শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষার যে রীতি, তাতে ক'রে শিশুরা বিদ্যালয়কে একটা জেলখানাই মনে করে,

ছুটির ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষাতেই তারা সারাদিন কাটায়। কিন্তু সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বিদ্যালয়ে ঠিকমত চালনা করলে বিদ্যালয়-জীবনে অনেক বৈচিত্র্য আসে এবং তার প্রতি শিক্ষার্থীরা আকৃষ্ট হয়। এই সব কাজের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রতি আনুগত্যও বাড়ে এবং বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধও (school spirit) জাগে।

বিদ্যালয় জীবনের প্রতি আকর্ষণ

[ছয়] সহপাঠ্যক্রমিক কাজের সুপরিচালনা করতে পারলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষার সমস্যারও সমাধান হয়। পূর্বে ধারণা করা হ'ত, এই ধরনের কাজ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাকে ব্যাহত করে, ছাত্রদের অমনোযোগী করে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌রা বিশ্বাস করেন, শৃঙ্খলা হ'ল ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ন্ত্রণের প্রবৃত্তি। খেলার মাঠের নিয়ম-কানুন মেনে, সভার নিয়ম-কানুন অনুশীলন ক'রে বা অন্য যে-কোন ধরনের স্বাধীন কাজের মধ্যে নিয়ম-কানুন মেনে কাজ সম্পাদন ক'রে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্বাধীন প্রচেষ্টা দিয়ে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শৃঙ্খলার যে শিক্ষা, তাই চিরস্থায়ী হবে। ফলে, সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাস্থাপন করা যায়।

শৃঙ্খলা-স্থাপন

[সাত] শিক্ষক যদি সচেতন হন, তাহ'লে শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন্ বিষয়ে দক্ষতা আছে বা ঝোঁক আছে, তা তিনি নির্ণয় করতে পারেন এই সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে। শিশুরা যখন এইসব কাজ করে, তখন তাদের কি ধরনের বৃত্তিমূলক আগ্রহ আছে, কি ধরনের বিশেষ ক্ষমতা আছে, তা যদি শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করেন, তাহ'লে তিনি সহজেই শিক্ষার্থী সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এই সব তথ্য তাঁর নিজের পাঠ-পরিকল্পনা রচনায় যেমন সাহায্য করবে, অন্যদিকে শিক্ষামূলক নির্দেশনা (Educational and Vocational Guidance) দানের ক্ষেত্রেও সহায়তা করবে।

শিক্ষামূলক নির্দেশনা দানের সুবিধা

[আট] সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিশুর দৈহিক বিকাশ ও মানসিক বিকাশ হয়। খেলাধূলা ইত্যাদির মাধ্যমে দৈহিক বিকাশ হয়। আবার বক্তৃতা, বিতর্কসভা ইত্যাদির মাধ্যমে মানসিক বিকাশও হয়। এছাড়া, এই কর্মসম্পাদনের সময় অবাধ মেলামেশার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ভাবের আদান-প্রদান হয়, তার মাধ্যমে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটে এবং স্থায়ী মনোভাব (attitude) গড়ে ওঠে।

দৈহিক ও মানসিক বিকাশ

[নয়] সহপাঠ্যক্রমিক কাজের যে শিক্ষা শিশুরা বিদ্যালয়ে পায়, তা তার ভবিষ্যৎ জীবনে সুস্থভাবে অবসর-যাপনে সহায়তা করে। অবসর-যাপনের শিক্ষা আধুনিক যান্ত্রিক যুগের এক বড় সমস্যা, সেই সমস্যার অনেকটা সমাধান হ'য়ে যায় বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের ব্যবস্থা করলে।

অবসর-যাপনের শিক্ষা

[দশ] সবশেষে বিশেষ কয়েক ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সেবামূলক মনোভাবের বিকাশ হয়—যেমন, স্কাউট্, সেণ্ট্ জন অ্যাম্বুলেন্স কোর ইত্যাদি চরিত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকের বিকাশ খুব সহজেই করতে পারে।

সেবামূলক মনোভাব

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যলাভে সহায়তা করে। শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির এতগুলো গুণ সার্থকভাবে বিকাশ করা সম্ভব নয়। নিয়মমাফিক বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে যদি এই ধরনের বহিঃশ্রেণীগত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, তাহ'লে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক সকল গুণেরই বিকাশ করা সম্ভব হবে। ব্যক্তি জীবনের সুষম বিকাশসাধনের প্রচেষ্টায় এদের গুরুত্বকে আর অবহেলা করা যায় না।

মন্তব্য

॥ বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ ॥
(Different types of Co-curricular activities)

বিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। এই ধরনের সার্থক পরিকল্পনার মধ্যে সহপাঠ্যক্রমিক কাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সাধারণতঃ যে সব বহিঃশ্রেণীগত কাজ আমাদের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানকে সহায়তা করতে পারে, তাদের আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি উদ্দেশ্য অনুযায়ী। তবে এই শ্রেণীবিভাগ যে একেবারে স্থির এবং নির্দিষ্ট, তা বলা যায় না। কারণ, বিভিন্ন ধরনের কাজ বিভিন্ন ভাবে ব্যক্তি-জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই শুধুমাত্র আলোচনার জন্য এই শ্রেণীবিভাগ।

[এক] বিভিন্ন ধরনের শরীরচর্চামূলক কাজকে গ্রহণ করা যায় সহপাঠ্যক্রমিক কাজ হিসেবে। এই ধরনের কাজ নিয়ম-মাফিক বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা হ'তে পারে, যেমন—ফুটবল, ভলিবল, ব্যাড্‌মিণ্টন, টেবিল টেনিশ ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে শুদ্ধ শরীরচর্চামূলক হ'তে পারে, যেমন—দৌড়, ঝাঁপ, বক্সিং ইত্যাদি। এই সব কাজের মাধ্যমে শুধুমাত্র দৈহিক বিকাশ হয় তা নয়, অনেক সামাজিক গুণের বিকাশেও এরা সহায়তা করে। দল গতভাবে খেলার মাধ্যমে শিশুরা নানা ধরনের সামাজিক গুণ, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সামাজিকতা ইত্যাদি অর্জন করে। অপর দিকে দেহচর্চার মাধ্যমে দেহের পুষ্টিসাধন হয় এবং তা আত্মরক্ষা এবং দলগত স্বার্থরক্ষায় সাহায্য করে। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য দৈহিক বিকাশসাধন ব'লে এদের এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

শরীরচর্চামূলক কাজ

[দুই] শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের নির্দেশনার দ্বারা শিক্ষালাভ করা ছাড়াও শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে পেতে পারে। সাহিত্য-সভা, বিতর্ক-সভা, আলোচনা-চক্র, প্রদর্শনী, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। এই সব কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা খুব সাধারণ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনেক নতুন জিনিস শিখতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তিরও বিকাশ হয়।

শিক্ষামূলক কাজ

[তিন] আবার, বিভিন্ন ধরনের কৃষ্টিমূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক

সত্তার বিকাশসাধন করা সহজ হয়। অভিনয়, আবৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের যৌথ-প্রচেষ্টা, স্বাস্থ্য-সপ্তাহ পালন, গ্রামোন্নয়নে অংশগ্রহণ, বিদ্যালয়ে শৃংখলা-স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সমিতিগঠন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক গুণের বিকাশ হয় এবং তার সাংস্কৃতিক জীবনের উৎকর্ষসাধন হয়।

কৃষ্টিমূলক কাজ

এছাড়া, আরও নানারকম কাজ বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা যায়, এদের মধ্যে এন. সি. সি., স্কাউট, গার্লস্ গাইড ইত্যাদি আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয়। এই কাজের মাধ্যমে শিশুর সকল রকম গুণেরই বিকাশ হয়। সহপাঠ্যক্রমিক কাজের যে তালিকা দেওয়া হ'ল, তাই যে সঠিক তার কোন স্থিরতা নেই। এই ধরনের কাজের প্রকৃতি এবং উপকারিতা শিক্ষকের তৎপরতা এবং কৌশলের ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষক তাঁর নিজের সুবিধা এবং সুযোগ অনুযায়ী বিশেষ কাজ বেছে নেবেন এবং সেগুলির সার্থক রূপায়ণের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করবেন। শিক্ষক, বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থী সকলের আন্তরিক চেষ্টা ছাড়া এই ধরনের পরিকল্পনা থেকে ভাল ফল পাওয়া যায় না। সকলে যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের নিয়োগ করবে, তখনই এদের সার্থকতা উপলব্ধি করা যাবে।

আলোচনা

॥ সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর পরিচালনার মূল নীতি ॥

(Basic Principles in the Organisation of Co-curricular Activities)

বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ পরিচালনা করবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম পালন করতে হয়। এখানে আমরা তাদের পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করব না। শুধুমাত্র এই ধরনের কাজ পরিচালনা করবার জন্য সাধারণ যে মূল নীতিগুলো মেনে চলা উচিত, তার উল্লেখ করব।· সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে ভাল ফল পেতে হ'লে এই নীতিগুলো মেনে চলা উচিত—

[এক] শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনে বাস করে, সুতরাং সমাজ-জীবনে নিজের কাজ বা বৃত্তি-নির্বাচনে ব্যক্তির যেমন স্বাধীনতা আছে, বিদ্যালয়েও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী নির্ধারণ করবার জন্য ছাত্রদের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কোন কাজ যদি জোর ক'রে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততার উপাদান নষ্ট হ'য়ে যাবে। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে রেখে গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে তুলতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী নির্বাচন করার দরকার।

নির্বাচনের স্বাধীনতা

[দুই] সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলোকে বিদ্যালয়ের কাজ চলাকালীন পরিচালনা করতে হবে। তা' না হ'লে সকলে এতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। বিদ্যালয়ের সময়-তালিকার মধ্যে এই ধরনের কাজ করার জন্য সময় রাখার দরকার।

সময়সূচীর অন্তর্ভুক্তি

[তিন] এ কথাও শিক্ষকদের মনে রাখা দরকার, এই ধরনের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য নিয়মিত শ্রেণীর কাজ বাদ দেওয়া চলবে না, বা ছাত্রদের ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। যদি নির্দিষ্ট সময় ছাড়া ছাত্রদের শ্রেণীর বাইরের কাজে নিযুক্ত করা হয়, তাহ'লে ধীরে ধীরে ঐ সব কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ এমন বেড়ে যাবে যে, নিয়মিত শ্রেণী পরিচালনা করা মুশকিল হ'য়ে পড়বে।

বাইরের কাজে ব্যক্তির অংশগ্রহণে বাধা

[চার] অনেক সময় যে সব ছাত্র বিদ্যালয়ে পড়ে না বা যারা পাশ ক'রে চলে গেছে, তারাও এই ধরনের কাজে অংশ গ্রহণ করে। এই ধরনের ব্যবস্থা বন্ধ করা দরকার। এতে ক'রে এই সব কাজের উদ্দেশ্য নানা কারণে ব্যাহত হয়। তাছাড়া, বর্তমান ছাত্ররা ঠিকমত সুযোগ পায় না।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ

[পাঁচ] সহপাঠ্যক্রমিক কাজ পরিচালনা করার জন্য যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে। শিক্ষকদের যোগ্যতা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের কাজের ভার ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের ওপর দিতে হবে।

শিক্ষক-নির্বাচন

[ছয়] এই সব কাজের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু ছাত্রের মধ্যে যে নেতৃত্বের বিকাশ লাভ করে, তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। বিভিন্ন কাজের জন্য নেতা-নির্বাচন, বিশেষভাবে যাদের পারদর্শিতা আছে, তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে।

নেতৃত্বের মর্যাদা

[সাত] যে শিক্ষকের ওপর সহপাঠ্যক্রমিক কাজ পরিচালনা করার ভার থাকবে, তিনি যেন নিজের মতামত ছাত্রদের ওপর জোর ক'রে না চাপান। কর্ম-নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি ছাত্রদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবেন এবং কর্ম-পরিচালনার ব্যাপারে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন।

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দায়িত্ব

[আট] প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে বাধ্যতামূলকভাবে সহপাঠ্যক্রমিক কাজে যোগ দিতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারণ বর্তমানে এগুলোকে পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে ধরা হয়। এই অংশের শিক্ষা যদি তার না হয়, শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'য়েছে, এ কথা বলা যায় না। অবশ্য প্রত্যেকে এই রকম কাজে যোগ দেবে, বা একই রকম পারদর্শিতা দেখাবে, তা কখনও আশা করা যায় না। তবে এই সব কাজে যোগদানের মাধ্যমে নিজেদের বিকাশ করার অনেক সুযোগ তারা পাবে। এই সুযোগ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না।

বাধ্যতামূলক করা

[নয়] এই ধরনের কাজ বিদ্যালয়ে প্রচলন করার সময় অনেকগুলো কাজ এক সঙ্গে হাতে নিলে অসুবিধা হবে। তাতে শিক্ষকদের ওপর অনেক চাপ এসে পড়বে। কিন্তু প্রথম স্তরে যদি নির্বাচিত কয়েকটি কাজ নেওয়া যায় এবং তাদের সুষ্ঠু পরিচালনা করা যায়, তাহলে অনেক ভাল ফল পাওয়া যাবে। অনেক কিছু এক সঙ্গে করতে গিয়ে যদি

নির্বাচিত কয়েকটি কাজ গ্রহণ

সুপরিচালনা করা না যায়, তাহ'লে তার থেকে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। সুতরাং এই ধরনের কাজের প্রবর্তন করতে হ'লে প্রথমে কম থেকে শুরু ক'রে ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়াতে হবে।

কাজের উপকার

[দশ] প্রত্যেক ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় উপকরণ, অর্থ ইত্যাদি সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজন হ'লে শিক্ষামূলক আসর বা ক্লাবের জন্য ঘরও ছেড়ে দিতে হবে। এই ধরনের কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে ছাত্ররা যদি প্রতি পদে বাধা পায়, তাহ'লে তারা ক্রমে নিরুৎসাহী হ'য়ে পড়বে।

কাজের মূল্যায়ন

[এগার] প্রত্যেক রকম কাজের জন্য আলাদা আলাদা রেকর্ড কার্ড থাকবে, যার দ্বারা ছাত্রদের পারদর্শিতার মূল্যায়ন করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কাজেরও মূল্যায়ন করার দরকার। কোন্ কাজ কতটা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তুলছে, তাও বিচার ক'রে দেখার দরকার। কারণ, এর ওপর নির্ভর করছে, কোন্ কাজটা রাখা হবে, কোন্‌টাকে বাদ দিতে হবে। যে সব কাজের দ্বারা শিক্ষার্থীদের কোন রকম উন্নতিই হয় না, সেগুলোর চর্চা করার কোন প্রয়োজন নেই।

অভিভাবকের অবগতির জন্য ব্যবস্থা

[বার] সবশেষে বিদ্যালয়ে কি কি ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর অনুশীলন করা হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা কি ধরনের পারদর্শিতা সেখানে দেখাচ্ছে, এ সম্পর্কে অভিভাবক এবং পিতামাতার অবগতির একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের অবগতির ব্যবস্থাও করতে হবে।

মন্তব্য

যে সব মূলনীতির উল্লেখ করা হ'ল, এইগুলিই সব নয়। এ ছাড়া, প্রত্যেক ধরনের কাজ সংগঠনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। তবে এ কথা বলা যায়—এই সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী যদি উপরিউক্ত নিয়মের ওপর ভিত্তি ক'রে রচনা করা যায়, তাহ'লে সেগুলি সাধারণ পাঠ্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। একথা মনে রাখা দরকার, কেবলমাত্র সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হ'তে পারে না। গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে ওগুলো কাজ করে। তাই ম্যাককন বলেছেন—"A school only with extra-curricular activities would be as absurd as a school without them."

॥ আলোচনা ॥

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্তমানে কোন শিক্ষাবিদ্‌ই বিরূপ মত পোষণ করেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এদের সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন আজও সংগঠিত হয়নি। যদিও বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টে এদের গুরুত্বের কথা

উল্লেখ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এদের পরিপূর্ণ সংস্থান আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে হয়ে ওঠেনি। বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্ এদের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন; যেমন, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে, কেবল মাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্য-গীত-বাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত-সাধনের জন্য যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন, সেগুলি এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করবো। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই সমস্তরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি।" কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আমাদের দেশে এই চর্চার বহুল প্রসার হয়নি। এর জন্য অনেক কিছুই দায়ী।

সহপাঠ্যক্রমিক কাজ প্রবর্তনের পথে বাধা

প্রথমতঃ, বলা যেতে পারে, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা সহপাঠ্যক্রমিক কাজের অনুশীলনকে ব্যাহত করছে। আমাদের সমাজ বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং এখানে সাধারণভাবে শিক্ষার বৃত্তিমূলক আদর্শকে বড় ক'রে দেখা হ'চ্ছে। তাই সকলের ঝোঁক কোনরকমে কয়েকটা ডিগ্রী যোগাড় করা। ডিগ্রী যোগাড় করতে পারলে একটা ভাল চাকরি পাওয়া যাবে এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আসবে। আমাদের বিদ্যালয়গুলোও এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বলে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের গুরুত্ব সেখানে দেওয়া হয় না। আসল কথা হ'ল, উপযুক্ত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব।

সামাজিক মনোবৃত্তি

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা একান্তভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রিক (Examination centred)। পাঠ্যক্রমও সেই ভিত্তিতে রচিত হ'য়েছে, আর তার অনুশীলনও সেই উদ্দেশ্যে। যদিও মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন (মুদালিয়ার) ও ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন (কোঠারী) বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের এবং অবসর-বিনোদনের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী পরীক্ষাব্যবস্থা সংস্কার করার কথা বলেছেন, তা সত্ত্বেও পরীক্ষা সম্পর্কে তাঁরা যা সুপারিশ করেছেন, তা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে, গতানুগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতি থাকায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা-পাশের উপযোগী ক'রে তৈরি ক'রে দেওয়াই বিদ্যালয় তার প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে। আর এই সব কাজের ওপর যখন পরীক্ষা হয় না, তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের গুরুত্ব কমে যায়। এখনও তাই আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে দেখতে পাই পরীক্ষা যত এগিয়ে আসে খেলাধূলা কমানোর জন্য ততই চেষ্টা বাড়তে থাকে।

শিক্ষায় পরীক্ষা-কেন্দ্রিকতা

তৃতীয়তঃ, শিক্ষামূলক পরিকল্পনা যাঁরা রচনা করেন এবং অর্থসাহায্য করেন, তাঁদের উদাসীনতার জন্য এই ধরনের পাঠ্যক্রম বিদ্যালয়ে অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনা করতে হ'লে যে অর্থের দরকার, তা বিদ্যালয়কে দেওয়ার মত বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। যে সব বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী খুব উৎসাহী, তাঁরা নিজেদের

কর্তৃপক্ষের উদাসীন মনোভাব

চেষ্টায় হয়ত কিছু করেন বা তার সংস্থান করতে কিছু অর্থসাহায্য যোগাড় করেন। কিন্তু তা দিয়ে সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব হয় না।

চতুর্থতঃ, শিক্ষকের আর্থিক নিরাপত্তার অভাব এবং মনোভাবের অভাব আমাদের বিদ্যালয়ে এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণের পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের সময়-তালিকা অনুযায়ী কাজ করেন, তার বাইরে তাঁদের কাজ করার নানা রকম অসুবিধা আছে। হয়ত অবসর-সময়ে তাঁকে অন্যভাবে অর্থের সন্ধানে যেতে হয়, তাই তাঁর পক্ষে এই ধরনের কাজের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয় না।

শিক্ষকের আর্থিক নিরাপত্তার অভাব

তাই আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের প্রবর্তন করতে হ'লে সকলের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করার একান্ত প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার নব-প্রবর্তিত পাঠ্যক্রমে এই চেষ্টাই করা হচ্ছে। এখানে, কর্মভিত্তিক শিক্ষা (Work Education), সমাজসেবা (Social Service), শারীর শিক্ষা (Physical Education) ইত্যাদির মত বিষয়কে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সকল কাজকে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যেমন আবশ্যিক করা হ'য়েছে, এই সব কাজ পরিচালনার দায়িত্বও তেমনি শিক্ষকের ক্ষেত্রে আবশ্যিক করা হয়েছে। যদি এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে উপযুক্ত মনোভাব (attitude) গড়ে ওঠে, তাহ'লে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর সুফল আমরা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ করতে পারব।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের ওপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হ'ত। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে অনুশীলনের সামগ্রী ছিল কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিষয়গুলি। কিন্তু আধুনিক কালে শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তন হ'য়েছে। এখন শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা। তাই সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বৌদ্ধিক বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিকাশ-সহায়ক অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীকে দেওয়ার কথা বলা হ'য়েছে। খেলাধূলা, অভিনয়, বৃত্তিকেন্দ্রিক কার্যাবলী বর্তমানের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। এই অন্তর্ভুক্তিও হঠাৎ করে একদিন হয়নি। তাদের স্বীকৃতির প্রথম স্তরে তাদের বহিঃপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী (Extra-Curricular activities) বলা হ'ত। পরে, তাদের গুরুত্বের কথা চিন্তা ক'রে আধুনিক মনোবিদ্‌গণ বললেন, এদের বহিঃপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী না বলে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বলা উচিত। বিবর্তনের ধারায় এই সব সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীকে বর্তমানে এই নামেও অভিহিত করা হয় না। তাদের পাঠ্যক্রমে সহায়ক অভিজ্ঞতা হিসেবে বিবেচনা না করে পাঠ্যক্রমের অঙ্গ হিসেবেই ধরা হয়। তাই বর্তমানে পাঠ্যক্রমকে পরিচালনাগত দিক থেকে দুইটি অংশে ভাগ করা হয়। এক অংশকে বলে শ্রেণীকক্ষের অন্তর্ভুক্ত অংশ, যার মধ্যে থাকে গতানুগতিক বৌদ্ধিক বিষয়সমূহ এবং অপর অংশকে বলে শ্রেণীকক্ষের বাইরের অভিজ্ঞতাসমূহ (Off the class activities)। এই দ্বিতীয় অংশেরই পূর্বনাম সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী।

শিক্ষাক্ষেত্রে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কারণ, এর দ্বারা শিক্ষার বিশেষ কতকগুলি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। এই কাজগুলি শিক্ষালয়ে পরিচালনা করলে শিক্ষাকে শিশুর চাহিদা-ভিত্তিক করা যায়, এদের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক বিকাশকে সহায়তা করা যায়, তাছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সমবেদনা ইত্যাদির মত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-বিকাশের পথও সুগম হয়। এছাড়া, সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বিদ্যালয়ে মুক্ত-শৃঙ্খলা-স্থাপনে সহায়তা করে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) শরীর-চর্চামূলক—শরীরচর্চা ও দেহ-সঞ্চালনমূলক কার্যাবলী ; (২) শিক্ষামূলক—সাহিত্য-সভা, বিতর্কসভা, আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী ইত্যাদি ; (৩) কৃষ্টিমূলক—বিভিন্ন সামাজিক ও বিদ্যালয়ের নিয়মিত উৎসব ও অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী থেকে সুফল পেতে হ'লে বিদ্যালয়ে তাদের সুপরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার নীতিগুলির মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল—কার্যনির্বাচনে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দান, কার্য-পরিচালনার উপযুক্ত সময়সূচী নির্ধারণ, উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন, কাজের উপযোগী উপকরণ সরবরাহ করা এবং কাজের মূল্যায়ন। এই ধরনের কাজকে শিক্ষার উপযোগী করে তুলতে হ'লে আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. **Describe the utility of Co-curricular activities in school. Why are these activities now-a-days called Co-curricular activities ?**

[বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর উপযোগিতা বর্ণনা কর। বর্তমানে কেন এদের সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বলা হয় ?]

2. **What are Co-curricular activities ? Why are they considered important in the field of education ?**

[সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী কি ? শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এত গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন ?]

3. **"Co-curricular activities are now considered as integral part of education."—Discuss. What is the value of such activities ?**

["সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীকে বর্তমানে শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়"—এই উক্তি সম্পর্কে আলোচনা কর। এই কাজগুলির মূল্য কি ?

4. **Write an essay on the place of extra-curricular activities in educational insititution.**

[শিক্ষালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর স্থান সম্পর্কে আলোচনা কর।]

5. **What do you understand by Co-curricular activities ? Discuss the broad principles on which they should be organised in a school.**

[সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বলতে কি বোঝ ? বিদ্যালয়ে এই ধরনের কাজ কিভাবে পরিচালনা করা হবে, তার মূলনীতিগুলি আলোচনা কর।]

6. **Write notes on the meaning and values of Co-curricular activities.**

[সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর অর্থ ও মূল্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।]

7. **Indicate the importance of Co-curricular activities citing examples.**

[উদাহরণ সহযোগে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর শিক্ষামূলক গুরুত্ব পরিস্ফুট কর।]

8. **What do you understand by Co-curricular activities ? What are the broad principles on which these activities should be organised in schools ?**

[সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বলতে কি বোঝ ? কোন্ কোন্ নীতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী বিদ্যালয়ে পরিচালিত করা উচিত ?]

পঞ্চদশ অধ্যায়

পরীক্ষা-গ্রহণ
Examination

শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তির মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনা। যে কোনরকম শিক্ষা-প্রচেষ্টার মূলে ঐ একই উদ্দেশ্য কাজ করছে। শিক্ষাদান বা পাঠদানের ফলে শিক্ষার্থীরা কতদূর অগ্রসর হয়েছে, তা পরিমাপ ক'রে না দেখলে আমরা বুঝতে পারব না শিক্ষার প্রক্রিয়ার ফলাফল কিভাবে তাকে প্রভাবিত করছে। এই কারণে শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষা-ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতি প্রাচীন কাল থেকে পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। শিক্ষার্থী শিক্ষার দ্বারা কতটা প্রভাবিত হ'য়েছে, তার পরিমাপ করার পদ্ধতিকেই পরীক্ষা বলা হয়। শিক্ষার্থীর উন্নতির বা অগ্রগতির পরিমাপ ছাড়াও পরীক্ষা দ্বারা আরও অনেক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তাই পরীক্ষা-গ্রহণ শিক্ষাক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

॥ পরীক্ষার উপযোগিতা ॥
(Functions of Examination)

পরীক্ষা-পদ্ধতির রীতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, পরীক্ষা-গ্রহণ শিক্ষার প্রক্রিয়াকে সক্রিয় রাখার জন্য একান্ত প্রয়োজন। তার কারণ পরীক্ষা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য-সাধনে সহায়তা করে—

[এক] **পরীক্ষা—শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও জ্ঞানের পরিমাপক** (Examination measures the achievement of the pupil) ঃ

সাধারণতঃ পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞান বা দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। শিক্ষার্থী বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রভাবে কতটুকু জ্ঞান অর্জন করল, তা পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন হ'য়েছে।

[দুই] **পরীক্ষা—শিক্ষকের দক্ষতার পরিমাপক** (Examination measures the efficiency of teacher) ঃ

শিক্ষক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। তিনি নির্দিষ্ট সময় ধ'রে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। তিনি কিরকম পাঠদান করেছেন, তার যথার্থতা প্রমাণিত হবে তাঁর শিক্ষার্থীরা কিরকম ফল করছে তার দ্বারা। তাই পরীক্ষা পাঠদানের সামর্থ্যকেও (Teaching efficiency) পরিমাপ করে।

[তিন] **পরীক্ষা—শিক্ষণ-পদ্ধতি ও বিদ্যালয়ের ক্ষমতা-পরিমাপক** (Examination measures the efficiency of teaching Method) ঃ

পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষা-পদ্ধতির যোগ্যতাও পরিমাপ করা যায়। ধরা যাক, শিক্ষক কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে পাঠদান করেছেন। এখন ঐ পদ্ধতি

যদি উপযুক্ত না হয়, তাহ'লে শিক্ষার্থীদের আচরণেরও আশানুরূপ পরিবর্তন হবে না। পরীক্ষার দ্বারা তাঁর এই পদ্ধতির উপযোগিতাও বিচার করা যায়। তাছাড়া, বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য সাংগঠনিক দিকও শিক্ষণের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ আদর্শস্থানীয় না হ'লে পদ্ধতি যতই ভাল হোক, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব যতই আদর্শস্থানীয় হোক্-না-কেন, শিক্ষার্থীদের ওপর আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে না। তাই পরীক্ষা পরোক্ষভাবে শিক্ষণ-পদ্ধতি ও বিদ্যালয়-পরিবেশের প্রভাবকে পরিমাপ করে।

[চার] **পরীক্ষা—শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পারদর্শিতার নিরূপণ** (Examination predicts the future performance of the pupil) :

বর্তমানে যে পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন আছে, তার ফলাফলের ভিত্তিতেই পরবর্তী শিক্ষাস্তরে বা বৃত্তির ক্ষেত্রে আমরা বৃত্তি নির্বাচন (vocational selection) ক'রে থাকি। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়, তাদের ফলাফল বিচার ক'রে বিভিন্ন কলেজে বা বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। আবার কোন বিশেষ বৃত্তির জন্য কর্মী নিয়োগ করার সময় তাদের পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করা হয়। এর পেছনে মূল নীতি হ'ল—পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে পরবর্তী শিক্ষাস্তরে সম্ভাব্য সাফল্যের বা কোন বিশেষ বৃত্তিতে সম্ভাব্য কৃতকার্যতার বিশেষ সংযোগ আছে। সুতরাং পরীক্ষার ভবিষ্যৎ সাফল্য-নির্ণায়ক একটা মূল্য আছে।

[পাঁচ] **পরীক্ষা—শিক্ষণের প্রেষণা-শক্তির উৎস** (Examination Provides motivation to learning) :

পরীক্ষা শিক্ষার্থীকে শিখনে প্রেরণা যোগায়। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অনেক পরীক্ষার জন্যই পড়াশুনা করে। তবে এই ধরনের চরম অবস্থার কথা ছেড়ে দিলেও পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীরা তাদের অগ্রগতি সম্বন্ধে যে ধারণা পায়, তাই তাদের পরবর্তী শিখনে প্রেরণা যোগায়। নিজের সাফল্য সম্পর্কে ধারণা (knowledge of success) যে-কোন প্রচেষ্টামূলক কাজে মানুষকে প্রেরণা যোগায়। এই দিক থেকে পরীক্ষাকে শিখন-সহায়ক একটি ভাল কৌশল বলা যেতে পারে।

[ছয়] **পরীক্ষা—পরীক্ষার্থীর দুর্বলতার নির্ণায়ক** (Examination as a diagnostic measure of pupil's weakness) :

পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা বিশেষ কোন্ কোন্ জায়গায় পরীক্ষার্থীদের দুর্বলতা আছে, তা নির্ণয় করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী নিবারণমূলক শিক্ষার (Remedial teaching) পরিকল্পনা রচনা করতে পারি। তাছাড়া, অনেক সময় শিক্ষার্থীরা নিজেদের ত্রুটিগুলো জানতে পারলে, আত্মচেষ্টায় তা দূর করতে পারে। এই কারণে, পরীক্ষার ত্রুটি-নির্ণায়ক একটা (diagnostic value) আছে, এ কথা সকলে স্বীকার করেন।

[সাত] পরীক্ষা—পরীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধির পরিমাপক (Examination as a measure of all round development of the pupil) :

আদর্শ পরিকল্পিত পরীক্ষার লক্ষ্য হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য (objectives of education) কতটা লাভ করা গেছে, তা পরিমাপ করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক সকল রকম বৈশিষ্ট্যের বিকাশ। গতানুগতিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা বলতে আমরা বৌদ্ধিক বিকাশকে (intellectual development) বুঝি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের সংব্যাখ্যানে শিক্ষা হ'ল সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। তাই পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু যে আমরা বৌদ্ধিক বিকাশের পরিমাপ করি তাই নয়, তার অন্যান্য মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক গুণের বৃদ্ধিও পরিমাপ করি। এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষণ বা পরিমাপকে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা মূল্যায়ন (evaluation) নাম দিয়েছেন।

[আট] পরীক্ষা—বিদ্যালয়-সংগঠনের সহায়ক (Examination as an aid to school organisation) :

বিদ্যালয়ের শ্রেণীবিন্যাস (classification into groups), সময়-তালিকানির্ণয় (fixing of time table), সহপাঠ্যক্রমিক কাজের পরিচালনা (organisation of co-curricular activities), পাঠ্যক্রম নির্ধারণ (determination of curriculum) —সব কিছু পরীক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা দেখে এই সব ব্যবস্থাকে সংগঠিত করতে হবে। তবে পরীক্ষারও একটা সাংগঠনিক উপযোগিতার দিক আছে।

[নয়] পরীক্ষা—শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার সহায়ক (Examination as aid to Educational and Vocational guidance) :

শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম যা দরকার হয়, তা হ'ল শিক্ষার্থী-সম্পর্কীয় তথ্য (pupil data)। শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তথ্য পেতে হ'লে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ ক'রে দেখার দরকার। পরিমাণগত (quantitative) তথ্য ছাড়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হয় না। এর জন্য একদিকে যেমন ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিকাশকে পরিমাপ ক'রে দেখার দরকার হয়, তেমনি বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে (subject) সে কতটা দক্ষতা অর্জন করেছে, তাও পরীক্ষা ক'রে দেখার দরকার হয়। বিদ্যালয়ের সাধারণ পরীক্ষা আমাদের এই বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান পরিমাপ করতে সহায়তা করে।

আমরা এই যে উদ্দেশ্যগুলোর উল্লেখ করলাম, তার সমস্যাগুলো প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা সার্থকভাবে সাধিত হয় না। তবে আদর্শগত দিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, যে-কোন পরীক্ষা এই ধরনের উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থায় নানা দোষত্রুটি থাকার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ তার সমালোচনা করছেন। তার কারণ, তার দ্বারা এই সকল উদ্দেশ্য সাধিত

হয় না। কিন্তু পরীক্ষা যদি এই সকল উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহ'লে তার প্রয়োজনও শিক্ষাক্ষেত্রে চিরদিনই থাকবে।

॥ পরীক্ষা-পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ ॥
(Classification of Forms of Examination)

পরীক্ষার যে পূর্বোক্ত কাজগুলির (Functions) কথা বলা হ'য়েছে, তা মোটামুটি যে কোন ধরনের পরীক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে সম্পাদন করে থাকে। শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের আদিকাল থেকে এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার বিবর্তন হ'য়ে আছে। বর্তমানে আমরা যে পরীক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত, সে পরীক্ষা-ব্যবস্থা চিরদিন ছিল না।

প্রস্তাবনা

তবে পরীক্ষা-ব্যবস্থা যেমনই থাক-না-কেন, সেখানে পরীক্ষা উল্লিখিত কতকগুলি কাজ প্রত্যক্ষভাবে এবং কতকগুলি পরোক্ষভাবে সম্পাদন করত। কিন্তু পরীক্ষার প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন। বর্তমানে পরীক্ষা-ব্যবস্থার যে সংস্কার করা হ'চ্ছে, তা বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-ব্যবস্থার ভাল গুণগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা হচ্ছে। পরীক্ষার যে বিভিন্ন আকার ছিল বা বর্তমানে আছে, সেগুলিকে আমরা কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে শ্রেণী-বিভাগ করতে পারি। এই শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তি হিসেবে যে মূল উপাদানগুলিকে বিবেচনা করা যায়, তা হ'ল—(১) পরীক্ষা পরিচালন-সংস্থা (Examining body), (২) পরীক্ষার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা (Controlling arrangement, (৩) পরীক্ষার প্রশ্নের সংগঠন (Structure of Question paper), (৪) পরীক্ষার উত্তরদানের পদ্ধতি (Answering system) এবং (৫) পরীক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives o। examination)।

[এক] **পরীক্ষার পরিচালন-সংস্থার ভিত্তিতে শ্রেণী-বিভাগ** (Classification on the basis of examining body) :

প্রচলিত পরীক্ষার উদ্দেশ্য এক হ'লেও পরীক্ষা বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে থাকে। পরিচালন-সংস্থাভেদে পরীক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—**অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা** (Internal examination) ও **বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষা** (Public examination)। যে পরীক্ষা সাধারণতঃ শিক্ষণ-সংস্থা (Teaching institution) দ্বারা পরিচালিত হয়, তাকে বলে **অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা**। এই পরীক্ষায় শিক্ষাদান ও পরীক্ষা-গ্রহণ একই সংস্থা করে থাকেন। বিদ্যালয়ে শ্রেণী-পরীক্ষা (Class examination), মহাবিদ্যালয়ের নির্বাচনী পরীক্ষা (test) এই জাতীয় পরীক্ষা। যে পরীক্ষা বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষণ-সংস্থার বাইরের কোন সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়, তাকে বলে **বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষা**। এখানে শিক্ষাদানের সংস্থা ও পরীক্ষা-সংস্থা পৃথক। যেমন, শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করে। কিন্তু মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময়ান্তে পরীক্ষা গ্রহণ করে। এই অর্থে, মাধ্যমিক পরীক্ষা, উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষা বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষা।

অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসংস্থা পরিচালিত পরীক্ষা

[দুই] **পরীক্ষার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী-বিভাগ (Classification on the basis of controlling arrangement) :**

পরীক্ষা-গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীকে কতটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হচ্ছে, তার ভিত্তিতে পরীক্ষাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—**নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা** (Formal Examination) ও **অনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা** (Informal examination)। পরীক্ষার কতকগুলি বিধিনিষেধ আছে। পরীক্ষার জন্য একটি প্রশ্নপত্র রচনা করতে হয়, শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ প্রশ্নপত্রের উত্তর করতে হয়; পরীক্ষার সময় শিক্ষকের সাহায্য করা চলে না; পরীক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করতে হয়। এই সব বিধিনিষেধের মধ্যে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে হয়। এইভাবে শ্রেণীকক্ষের বাইরে একটি কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করে শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাকে বলা হয় **নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা**। অন্যদিকে এই সব বিধিনিষেধ না মেনে, স্বাভাবিক অবস্থায় শ্রেণীকক্ষের মধ্যে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু কতটুকু আয়ত্ত করেছে তা জানার জন্য যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তাকে বলা হয় **অনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা**। যে কোন পাঠ-পরিচালনার পর শিক্ষক ছাত্রদের যে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, তা অনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা। অন্যদিকে বাৎসরিক পরীক্ষা বা বহিঃসংস্থা পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা। পরীক্ষা যত অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে পরিচালিত করা যাবে, শিক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থীরা তত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে এবং তাদের পরিমাপও তত সঠিক হবে।

নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা

[তিন] **পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সংগঠনের ভিত্তিতে শ্রেণী-বিভাগ (Classification on the basis of structure of question paper) :**

আমরা জানি, প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য একটি করে প্রশ্নপত্রের প্রয়োজন। গতানুগতিক পরীক্ষায় যে প্রশ্ন করা হয়, সেখানে প্রত্যেকটির উত্তর হিসেবে পরীক্ষার্থীকে একটি করে প্রবন্ধ রচনা করতে বলা হয়। যেমন—"ভারতবর্ষের বনজ সম্পদ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।" এর উত্তরে পরীক্ষার্থীরা ভারতের বনজ সম্পদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করে মূল্যায়ন করা হয়। এই ধরনের পরীক্ষাকে বলা হয় **রচনাধর্মী পরীক্ষা** (Essay type Examination)। আবার অনেক সময় পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে রচনাধর্মী প্রশ্ন না দিয়ে বস্তুধর্মী বা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective type) দেওয়া হয়। এই সব প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ রচনার পরিবর্তে খুব সামান্য কিছু লিখতে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করতে হয়। এখানে প্রশ্নগুলি বস্তুধর্মী বা নৈর্ব্যক্তিক গুণসম্পন্ন বলে এই পরীক্ষাকে বলা হয় **নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা** (Objective type Examination)। সুতরাং, প্রশ্নের প্রকৃতি দিক থেকে পরীক্ষাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এই দু'ধরনের পরীক্ষা সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে আলোচনা করব।

রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

[চার] পরীক্ষায় উত্তরদানের ভিত্তিতে শ্রেণী-বিভাগ (Classification on the basis of answering) :

পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের যে প্রশ্ন করা হয়, তার উত্তর শিক্ষার্থীদের সাধারণতঃ লিখিতভাবে দিতে হয়। এইভাবে যে পরীক্ষায় উত্তর লিখিতভাবে প্রকাশ করতে হয়, সেই পরীক্ষাকে বলা হয় **লিখিত পরীক্ষা** (Written examination)। আমরা যে পরীক্ষার সঙ্গে পরিচিত তার বেশীর ভাগই এই ধরনের পরীক্ষা। অন্যদিকে অনেক সময় পরীক্ষক এবং পরীক্ষার্থী মুখোমুখী বসেন এবং পরীক্ষার্থী প্রশ্নগুলির উত্তর মুখে মুখে দেয়। এই ধরনের পরীক্ষাকে মৌখিক পরীক্ষা বলে। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের মৌখিক পরীক্ষা (Oral examination) আংশিকভাবে প্রবর্তন করা হ'য়েছে। সুতরাং উত্তরদানের দিক থেকেও পরীক্ষাকে **লিখিত** (Written) এবং **মৌখিক** (Oral) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তবে বর্তমানে পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্‌গণ এই দু'ধরনের রীতির সংমিশ্রণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা

[পাঁচ] পরীক্ষার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণী-বিভাগ (Classification on the basis of objectives) :

পরীক্ষা-গ্রহণের নানারকম উদ্দেশ্য থাকে। পরীক্ষার এই উদ্দেশ্যগুলি বিশেষভাবে তাৎক্ষণিক কোন চাহিদার দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে থাকে। কোন বিশেষ তাগিদের পরিপ্রেক্ষিতে যখন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তখন সেই তাগিদ বা চাহিদা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এইরকম মূল কয়েকটি উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষাকে শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। অনেক সময় কোন বিশেষ বৃত্তিতে লোক নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বা কোন বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হ'য়ে থাকে। এই ধরনের পরীক্ষাকে বলা হয় **নির্বাচনী পরীক্ষা** (Selection test)। আবার কোন কোন সময়, বিশেষ প্রশিক্ষণের শেষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হ'য়ে থাকে। এই জাতীয় পরীক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের মান নির্ণয় করা বা তারা প্রশিক্ষণের দ্বারা কতটুকু লাভবান হ'য়েছে, তা নির্ণয় করা। এই জাতীয় পরীক্ষাকে বলা হয় **মান-নিরূপক পরীক্ষা** (Evaluative examination) এবং অনেক সময় শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসুবিধাগুলি নির্ণয় করার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির প্রকৃতি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারলে পরবর্তী শিক্ষা-পরিকল্পনা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাকে বলে **নির্ণায়ক পরীক্ষা** (Diagnostic Examination)।

নির্বাচনী মান নিরূপক ও নির্ণায়ক পরীক্ষা

পরীক্ষার এই যে বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ করা হ'ল, এই শেষ নয়। পরীক্ষাকে নানাভবে শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। তবে এ কথা স্মরণ রাখার দরকার যে, কোন

একটি আদর্শ পরীক্ষার মধ্যে এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলির ভাল দিকগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া, আধুনিক কালে পরীক্ষার ক্ষেত্রে আরও কতকগুলি নতুন ধারণার প্রবর্তন হ'য়েছে, যেমন মূল্যায়ন, আদর্শায়িত অভীক্ষা ইত্যাদি। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আলোচনা করেছি।

মন্তব্য
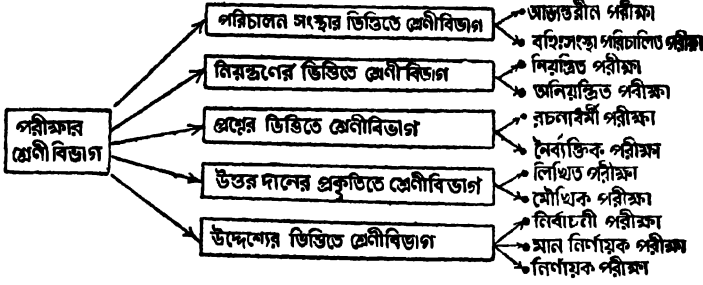
॥ গতানুগতিক পরীক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি ॥

(Defects of Traditional Examination system)

প্রচলিত পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সকলে পরিচিত। সাধারণতঃ শিক্ষাবর্ষের শেষে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ বা বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্তরের শেষে কোন বহিঃ-প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং এই পরীক্ষার ফলাফল বিচার ক'রে পরবর্তী উঁচু শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের বসার অনুমতি দেন বা একটি বিশেষ মানপত্র দেন। এই পরীক্ষার পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরীক্ষা নেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই পরীক্ষায় কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিদ্যালয়-পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান পরীক্ষা করা হয়। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্রে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রশ্ন দেওয়া হয় এবং তার মধ্যেও আবার নির্বাচনের সুযোগ থাকে। হয়ত আটটি প্রশ্ন দিয়ে যে-কোন পাঁচটি লিখতে বলা হয় বা অনেক সময় বিশেষ প্রশ্নের মধ্যে নির্বাচনের সুযোগ থাকে। চতুর্থতঃ, প্রশ্নগুলোর উত্তরে বিশেষ একটি ক'রে রচনা (Essay) লিখতে হয়। তাই এই গতানুগতিক পরীক্ষার পদ্ধতিকে অনেক সময় রচনাভিত্তিক পরীক্ষা (Essay-type examination) বলা হয়; গতানুগতিক পরীক্ষার এই সব বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ত্রুটিগুলো উল্লেখ করছি—

গতানুগতিক পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য

[এক] প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটি হিসেবে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা বলেছেন যে, এই পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞানের পরিসর (Range of Knowledge) পরিমাপ করা যায় না। তার কারণ, এই ধরনের পরীক্ষায় নির্বাচিত কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হয়। এই সব প্রশ্ন দ্বারা কোন বিষয়ের সমস্ত অংশের জ্ঞান পরীক্ষা করা যায় না। যেমন, ইতিহাসে প্রশ্ন করা হ'ল—"আকবরের রাষ্ট্রনীতির বিবরণ দাও"। এই প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীরা যা লেখে, তার দ্বারা

অসম্পূর্ণ পরিমাপ

শিক্ষার্থী'দের আকবর সংপর্কে সম্পূর্ণ ধারণাকে পরিমাপ করা যায় না। এইরকম কয়েকটা প্রশ্ন দিয়ে পাঠ্যসূচীর বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না; সুতরাং এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থী'র বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে পরিমাপ করা যায় না।

নৈর্ব্যক্তিক নয়

[দুই] এই পরীক্ষা-পদ্ধতি ব্যক্তিগত (subjective) উপাদানকে পরিমাপের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের সুযোগ দেয়। বিশেষ এক প্রশ্নের উত্তরে কোন শিক্ষার্থী যে উত্তর দেয়, সেই উত্তরকে বিচার করতে গিয়ে তার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা, মতবাদ, রুচি, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে, এই ধরনের পরিমাপে ব্যক্তিগত অবস্থাজনিত ত্রুটি (personal error) থেকেই যায়। তাই গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যক্তিগত অবস্থাজনিত ভুলে দুষ্ট। পরীক্ষকের মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য একই উত্তরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হ'য়ে থাকে।

নির্ভরযোগ্যতার অভাব

[তিন] রচনাভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা খুবই কম। একই বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর দু'বার পরীক্ষা নিলে এবং একই পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করালে দেখা যায় যে, সে দু'রকম নম্বর পেয়েছে। এর থেকেই বোঝায় যে, এই পরিমাপের কোন নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) নেই। আবার, একই খাতা যদি দু'জন পরীক্ষককে দিয়ে দেখানো হয়, তাতেও দেখা গেছে নম্বরের পার্থক্য হয়। অর্থাৎ, এই ধরনের পরিমাপে সব সময় একটা পরিবর্তনশীল ত্রুটি (variable error) থেকে যায়। বিভিন্ন মনোবিদ্ এ বিষয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। তাঁদের পরীক্ষা থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিভিন্ন পরীক্ষকের পরিমাপের মধ্যে সহগতির সহগাঙ্ক (Co-efficient of Correlation) কোন সময় 60-এর বেশী হয় না।

যথার্থতার অভাব

[চার] এই ধরনের পরীক্ষার পরিমাপের যথার্থতাও (validity) নেই বললেই চলে। যে বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপের জন্য পরীক্ষা করি, এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তা সব সময় সঠিকভাবে পরিমাপ করে না। যেমন, কোন বিশেষ বিষয়ে প্রশ্ন ধরা যাক, ইতিহাসের প্রশ্নের পরীক্ষার্থীরা যে উত্তর লেখে, তাতে আমরা তার শুধু ইতিহাসের জ্ঞানই পরীক্ষা করি না; প্রকাশভঙ্গী, ভাষা-জ্ঞান, হাতের লেখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি আরও নানারকম জ্ঞানও পরীক্ষা করি। ফলে, যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নিচ্ছি, কেবল সেই উদ্দেশ্যকে মূল্যায়নের সময় বিচার করি না। যদি কোন পরিমাপযন্ত্রের পরিমাপে সব সময় একই ধরনের ভুল করে, তাহ'লে বলব সেই পরিমাপযন্ত্রের যথার্থতা নেই। কোন পরিমাপ-যন্ত্রের যথার্থতা নির্ভর করে তার স্থায়ী ত্রুটির (constant error) ওপর। গতানুগতিক পরিমাপে এই ধরনের ভুল সব সময় থেকে যায়। ফলে, এই পরীক্ষার দ্বারা কোন সময়· আমরা সঠিকভাবে শিক্ষার্থীর বিষয়ের জ্ঞানকে পরিমাপ করতে পারি না।

[পাঁচ] এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের উত্তরের সংখ্যামূল্য নির্ধারণের (Marking or scoring) কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় নানারকম অসুবিধা হয়। এতে ক'রে বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরিমাণ নম্বর পেতে পারে। কোন পরীক্ষকের হয়ত বিশেষ একটা দিকে প্রবণতা আছে বা কোন আলোচ্য বস্তুর বিশেষ একটা জায়গা সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে, কোন পরীক্ষার্থী যদি সেটা উল্লেখ না করে, তিনি সেটাকে গুরুতর ভুল মনে করে নম্বরও কম দেন। আবার অন্য পরীক্ষকের হয়ত সেরকম কিছু নেই, তিনি ঐ ধরনের ভুলে খুব গুরুত্ব দেন না। ফলে, তাদের পরিমাপে পার্থক্য দেখা দেয়। সুতরাং এই পরীক্ষা-পদ্ধতিতে সংখ্যামূল্য দেওয়ায় কোন নির্দিষ্ট মান থাকে না ব'লে শিক্ষার্থীদের উন্নতির সত্যিকারের পরিমাপ সম্ভব হয় না।

মূল্য-নিরূপণের পদ্ধতির ত্রুটি

[ছয়] এই ধরনের পরীক্ষার সময়-নির্ধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয় না। ফলে, অনেক সময় দেখা যায়, প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তরের তুলনায় সময় খুব বেশী বা খুব কম হ'য়ে গেছে। সময় যদি কম হয়, তাতে ক'রে শিক্ষার্থীরা বিষয় সম্বন্ধে জানলেও সময়ের অভাবের জন্য লিখতে পারে না। ফলে, সেই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ আমরা সঠিকভাবে করতে পারি না। তাই গতানুগতিক পরীক্ষায় সময়-সীমা নির্ধারণের কোন বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নেই।

সময়-নির্ধারণে ত্রুটি

[সাত] এই পরীক্ষার পরিমাপ দ্বারা আমরা সব সময় ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর পরস্পরের মধ্যে তুলনা করতে পারি না। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত বিভিন্ন শিক্ষার্থী যদি তাদের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসে, তাতে দেখা যাবে, কোন এক বিশেষ বিষয়ে বিশেষ এক বিদ্যালয়ে এক ছাত্র অনেক বেশী নম্বর পেয়েছে; অথচ অন্য এক বিদ্যালয়ে ছাত্র তার চেয়ে কম নম্বর পাওয়া ছাত্রের তুলনায় সে অনেক কাঁচা। যে বিদ্যালয়ের গড় মান নীচু, সে বিদ্যালয়ের ছাত্রের একই বিষয়ের একই নম্বর তাদের সমান পারদর্শিতার পরিচায়ক নয়। ফলে, এই ধরনের পরীক্ষার নম্বরকে তুলনামূলকভাবে বিচার করা যায় না।

তুল্যতার অভাব

[আট] এই ধরনের পরীক্ষা বোধগম্যতার চেয়ে মুখস্থের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় দেয় এবং এই ধরনের প্রচেষ্টা আদর্শ শিক্ষার সহায়ক নয়। শিক্ষার্থীরা কতকগুলো অংশ ভালভাবে মুখস্থ ক'রে পাশ করে যায়, হয়ত বিষয়ের ওপর কোন দক্ষতাই তাদের থাকে না। ফলে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

মুখস্থের ওপর বেশী গুরুত্ব

[নয়] এই জাতীয় পরীক্ষায় ছাত্ররা পূর্ব থেকে প্রশ্ন প্রত্যাশা করে এবং সেই মত তৈরি হয়। এটা শিক্ষাক্ষেত্রে একেবারে কাম্য নয়। এর ফলে দেখা যায়, অনেক খারাপ ছেলে ভাল ফল করে, আবার অনেক ভাল ছেলে খারাপ ফল করে।

প্রত্যাশার অভাব

[দশ] প্রচলিত পরীক্ষার্থীর সারা বছরের সামগ্রিক পারদর্শিতার ওপর কোন কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পরীক্ষার তিন ঘণ্টা সময়ের পারদর্শিতাকেই পরিমাপের সময় বিচার করা হয়। ফলে, কোন ছাত্র যদি কোন মানসিক বা দৈহিক কারণে ঐ সময়-সীমার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে না পারে, তাহ'লে তাকে অযোগ্য বলে নির্ধারণ করা হয়।

সামগ্রিক পারদর্শিতার অভাব

[এগার] এই ধরনের পরীক্ষার প্রভাবে ছাত্রদের মধ্যে একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে এবং এই মনোভাব শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ জীবন-যাপনের সহায়ক নয়। কারণ, পরীক্ষায় ভাল ফল পাওয়ার জন্য তারা নানারকম অবাঞ্ছিত উপায় অবলম্বন করতে আরম্ভ করে। আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিভিন্ন ত্রুটির জন্য এই গতানুগতিক পরীক্ষা-ব্যবস্থাই অনেকাংশে দায়ী, তাই বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টে এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তাঁদের রিপোর্টে পরীক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

প্রতিযোগী মনোভাবের কুফল

[বার] সবশেষে বলা যায়, এই ধরনের পরীক্ষার দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ করতে পারি না। শিক্ষার দ্বারা আমরা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চাই না, তার চারিত্রিক বিকাশও করতে চাই। কিন্তু তার চারিত্রিক বিকাশ কতটা হ'য়েছে, তা আমরা এই ধরনের পরীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করতে পারি না।

সামগ্রিক বিকাশ পরিমাপে অক্ষম

এই সব দোষত্রুটি থাকার জন্য আধুনিক শিক্ষাবিদরা এই রচনাধর্মী পরীক্ষার পক্ষপাতী নন। এর সংস্কার-সাধনের জন্য তাঁরা বিভিন্ন ধরনের পন্থার কথা বলেছেন। সেই পন্থাগুলোর মধ্যে প্রধান হল—

মন্তব্য

(১) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন গঠন (Objective type test)

(২) আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠন (Standardized test)

(৩) প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষার সংস্কার (Reformation of Essay type examination)

(৪) মূল্যায়ন (Evaluation) ও ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্রের (Cumulative Record Card) প্রচলন।

॥ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন গঠন ॥
(Preparation of Objective Type Test)

প্রচলিত পরীক্ষার দোষত্রুটির কথা বিবেচনা ক'রে তা দূর করার জন্য নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হ'য়েছে। মনোবিদ্‌রা মনে করেন, প্রচলিত এই পরীক্ষার দোষত্রুটি বিশেষভাবে তার একটা সংগঠনিক বৈশিষ্ট্য থেকে এসেছে—তা হ'ল তার

রচনাধর্মিতা। তাই তাঁরা বললেন, এমন প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে, যার মূল্যায়নের সময় ব্যক্তিগত উপাদানের প্রভাব একেবারে না আসতে পারে। তাঁরা বিশেষভাবে গতানুগতিক পরীক্ষাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Subjective) ব'লে সমালোচনা করেছেন এবং তার পরিবর্তে পরীক্ষাকে নৈর্ব্যক্তিক (Objective) করার চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই তাঁরা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন গঠনের কথা বলেছেন। এই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য হ'ল—(১) এতে একটার বেশী উত্তর থাকতে পারে না ; (২) এখানে শিক্ষার্থীর উত্তরের জন্য বিশেষ কিছু লিখতে হয় না ; ফলে, পরীক্ষা-ক্ষেত্র থেকে ব্যক্তিগত প্রভাবকে দূর করা যায়। এই ধরনের প্রশ্ন বিভিন্ন রকমের হ'তে পারে। কয়েক রকম প্রশ্নের এখানে উল্লেখ করা হ'চ্ছে—

প্রস্তাবনা

[এক] সত্য-মিথ্যা নিরূপণ (True-False Type)

এই ধরনের প্রশ্নে বিষয়-সংক্রান্ত কতকগুলো উক্তি বা ঘটনার বিবরণ বা মন্তব্য পর পর সাজানো থাকে। তবে এই সব উক্তি, ঘটনা বা মন্তব্য সবগুলো ঠিক নয়। কতকগুলো ভুলও থাকে। ভুল ও সত্য মন্তব্য বা উক্তিগুলো ইতস্ততঃভাবে মিশিয়ে সাজানো থাকে। পরীক্ষার্থীর কাজ হ'ল এদের মধ্যে কোন্‌গুলো ভুল এবং কোন্‌গুলো ঠিক, তা খুঁজে বের করা। এই ধরনের প্রশ্ন সমাধান করার জন্য শিক্ষার্থীর পুনরুদ্রেক (Recall) এবং প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)—এই দু'ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। প্রশ্নপত্রের ওপরে নির্দেশ দেওয়া থাকে পরীক্ষার্থীকে কিভাবে উত্তর করতে হবে।

নির্দেশ	নীচে কতকগুলো বাক্য দেওয়া আছে। এর মধ্যে কতকগুলো ঠিক এবং কতকগুলো ভুল। যেগুলো ভুল তার পাশে F লিখবে এবং যেগুলো ঠিক, তার পাশে T লিখে নির্দেশ করবে।

॥ নমুনা ॥

(ক) প্রথম পানিপথের যুদ্ধ আকবর আর হিমুর মধ্যে হয়েছিল।
(খ) পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ হ'ল এভারেষ্ট।
(গ) কোন্ সংখ্যাকে অপর সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল সব সময় সেই সংখ্যা দু'টির চেয়ে বড় হয় ?
(ঘ) ফা-হিয়েন হর্ষবর্ধনের সময় ভারতবর্ষে আসেন।

[দুই] সম্পূর্ণকরণ (Completion Type)

এই ধরনের প্রশ্নে কতকগুলো অসম্পূর্ণ বাক্য বা ধারণা উপস্থাপন করা হয়। পরীক্ষার্থীর কাজ হ'ল ঐ অসম্পূর্ণ অংশগুলোকে তার অভিজ্ঞতা বা বিষয়ের জ্ঞান থেকে পূর্ণ করা। এখানে পরীক্ষার্থীর পুনরুদ্রেক (Recall) প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কাজ করে। পরীক্ষার্থীকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়—

নির্দেশ | নীচে কতকগুলো বাক্য বা ধারণা দেওয়া আছে যার কিছু কিছু অংশ অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। তুমি ঐ অসম্পূর্ণ অংশে প্রয়োজনীয় শব্দ লিখে ধারণাটিকে সম্পূর্ণ করবে।

॥ নমুনা ॥

(ক) রবীন্দ্রনাথ — খ্রীষ্টাব্দে — শহরে জন্মগ্রহণ করেন।
(খ) প্রোজেক্ট পদ্ধতির প্রবর্তক হ'লেন —।
(গ) গান্ধীজি যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, তার নাম হ'ল —।
(ঘ) ফ্রয়েবল — পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং ডাল্টন পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন —।

[তিন] বহুর মধ্যে নির্বাচন (Multiple-choice Type)

এই জাতীয় প্রশ্নে কতকগুলো সমস্যা থাকে এবং তার সম্ভাব্য কতকগুলো উত্তর পাশে লেখা থাকে। পরীক্ষার্থীকে অসল উত্তরটা খুঁজে বের করতে বলা হয়। আবার অনেক সময় এগুলো প্রশ্নের উত্তর হিসেবে না দিয়ে সম্পূর্ণকরণের মত অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে তার কতকগুলো সম্ভাব্য উত্তর দিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর কাজ হ'ল সঠিক উত্তর বা শব্দের নীচে দাগ দিয়ে নির্দেশ করা। এই ধরনের প্রশ্ন সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) প্রক্রিয়া পৃথকীকরণের ক্ষমতার (Power of discrimination) সাহায্য নিতে হয়।

নির্দেশ | নীচে কতকগুলো প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং তাদের প্রত্যেকের পাশে কতকগুলো ক'রে সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। প্রশ্নটি পড়ে তার সঠিক উত্তরটি নীচে দাগ দিয়ে নির্দেশ কর।

(ক) আজ পর্যন্ত কতজন ভারতবাসী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন—একজন, দু'জন তিনজন, দশজন।
(খ) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?—আকবর, বাবর, হুমায়ুন, শেরশাহ।
(গ) ভারতবর্ষে কোন্ রাজ্যে সবচেয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী?—পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ।
(ঘ) 'কিং লিয়ারে'র রচয়িতা কে?—সমরসেট মম, বার্নাড শ, ও-নীল, শেকস্পীয়ার।

অন্যভাবে—

(ক) আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ভারতীয় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন—একবার, দু'বার, তিনবার, দশবার।
(খ) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন—আকবর, বাবর, হুমায়ুন, শেরশাহ্।
(গ) ভারতবর্ষে যে রাজ্যে সবচেয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী, তার নাম হ'ল—পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ।
(ঘ) 'কিং লিয়ার'-এর রচয়িতা হ'লেন—সমরসেট মম, বার্নাড শ, ও-নীল, শেকস্পীয়ার।

[চার] যোজ্যতা নিরূপণ (Matching Type)

এই ধরনের প্রশ্নে দু'টো সারি থাকে। বামদিকের সারিতে থাকে কতকগুলো ধারণা বা প্রশ্ন এবং ডানদিকের সারিতে থাকে তার যোজ্য ধারণা বা তার উত্তর। কিন্তু ডানদিকের সারিতে উত্তরগুলো বা ধারণাগুলো ইতস্ততঃ সাজানো থাকে। পরীক্ষার্থীর কাজ হ'ল বামদিকের সারির প্রশ্নগুলো পড়ে ডানদিকের সারির সঠিক উত্তরটা খুঁজে বের করা এবং তার পাশে প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা বসিয়ে নির্দেশ করা। এই ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর বিশ্লেষণাত্মক প্রতিক্রিয়া Analytical reaction) করার ক্ষমতা বিচার করা হয়। বিভিন্নভাবে এই প্রশ্ন তৈরি করা যায়। কোন সময় একদিকে অসম্পূর্ণ বাক্য রেখে অন্যদিকে যোজ্য শব্দগুলো রাখা হয়। শিক্ষার্থীর কাজ হ'ল যোজ্যতা খুঁজে বের করা এবং তা নির্দেশ করা।

নির্দেশ | নীচের প্রশ্নে দু'টো সারি আছে। বামদিকের সারিতে কতকগুলো বস্তু বা ধারণার নাম দেওয় আছে এবং তাব পাশের সাবিতে তাদেব অর্থ ব্যাখ্যা কবা আছে। কিন্তু অর্থগুলো ঠিক বস্তু বা ধাবণার পাশে লেখা নেই। প্রথম বামদিকেব সাবিতে লক্ষ্য কব এবং তার প্রত্যেকটি ধারণাব উপযোগী ব্যাখ্যাটি পাশের সারিতে খুঁজে বের কর। এরপর ঐ ব্যাখ্যাটিব পাশে ধারণাব যা ক্রমিক সংখ্যা আছে বসাও।

নমুনা ॥

প্রথম সারি	দ্বিতীয় সারি	
(ক) 'জ্যাষ্ট্-ল'	(ক) পবিবাহকের বোধ (Resistance)-সংক্রান্ত সূত্র।	( )
(খ) 'ল-অফ বেডিনেস্'	(খ) স্মৃতি-সংক্রান্ত সূ	( )
(গ) 'ল-অফ ফাইলেল বিগ্রেশ ন'	(গ) শিক্ষণ-সংক্রান্ত সূত্র।	( )
(ঘ) 'ওহম-ল'	(ঘ) বংশগতিব নিয়ম-সংক্রান্ত সূত্র।	( )

[পাঁচ] শ্রেণীকরণ (Classification type)

এই ধরনের প্রশ্নে কতকগুলো সমজাতীয় ধারণার সঙ্গে একটা অন্য ধারণাকে মিশিয়ে এক সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়। পরীক্ষার্থীর কাজ হ'ল বিজাতীয় শব্দটি খুঁজে বের ক'রে নির্দেশ করা। এই ধরনের প্রশ্ন সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণাত্মক চিন্তার (Analytical thinking) এবং সম্পর্ক-নির্ণয়ের ক্ষমতার প্রয়োজন হয়

নির্দেশ | নীচেব প্রত্যেক প্রশ্নে কতকগুলো ক'রে শব্দ বা ধারণা শ্রেণীভুক্ত করা আছে। এদের মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলি সমজাতীয় বা কোন-না-কোন দিক থেকে তাদের মধ্যে মিল আছে। যেটি ঐ শ্রেণীভুক্ত নয়, তার নীচে দাগ দিয়ে নির্দেশ কর।

॥ নমুনা ॥

(ক) চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, পাখা, আলমারি।
(খ) লোহা, তামা, পারদ, জল, রূপা।
(গ) শিরা, ধমনী, মস্তিষ্ক, জালক, হৃদ্‌পিণ্ড।
(ঘ) কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কেরল, চণ্ডীগড়।

[ছয়] উপমাণ নির্ণয় (Analogy Type)

এই ধরনের প্রশ্নে প্রথমে এমন দুটো বস্তু বা ধারণা দেওয়া থাকে যারা বিশেষ সম্পর্কে যুক্ত, পরে অপর আর একটা বস্তু বা ধারণা দিয়ে পরীক্ষার্থীকে এই তৃতীয় বস্তু বা ধারণার সঙ্গে কোন্ বস্তু বা ধারণার সম্পর্ক আছে, তা নির্ণয় করতে বলা হয়। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর কাজ হ'ল প্রথম দুটো শব্দের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্কে তৃতীয় শব্দ বা ধারণার সঙ্গে কোন্ শব্দ বা ধারণা যুক্ত, তা খুঁজে বের করা। এই ধরনের সমস্যা-সমাধানের জন্য খুব জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করতে হয়। প্রথমে পূর্বের জোড়া শব্দের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয় এবং পরে সেই সম্পর্কে তৃতীয় শব্দের সঙ্গে কোন্ শব্দ যুক্ত, তা স্থাপন করতে হয় (Education of correlates)। নিম্নের উদাহরণ থেকে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হবে।

নির্দেশ

নীচের প্রত্যেক প্রশ্নে তিনটি ক'রে শব্দ দেওয়া আছে, এদের প্রথম দুটোর মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্ক কোন্ শব্দের সঙ্গে প্রদত্ত তৃতীয় শব্দের আছে, তা নির্ণয় কর এবং পাশে লিখ।

॥ নমুনা ॥

(ক) চোখের সঙ্গে দেখার যে সম্পর্ক, কানের সঙ্গে কার সে সম্পর্ক? —
(খ) পেনসিলের সঙ্গে ড্রয়িং-এর যে সম্পর্ক, তুলির সঙ্গে কার সে সম্পর্ক? —
(গ) সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর যে সম্পর্ক, পৃথিবীর সঙ্গে কার সে সম্পর্ক? —
(ঘ) মানুষের সঙ্গে ভাতের যে সম্পর্ক, গরুর সঙ্গে কার সে সম্পর্ক? —

এদের সাধারণতঃ নিম্নাকারে পরিবেশন করা হয়—

(ক)	চোখ	: দেখা	::	কান	:	?——
(খ)	পেনসিল	: ড্রয়িং	::	তুলি	:	?——
(গ)	সূর্য	: পৃথিবী	::	পৃথিবী	:	?——
(ঘ)	মানুষ	: ভাত	::	গরু	:	?——

॥ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা ॥

॥ আলোচনা ॥

(Objective Type Questions)

এই ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির কথা অনেক শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিদ্ বলেছেন। এদের মাধ্যমে গতানুগতিক পরীক্ষার অনেক দোষত্রুটি দূর করা যায়। বিশেষভাবে, ব্যক্তিগত উপাদানের যে খারাপ প্রভাব, তার থেকে পরীক্ষাকে মুক্ত করা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র প্রশ্নের গঠন বদলালেই পরীক্ষা-পদ্ধতি আদর্শ হবে না। কারণ, তার অন্যান্য ত্রুটিও আছে, যেমন নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), যথার্থতা (Validity) এবং সাধারণ তাৎপর্য-নির্ণয়ের অসুবিধা, তুলনাযোগ্য পরিমাপ পাওয়ার অসুবিধা ইত্যাদি। পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে ত্রুটিহীন করতে হ'লে এগুলোও দূর করার প্রয়োজন। তাই বর্তমান কালে মনোবিদ্‌রা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তাঁরা প্রশ্নপত্রের সংস্কারের কথাও বলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় প্রশ্নের ভিত্তিতে আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা (Standardized achievement test) গঠন করতে বলেছেন।

॥ আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা ॥

(Standardized Achievement Test)

আদর্শায়িত অভীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি এবং তাৎপর্য-নির্ণয়েব পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা থাকে। আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা বলতে আমরা বুঝি এমন এক প্রশ্নপত্র যার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর পারদর্শিতা একটা নির্দিষ্ট সাংখ্যমানে প্রকাশ করা যায়।

আদর্শায়িত অভীক্ষা কি ?

(The standardized achievement test are those which express the achievement of the pupil in different school subjects or any skill in a single score.) আদর্শায়িত অভীক্ষার পরিচালনা-পদ্ধতি, মান-নির্ণয়ের নিয়ম সবকিছু নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা। এর মধ্যে যে প্রশ্নগুলো (test item) বলা হয়ে থাকে, সেগুলো নৈর্ব্যক্তিক ধরনের (Objective type) এবং তাদের উত্তর খুব সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। এই সব প্রশ্নের একের বেশী উত্তর থাকে না, ফলে এই অভীক্ষা বিদ্যালয়ে নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং তুলনা করার সুবিধা হয়। এই ধরনের আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরি করার জন্য কতকগুলো স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। সেই স্তরগুলোর উল্লেখ করলে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা আরও পরিষ্কার হবে।

॥ আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা-গঠনের বিভিন্ন সোপান ॥

(Steps for the Construction of Standardized Achievement Test)

[এক] আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরি করতে হ'লে প্রথম যে বিশেষ বিষয়ের অভীক্ষা,

যে শ্রেণীর জন্য তৈরি করতে চাই, সেই শ্রেণীতে সেই বিষয়ের পারদর্শিতা বলতে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে ধারণা স্থির করতে হবে। যদি অঙ্কের একটি অভীক্ষা তৈরি করতে চাই সপ্তম শ্রেণীর জন্য, সপ্তম শ্রেণীর অঙ্কের পারদর্শিতা বলতে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে একটা ধারণা আগে নিতে হবে এবং একই সঙ্গে পরিষ্কার ক'রে বলার দরকার, কি কি আচরণের মধ্যে সেই সব গুণ প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ, কি কি ধরনের সমস্যা সমাধান করতে পারলে আমরা বলব তার সপ্তম শ্রেণীর অঙ্কের পারদর্শিতা আছে। এ পর্যায়কে বলা হয় **ধারণা গঠনের পর্যায়** (Stage of concept formation)।

কার্যকরী ধারণা গঠন

[**দুই**] এখন, দ্বিতীয় পর্যায়ে পূর্বোক্ত ধারণা অনুযায়ী অভীক্ষা প্রশ্ন (test item) নির্বাচন করতে হয়। শিশুর যে ধরনের ক্ষমতাগুলোর বিকাশ করতে চাইছি অঙ্কের মধ্য দিয়ে, সেইগুলো যাতে প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, সে দিক লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে। এই পর্যায়কে বলা হয় **প্রশ্ন-নির্বাচনের** (item selection) **স্তর**।

প্রশ্ন-নির্বাচন

[**তিন**] এরপর এই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞ শিক্ষকের মতামত নেওয়ার দরকার হয়। তাতে ক'রে যদি প্রশ্ন-নির্বাচনে ভুল থাকে, তাহ'লে তা দূর করা সম্ভব হবে। এই পর্যায়কে বলা হয় অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা **বিচারকরণের** (expert verification) **স্তর**।

বিচারকরণ

[**চার**] অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা বিচারকরণের পর প্রশ্নগুলোকে কাঠিন্যের ক্রমে সাজানো হয় (arranged in order of difficulty) এবং একটা সময়সীমা আপাতভাবে নির্দেশ করা হয়। এরপর ঐ প্রশ্নগুলো শ্রেণীর জন্য অভীক্ষা তৈরি হ'চ্ছে, সেই শ্রেণীর এক বাছাই দলের (sample) ওপর প্রয়োগ করা হয়। এই পর্যায়কে বলা হয় **প্রাথমিক পরীক্ষণের** (Try out) **স্তর**।

প্রাথমিক পরীক্ষণ

[**পাঁচ**] এরপর শিক্ষার্থীদের উত্তর-পত্রগুলোর সাংখ্যমান নির্ণয় করা হয় এবং রাশি-বিজ্ঞানের বিশেষ কৌশল অবলম্বন ক'রে, শেষবারের মত প্রশ্ন ঠিক করা হয়। এখানে প্রত্যেক প্রশ্নের বিভাজন-ক্ষমতা (Discriminating value) এবং কাঠিন্য (difficulty value) বিচার ক'রে দেখা হয়। যে প্রশ্নগুলোর বিভাজন-ক্ষমতা নেই, সেগুলোকে বাদ দেওয়া হয়। আর প্রশ্নগুলোকে তার কাঠিন্যানুসারে সাজানো হয়। এই পর্যায়কে বলা হয় **প্রশ্ন-বিশ্লেষণের** (Item-analysis) **স্তর**। এই পর্যায়ের সময়ও স্থির করা হয়।

প্রশ্ন-বিশ্লেষণ

[**ছয়**] পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করার পর যে প্রশ্নগুলো থাকে, সেগুলোকে একত্রিত ক'রে কাঠিন্যানুসারে সাজিয়ে পূর্ণ অভীক্ষা তৈরি করা হয় এবং আবার ঐ শ্রেণীর আরও বেশীসংখ্যক শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ করা হয়। এই শিক্ষার্থীদের একই সঙ্গে ঐ বিষয়ে অন্যান্য পুরাতন আদর্শায়িত অভীক্ষাও দেওয়া হয়।

সর্বশেষ প্রয়োগ

[সাত] এই নতুন অভীক্ষার ফলাফলকে পুরাতন অভীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখা হয়। যদি তাদের সাংখ্যমান প্রায় সমান হয়, তা'হলে বুঝতে হবে অভীক্ষাটির যথার্থতা (validity) আছে। এই যথার্থতা সহগতির সহগাঙ্কের (Co-efficient correlation) দ্বারা নির্ণয় করা হয়।

যথার্থতা নির্ণয়

[আট] এরপরে নির্ভরযোগ্যতা বিচার করে দেখা হয়। নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন রাশি-বৈজ্ঞানিক কৌশল (Statistical technique আছে। তার যে-কোন একটি প্রয়োগ ক'রে নির্ভরযোগ্যতা দেখা হয়। যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যদি ঠিকমত থাকে, তা'হলে অভীক্ষা তৈরির কাজ অনেকটা হ'য়ে গেছে বলা যায়।

নির্ভরযোগ্যতা

[নয়] এই অভীক্ষাতে প্রশ্নের উত্তরগুলো মূল্যায়নের সময় কি ধরনের সাংখ্যমান নির্দেশ-পদ্ধতি কিভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, কিভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিতভাবে অভীক্ষার সঙ্গে দিতে হবে, যাতে যে-কোন শিক্ষক এই অভীক্ষা প্রয়োগের সময় ঐ নিয়ম অনুসরণ করেন। এতে ক'রে বিভিন্ন পরীক্ষকের মধ্যে যে পার্থক্য হয়, তা দূর করা যায়। এই পর্যায়কে বলা হয় নির্দেশপত্র (Scoring key) গঠনের স্তর।

সাংখ্যমান নির্ণয়ের পদ্ধতি নির্দেশ

[দশ] সবশেষে, অভীক্ষার ফলাফলের তাৎপর্য-নির্ধারণের জন্য এই অভীক্ষার একটা সাধারণ মান (Norm) বা তুল্যাঙ্ক দেওয়া হয়, যাতে ক'রে যে-কোন শিক্ষক তার ফলাফল ঐ সাধারণ মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন। এই মানও রাশিবিজ্ঞানের কৌশলে নির্ণয় করা হয়।

তাৎপর্যের মান নির্ধারণ

॥ আদর্শায়িত অভীক্ষার গুণাবলী ॥

(Merit of Standardized Test)

আধুনিক নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার অনেক গুণ আছে। গতানুগতিক পরীক্ষার তুলনায়, এর পরীক্ষা অনেক ত্রুটিহীন। গতানুগতিক পরীক্ষার মধ্যে যে সংকীর্ণতা আছে, এই পদ্ধতি তা অনেকাংশে দূর করতে পারে। যেমন—

(১) এই ধরনের অভীক্ষায় যাথার্থ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই অভীক্ষা ঠিক যে বিষয়ের জন্য তৈরি, সেই বিষয়ের পারদর্শিতা বিশেষভাবে পরিমাপ ক'রে এবং অন্য গুণকে বিচার ক'রে দেখে না। ফলে, পরিমাপ অনেক সঠিক হয়।

(২) এই ধরনের অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কোন চিন্তা করতে হয় না, কারণ উন্নত ধরনের গাণিতিক কৌশল দ্বারা তা নির্ধারণ করা হয়। ফলে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরীক্ষার ফলাফল স্থির থাকে।

(৩) এই অভীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে রচনা করা হয় বলে বিভিন্ন পরিক্ষকের মধ্যে পার্থক্য থাকার অবকাশ থাকে না।

(৪) এই অভীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তুলনা করা যায়। কারণ, এর প্রয়োগবিধি অনেক সহজ এবং পরিস্থিতির প্রভাব-নিরপেক্ষ।

(৫) এই অভীক্ষার উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কম পরিশ্রম করতে হয় এবং পরীক্ষকদেরও মান নির্দেশ করার সময় পরিশ্রম অনেক কম হয়।

(৬) অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর মুখস্থ-করা জ্ঞানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তার বোধগম্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৭) এই অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর বিষয়ে সমগ্র অংশের পরীক্ষা করা হয়। শুধুমাত্র কয়েকটি নির্বাচিত অংশ থেকে পরীক্ষা করা হয় না। প্রশ্নের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে এবং ফলে তা সম্পূর্ণ পাঠ্য বিষয়ের ওপর থেকে প্রশ্ন করা হয়।

(৮) এই ধরনের অভীক্ষায় পরীক্ষাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের (Objectives) সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে বিবেচনা করা হয়।

এই সমস্ত দিক্ থেকে বিবেচনা করলে বলা যায়, গতানুগতিক পরীক্ষার তুলনায় এই ধরনের পরীক্ষা অনেক উন্নত এবং এর বহুল প্রচার করার জন্য আধুনিক প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্‌ই সচেষ্ট। কিন্তু তাহ'লেও এর কতকগুলো অসুবিধা থেকেই যায়। তাই অনেকে এর প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেছেন।

মন্তব্য

॥ আদর্শায়িত অভীক্ষার ত্রুটি ॥

(Demerits of Standardized Achievement Test)

[এক] নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা তৈরি করতে শিক্ষকের অনেক পরিশ্রম হয়। দৈনন্দিন কাজের চাপ তাঁদের ওপর এত বেশী থাকে যে, সব কিছু ক'রে তারপর নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করার সময় তাঁদের হ'য়ে ওঠে না। তাছাড়া, এই ধরনের অভীক্ষায় অর্থের খরচও বেশী হয় যা সব বিদ্যালয়ের পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে প্রশ্ন করলে, প্রশ্নপত্রের দৈর্ঘ্য অনেক বেশী হয় এবং ছাপা খরচ অনেক বেড়ে যায়।

সময়ের অভাব

[দুই] এই জাতীয় অভীক্ষা তৈরি সাধারণ শিক্ষক দ্বারা সম্ভব হয় না, তাতে এত ত্রুটি থেকে যাবে যে, তা গতানুগতিক পরীক্ষার চেয়েও খারাপ ফল দেবে। তাই বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন। সাধারণতঃ এই ধরনের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব বিদ্যালয়ে আছে। তাই এই ধরনের অভীক্ষার বহুল প্রচার ব্যবহারিক দিক্ থেকে সম্ভব হ'য়ে ওঠে না।

দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা

[তিন] যাঁরা অভীক্ষা তৈরি করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাব যে এর ওপর এসে একবারে পড়ে না, এ কথা বলা যায় না। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তিভেদে প্রাথমিক ধারণার তফাত হওয়া স্বাভাবিক এবং এই কারণে দেখা গেছে, যতই একে নৈর্ব্যক্তিক বলা হোক, বিভিন্ন পরীক্ষক-ভেদে শিক্ষার্থীর পরিমাপের পার্থক্য হয়। তবে গতানুগতিক পার্থক্যের তুলনায় এই পার্থক্য অনেক কম।

ব্যক্তিগত প্রভাব

[চার] অনেক সময় শিক্ষার্থীরা এইসব প্রশ্নের উত্তর অনুমানের ওপর দেয়। হয়ত পাঁচটা প্রশ্নের নীচে দাগ দিতে হবে, শিক্ষার্থীরা যদি ইচ্ছামত দাগ দিয়ে যায়, তা'হলে এমন হ'তে পারে দুটো ঠিক হ'য়ে গেল। এক্ষেত্রে সঠিকভাবে বুঝবার উপায় থাকে না যে, শিক্ষার্থী কতটা অনুমানের ওপর নির্ভর করেছে এবং কতটা উত্তর করেছে তার প্রকৃত জ্ঞানে।

অনুমানের প্রভাব

[পাঁচ] অনেক সময় পরীক্ষার্থীরা এই জাতীয় প্রশ্নের নির্দেশ ঠিকমত বুঝতে পারে না ব'লে প্রশ্নের উত্তর করতে পারে না। তাছাড়া, এইসব প্রশ্ন এমন ধরনের হয় যে, এখানে নানা ধরনের মানসিক কৌশল ও প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করতে হয়। সুতরাং এই ধরনের অভীক্ষা শুধু যে শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরিমাপ করে তাই নয়, অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়াকেও পরিমাপের ক্ষেত্রে বিবেচনা করে। যে পরীক্ষার্থীর বিভেদমূলক প্রতিক্রিয়া (discriminating response) করার ক্ষমতা কম, সে অনেক সময় যোজ্যতামূলক প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে পারে না। আবার ঐ প্রশ্ন যদি 'সম্পূর্ণকরণে'র মাধ্যমে দেওয়া হয়, সেগুলোর সব উত্তর সে করতে পারে। সুতরাং শিক্ষার্থীর জ্ঞান-পরিমাপের ক্ষেত্রে এগুলো যে সব সময় সঠিক ফল দেবে, তার কোন স্থিরতা নেই।

শিক্ষার্থীর বিশেষ অসুবিধা

[ছয়] এই অভীক্ষার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হ'ল এদের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান যেভাবে ব্যবহার করা হবে, তার কথা বিচার না ক'রে পরীক্ষা করি। জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটা একেবারে গ্রাহ্য করা হয় না। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রকাশভঙ্গী, চিন্তাশক্তি, লেখার ভঙ্গী ইত্যাদি পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। সভ্য জগতে এগুলোরও মূল্য অনেক। কারণ ব্যক্তির মধ্যে শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, তার সুষ্ঠু প্রকাশ হওয়াও দরকার। শিক্ষার্থীর উপলব্ধি (Appreciation), কল্পনাশক্তি (imagination) ইত্যাদি এই অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা হয় না।

জ্ঞান-প্রয়োগের অসুবিধা

[সাত] সবশেষে, শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ এই অভীক্ষার দ্বারা করা যায় না। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীকে দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক দিকে বিকাশসাধন করা। এতে শুধুমাত্র মানসিক বিকাশেরই পরিমাপ হয়। তাই আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্ এবং মনোবিদ্‌রা এই ধরনের পরীক্ষার পরিবর্তে মূল্যায়নের (Evaluation) ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

সামগ্রিক বিকাশ পরিমাপ করা যায় না

এই ধরনের বিভিন্ন দোষত্রুটি থাকলেও নৈর্ব্যক্তিক আদর্শায়িত পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা-ব্যবস্থার চেয়ে যে ভাল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইসব অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), যথার্থতা (Validity), নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) গতানুগতিক পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশী। তাই গতানুগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তে এদের গ্রহণ করলে, পরীক্ষা-পদ্ধতি সংস্কারের পথে এক ধাপ এগিয়ে থাকবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর যে বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে শিক্ষকের ব্যক্তিগত অসুবিধাগুলো খুব সহজেই দূর করা যায়, বাকী অন্যান্য সাংগঠনিক ত্রুটিগুলি, আশা করা যায়, মনোবিদ্‌দের চেষ্টায় নিশ্চয়ই দূর করা সম্ভব হবে। কারণ, পরিমাপের কৌশল ও পদ্ধতির ওপর আধুনিক মনোবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে।

আলোচনা

॥ প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষার সংস্কার ॥
(Reformation of Essay type Examination)

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা-পদ্ধতির বিভিন্ন অসুবিধার কথা চিন্তা ক'রে অনেক শিক্ষাবিদ্ প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থাব সংস্কারের কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, নতুন পরীক্ষা-পদ্ধতি একদিকে খুবই পরিশ্রমসাধ্য, তাতে যদি আবার তার এত দোষত্রুটি থাকে, তবে প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করাই ভাল। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন ধরনের উন্নত কৌশলের কথা বলেছেন যার দ্বারা গতানুগতিক পরীক্ষায় উন্নতি সাধন করা যায়। এর মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার কিছু ভাল উপাদানেরও সংযোজন করার চেষ্টা হ'য়েছে ; সঙ্গে সঙ্গে রচনাধর্মী পরীক্ষ'র ভাল দিক্‌গুলির কথাও বিবেচনা করা হ'য়েছে।

[এক] এই পদ্ধতিতে কোন বিশেষ বিষয়ে প্রশ্ন করার পূর্বে পরীক্ষক বা শিক্ষক ঠিক ক'রে নেবেন, সেই বিষয় পড়ানোর উদ্দেশ্য কি কি? এরপরে তিনি ঐ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে প্রশ্ন রচনা করবেন, এতে ক'রে প্রশ্নের সংখ্যার সঙ্গে সমতা রেখে শিক্ষার উদ্দেশ্য-উপযোগী পরিমাপের ব্যবস্থা করা যাবে।

উদ্দেশ্য-উপযোগী প্রশ্ন

[দুই] পরীক্ষার প্রশ্নের সংখ্যা যত বেশী হবে, নির্ভরযোগ্যতাও তত বেশী হবে। তবে সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি প্রশ্ন করতে হয়, রচনাধর্মী পরীক্ষায় খুব বেশী প্রশ্ন দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এই অসুবিধাকে দূর করার জন্য গতানুগতিক প্রশ্নের রীতিকে বদলে সংক্ষিপ্ত উত্তর (short-answer-type) হয়, এরকম কতকগুলো প্রশ্ন দেওয়া ভাল। তবেই সব ক্ষেত্রেই সময় স্থির করার সময় সুবিবেচনার দরকার।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

[তিন] একই প্রশ্ন দুবার যেন প্রশ্নপত্রে না থাকে, প্রশ্ন-রচনার সময় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া, এমন প্রশ্ন করা হবে না বা আংশিকভাবে অন্যের উত্তরের সঙ্গে মিলে যায়। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিতে প্রশ্নপত্রের নির্ভরযোগ্যতা কমে যায়।

প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি বন্ধ

[চার] প্রশ্নের ভাষা যেন সাধারণের বোধগম্য হয় এবং কি উত্তর চাওয়া হ'চ্ছে তা যেন প্রশ্নের ভেতর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে। যে শিক্ষার্থী জানা সত্ত্বেও প্রশ্ন না বুঝতে পারার জন্য লিখতে পারেনি, সেটা তার দোষ নয়, দোষ প্রশ্নকর্তার, কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল তার প্রকৃত জ্ঞান পরীক্ষা করা। সে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগই যদি না পায়, তাহ'লে তাকে পরিমাপ করব কি ক'রে?

প্রশ্নের স্পষ্টতা

[পাঁচ] প্রশ্নের উত্তরে নম্বর দেওয়ার পূর্বে একটা পরিকল্পনা ক'রে নেওয়া উচিত। প্রত্যেক প্রশ্নকে বিশ্লেষণ ক'রে তার কি উত্তর হবে তা নির্দেশ ক'রে প্রত্যেক অংশের জন্য কত নম্বর দেওয়া হবে, তা সব ঠিক ক'রে নিলে নম্বর দেওয়ার কাজকে অনেকটা ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থার প্রভাবমুক্ত করা যায়।

নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি

[ছয়] প্রশ্নের উত্তর একজন পরীক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা না করিয়ে অন্ততঃপক্ষে দু'জন পরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা করালে ভাল হয়। যদি একটি পরীক্ষকের বোর্ড দ্বারা পরীক্ষা করানো যায়, তা'হলে অনেক ভাল হয়।

পরীক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধি

[সাত] উত্তরের সংখ্যাগত মান না দিয়ে গুণগত মান দেওয়ার কথা অনেক শিক্ষাবিদ্ বলেছেন। এতে ক'রে তুলনার সুবিধা হয়, তাছাড়া রচনাধর্মী পরীক্ষায় যখন শিক্ষার্থীর বিষয়ের পারদর্শিতা ছাড়াও অনেক গুণ পরিমাপ করা হ'চ্ছে, তখন গুণগত মান বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। মুদালিয়ার কমিশনও তাঁদের রিপোর্টে এই পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলেছেন। ('The system of symbolic rather than numerical marking should be adopted for evaluating and grading the work of the pupil in external examinations and in maintaining the school records".)

গুণগত মান প্রমাণ

[আট] শিক্ষার্থীদের উত্তর পরীক্ষার সময় পরীক্ষকরা যদি একটি প্রশ্ন পৃথকভাবে পরীক্ষা করেন, তা'লে খুব ভাল হয়। অর্থাৎ বিশেষ একটি প্রশ্ন বিভিন্ন পরীক্ষার্থী কেমন উত্তর দিয়েছে তা বিচার করে দেখেন, তাতে ক'রে তুলনা-মূলক বিচারের অনেক সুবিধা হয় এবং নম্বরেরও সমতা থাকে। সাধারণ পদ্ধতিতে যে এক-একজন পরীক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরপত্র এক সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়, তা ত্রুটিপূর্ণ। তাতে ক'রে পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা কমে যায়।

বিশেষ প্রশ্ন হিসেব মূল্য নির্ণয়

।। শিক্ষায় মূল্যায়ন ।।
(Educational Evaluation)

মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা শিক্ষাক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করছে এবং এই বিকাশের পেছনে আছে নতুন শিক্ষাদর্শনের প্রভাব। আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য

শিশুর শুধুমাত্র জ্ঞান, দক্ষতা বা বৌদ্ধিক বিকাশ নয়। তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর আগ্রহ, চিন্তনশক্তি, সামাজিক অভিযোজন-ক্ষমতা ইত্যাদি সবই বিকশিত করতে হবে। সুতরাং এই ধরনের বিকাশকে পরিমাপ করতে হ'লে পরিমাপের কৌশলকে এবং পরিমাপের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় এবং আরও সর্বাঙ্গীণ গুণসম্পন্ন করতে হবে। পরীক্ষা-পদ্ধতিকে এই সর্বাঙ্গীণ গুণসম্পন্ন করার চেষ্টা থেকেই 'মূল্যায়ন' (evalutation) কথার উৎপত্তি হ'য়েছে মনোবিদ্যা ও শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। 'মূল্যায়ন' বলতে আমরা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিমাপকে বুঝি। অর্থাৎ, বৌদ্ধিক, দৈহিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক—যত রকম গুণের বিকাশ শিক্ষার মধ্য দিয়ে হয় তার সুসমঞ্জস রূপ ব্যক্তি-জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করেছে, তার পরিমাপ করাকে বলে মূল্যায়ন। মূল্যায়ন বলতে খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন অংশের পৃথক পরিমাপ নয়, অর্থাৎ বৌদ্ধিক বিকাশের পরিমাপ করলাম—পৃথকভাবে পারদর্শিতার অভীক্ষা এবং বুদ্ধির অভীক্ষার সামাজিক বিকাশ পরিমাপ করলাম—সামাজিক বিকাশ পরিমাপক কোন অভীক্ষা দিয়ে নৈতিক বিকাশের পরিমাপ করলাম—কোন অভীক্ষা দিয়ে। এই ধরনের পরিমাপকে মূল্যায়ন বলব না, মূল্যায়ন করব আমরা ব্যক্তির। তার জীবনের সকল দিকের বিকাশের ফলে ব্যক্তি যে একক জৈব-মানসিক সত্তার অধিকারী হ'য়েছে, তার পরিমাপকে বলা হবে মূল্যায়ন। মন্‌রো (W. S. Monroe) মূল্যায়ন ও পরিমাপ (Evaluation and Measurement)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে এই কথাই বলেছেন ".. in measurement the emphasis is upon single aspect of subject-matter, achievement of specific skills and abilities, whereas in evaluation the emphasis is upon broad personality changes and major objectives of educational programme." ব্যক্তিত্বের এই মূল্যায়নের জন্য পরিমাপ কৌশল সাহায্য করে মাত্র। পরিমাপই শেষ কথা নয়, এটা একটা পন্থামাত্র—এ কথা আধুনিক সকল শিক্ষাবিদ্‌ই স্বীকার করেন।

মূল্যায়ন কি ?

॥ মূল্যায়নের সোপান ॥

(Steps for evaluation)

বিদ্যালয়ে মূল্যায়নের ধারণাকে কাজে লাগাতে হ'লে কতকগুলো স্তরের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হবে। মূল্যায়ন গতানুগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতি ও গতানুগতিক পরীক্ষা-সংক্রান্ত ধারণার চেয়ে উন্নত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মূল্যায়নের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হ'লে আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরির মত কতকগুলো স্তরের মধ্য দিয়ে এগোতে হবে।

প্রথমতঃ, পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য (Objectives of curriculum) সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা স্থাপন করতে হবে। কারণ, মূল্যায়ন হবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বা শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। কি কি আদর্শ নিয়ে আমরা বিদ্যালয়ে কাজ করছি, সেগুলোকে তালিকার আকারে সাজাতে হবে।

উদ্দেশ্য-স্থাপন

দ্বিতীয়তঃ, ঐ সব ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বা আদর্শগুলো যদি শিক্ষার্থী অর্জন করে, তা'হলে তাদের মধ্যে কি ধরনের বহিঃআচরণের পরিবর্তন হবে বা ব্যক্তির আচরণের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা বুঝব যে, তার মধ্যে সেই গুণগুলো বিকশিত হয়েছে। সেই আচরণগুলোকে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

আচরণগত বহিঃ-প্রকাশ

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন ধরনের আচরণগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপ ক'রার জন্য যে সব মানসিক অভীক্ষা আছে, তা সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলোকে শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ ক'রে তাদের আচরণগত উন্নতির পরিমাপ করতে হবে।

অভীক্ষা-সংগ্রহ

চতুর্থতঃ, এমন অনেক সময় হতে পারে যে, কোন কোন আচরণগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য কোন আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardized test) নেই। সে সব ক্ষেত্রে ঐ আচরণ পরিমাপক অভীক্ষা তৈরি করতে হবে। এই অভীক্ষা তৈরি করার জন্য অভীক্ষা-প্রস্তুতকরণের সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হবে।

অভীক্ষা-প্রস্তুতকরণ

পঞ্চমতঃ, পূর্বোক্ত বিভিন্ন নতুন অভীক্ষাগুলি এবং সংগৃহীত অভীক্ষাগুলির সবই ছাত্রদের উপর বুদ্ধিসম্মতভাবে প্রয়োগ ক'রে ফলাফল বিচার করা হবে।

প্রয়োগ

ষষ্ঠতঃ, এই পরিমাপের ফলাফলের তাৎপর্য নির্ণয় ক'তে পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যের (Curricular Objectives) পরিপ্রেক্ষিতে। সমস্ত পরিমাপ-গুলিকে একত্রিত ক'রে যদি তার সামগ্রিক তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে কি না বোঝা যাবে না।

তাৎপর্য-নির্ণয়

এর থেকে বোঝা যায়, মূল্যায়নে ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের ওপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। সামগ্রিকভাবে পরিমাপের কৌশলের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন বিভিন্ন পরিমাপকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হ'লে, তাদের একত্রিত করার দরকার এবং তা ঠিক তাৎপর্য অনুসারে হ'লে ভাল হয়। এই কারণে মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন পরিমাপ ও শিক্ষার্থী-সম্পর্কীয় খবরাখবর একত্রে সুসজ্জিতভাবে তালিকাভুক্ত করার প্রয়োজন। তাছাড়া. তার বিকাশের ধারাকে প্রকৃতভাবে অনুশীলন করতে হ'লে ধারাবাহিক রেকর্ড থাকার দরকার। এই কারণে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা বিশেষ এক ধরনের রেকর্ড করার

মন্তব্য

পদ্ধতির কথা বলেছেন, যাকে বলা হয় "কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড" (Cumulative Record Card)। এছাড়া আরও নানা ধরনের রেকর্ড করার পদ্ধতি আছে। তবে এই পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় এবং কার্যকরী।

॥ মূল্যায়ন ও কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড ॥
(Evaluation and Cumulative Record Card)

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ডে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দিকের পারদর্শিতা এবং তার সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর একত্রে ক্রমানুসারে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এই তালিকাকে যতদূর স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হ'য়েছে এবং এখন শিক্ষাবিদ্‌রা এর ওপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন কি ক'রে এর আরও উন্নতি করা যায়, কিভাবে এর মধ্যে আরও বেশী পরিমাণ তথ্য সংযোজন করা যায়। সাধারণতঃ এই রেকর্ডে বিভিন্ন অংশে শিক্ষার্থীর জীবন-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য লিখে রাখা হয়। এর মূল অংশগুলো হ'ল—

(১) **শিক্ষার্থী সম্পর্কে সাধারণ তথ্য** (General information about Pupil)—এখানে নাম, বয়স, ভর্তির তারিখ, পূর্বের বিদ্যালয় পরিবর্তনের কারণ ইত্যাদি সাধারণ তথ্য লেখা থাকে।

(২) **গৃহ-পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য** (Information about Home or Family)—এখানে গৃহ-পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর লেখা হয়—বাবার নাম, মায়ের নাম কতজন ভাইবোন, পরিবারের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি।

(৩) **দৈহিক বা স্বাস্থ্যগত তথ্য** (Information about Health)—শিক্ষার্থীর উচ্চতা, ওজন এবং বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসক যে রিপোর্ট দিয়েছেন, সে সম্পর্কে এখানে লেখা হয়।

(৪) **বুদ্ধি ও অন্যান্য ক্ষমতা-সংক্রান্ত তথ্য** (Information about Mental Abilities —এখানে বুদ্ধির অভীক্ষার ফলাফল লেখা হয়।

(৫) **পাঠ্য বিষয়ের সাফল্য** (Achievement in different School Subjects)—এখানে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে কি রকম পারদর্শিতা, শিক্ষার্থীকে দেখিয়ে লিখে রাখা হয়।

(৬) **ব্যক্তিগত গুণাবলীর পরিমাপ** (Personality traits)—এই অংশে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের (Personality traits) পরিমাপ লিখে রাখা হয়। যেমন—সামাজিকতা, সৎসাহস, সহযোগিতা ইত্যাদি গুণগুলোর বিজ্ঞান-সম্মত পরিমাপের ফলই এখানে লেখা হয়। এক কথায়, আমরা একে ব্যক্তি-সত্তার পরিমাপই বলতে পারি।

(৭) **সহপাঠ্যক্রমিক কাজের বিবরণী** (Record of Co-curricular Activities)—শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে কি ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজে যোগ দিয়েছে এবং কতটা পারদর্শিতা দেখিয়েছে, সে সব কিছু এই অংশে থাকে।

(৮) বিশেষ গুণ (Special qualities)—এই অংশে শিক্ষার্থীর কোন্ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ (Interest) আছে, তার হার কি, সাধারণতঃ কিভাবে সময় কাটায় ইত্যাদি তথ্য লেখা থাকে।

এছাড়া, শিক্ষার্থীর যদি বিশেষ কোন তথ্য বাদ পড়ে যায়, তার জন্য একটা সাধারণ অংশ থাকে, যেখানে শিক্ষক সেটা লিখে রাখতে পারেন।

এক কথায় বলা যেতে পারে, কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড শিক্ষার্থী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য একত্রে ধরে রাখে। তাই এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন মনোবিদ্ বলেছেন—"It is a systematic body of informations about the individual". সুতরাং এই ধরনের কার্ড বা ধারাবিবরণীর মূল্য যে শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিসীম প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রধান শিক্ষক সকলেই এর দ্বারা উপকৃত হবেন এবং পরীক্ষার যা উদ্দেশ্য তাও খুব সহজে সফল হবে। মুদালিয়ার কমিশনে এই কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। কমিশন সুপারিশ করতে গিয়ে বলেছেন—"In order to find out the pupil's all round progress and to determine his future, proper system of school records should be maintained for every pupil, indicating the work done by him for time, and his attainments in different spheres."

কিন্তু এই ধরনের রেকর্ড রাখতে গেলে শিক্ষকের খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয়, এটা তাঁর কাছে খুবই পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে এখন যে কাজ করতে হয়, তার ওপর যদি এটা চাপানো হয়, তাহ'লে সে-দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন না। কিন্তু এ সম্পর্কেও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (মুদালিয়ার) বলেছেন, "প্রথমটা অসুবিধা হবে ঠিকই, কিন্তু একবার ঠিকমত প্রবর্তন করতে পারলে, তার ভাল ফ. শিক্ষকরাও পাবেন।" তাই শিক্ষার্থীর উন্নতিকল্পে, শিক্ষকের নিজের কাজের সুবিধার্থে এবং আধুনিক মূল্যায়নের ধারণাকে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির জন্য প্রয়োগ করতে হ'লে এই ধরনের রেকর্ড প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ধরনের বিবরণী থেকে ব্যক্তি সম্পর্কে যে সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে তা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ধারাকে সার্থকভাবে অনুশীলন করতে সহায়তা করবে।

মন্তব

।। বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষা ।।
(Public Examination)

প্রত্যেক দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিতে দু'ধরনের পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন আছে। এই শ্রেণীবিভাগ করা হ'য়েছে পরিচালকমণ্ডলীর পার্থক্যভেদে। পরীক্ষা-পরিচালনার রীতিতে এই পরীক্ষকের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দু'ভাগে ভাগ করা হ'চ্ছে।

যেমন সংগঠনের দিক্ থেকে দু'ভাগ করা হয়েছে—প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা (Essay type Examination) এবং নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective type Examination), তেমনি পরীক্ষকভেদেও পরীক্ষাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়—অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (internal examination) এবং বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষা (external examination)। যখন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং পরীক্ষার পরিচালক একই সংস্থা হয়, তখন সেই পরীক্ষাকে বলা হয় **অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা** (Internal Examination)। যেমন, বিদ্যালয়ে যে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, ষাণ্মাসিক পরীক্ষা (Half-yearly Examination), সাপ্তাহিক পরীক্ষা (Weekly test), বাৎসরিক পরীক্ষা (Annual Examination) ইত্যাদি। এইসব পরীক্ষা পরিচালনা করেন শিক্ষকরাই। যাঁরা প্রশ্নপত্র তৈরি করেন, তাঁরাই উত্তরপত্রের মান নির্ধারণ করেন এবং তাঁরাই শিক্ষাদান করেন। অন্যদিকে শিক্ষাসংস্থা এবং পরীক্ষার সংস্থা যখন পৃথক পৃথক সংস্থা হয়, তখন সেই ধরনের পরীক্ষাকে বলা হয় **বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষা** (External Examination)। যেমন, মাধ্যমিক পরীক্ষা (Madhyamik Pariksha) ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরীক্ষা (Higher Secondary Examination) এক-একটি পৃথক বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। তার সঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ কোন শিক্ষামূলক সংযোগ নেই। সব রকম ডিগ্রী পরীক্ষা এই জাতীয় পরীক্ষা। এই পরীক্ষা সাধারণভাবে সকল ছাত্রছাত্রীই দিতে পারে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অনুমোদিত শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীরা সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে। এইজন্য এদের অনেক সময় সাধারণ পরীক্ষা (Public Examination) বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়-আয়োজিত পরীক্ষা, কোন বিশেষ অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত পরীক্ষা, যেমন—মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, কারিগরি শিক্ষা পর্ষৎ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বহিঃসংস্থা পরিচালিত পরীক্ষার প্রকৃতি

।। বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষার ত্রুটি ।।
(Defects of Public Examination)

যদিও এই ধরনের পরীক্ষা-গ্রহণের রীতির বহুল প্রচলন আছে, তবু একথা ঠিক যে, এর মধ্য দিয়ে নানারকম গলদ শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে। তাই আধুনিক কালের শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, এই ধরনের পরীক্ষায় সাধারণ পরীক্ষা প্রথার সমস্ত দোষই বর্তমান। তাছাড়া, এর নিজস্ব কতকগুলো ত্রুটি আছে। এই ধরনের পরীক্ষা প্রথার সাধারণ যা দোষ, তা হ'ল—

রচনাভিত্তিক হওয়ার দরুন অসুবিধাবলী

*(১) নির্ভরযোগ্যতার অভাব
*(২) যাথার্থ্যের অভাব,
*(৩) নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব,
*(৪) তুলনা করার অসুবিধা,
*(৫) বোধগম্যতাকে বাদ দিয়ে প্রকাশ-ভঙ্গীকে বড় ক'রে দেখা,
*(৬) তাৎপর্য-নির্ণয়ের অসুবিধা,
*(৭) মুখস্থের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান
*(৮) প্রশ্ন বেছে পড়ার স্বভাব গঠন।

এছাড়া, বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষার নিজস্ব অনেক ত্রুটি আছে। যেমন—

পরীক্ষা-কেন্দ্রিক শিক্ষা

(৯) এই ধরনের পরীক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষা-কেন্দ্রিক হ'য়ে পড়ে। পরীক্ষায় পাশ করাই শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাধান্য লাভ করে, চারিত্রিক অন্যান্য গুণের বিকাশ গৌণ হয়। এর ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

প্রশ্নের ত্রুটি

(১০) এই ধরনের পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তাদের সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের কোন সংযোগ থাকে না। অনেক সময় তাঁদের এই স্তরের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান কতটা হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে ধারণাও থাকে না। ফলে, প্রশ্ন শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের উপযোগী হয় না।

অপ্রীতিকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা

(১১) এই ধরনের পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপ্রীতিকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। যার জন্য সামাজিক গুণগুলোর সুস্থ বিকাশের চেষ্টা বিদ্যালয়ে ব্যর্থ হয়। তাই অনেকে পরীক্ষাকে Necessary evil বলে মনে করেন।

সঠিক পরিমাপের অসুবিধা

(১২) শিক্ষার্থীরা এই ধরনের পরীক্ষায় অনেক সময় পরীক্ষককে ঠকানোর জন্যে প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়ে একটা আবরণের আড়ালে উত্তর লিখে যায়। যেহেতু এক্ষেত্রে কোন স্থিরনির্দিষ্ট মান থাকে না, সেহেতু এইভাবে পরীক্ষা দিয়েও তারা উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়।

অসদুপায় অবলম্বন

(১৩) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরীক্ষকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ না থাকায় পরীক্ষার কৃতি সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা হয় না। এর ফলে পাশ করার জন্য তারা অনেক সময় অসদুপায় অবলম্বন করে।

ধারাবাহিক বিকাশের পরিমাপ হয় না

(১৪) এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক বিকাশের পরিমাপকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সাময়িক একটা প্রভাবই মাত্র দেখা হয়; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী কতটুকু প্রশ্নগুলির উত্তর করতে পেরেছে, তাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। ফলে, এই সময় যদি বিশেষ কোন কারণে তার মানসিক অবস্থা ভাল না থাকে, তবে সে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ভাল ফল করলেও তার কোন গুরুত্ব এখানে নেই।

---

*[এগুলো সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, পুনরাবৃত্তি করলাম না।]

॥ বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষার সংস্কার ॥
(Reforms of Public Examination)

বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষার মধ্যে উপরি-উক্ত দোষত্রুটি আছে বলে বর্তমান কালে শিক্ষাবিদ্‌রা একে উঠিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁরা যতদূর সম্ভব অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে বলেছেন। অনেক প্রগতিশীল দেশে তাই আজকাল বিদ্যালয়গুলো নিজেরাই শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির সংগঠনের মধ্যে এমন অনেক গলদ আছে যার জন্য এই ধরনের পরীক্ষাকে হঠাৎ উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এর কিছু উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা উচিত। নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রচলিত বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষার কিছু কিছু সংস্কার করা যায়।

প্রশ্ন-রচনা

[এক] প্রশ্নপত্র রচনার সময় পরীক্ষক পরীক্ষার্থী'র ক্ষমতা ও মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন। পরীক্ষক যেন মনে রাখেন, প্রশ্ন করা হ'চ্ছে শিক্ষার্থী'র উন্নতি পরিমাপ করার জন্য, তাকে ঠকানোর জন্য নয়।

পরীক্ষার সংখ্যা

[দুই] বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষার সংখ্যা যত কমানো যায়, তত ভাল। কারণ, এই পরীক্ষা শিক্ষার্থী'র মনকে বিচলিত করে।

শিক্ষকের গুরুত্ব

[তিন] পরীক্ষা বহিঃসংস্থার দ্বারা পরিচালিত হ'লেও যতদূর সম্ভব শিক্ষকদের দিয়ে প্রশ্ন করানো উচিত এবং উত্তরপত্র পরীক্ষা করানো উচিত। এতে ক'রে পরীক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন হয়।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফল বিচার

[চার] সবশেষে, এই পরীক্ষার ত্রুটি কমাতে হ'লে সম্পূর্ণভাবে এর ফলাফলের ওপর গুরুত্ব দিলে চলবে না। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের পরীক্ষার ফলাফলকে বিচার করতে পারলে তবেই ভাল হয়।

॥ আলোচনা ॥

পরীক্ষা-গ্রহণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং তাকে বিভিন্ন দিক থেকে সংস্কার ক'রে আংশিক ফল পাওয়া যায়। আবার, আধুনিক আদর্শান্বিত অভীক্ষাতেও নানারকম ত্রুটি আছে। তাই পরীক্ষা-ব্যবস্থা থেকে সুফল পেতে হ'লে এবং পরীক্ষাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের অনুকূল ক'রে কাজে লাগাতে হ'লে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়নই একমাত্র পন্থা। তাই মূল্যায়নের (evaluation) ধারণাকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে এবং শিক্ষাবিদ্, মনোবিদ্, শিক্ষক—সকলকে সমবেতভাবে চেষ্টা করতে হবে কি ক'রে এই পদ্ধতিকে ত্রুটিহীন করা যায়। প্রত্যেকে যদি আগ্রহ এবং সৎ ইচ্ছা নিয়ে এদিকে হাত বাড়ান, তাহ'লে পরীক্ষাকে আর Necessary Evil বলে আক্ষেপ করতে হবে না, তার পরিবর্তে পরীক্ষা শিক্ষাক্ষেত্রে Vital necessity হ'য়ে দাঁড়াবে।

সারসংক্ষেপ

শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তির মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনা। শিক্ষা-প্রক্রিয়ার পরিচালনার পর, সেই পরিবর্তনগুলি ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হ'য়েছে কি না এবং হ'লে তা কি পরিমাপে হ'য়েছে, তা জানা একান্তভাবে প্রয়োজন। তাই পরীক্ষা-গ্রহণ শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পরীক্ষা শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মূল্যায়ন ছাড়া আরও কতকগুলি কাজ সম্পন্ন করে। যেমন—পরীক্ষা শিক্ষকের দক্ষতা পরিমাপ করে, পরীক্ষা শিক্ষণ-পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করে, পরীক্ষা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিরূপণ করে, পরীক্ষা শিখন ও শিক্ষণ উভয়কে প্রেরণা যোগায়, পরীক্ষা শিক্ষার্থীর বিশেষ দুর্বলতার ক্ষেত্র নির্ধারণ করে, পরীক্ষা বিদ্যালয়-পরিচালনায় সহায়তা করে এবং পরীক্ষা বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক নির্দেশনা দিতে সহায়তা করে।

সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থারও বিবর্তন হ'য়েছে। আবার শিক্ষা-ব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা-ব্যবস্থারও বিবর্তন হয়েছে। পরীক্ষা নানাভাবে গ্রহণ করা হয় ও নানা উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মূল কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষাকে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা ও অনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা, রচনাধর্মী পরীক্ষা ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা এবং নির্বাচনী পরীক্ষা, মাননিরূপক পরীক্ষা ও নির্ণায়ক পরীক্ষা।

আমাদের গতানুগতিক পরীক্ষা মূলতঃ রচনাধর্মী, লিখিত ও বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার নানারকমের ত্রুটি আছে। এই পরীক্ষা ব্যক্তিনির্ভর, এর মানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা নেই। এই পরীক্ষার ফলাফল তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া, এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে না এবং তাদের মধ্যে নানা রকম কুঅভ্যাস গঠনে উৎসাহ দান করে।

রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি দূর করার জন্য বর্তমানে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা করার কথা বলা হ'যেছে এবং আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardized test) গঠন করতে বলা হ'যেছে। আদর্শায়িত অভীক্ষাকে বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হলেও তার দ্বারা শিক্ষার সকল উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। তাই আধুনিক কালে অনেক শিক্ষাবিদ পরীক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্য পন্থা অবলম্বনের কথা বলেছেন। অনেকে বলেছেন, পরীক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি করতে হ'লে প্রশ্নপত্রে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক দু'ধরনের প্রশ্ন রাখতে হবে। আবার অনেকে বলেছেন, রচনাধর্মী পরীক্ষার অনেক ভাল গুণ আছে, তাই তাকে রেখে তার দোষ-ত্রুটিগুলি দূর করতে হবে। এছাড়া, পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক'রে মূল্যায়নের (Evaluation) ধারণারও প্রবর্তন করা হয়েছে।

এই ভাবে পরীক্ষা-ব্যবস্থার সাংগঠনিক উন্নতি ছাড়া ও বহিঃসংস্থা-পরিচালিত হওয়ার জন্য তার মধ্যে যে সব ত্রুটি আছে, সেগুলিকেও দূর করতে হবে। এই ভাবে নানা দিক থেকে প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করতে পারলে, তবেই তা সঠিকভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিমাপ করতে পারবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the defects of the existing system of examination ? How could you bring about reforms in system ?

[বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি কি কি ? এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার কিভাবে করবে ?]

Or,

What are the defects of 'examination' ? How can these be rectified ?

['পরীক্ষার বর্তমান ত্রুটিগুলি কি ? এগুলিকে দূর করার উপায় কি ?]

2. Discuss the merits and demerits of Public examination. Can examination be improved ?

[বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষার ভাল ও খারাপ দিক্ সম্পর্কে আলোচনা কর। এই পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার কি সম্ভব ?]

3. Discuss the various functions served by Examination in the field of education.

[শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা যে কাজগুলি সম্পাদন করে, সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।]

4. Discuss the advantages and limitations of essay type examination.

[রচনাধর্মী পরীক্ষার সুবিধা ও ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

5. What are objective-type tests ? Mention a few of them with examples.

[নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বলতে কি বোঝো ? কয়েকটি এরকম ধরনের প্রশ্ন সম্বন্ধে উদাহরণ দিয়ে আলোচনা কর।]

6. Draw a broad classification of examination system.

[পরীক্ষা-গ্রহণের রীতিগুলির শ্রেণী-বিন্যাস কর।]

7. What is a Cumulative Record Card ? Mention the items which are usually included in it.

[কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড কি ? এই কার্ডে যে সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেগুলি উল্লেখ কর।]

8. What is a Standardized test ? Discuss their merits and demerits.

[আদর্শায়িত অভীক্ষা কি ? আদর্শায়িত অভীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর।]

9. What do you understand by evaluation ? In what respect evaluation is an improvement over examination ?

[মূল্যায়ন বলতে কি বোঝো ? কোন দিক থেকে 'মূল্যায়ন' পরীক্ষা থেকে উন্নত ব্যবস্থা ?]

10. What is evaluation ? What general steps are to be followed in organising a programme of evaluation ?

[মূল্যায়ন কি ? মূল্যায়নের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হ'লে যে সাধারণ পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়, সেগুলি কি ?]

11. Write notes on (টীকা লিখ) :

(a) Reforms of public examination (বহিঃসংস্থা-পরিচালিত পরীক্ষার সংস্কার-সাধন)

(b) Evaluation & Examination (মূল্যায়ন ও পরীক্ষা)

(c) Objective type Questions (নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বা বস্তুধর্মী প্রশ্ন)

(d) Type of examination (পরীক্ষার শ্রেণীভেদ)

12. What is the necessity of examination ? Can the essay type examination alone meet the necessity ? Discuss how the objective type of examination can supplement the Essay Type ?

[পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি ? কেবলমাত্র রচনাধর্মী পরীক্ষা কি এই প্রয়োজন মেটাতে পারে ? বস্তুমুখী অভীক্ষা কিভাবে রচনাধর্মী পরীক্ষার পরিপূরক হ'তে পারে, আলোচনা কর।]

শিক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি

শিক্ষণ বা পাঠদান প্রধানতঃ শিক্ষকেরই কৌশল। শিক্ষকের এই কর্মক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য শিক্ষা-বিজ্ঞানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। ফলে, শিক্ষানীতির মূলগত অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এছাড়া কৌশল বা পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। এই সব আধুনিক নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে পর পর কয়েকটি অধ্যায়ে।

খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা ও সক্রিয়তাবাদ

প্রাচীন শিক্ষণ-পদ্ধতিতে বিশেষভাবে শিক্ষকের ভূমিকা ছিল প্রধান। শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয়ভাবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনতো, কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। ফলে, শিক্ষণের নীতিরও পরিবর্তন হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি—সক্রিয়তায় শিশুকে সক্রিয় ক'রে তুলতে হবে শিক্ষাক্ষেত্রে। তাছাড়া, আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ক'রে তুলতে হ'লে তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে হবে, এই উদ্দেশ্যে তাঁরা শিশুর স্বাভাবিক সক্রিয়তার বহিঃ-প্রকাশ হিসেবে খেলাকে বেছে নিয়েছেন। ফলে, 'খেলাভিত্তিক শিক্ষা' আধুনিক শিক্ষার একটি মৌল নীতি, এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি

শিক্ষাক্ষেত্রে এই অধুনিক নীতিকে প্রয়োগ করতে গিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন শিক্ষণ-পদ্ধতি। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌ এইসব পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। সামগ্রিকভাবে এদের নাম দেওয়া হ'য়েছে মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। তুলনা-মূলকভাবে প্রাচীন পদ্ধতিকে বলা হ'য়েছে তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি। এইসব নতুন পদ্ধতি ও তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে দু'টি অধ্যায়ে।

ষোড়শ অধ্যায়

খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা

Play and Play-way Principle in Education

খেলা (play) শিক্ষাক্ষেত্রে আর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা নানা ধরনের মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী খেলা এবং শিক্ষা পরস্পরবিরোধী বিষয়। প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় খেলার কোন স্থান নেই। বরং খেলাকে ত্যাগ ক'রে, যত কঠোরভাবে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করা যাবে, ততই শিক্ষার কাজ ভাল হবে, এই ছিল গতানুগতিক ধারণা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা সকলে মনে করেন, খেলা ও শিক্ষা পরস্পরবিরোধী নয়। বরং, খেলা শিক্ষাক্ষেত্রের গতানুগতিক শিক্ষ-পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। তাই আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে খেলার প্রকৃতি ও ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা এই অংশে খেলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং সেই সঙ্গে কিভাবে তাকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, সে সম্পর্কেও আলোচনা করব।

॥ খেলার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ॥

(Definition and Nature of Play)

খেলা কি, তা এক কথায় বলা খুব মুশকিল। অথচ 'খেলা' শব্দটি আমরা সকলে ব্যবহার করি। মানুষ এবং ইতর প্রাণীর বিশেষ বিশেষ কতকগুলি আচরণকে আমরা 'খেলা' নামে অভিহিত করে থাকি। কিন্তু, আচরণগুলির সঠিক প্রকৃতি কি, সে সম্পর্কে আমাদের নির্দিষ্ট কোন ধারণা নেই। কিন্তু, 'খেলা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, প্রথমে তার একটি বিজ্ঞানসম্মত সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করার দরকার। এই উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমতঃ মানুষের খেলার আচরণকে বিশ্লেষণ করবো।

প্রস্তাবনা

খেলার চল পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত শিশুর মধ্যে বর্তমান। তাছাড়া, খেলা এমন এক ধরনের আচরণ যা মানুষ এবং ইতর প্রাণীর মধ্যে সমভাবে বর্তমান। খেলার মধ্যে সমতার উপাদান বা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য দেখে অনেক মনোবিদ্ তাকে অন্যান্য প্রবৃত্তির (instinct) মত একটি প্রবৃত্তি হিসেবে বিবেচনা করার পক্ষপাতী। কিন্তু খেলার মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন ধরনের আচরণের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ফলে, খেলা একটি মাত্র মানসিক সংগঠন বা মানসিক প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রবণতা বিশেষধর্মী আচরণ সৃষ্টি করতে পারে। শিশুর খেলাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারগত প্রবণতার প্রকাশ পায়। খেলার মধ্যে যখন সে বন্দী হয়, তখন তার মধ্যে বশ্যতার প্রবৃত্তি কাজ করে; যখন রাজা হয় বা নেতারূপে দল পরিচালনা করে, তখন তার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার (self-assertion) প্রবণতা কাজ করে। যখন টুকরো টুকরো জিনিস দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরি করে, তখন

খেলা ও প্রবৃত্তি

নির্মাণের প্রবণতার (construction) প্রকাশ পায় ; যখন বিভিন্ন ধরনের জিনিস সংগ্রহ করে, তখন সঞ্চয়ের (acquisition) প্রবণতা কাজ করে ; আবার সাথীদের সঙ্গে যখন নকল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন যুযুৎসা-প্রবৃত্তির প্রকাশ পায়। এমনিভাবে বিভিন্ন ধরনের খেলার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার ও প্রবণতার প্রকাশ দেখা যায়। সুতরাং, খেলাকে বিশেষ কোন ক্রিয়াশীল দিক্ বললে ভুল করা হবে। প্রবৃত্তি-তত্ত্বের প্রবর্তক ম্যাক্‌ডুগালও (Macdougall এ বিষয়ে এক মত। তিনি বলেছেন—'No one of the many varieties of playful activity can properly be ascribed to an instinct of play."

আবার সাধারণ ধারণায় খেলাকে অনেক সময় দেহচর্চা বা সাধারণ খেলাধূলার (Sports and Games) সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু মনোবিদ্যায় খেলাকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ খেলা শুধু দেহচর্চা নয়, তার মাধ্যমে অনেক মানসিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যেরও বিকাশ হয়। খেলার সেই তাৎপর্যের কথা যদি উল্লেখ করা না হয়, তাহ'লে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক'রে বলা হবে না। প্রাচীনপন্থী মনোবিদ্‌রা খেলাকে পেশীর স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চালনের সঙ্গে সমতুল্য হিসেবে বিচার করেছেন। মনোবিদ্ এ্যাঞ্জেল (Angell) বলেছেন—"In little children the impulse to play is practically indentical with the impulse to use voluntary muscle"। দেহের পেশীর স্বতঃশ্চল সঞ্চালনকেই যদি খেলা বলা হয়, তাহলে স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম, প্রতিক্রিয়াজনিত কর্ম (Spontaneous action, Reflex action) ইত্যাদির সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকে না।' কারণ, ঐ ধরনের অনৈচ্ছিক কর্মও স্বতঃস্ফূর্ত পেশীর সঞ্চালনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। সেইজন্য এই ধরনের দৈহিক ক্রিয়া দিয়ে খেলার প্রকৃতিকে প্রকাশ করা যায় না।

খেলা ও দেহচর্চা

ম্যাক্‌ডুগাল খেলার সংব্যাখ্যান ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, খেলার মধ্যে মানসিক শক্তির প্রবাহ হয়। খেলার সময় কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে স্নায়বিক শক্তির প্রবাহ হয় এবং তার ফলে আমরা বিভিন্ন ধরনের আচরণ করি। তিনি খেলাকে একটা বিশেষ কোন প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত না ক'রে সাধারণ শক্তির প্রবাহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন, আমাদের মধ্যে যে সব জন্মগত প্রবণতা (instinct) আছে, সেগুলোর শক্তি তার স্বাভাবিক পথে প্রবাহিত না হ'য়ে যদি সমাজসম্মত কোন পথ দিয়ে প্রকাশ পায়, তখনই আমরা তাকে বলি খেলা। ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন—"Play is the outcome of the Primal libido or vital energy flowing not in the channel of instinct, but overflowing generating a vague appetite for movement and finding outlet in any or all the motor mechanism in turn." সুতরাং ম্যাক্‌ডুগালের এই মতবাদ অনুযায়ী আমরা বলতে পারি খেলা হ'ল জীবনীশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র, এদিক্ থেকে ম্যাগডুগাল নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। খেলাকে জীবনীশক্তির

খেলা ও জীবনীশক্তি

সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে তার প্রধান একটা বৈশিষ্ট্যকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এছাড়া, খেলার আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, যা আমরা আধুনিক শিক্ষাবিদ্ এবং মনোবিদ্‌দের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে পাই।

খেলা ও সৃজনীস্পৃহা

শিক্ষাবিদ্ নান (Nunn) সংস্কারগত প্রবণতার সঙ্গে খেলার তফাৎ করতে গিয়ে বলেছেন, সংস্কারগত কর্ম গতানুগতিক এবং পুনরাবৃত্তিমূলক। তার ভেতর কোন নতুনত্বের বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু খেলা হ'ল সৃজনধর্মী (Creative)। খেলার মধ্যে যে আনন্দ আমরা দেখতে পাই, তা সৃষ্টির আনন্দ। সুতরাং, খেলার মধ্যে শিশু নতুনত্বের আস্বাদ পায় এবং তার সৃজনস্পৃহা চরিতার্থ হয়। খেলার মধ্যে আছে কল্পনাবিলাস। কেউ যখন খেলার মধ্যে বিশেষ কোন ব্যক্তির অভিনয় করে, তখন সে সত্যি সত্যি তা বিশ্বাস করে।

খেলা ও স্বাধীনতা

অধ্যাপক গালিক (Gullick) বলেছেন, খেলার মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রয়াস দেখা যায়। শিশু যখন খেলা করে, তখন সে নিজে কল্পনা করে, নিজেই পরিকল্পনা করে এবং স্বাধীনভাবে তা সম্পাদন করে। গালিক বলেছেন—"Play is what we do, when we are free to do what we will".

খেলা ও আনন্দ

ড্রিভার (Drever) বলেছেন, খেলার মধ্যে যে আনন্দ নিহিত, যে আনন্দ শিশু খেলার মধ্যেই পায়, বাইরের কোন বস্তুর মধ্যে সে এই আনন্দ পায় না। খেলে বলেই সে আনন্দ পায়। তিনি বলেছেন—"In play the value and significance of the activity are found in the activity itself." অর্থাৎ, খেলার আনন্দ খেলার অন্তঃজ।

খেলার সংজ্ঞা

সুতরাং খেলার স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা দিতে হ'লে, তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সংযোজন করার দরকার। তাই আমরা বলতে পারি, **খেলা হ'ল আমাদের এমন এক স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দদায়ক এবং সৃজনাত্মক ক্রিয়া যার উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত।** ("Play is a spontaneous pleasurable activity creative in nature and having some intrinsic end behind it.") খেলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে, যদি আমরা খেলা ও কাজের মধ্যে পার্থক্যের কথা আলোচনা করি।

।। খেলা ও কাজ ।।
(Play and Work)

খেলা ও কাজের মধ্যে সঠিক পার্থক্য করতে না পারলে খেলার অপর একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। খেলার প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হ'লে কাজের সঙ্গে তার পার্থক্য করার দরকার। প্রাচীন শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে খেলা এবং কাজ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। তাদের নিজস্ব কতকগুলো পৃথক পৃথক

বৈশিষ্ট্য আছে, যার দ্বারা তাদের পৃথক করা যায়। খেলা এবং কাজ দুটোই ব্যক্তির আচরণ। কিন্তু বিভিন্ন দিক্ থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

খেলা স্বতঃস্ফূর্ত কাজ, বাধ্যতামূলক নয়

প্রথমতঃ, কাজের বাধ্যবাধকতা আছে খেলার মধ্যে সেই বাধ্যবাধকতা নেই। খেলা স্বতঃস্ফূর্ত কাজ, বাধ্যবাধকতার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষাবিদ্ নান (Nunn) বলেছেন—"An agent thinks of his activity as play if he can take it up or play it down at choice ·· ; he thinks of it as work if it is imposed on him by unavoidable necessity or if he is held to it by a sense of duty or vocation." অর্থাৎ যে কোন পছন্দমত স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তাই খেলা ; যে কোন বাধ্যতামূলক সক্রিয়তা হ'ল কাজ।

কাজ উদ্দেশ্যমুখী, খেলার বাইরের কোন উদ্দেশ্য নেই

দ্বিতীয়তঃ, কাজের পেছনে একটা বিশেষ বাহ্যিক উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু খেলার পেছনে সে রকম বাহ্যিক কোন উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়াস নেই। তবে খেলা যে একেবারে উদ্দেশ্যহীন তা নয়, তার উদ্দেশ্য তার নিজের অন্তঃস্থ। বাইরের কোন বস্তুকে পাওয়ার বা কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য আমরা খেলি না। খেলার আনন্দেই আমরা খেলা করি। কিন্তু কাজের পেছনে সব সময় একটা উদ্দেশ্য থাকে এবং কাজের জন্য যে সব আচরণ আমরা করি, তা সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যমুখী। বিশেষ কোন বস্তুধর্মী ফলশ্রুতির আশায় আমরা কাজ করি।

খেলা শাস্তি-পুরস্কারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়

তৃতীয়তঃ, কাজ শাস্তি ও পুরস্কারের মনোভাব বা প্রত্যাশার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু খেলার জন্য এই ধরনের বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ বা উদ্‌বোধকের প্রয়োজন হয় না। খেলা স্বতঃস্ফূর্ত বলে শৃঙ্খলাও খেলায় স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তা হয় না। কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে না পারলে নিন্দার ভয় থাকে ; কিন্তু খেলার শেষে এ ধরনের মনোভাব আসে না।

খেলায় অবসাদ দেরিতে আসে

চতুর্থতঃ, কাজের মধ্যে বাহ্যিক চাপ থাকে ব'লে মানসিক অবসাদ খুব তাড়াতাড়ি আসে, কিন্তু খেলার ক্ষেত্রে তা হয় না। খেলার মাধ্যমে শারীরিক ক্লান্তি কোন সময়ে আসে, কিন্তু মানসিক অবসাদ আসে না। তাই শিশুরা দীর্ঘ সময় ধরে খেলা করতে পারে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

পঞ্চমতঃ, অধ্যাপক হর্নি খেলা ও কাজের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্যের কথা বলেছেন। খেলার মধ্যে জীবিকা-অর্জনের কোন স্পৃহা থাকে না। কিন্তু কাজ জীবিকা-অর্জনের উপায় হিসেবে আমরা গ্রহণ করি। হর্নি (Horne) বলেছেন—"Economically, play does not aim at earning a living and work does."

খেলা ও কাজের মধ্যে এই ধরনের পার্থক্যের কথা বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্

উল্লেখ করলেও, তাদের মধ্যে বিভেদের সীমারেখা খুবই ক্ষীণ। যে কোন ধরনের আচরণ উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য কারও কাছে খেলা হ'তে পারে, কারও কাছে কাজ হতে পারে। ডাক-পিয়ন যখন তার জীবিকা-অর্জনের জন্য ঐ বৃত্তির অন্তর্গত বিভিন্ন আচরণ সম্পাদন করে, তখন আমরা তাকে বলি কাজ। আর ছোটছেলেরা যখন ডাক-পিয়নের ভূমিকায় অভিনয় করে, তখন

আলোচনা

॥ খেলা ও কাজের পার্থক্য ॥

খেলা (Play)	কাজ (Work)
১। খেলা স্বতঃস্ফূর্ত কাজ; কারুর ওপর জোর করে আরোপ করা হয় না।	১। কাজে বাধ্যবাধকতা আছে। কাজ ব্যক্তির ওপর আরোপ করা হয়।
২। খেলার মূলে কোন বস্তুধর্মী উদ্দেশ্য থাকে না।	২। কাজের পেছনে সব সময় বস্তুধর্মী উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে।
৩। খেলার শক্তির উৎস হ'ল ব্যক্তির আন্তরিক প্রেরণা।	৩। কাজের শক্তির উৎস হ'ল—ব্যক্তির চাহিদা বা অভাব-বোধ (need)।
৪। খেলার জন্য কোন বাহ্যিক উদ্বোধক (Incentive) প্রয়োজন হয় না। খেলার প্রেষণা (Motive) অন্তঃস্থ।	৪। কাজের জন্য বাহ্যিক উদ্বোধক প্রয়োজন হয়। কারণ, কোন উদ্বোধক ছাড়া ব্যক্তির মধ্যে কাজের প্রেষণা সঞ্চার করা যায় না।
৫। খেলার সময় ব্যক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়। শিশুরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলার বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলে।	৫। কাজের সময় ব্যক্তি যে শৃঙ্খলা মেনে চলে, তা সম্পূর্ণভাবে আরোপিত।
৬। খেলা সব সময় ব্যক্তির কাছে আনন্দদায়ক। খেলার এই আনন্দ তার একান্তই নিজস্ব।	৬। কাজ সব সময় ব্যক্তির কাছে আনন্দদায়ক নাও হ'তে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে কাজে আনন্দ থাকলেও, সে আনন্দ বহির্জাত।
৭। খেলার সময় ক্লান্তি বা অবসাদ সহজে আসে না।	৭। কাজের সময় ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি অবসাদগ্রস্ত হয়।
৮। খেলায় কোন অর্থনৈতিক প্রত্যাশা নেই।	৮। কাজ মানুষের জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই সেখানে অর্থনৈতিক প্রত্যাশা আছে।

আমরা তাকে বলি খেলা। অর্থাৎ, উদ্দেশ্যের পার্থক্যের জন্য আচরণের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তার বিচারেই খেলা এবং কাজকে পৃথক করা যায়। মনোবিদ্ ড্রেভার (Drever) বলেছেন—"In play, the value and significance of the activity are found in the activity itself; whereas in work, the value

and significance of the activity are found in an end beyond the activity." সুতরাং বস্তুমুখী (Objective) আচরণকে আমরা বলি কাজ; আর ব্যক্তিমুখী (Subjective) আচরণকে আমরা বলি খেলা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, খেলা ও কাজের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। তফাৎ স্বাধীনতা ও উদ্দেশ্যের মাত্রার তারতম্য (degree of freedom and purpose) মাত্র। আধুনিক কালে সব শিক্ষাবিদ্‌ই এ কথা স্বীকার করেন এবং তাঁরা মনে করেন, কাজ এবং খেলার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলেই শিক্ষার কাজ অনেক সহজ হবে। কাজের মধ্যে খেলার স্বতঃস্ফূর্ততা আনতে পারলে কাজের একঘেয়েমি দূর হবে। জন ডিউই বলেছেন, জীবনের বহিঃপ্রকাশ হল কাজের মাধ্যমে; আর শিক্ষা হল সেই ধরনের কাজের ফল যার মধ্যে খেলার স্বতঃস্ফূর্ততা আছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, খেলা কাজ ও জীবনের মধ্যে সার্থক সামঞ্জস্য-বিধানের মাধ্যমেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হবে; জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশও হবে।

॥ খেলা ও ইচ্ছানিরপেক্ষ কাজ ॥
(Play and Drudgery)

আধুনিক কালে কিছু শিক্ষাবিদ্‌ খেলা এবং ইচ্ছানিরপেক্ষ কাজের মধ্যে পার্থক্যের কথাও বলেছেন। আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কর্ম নির্বাচন করতে পারে না। এর মূলে অবশ্য নানা রকম কারণ আছে। সমাজের প্রকৃতি, বেকার-সমস্যা (unemployment problem) এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রকৃতির জন্য বৃহত্তর জীবনে তার নিজস্ব ইচ্ছা, অনুরাগ ও ক্ষমতা অনুযায়ী কর্ম-নির্বাচনের সুযোগ পায় না। তাছাড়া, বর্তমান অতি-যান্ত্রিকতার যুগে এবং বিশেষ জ্ঞানভিত্তিক কর্ম-প্রয়োজনীয়তার (Specialization) যুগে ব্যক্তির সব সময় জানা সম্ভব হয় না, সে কি করছে এবং কেন করছে। ফলে, সে কলুর বলদের মত ঘানি টেনেই চলেছে জীবিকা-অর্জনের জন্য। এই ধরনের কাজকে বলা হ'চ্ছে ইচ্ছানিরপেক্ষ বা উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ কাজ (Drudgery)। এ সব কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যক্তি ওয়াকিবহাল নয়, এর ভেতর স্বতঃস্ফূর্ততা বা আনন্দ নেই। একে আমরা চরমভাবাপন্ন অমনোবৈজ্ঞানিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কাজ ও খেলার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি, তাদের মধ্যে বিভেদের সীমারেখা খুবই অল্প। কিন্তু এই ধরনের কাজের সম্পূর্ণ বিপরীত হ'ল খেলা। অধ্যাপক কে. কে. মুখোপাধ্যায় বলেছেন—বৈশিষ্ট্যের দিক্ থেকে খেলা ও ইচ্ছানিরপেক্ষ কাজ দুই বিপরীত প্রান্তবিন্দুতে অবস্থিত; আর কাজ আছে এই প্রান্তরীয় বিন্দুর মাঝখানে (Play and drudgery are the two extremes between which comes work)। তাই খেলা এবং ইচ্ছানিরপেক্ষ কাজের মধ্যে গভীর ব্যবধানের সম্পর্ক বর্তমান।

খেলা ও ইচ্ছানিরপেক্ষ কাজ বিপরীতধর্মী

॥ খেলার বৈশিষ্ট্য ॥
(Characteristics of Play)

উপরি-উক্ত বিভিন্ন আলোচনায় খেলার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের একত্রিত করলে খেলা সম্বন্ধে আমাদের নিম্নবর্ণিত ধারণাগুলি স্পষ্ট হবে।

সাধারণ প্রবণতা

[এক] খেলা হ'ল মানুষের জন্মগত সাধারণ প্রবণতা। পৃথিবীর সকল দেশের সকল শিশুই খেলা করে এবং খেলা করতে ভালবাসে। সেইজন্য আমরা খেলাকে মানুষের সর্বজনীন (Universal) আচরণগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

স্বতঃস্ফূর্ততা

[দুই] খেলা স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। খেলার জন্য বাইরে থেকে কোন উদ্‌বোধকের (incentive) প্রয়োজন হয় না। শিশু নিজে থেকেই খেলায় মত্ত হয় এবং খেলার সময় আনুষঙ্গিক নানা রকম মানসিক অবস্থারও সৃষ্টি হয় স্বাভাবিকভাবে।

উদ্দেশ্যহীনতা

[তিন] খেলার মধ্যে বস্তুধর্মী উদ্দেশ্য-সাধনের কোন লিপ্সা থাকে না। খেলার উদ্দেশ্য খেলার মধ্যেই নিহিত। বাইরের কোন লাভের কথা চিন্তা ক'রে শিশুরা খেলা করে না। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যে প্রতিযোগিতামূলক পেশাদারী খেলার প্রবর্তন হ'য়েছে, তাকে আমরা সাধারণ অর্থে খেলা বললেও মনোবৈজ্ঞানিক অর্থে তাকে 'খেলা' বলা যায় না। কারণ, অর্থ বা মর্যাদার প্রত্যাশায় ব্যক্তি এই জাতীয় পেশাদারী বা প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশ গ্রহণ করে।

স্বাধীনতা

[চার] খেলা এক ধরনের স্বাধীন প্রক্রিয়া। খেলার সময় শিশু তার আপন জগতে বিচরণ করে। সকল রকম বাধা-বন্ধনের বাইরে আপন যে মনের রাজ্য, তার দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত হয়। বাইরের কোন বিশেষ বাধা তার খেলার পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ালে সে বিরক্তি বোধ করে।

স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা

[পাঁচ] খেলার মধ্যে শৃঙ্খলা (discipline) স্বাভাবিকভাবে আসে। খেলার জন্য যে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়, তা শিশু নিজের থেকেই নিজের ওপর আরোপ হয়েছে চিন্তা করে। খেলার বিধিনিষেধ বা নিয়মকানুন সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে চলে। কোন বাইরের ব্যক্তি তার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয় না। ফলে, খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল—স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা বা মুক্ত শৃঙ্খলা (Free discipline) এই পরিস্থিতি বিকাশলাভ করে।

সৃজনধর্মিতা

[ছয়] প্রত্যেক খেলাই সৃজনধর্মী। খেলার মাধ্যমে শিশু তার নির্মাণের প্রবণতাকে (instinct of construction) চরিতার্থ করে। খেলার মাধ্যমে শিশুরা যে সব জিনিস সৃষ্টি করে, বড়দের কাছে তার কোন মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু তার জীবন-বিকাশের দিক থেকে এইসব সৃজনাত্মক কাজের মূল্য অনেক।

[সাত] খেলার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশসাধন হয়। খেলার মাধ্যমে তার দেহ-মনের পুষ্টিসাধন হয়। শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশ হয় খেলার মাধ্যমে। তার চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশ হয়। অর্থাৎ, খেলা শিশুর দেহ-মনের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক।

বিকাশের সহায়ক

[আট] খেলা শিশুর সামাজিক গুণ-বিকাশেরও সহায়ক। খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে যৌথ প্রচেষ্টার সুযোগ পায়, তার ফলে তাদের মধ্যে নানা রকম সামাজিক গুণের বিকাশ হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের খেলায় অংশগ্রহণ ক'রে শিশুরা নানারকম সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন হয়।

সামাজিক গুণসম্পন্ন

[নয়] সবশেষে, খেলা এক ধরনের আনন্দদায়ক আচরণ এবং এই আনন্দের ও তৃপ্তির ভাব খেলার মধ্যে নিহিত। কারণ, খেলার মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। উপরন্তু, শিশুর স্বাধীন মনোবৃত্তির বিকাশসাধন হয়।

আনন্দদায়ক

।। খেলার বিভিন্ন তত্ত্ব ।।
(Different Theories of Play)

খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন শিশুরা খেলা করে। এই প্রশ্ন প্রাচীন চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিকদের মনেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা বিভিন্নভাবে এর সংব্যাখ্যান দিয়েছেন। ফলে, আমরা দেখতে পাই খেলার বিভিন্ন তত্ত্ব। তাদের সম্পর্কে আলোচনা করলে খেলার অনেক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে।

।। [এক] উদ্বৃত্ত শক্তির তত্ত্ব ।।
(Surplus Energy Theory)

এই তত্ত্ব প্রথম প্রস্তাব করেন প্রাচীন জার্মান কবি শিলার (Schiller)। পরে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) একে সমর্থন করেন এবং যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন। এই তত্ত্বে খেলার দেহতত্ত্বমূলক বা স্নায়বীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই মতানুযায়ী, খেলা হ'ল বাড়তি শক্তিক্ষয়ের পদ্ধতি ছাড়া কিছু নয়। শিশুরা খাদ্যসামগ্রী থেকে যে পুষ্টি গ্রহণ করে, তার সমস্তটা দেহের প্রয়োজনে লাগে না। তাছাড়া, তাদের অতিরিক্ত কাজ করারও কোন সুযোগ নেই। তাই দেহ-সঞ্চালনের মধ্যে তারা সেই শক্তিকে ক্ষয় ক'রে থাকে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে এর কোন সুযোগ নেই। তার কারণ, তাদের জীবন-যাত্রার রসদ-সংগ্রহের জন্য সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং তাতেই তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর অতিরিক্ত শক্তি যখন দেহ-সঞ্চালনের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাকেই আমরা খেলা বলে বিবেচনা করি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুকে রেলগাড়ীর এঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে। এঞ্জিনে যেমন বাষ্প থেকে যতটুকু

উদ্বৃত্ত শক্তির তত্ত্ব কি ?

শক্তি দরকার ততটুকু নেওয়ার পর বাকীটা ছেড়ে দেওয়া হয়, তেমনি শিশুরাও খাদ্য থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তার প্রয়োজনমত রেখে বাকীটুকু ছেড়ে দেয় খেলার মাধ্যমে।

খেলার এই তত্ত্বের ভেতর অনেক সত্যতা আছে। যেমন, খেলার মাধ্যমে দেহের পুষ্টিসাধন হয়, দেহ কর্মক্ষম হয় এবং অত্যধিক মানসিক কাজ-গ্রহণের উপযোগী হয়। কিন্তু তাহ'লেও এর অসুবিধা অনেক বেশী। আধুনিক মনোবিদ্‌রা খেলার এই ধরনের দেহতত্ত্বগত ব্যাখ্যাকে মেনে নেন না। তাঁরা মনে করেন, খেলার ওপর এই ধরনের দেহতত্ত্বগত সংব্যাখ্যান আরোপ করলে খেলার যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার মানসিক বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাকে উপেক্ষা করে। এই তত্ত্বের বিভিন্ন ত্রুটি আমরা উল্লেখ করতে পারি—

উদ্বৃত্ত শক্তিতত্ত্বের ত্রুটি

(১) প্রথমতঃ, খেলাকে যদি বাড়তি শক্তির বহিঃপ্রকাশই বলি, তাহ'লে কেন সেই শক্তি বহিঃপ্রকাশের সময় বিশেষ আকার ধারণ করে, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। খেলা এবং স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম (Spontaneous action) যে এক জিনিস নয়, তা আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি। শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত দেহ-সঞ্চালন আর খেলা এক জিনিস নয়। খেলার মধ্যে আমরা সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের ক্রমিক প্রকাশ দেখতে পাই। এই তত্ত্বে এ বিষয়ে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

(২) দ্বিতীয়তঃ, শিশুদের ক্ষয় করার মত বাড়তি শক্তি যখন না থাকে, তখনও তারা কেন খেলা করে, এর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে দেওয়া হয়নি। শিশুরা যখন পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, তখনও খেলা করে। তাকে খেলা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তাগাদা দিতে হয়। কোন কাজ করার পর ক্লান্ত হ'য়ে এসেও দেখা যায় শিশুরা খেলা করতে দৌড়ে যাচ্ছে। এই ধরনের আচরণকে এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(৩) তৃতীয়তঃ, এমন অনেক প্রাণী আছে, যাদের আহার্যের সন্ধানে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে হয়, তা সত্ত্বেও তারা খেলা করে।

(৪) চতুর্থতঃ, বয়স্ক ব্যক্তিদের খেলার কোন ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের মধ্যে দেওয়া হয়নি। তারা সারাদিন পরিশ্রান্ত হ'য়ে এসেও খেলার জন্য প্রস্তুত হয়।

মন্তব্য

এইসব ত্রুটি থাকার জন্য এই তত্ত্বকে খেলার উপযুক্ত সংব্যাখ্যান ব'লে গ্রহণ করা যায় না। শিশু ও ব্যক্তির মধ্যে খেলার প্রবণতাকে সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করতে হ'লে মনোবিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের প্রয়োজন।

।। [দুই] পুনরুজ্জীবনের তত্ত্ব ।।

(Recreation Theory)

এই মতবাদের প্রবর্তক হলেন জার্মান দার্শনিক ল্যাজারস্ (Lazaurs)। এই মতানুযায়ী খেলা আমাদের ক্ষয়জাত শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে। প্রাণী খেলা করে,

তার কারণ হ'ল খেলার মধ্য দিয়ে তারা হৃত উৎসাহ ও শক্তি ফিরে পায়। মনোবিদ্‌রাও বিশ্বাস করেন যে, কাজের প্রকৃতি পরিবর্তন করলে মানসিক অবসাদ্ (Mental fatigue) কমানো যায়। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, এই তত্ত্বের মধ্যে সত্যতা আছে। আমরা কোন কাজের পর যখন খেলায় যোগ দিই, কাজের প্রকৃতির পরিবর্তন হওয়ার জন্য তা আমাদের অবসাদ ও বিরক্তিকর একঘেয়েমি ভাব দূর করে এবং আবার সেই কাজ করবার উপযোগী মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। যে শিশু অনেকটা পথ হেঁটে ক্লান্ত, সেও দৌড়ে খেলার মাঠে চলে যায়।

পুনরুজ্জীবনের তত্ত্ব কী?

কিন্তু খেলার এই ধরনের ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ নয়। এরও অনেক ত্রুটি আছে। কেন শিশুরা খেলতে ভালবাসে এবং খেলার মধ্য দিয়ে শক্তির পুনরুজ্জীবন হয়, ঘুম বা বিশ্রামের দ্বারা হয় না, তার কোন সদুত্তর এই তত্ত্বে মেলে না। তাছাড়া, এই তত্ত্বে অবসাদ-দূরীকরণের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাও ঠিক নয়। তার কারণ অবসাদ এবং একঘেয়েমি তখনই কমবে, যখন কাজের এবং ব্যবহৃত দেহের অঙ্গের পরিবর্তন হবে। কিন্তু দেখা গেছে, যে অঙ্গের অবসাদ এসেছে, সেই অঙ্গই শিশুরা খেলার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করতে পারে। যে ছেলে হেঁটে ক্লান্ত, সে ই দৌড়-ঝাঁপের খেলা খেলেছে উৎসাহের সঙ্গে। শিক্ষাবিদ্ নান্ (Nunn) তাই বলেছেন—"this explanation is quite insufficient. Under the influence of play, the child not only continues the activity which has wearied him, but actually puts twice as much vigour into it." সুতরাং, পুনরুজ্জীবনের তত্ত্বও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না।

পুনরুজ্জীবন তত্ত্বের ত্রুটি

।। [তিন] প্রত্যাশামূলক তত্ত্ব ।।
(Anticipatory Theory)

এই মতবাদের প্রথম প্রস্তাবক হ'লেন মেলব্রান্স্ (Malebrance)। কিন্তু পরবর্তী কালে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ কার্ল গ্রুজ (Karl Groos) এই মতবাদকে সমর্থন করেন এবং পরিবর্ধন করেন। গ্রুজ প্রাণীর খেলা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের প্রাণীদের আচরণ বিশেষভাবে প্রবৃত্তি (Instinct) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের আচরণের মধ্যে খেলার কোন অস্তিত্বই দেখা যায় না। খেলা উন্নততর প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে মেরুদণ্ডী প্রাণীর আচরণের মধ্যে খেলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি আরও বলেছেন, উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর জীবন-পরিস্থিতি অনেক জটিল। অভিব্যক্তির স্তরে যে প্রাণী যত উন্নত, তার জীবন-পরিবেশ ততই জটিল। সুতরাং, এই জটিল পরিস্থিতিতে সার্থক অভিযোজনের জন্য সে অবিরত সংগ্রাম ক'রে চলেছে।

কার্ল গ্রুজের বিশ্লেষণ

গ্রুজ মনে করেন, শৈশবে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জটিল জীবন-পরিস্থিতির সম্মুখীন হই না। তখন আমাদের জীবন থাকে অনেকটা দায়িত্বভারহীন। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই আমরা ভাবী সংগ্রামবহুল জীবনের মহড়া দিই এবং তা খেলার মাধ্যমে। অর্থাৎ, এই মতবাদ অনুযায়ী খেলা হ'ল ভবিষ্যৎ জীবনের মহড়া। তাই অনেক সময় এই তত্ত্বকে ভাবী জীবনের মহড়ার তত্ত্ব (Rehearsal theory) বলা হয়। শিশুরা ভবিষ্যৎ জীবন-সংগ্রামের বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রত্যাশা করে বলেই তারা খেলা করে এবং খেলার মাধ্যমে তারা প্রশিক্ষণ লাভ করে। বিড়াল-ছানা বলের ওপর ঝাঁপ দেয়, তার কারণ ভবিষ্যতে তাকে ইঁদুর ধরার জন্য ঐ ভাবে লাফাতে হবে। ছোট মেয়েরা পুতুল নিয়ে তাকে স্নান করায়, খাওয়ায়, যত্ন করে। তার কারণ হ'ল—ভবিষ্যৎ মাতৃজীবনের অভিনয় করে সে এই খেলার মাধ্যমে। চার্চিল (Winston Churchill) তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন—"My choice of a military career was entirely due to my collection of toy soldiers." শিশুরা ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে প্রত্যাশা নিয়েই খেলা করে। এই ধরনের আচরণের মধ্যে কল্পনা-বিলাস (Make-believe) আছে। সে বিশ্বাস করে যে, বড় হ'য়ে সে সৈনিক হবে বা ডাক-পিয়ন হবে এবং খেলার মধ্যে সে সেই ধরনের আচরণ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কার্ল গ্রুজ-এর মতানুযায়ী খেলা শিক্ষাধর্মী; খেলা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি; খেলার মাধ্যমে শিশু অবচেতন মনে প্রকৃতির কাছ থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী শিক্ষা পায়। ম্যাক্‌ডুগাল (Macdougall) এই মতবাদ সম্পর্কে বলেছেন—"...it is not that young animals play because they are young and have surplus energy ; we must believe rather than the higher animals have this period of youthful immaturity in order that they may play."

প্রত্যাশামূলক শিক্ষা কি?

কার্ল গ্রুজের এই তত্ত্বের অনেক সত্যতা থাকলেও এবং তার পেছনে অনেক বাস্তব যুক্তি থাকলেও সব রকম খেলার বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করতে পারে না। বিশেষভাবে বয়স্ক জীবনের খেলার ব্যাখ্যা এর থেকে পাওয়া যায় না। কারণ, সেখানে প্রস্তুতির কোন কথাই ওঠে না।

এই তত্ত্বের ত্রুটি

॥ [চার] পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব ॥

(Recapitulation Theory)

এই তত্ত্বে কার্ল গ্রুজের বিপরীত মতবাদ প্রকাশ করা হ'য়েছে। স্ট্যানলি হল (Stanley Hall) এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেছেন, খেলার মাধ্যমে আমরা পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করি। হল (Hall) কার্ল গ্রুজের তত্ত্বকে সমালোচনা ক'রে বলেছেন, প্রত্যাশামূলক তত্ত্ব একান্তভাবে আংশিক এবং এটি একটি বাহ্যিক সংব্যাখ্যান। যে তত্ত্বের মধ্যে সমাজের অতীত সংস্কারের ধারাকে গ্রহণ করা

হয়নি এবং তাকে যথার্থ মূল্য দেওয়া হয়নি, তাকে কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না। মানুষের সভ্যতার বিবর্তন যে সব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে হ'য়েছে, শিশুরা খেলার মাধ্যমে সেইসব স্তরের পুনরাবৃত্তি ক'রে ভাবী জীবনের সার্থক উত্তরাধিকারী হয়। শিশুরা তীর-ধনুকের খেলার মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারণের সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ এক কাজের পুনরাবৃত্তি করে। এই মত অনুযায়ী সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় আমরা অনেক আচরণ পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার সার্থক অধিকারী হ'তে হ'লে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেইসব স্তরের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। তাই খেলার মাধ্যমে শিশু-অবস্থায় অতীত সভ্যতার বিভিন্ন ধরনের পরিত্যক্ত কাজেরই আমরা পুনরাবৃত্তি করি। কোন বিশেষ শ্রেণীর কৃষ্টির পুনরাবৃত্তি হয় খেলার মাধ্যমে। লুকোচুরি খেলা, মাছ ধরার খেলা, শিকারের খেলা যা সাধারণ শিশুরা অভ্যাস করে, তা সবই আদিম যুগের লোকদের জীবনধারণের উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ আচরণ ছিল।

পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব কি ?

এই তত্ত্বের মধ্যে অনেক কিছুই সত্য বলে মনে হয়। তাছাড়া, এই তত্ত্বকে গ্রহণ করলে বিভিন্ন দেশের শিশুদের খেলার মধ্যে যে সমতা দেখা যায়, তার ব্যাখ্যাও সহজে করা যায়। কিন্তু এর ত্রুটিও আছে অনেক, যার জন্য একে এককভাবে খেলার তত্ত্ব হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না—যদিও এই তত্ত্ব বিভিন্ন দেশের শিশুর খেলার সমতার সংব্যাখ্যান দিতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্যের কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। **দ্বিতীয়তঃ**, কেন যে শিশুরা খেলার মধ্যে অতীত কার্যাবলীর পুনরাবৃত্তি করতে চায়, তার কারণ কোথাও ব্যাখ্যা করা হয়নি এই তত্ত্বে। তাছাড়া, এই তত্ত্বকে গ্রহণ করলে খেলার মধ্যে যে প্রধান বৈশিষ্ট্য 'স্বাধীনতা', তা আর থাকে না। খেলার প্রকৃতি যদি সমাজের ইতিহাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে শিশুর স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের কোন সুযোগ থাকে না। সুতরাং খেলা হ'য়ে দাঁড়ায় গতানুগতিক, পৌনঃপুনিক আচরণ (Stereo-typed behaviour)। সবশেষে বলা যেতে পারে, এই তত্ত্বে শিশুর বংশগতির (Heredity) ওপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে, পারিপার্শ্বিক প্রভাবের কথাকে স্বীকার করা হয়নি। এইসব কারণে এই তত্ত্বকে খেলার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না।

এই তত্ত্বের ত্রুটি

॥ (পাঁচ) প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব ॥
(Rivalry Theory)

এই তত্ত্বের প্রস্তাবক হ'লেন বিখ্যাত মনোবিদ্ ম্যাক্‌ডুগাল (Macdougall)। ম্যাক্‌ডুগাল তাঁর প্রবৃত্তি (instinct) তত্ত্বের অংশ হিসেবে খেলার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকেই বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব বলা হয়। মানুষ তার মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতাকে খেলার মাধ্যমে প্রকাশ করে। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কতকগুলো জন্মগত প্রবণতা আছে। এবং বিশেষভাবে শৈশবের বেশীর ভাগ আচরণই এইসব প্রবণতার দ্বারা চালিত হয়। মনোবিদ্যায় এই প্রবণতা (disposition) কথাটা

এসেছে মানুষের আচরণের দুটো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সংব্যাখ্যান দিতে গিয়ে। একটা হ'ল আচরণের সমতা। বিশেষ বিশেষ প্রাণীকুলে বিশেষ বিশেষ আচরণ-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়। এগুলোকে বলা হয় সমতাসম্পন্ন প্রতিক্রিয়া (pattern reaction)। যখন কোন বিশেষ এক শ্রেণীর সব প্রাণী নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে বা প্রতিক্রিয়া করে, তখন নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে এমন কোন সংগঠন আছে, যা তাদের বাধ্য করে এইভাবে প্রতিক্রিয়া করতে। এই জৈব-মানসিক সংগঠনকে বা প্রবণতাকে ম্যাক্‌ডুগাল প্রবৃত্তি (Instinct) বলেছেন। অপর এক দিক থেকে প্রবণতার (disposition) ধারণার প্রয়োজন ছিল, তা হল তার আচরণের উদ্দেশ্যগত দিক্ বিশ্লেষণ করার জন্য। ম্যাক্‌ডুগাল বললেন, সব দেশের, সব কালের শিশুরা যখন খেলা করে, তখন তার জন্যও নিশ্চয়ই কোন প্রবণতা আছে। এবং বিশ্লেষণ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা (propensity of rivalry) থেকেই খেলার প্রকাশ। তবে স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা যখন খেলার পেছনে আছে, তখন খেলা মানেই সাথীদের সঙ্গে মারামারি। ম্যাক্‌ডুগাল তারও সৎ উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা ও যুযুৎসার প্রবণতা (combative instinct) আলাদা। প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতার মধ্যে আত্মবিকাশের প্রচেষ্টা বা আত্মোন্নতির চেষ্টা আছে, কিন্তু যুযুৎসার মধ্যে আছে শত্রুকে ঘায়েল করার প্রবৃত্তি। তিনি বলেছেন - "The impulse of rivalry is to get the better of an opponent in some sort of struggle ; but it differs from the combative implusc, in that ıt does not prompt to, and does not find satisfaction in the destruction of the opponent"

প্রতিদ্বন্দ্বিতাব তত্ত্ব কি ?

ম্যাক্‌ডুগালের এই তত্ত্বে মনোবিজ্ঞানসম্মত সংব্যাখ্যান থাকলেও খেলার প্রামাণিক তত্ত্ব হিসেবে বর্তমানে একেও গ্রহণ করা হয় না। তার কারণ, সব, রকম খেলার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের দ্বারা দেওয়া যায় না। তাছাড়া, বর্তমানে মনোবিদ্‌রা মনে করেন, খেলা বিশেষ কোন প্রবৃত্তির (instinct) বহিঃপ্রকাশ নয়। খেলার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তিগত চাহিদা (instinctive urge) চরিতার্থ হয়

এই মতবাদেব ক্রটি

॥ [ছয়] বিরেচনবাদ ॥
(Catharic theory)

ক্যাথারসিস্ (Catharsis) কথাটা ডাক্তারী শাস্ত্রে ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ হ'ল অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার পদ্ধতি। কিন্তু এই কথাটা ফ্রয়েড (Freud) তাঁর মনোবিকলনের তত্ত্বে (Psycho-analytic theory) বিশেষ এক অর্থে প্রয়োগ করেন। বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক প্রক্রিয়ার (Primary process) পেছনে যে কৌশল কাজ করে, তাকেই ফ্রয়েড্ বলেছেন বিরেচন (Catharsis)। মানুষের মনের অনেক

আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা আছে, যা তারা সমাজের অনুশাসনের জন্য স্বাভাবিক-ভাবে চরিতার্থ করতে পারে না। এই ধরনের অসামাজিক চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা-গুলোকে (antisocial desire) মানুষ অবচেতন মনে চাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু অবচেতন মনে এই আকাঙ্ক্ষাগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না। তারা বিশেষ সংগঠনের মাধ্যমে গতি-শক্তি (driving force) লাভ করে এবং আমাদের প্রত্যক্ষ আচরণের মধ্যে বেরিয়ে এসে প্রকাশ পেতে চায়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির বাধা সব সময় তাদের প্রত্যক্ষ প্রকাশকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এমত অবস্থায় এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো সমাজগ্রাহ্য কোন বস্তু বা প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র ক'রে পরোক্ষভাবে আমাদের আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং এইভাবে তৃপ্তিলাভ করে। এইভাবে কোন অতৃপ্ত অবদমিত আকাঙ্ক্ষার (Repressed unfulfilled desire) প্রত্যক্ষ বস্তুকে ত্যাগ ক'রে অন্য সমাজগ্রাহ্য বস্তু বা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার যে পদ্ধতি, তাকে ফ্রয়েড্ বলেছেন প্রাথমিক প্রক্রিয়া (Primary process)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী খেলাও এক ধরনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। যেমন, স্বপ্নও প্রাথমিক প্রক্রিয়া। আর এর পেছনে যে কৌশল, তাকেই বলা হ'চ্ছে বিরেচন। অর্থাৎ, খেলার মাধ্যমে আমরা মনের অনেক ময়লা পরিষ্কার করতে পারি। খেলার মাধ্যমে আমরা সামাজিক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করি। এই হল এই তত্ত্বের মূল কথা। ফ্রয়েড্ এই তত্ত্ব স্বাভাবিকভাবে সকল রকম আচরণের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। খেলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এর প্রয়োগের পক্ষপাতী হলেন মনোবিদ্ রস (Ross)। তিনি এই তত্ত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বিবেচনবাদ কি?

খেলার এই তত্ত্ব যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর মধ্যে সত্যতা যে আছে, সে কথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। তবে খেলার এই সংব্যাখ্যান শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণে বিশেষ কিছু সহায়তা করে না। এর দ্বারা আচরণের প্রকৃতি-নির্ধারণ (diagnosis) এবং চিকিৎসা (treatment) করার পরিকল্পনা রচনা করা যেতে পারে। তবে এটা একটা বড় ত্রুটি নয়। কি কিছু শিক্ষাবিদ্ এবং মনোবিদ্ মনে করেন, খেলার মত নির্মল স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের মধ্যেও ফ্রয়েড্-পন্থীরা অত্যধিক পরিমাণে খারাপ গুণ আরোপ (aspersion) করার চেষ্টা করেছেন। শিশু, যাদের অভিজ্ঞতার পরিধি তখনও বিস্তার লাভ করেনি, যারা পিতামাতার স্নেহের ছায়ায় মানুষ হ'চ্ছে, প্রত্যক্ষ জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতা যাদের হয়নি, তাদের মধ্যে অতৃপ্ত অসামাজিক আকাঙ্ক্ষা এরকম প্রবল আকার ধারণ করতে পারে না। তাই শিশুদের সব খেলাকে বিরেচন-তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। অস্বাভাবিক মনের ক্ষেত্রে যা সত্য, সুস্থ স্বাভাবিক নির্মল মনের অধিকারী শিশুদের ক্ষেত্রে তা সত্য নাও হতে পারে।

বিবেচনবাদের ত্রুটি

॥ [সাত] জীবন-সক্রিয়তার তত্ত্ব ॥
(Theory of life-activity)

এই তত্ত্বের সমর্থক হ'লেন ডিউই, ফ্রয়েবেল ইত্যাদি আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা।

ডিউই-এর মতে জীবনের অভিব্যক্তি হ'ল তার কর্মের মধ্যে। সক্রিয়তাই জীবনের ধর্ম। তিনি বলেছেন, "L fe is byproduct of activities." খেলাকে তিনি এই জীবন-সক্রিয়তার এক বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জীবনের এই সক্রিয়তা দু'ধরনের হতে পারে—উদ্দেশ্যমূলক এবং উদ্দেশ্যহীন। উদ্দেশ্যমূলক সক্রিয়তাকে বলা হয় কাজ এবং উদ্দেশ্যহীন সক্রিয়তাকে বলা যেতে পারে খেলা। ফ্রয়েবেলও এই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন খেলার। তিনিও বলেছেন, খেলার মাধ্যমে শিশুর আত্ম-সক্রিয়তার (self-activity) প্রকাশ হয়।

জীবন-সক্রিয়তার তত্ত্ব কি ?

এ ধরনের তত্ত্ব যে মিথ্যা নয়, সেকথা আমরা স্থিরভাবে বলতে পারি। তবে এই তত্ত্বের দ্বারা খেলার খুব অস্পষ্ট একটা সংব্যাখ্যান দেওয়ার চেষ্টা হ'য়েছে এবং এই তত্ত্বে ব্যবহারিক দিকের চেয়ে দার্শনিক চিন্তার প্রভাবই বেশী।

এই মতবাদের ত্রুটি

॥ আলোচনা ॥

খেলার এই বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করলাম, কোন একটা তত্ত্বকে এককভাবে সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হিসেবে বেছে নেওয়া যায় না। কারণ, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু-না-কিছু ত্রুটি বর্তমান। আবার কোনটাকেই একেবারে ত্যাগ করা যায় না। কারণ, প্রত্যেকের মধ্যে কিছু-না-কিছু সত্যতা আছে। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে বিরোধ বিশেষ কিছু নেই, আছে অপরিপূর্ণতা। আর এই অপরিপূর্ণতা এসেছে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্‌দের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থেকে। তাই খেলার প্রকৃত সংব্যাখ্যান দিতে গেলে, এই সব তত্ত্বের মধ্যে সার্থক সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এবং তা করা খুব অসুবিধাজনক নয়। ফ্রয়েডীয় বিরেচনবাদের সঙ্গে বাড়তি শক্তির তত্ত্বের সহজেই সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যদি আমরা বাড়তি শক্তিকে শুধুমাত্র দৈহিক শক্তি না বলে অতৃপ্ত প্রবণতা বা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত শক্তি হিসেবেও বিবেচনা করি। অর্থাৎ, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে গতি-শক্তির সঞ্চার হয়, তাই স্বতঃস্ফূর্ত খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। আবার বিরেচনবাদের সঙ্গে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বিশেষ কিছু অমিল থাকে না যদি আমরা মেনে নিই যে, আদিম প্রবৃত্তির তাগিদেই আমরা খেলা করছি এবং সেই আদিম প্রবৃত্তিগুলোকেই খেলার মাধ্যমে চরিতার্থ করছি। মারামারি করা আদিম প্রবৃত্তি, তাই খেলার মধ্যে আমরা যুদ্ধ করি। আবার স্ট্যানলি হলের তত্ত্বের সঙ্গে কার্ল গ্রুজের তত্ত্বেরও কোন বিরোধ থাকে না যদি আমরা মেনে নিই যে, সার্থক জীবনধারণের জন্য অতীতের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতি দুইই প্রয়োজন। শিক্ষাবিদ্‌ নান্‌ও (Nunn) এই কথাই বলেছেন। আর এই সব কিছুর মূলে আছে জীবন-সক্রিয়তার তত্ত্ব। শিশুর সক্রিয়তার প্রচেষ্টা থেকেই খেলার উৎপত্তি এবং তা বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) এ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা উল্লেখ ক'রে এই আলোচনা শেষ করছি—

খেলার বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান

"Play is undoubtedly reminiscent of the useful activities of our ancestors ; it is undoubtedly a preparation for the serious activities of later life ; it has undoubtedly, as its main element, the impluse of rivalry ; it undoubtedly first uses up the superfluous energy of the individual, and it undoubtedly serves in many cases as a means of recreation".

॥ খেলাভিত্তিক শিক্ষা ॥
(Playway in Education)

প্রাচীন ধারা অনুযায়ী খেলা এবং শিক্ষা পরস্পর-বিপরীতধর্মী। আগে মনে করা হ'ত পড়াশুনার সময় খেলাকে অবশ্য ত্যাগ করতে হবে। শিশুরা অত্যধিক খেলাধূলা করলে বিদ্যালয়ে তাদের শাসন করা হ'ত। খেলার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে আমরা দেখলাম, খেলা সৃজনশীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দদায়ক আচরণ। যে আচরণ সৃজনধর্মী এবং যার মধ্যে কোন বাধা (restriction) নেই, তা শিক্ষারও অঙ্গ হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, খেলাকে শিক্ষার কাজে লাগাতে পারলে শিক্ষার কাজ অনেক সহজ হবে। তাই বর্তমানে তাঁরা একে শিক্ষাক্ষেত্রে একেবারে বর্জনীয় বলে স্বীকার করেন না। যদিও এই ধারণা শিক্ষাক্ষেত্রে খুব পুরাতন নয়, তবুও এই অল্প সময়ের মধ্যে তা সকলের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

প্রস্তাবনা

খেলাভিত্তিক শিক্ষার মূল কথা হ'ল—খেলার মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য আছে, সেই সব বৈশিষ্ট্য শিক্ষার মধ্যে সংযোজিত করা। গতানুগতিক ধারণা হ'ল—"কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা ("work while you work, play while you play".)। অর্থাৎ, দুটোকে একত্রে মেশানো চলবে না। তাতে ক'রে কোনটাই সম্পূর্ণ হবে না। এই ছিল প্রচলিত ধারণা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্ ঠিক এর উল্টো মনে করেন। তাঁরা বলেন, "খেলার সঙ্গে কাজ, কাজের সঙ্গে খেলা (work while you play, play while you work)।" অর্থাৎ, শিক্ষা অথবা জীবনের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে খেলার বৈশিষ্ট্য আনতে হবে এবং খেলার মাধ্যমে ব্যক্তিকে জীবনের কঠিন কর্মময় পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত করতে হবে বা তাকে শিক্ষা দিতে হবে। এটাই হ'ল খেলাভিত্তিক শিক্ষার মূল বক্তব্য। শিক্ষাবিদ্ ক্যাল্ডওয়েল কুক (Caldwell Cook) খেলাভিত্তিক শিক্ষার play-way) কথা প্রথম উল্লেখ করেন। তিনি নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখান কিভাবে খেলাকে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়।

খেলাভিত্তিক শিক্ষা কি ?

খেলাভিত্তিক শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা থেকে যায়। আমরা

মনে করি, এটা একটা বিশেষ ধরনের শিক্ষণ-পদ্ধতি (Teaching method) ; কিন্তু এটা আসলে তা নয়। যে কোন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বা শিক্ষণ-পদ্ধতি যার মধ্যে খেলার মনোভাব, খেলার আনন্দ শিক্ষার্থী পায়, তাকেই আমরা খেলাভিত্তিক শিক্ষা বলতে পারি।

খেলাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি নয়

অধ্যাপক কে. কে. মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে তাঁর New Education and its Aspects বই-এ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"Strictly speaking play-way is not the name of one particular method of teaching, but rather it may be called a general name for all modern psychological method that have the marks or characteristics of play in them." তাই খেলাভিত্তিক শিক্ষণকে পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা না ক'রে শিক্ষণ-পদ্ধতির তত্ত্বগত দিক্ হিসেবেই বিবেচনা করা ভাল ; বা, 'শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করার তত্ত্ব' (Play-way principle in education), এইভাবে প্রকাশ করা ভাল। আধুনিক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে আমরা এই খেলার উপাদান (Elements of play) দেখতে পাই। যেমন, ফ্রয়েবেলের 'কিণ্ডারগার্টেন', ডিউই-পরিকল্পিত ও কিলপ্যাট্রিক-প্রবর্তিত 'প্রোজেক্ট পদ্ধতি' (Project method), রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনা' ইত্যাদি সবগুলোর মধ্যেই খেলার বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতে পারে, শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করার কারণ কি ? এর উত্তর খেলার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আছে। আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হ'ল শিশুকেন্দ্রিকতা ; শিশুর আগ্রহ, অনুরাগ, ইচ্ছা, ক্ষমতা ইত্যাদি সব কিছু বিবেচনা ক'রে তার মনোমত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে খেলার বৈশিষ্ট্য হ'ল—স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দদায়ক সৃজনাত্মক ক্রিয়া। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুর মধ্যে যা আসে, তাতে স্বভাবতঃই শিশুরা আগ্রহশীল। সুতরাং, শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার জন্য, শিশুর আগ্রহভিত্তিক করার জন্য খেলাকেই কাজে লাগানো খুব সহজ হবে। দ্বিতীয়তঃ খেলা যে শুধু নিছক অর্থহীন দেহ-সঞ্চালন তা নয়, সৃজনাত্মকও বটে। শিক্ষাও সৃজনধর্মী, সুতরাং খেলাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে শিশুর সৃজনাত্মক স্পৃহা একদিকে যেমন চরিতার্থ হবে, অপর দিকে তাকে তার ব্যক্তিগত কল্যাণের কাজে লাগানো যাবে। তৃতীয়তঃ, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন করা। খেলার মাধ্যমে শিশুর দেহ এবং মন উভয়ের বিকাশসাধন হয়। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষার মধ্যে খেলার উপাদান সংযোজনের পক্ষপাতী। সবশেষে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে ব্যক্তিকে গড়ে তোলা ; বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ ক'রে সে যে বৃহত্তর কর্মজীবনে যাবে, তার যোগ্য ক'রে তাকে গড়ে তুলতে হবে। খেলা এই দিক্ থেকে সহায়তা করে। খেলাভিত্তিক শিক্ষা, শিক্ষার মধ্যে যে যান্ত্রিকতার ভাব আছে, তার পরিবর্তে আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে, কোন কিছুই তার

খেলাভিত্তিক শিক্ষা কেন ?

কাছে বোঝাস্বরূপ মনে হয় না। সুতরাং, খেলাভিত্তিক শিক্ষা ব্যক্তিকে ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সহজভাবে গ্রহণ করার প্রশিক্ষণ দেয়, এবং গতানুগতিক শিক্ষার সঙ্গে কর্মময় জীবনের ব্যবধানকে কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। এই সব কারণেই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা খেলাভিত্তিক শিক্ষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে এক মূলনীতি হিসেবে স্বীকার করেছেন।

॥ খেলাভিত্তিক শিক্ষার উপকারিতা ॥
(Advantages of Play-way Principle in Education)

শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করতে পারলে আমাদের শিক্ষাদান কাজের অনেক সুবিধা হয়। শিক্ষাও ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক হয়। খেলাভিত্তিক শিক্ষার যে উপকারিতা আছে, তার বিশেষ কয়েকটি আমরা উল্লেখ করছি।

[এক] খেলাভিত্তিক শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের অনুকূল ব'লে শিক্ষার্থীর কাছে তা বোঝাস্বরূপ মনে হয় না। শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণা স্বাভাবিক নিয়মে সঞ্চারিত হয়। এই প্রেষণা শিক্ষার্থীর শিখনমূলক প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

[দুই] খেলাভিত্তিক শিক্ষার মধ্যে শিশুরা আনন্দ পায়। ফলে, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সঙ্গে যে অভিজ্ঞতা আসে, তা অনেক দিন স্থায়ী হয়। অর্থাৎ খেলাভিত্তিক শিক্ষা শিখন (Learning) ও সংরক্ষণ (Retention) উভয় প্রক্রিয়াকেই সহায়তা করে।

[তিন] খেলাভিত্তিক শিক্ষায় শিশু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শিক্ষা পায় ব'লে শিখন-সঞ্চালনের (Transfer of Learning) কাজ অনেক সহজ হয় এবং এর জন্য কোন বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

[চার] খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিশুর কৌতূহল, নির্মাণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলোকে সার্থকভাবে সমাজ-নির্দিষ্ট পথে বিকশিত করা যায়।

[পাঁচ] খেলাভিত্তিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিশুর ভয়, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রক্ষোভ (Disruptive emotion)-গুলোকে সমাজনির্দিষ্ট পথে উদ্‌গমন করা সম্ভব হয়।

[ছয়] খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রবণতার বিকাশসাধন করা যায়। সহযোগিতা, সমবেদনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো শিশুর মধ্যে সহজে বিকাশলাভ করে।

[সাত] খেলাভিত্তিক শিক্ষায় শিশুর দলগত মনোভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। দলের সঙ্গে একাত্মবোধের অনুভূতি জাগ্রত হয়। বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধের বিকাশ হয়।

[আট] খেলাভিত্তিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে যারা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু, তারাও সহজভাবে পাঠ গ্রহণ করতে পারে।

[নয়] খেলাভিত্তিক শিক্ষায় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অনুকরণমূলক শিখন

(imitation learning) সংগঠিত হয় ; বিশেষভাবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায়। এই ধরনের শিখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

[দশ] খেলাভিত্তিক শিক্ষায় শৃঙ্খলার (discipline) কোন বিশেষ সমস্যা থাকে না। স্বাভাবিক নিয়মেই স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজ করে। তাছাড়া, আধুনিক শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতা (Freedom) দেওয়ার কথা বলা হ'য়েছে, খেলাভিত্তিক শিক্ষায় তার সুযোগ আছে। ফলে, একঘেয়েমি, অবসাদ ইত্যাদির প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সহজে দূর করা যায়, যদি আমরা শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করতে পারি।

॥ খেলাভিত্তিক শিক্ষায় সংযোজন ॥

(Means of installing play-way element in Education)

শিক্ষার মধ্যে খেলার বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করতে হ'লে শিক্ষকের সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, যে-কোন শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষক গ্রহণ করুক-না-কেন, তাকে খেলাভিত্তিক ক'রে তোলা যায়। শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করার জন্য শিক্ষক বিশেষ কয়েকটি দিকে নজর দেবেন।

পাঠ্যক্রম নির্ধারণ

[এক] শিক্ষায় খেলার আনন্দ আনতে হ'লে পাঠ্যক্রম শিশুর আগ্রহ ও অনুরাগের কথা বিবেচনা ক'রে নির্ধারণ করতে হবে। পাঠ্যক্রমে এমন বিষয় নির্বাচন করতে হবে, যার অনুশীলনের মাধ্যমে শিশু তার প্রয়োজনের অনুকূল অভিজ্ঞতা পায়। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রম যাতে শিক্ষার্থীদের বর্তমান চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিশুর সামর্থ্য

[দুই] যে সব পাঠ শিশুদের মানসিক সামর্থ্যের উপযোগী নয়, তা দেখে শিশুরা আনন্দ পায় না। শিক্ষার মধ্যে খেলার আনন্দ আনতে হ'লে শিক্ষার্থীকে এমন সমস্যার সম্মুখীন করতে হবে, যা তারা মানসিক ক্ষমতার দ্বারা সমাধান করতে পারে। কোন বিষয়ে বারবার অকৃতকার্য হ'লে তার থেকে তার আগ্রহ চলে যায়।

বাস্তবমুখী শিক্ষা

[তিন] যে সব বিষয় আমরা শিশুকে শেখাতে চাই, তা যেন শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই, সে রকম বিষয় শিশুকে শেখাতে গেলে তার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা যাবে না। ফলে, শিক্ষণ-পরিস্থিতি কৃত্রিম হ'য়ে পড়বে।

বিদ্যালয়-পরিবেশ

[চার] বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং সংগঠন শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী হওয়ার দরকার। সে যাতে কাজ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, সে রকম ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের দলগত কর্মপ্রচেষ্টা হাতে নিতে হবে, যার মাধ্যমে শিশুর সামাজিক গুণের বিকাশ হবে। বিভিন্ন ধরনের যৌথ প্রচেষ্টার অন্তর্গত কাজ যাতে তারা স্বাধীনভাবে সমাধা করতে

পারে, তার সুযোগ দিতে হবে। শ্রেণীকক্ষের বাইরে মুক্ত পরিবেশে যাতে শিশুরা কাজ করতে পারে, তার ব্যবস্থাও করতে হবে।

[পাঁচ] শিক্ষার মধ্যে খেলার আনন্দ সংযোজন করতে হ'লে আদর্শ ধরনের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব বজায় রেখে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী যাতে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ পান, সেই রকম আবহাওয়া বিদ্যালয়ে সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার্থীর বন্ধু হিসেবে শিক্ষক কাজ করবেন, প্রয়োজনবোধে তাদের সাহায্য করবেন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

[ছয়] শিশুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না ক'রে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা-স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজধর্মী পরিবেশ এবং শিক্ষকের বেদনামূলক মনোভাব এই কাজে সহায়তা করবে।

শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা

এই সমস্ত দিকে নজর রেখে শিক্ষক যদি বিদ্যালয় পরিচালনা ও পাঠদানের কাজ পরিচালনা করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে আনন্দলাভ করবে এবং তিনি যে-কোন ধরনের পদ্ধতির ব্যবস্থা করুন-না-কেন, শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকতা এনে দেবে।

মন্তব্য

সারসংক্ষেপ

আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে খেলাকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হ'য়েছে। এখন খেলাকে শিক্ষানুকূল প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হ'য়ে থাকে। খেলার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে আধুনিক শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিদ্গণ—একে একে ধরনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যজনিত স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দদায়ক, সৃজনাত্মক ক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

খেলা ও কাজের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে। যেমন—খেলা স্বতঃস্ফূর্ত, কাজ বাধ্যতামূলক ; কাজের বস্তুগত উদ্দেশ্য থাকে, খেলার বাহ্যিক কোন উদ্দেশ্য থাকে না, কাজের ক্ষেত্রে বস্তুধর্মী পুরস্কারের প্রত্যাশা থাকে, খেলা শাস্তি বা পুরস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, কাজে অবসাদ তাড়াতাড়ি আসে, খেলায় অপেক্ষাকৃত দেরীতে আসে, কাজের একটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু খেলায় তা থাকে না। কাজে অনেক ক্ষেত্রে একঘেয়েমি থাকে, খেলা পুনরাবৃত্তি হ'লেও সেখানে একঘেয়েমি দেখা যায় না। খেলার এইসব বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ তার শিক্ষাগত সম্ভাবনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

শিশুরা কেন খেলা করে, এ নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। বিভিন্ন চিন্তাবিদ্-প্রদত্ত এই ব্যাখ্যাগুলিকে খেলার তত্ত্ব (Theory of play) বলা হয়। এরকম খেলার বহু তত্ত্ব আছে। যেমন—উদ্বৃত্ত শক্তির তত্ত্ব, পুনরুজ্জীবন প্রত্যাশামূলক তত্ত্ব, পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব এবং জীবন-সক্রিয়তার তত্ত্ব ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেখানে খেলার এক-একটি বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এইসব তত্ত্বগুলির কোন একটির দ্বারা খেলার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। বাস্তব ক্ষেত্রে এই তত্ত্বগুলির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি খেলার ধর্মের অন্তর্গত।

খেলার শিক্ষামূলক সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ তার বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষার মধ্যে সংযোজনের চেষ্টা করেছেন। এইভাবে পরিচালিত শিক্ষাকে বলা হয় খেলাভিত্তিক শিক্ষা (Play-way in education)। শিক্ষাকে এই ভাবে খেলাভিত্তিক করলে কতকগুলি সুবিধা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়, শিখন ও সংরক্ষণে সহায়তা করা যায়, শিক্ষা-সঞ্চালন বেশী পরিমাণে করা যায়, শিক্ষার্থীর প্রবৃত্তিমূলক চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করা যায়, সামাজিক প্রবণতার বিকাশ করা যায় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা স্থাপন করা যায়।

শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করতে হ'লে কতকগুলি দিকের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণ-পদ্ধতি শিশুর চাহিদা ও সামর্থ্য ভিত্তিক হওয়া উচিত, পাঠ্যক্রমের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত, সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়-পরিবেশের উন্নতি সাধন করা উচিত ; শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সহজ করা উচিত এবং সবশেষে শিক্ষার্থীদের কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।

প্রশ্নাবলী

1. What is play ? How does it differ from work ? What is meant by playway in education ?

[খেলা কি ? 'কাজ' ও 'খেলা'র পার্থক্য কি ? শিক্ষার খেলাভিত্তিক ধারা বলতে কি বোঝ ?]

2. What are the essential characteristics of play ? Examine the Cathartic theory of play.

[খেলার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? খেলার বিরেচন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর ।]

3. "The whole education should be conducted in the spirit of play."—Elucidate.

["সম্পূর্ণ শিক্ষা-প্রক্রিয়া খেলার মনোভাবে পরিচালনা করা উচিত"—ব্যাখ্যা কর ।]

4. How do you distinguish between play and wor ? What is drudgery ?

[খেলা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য কর । একঘেয়ে কাজ বলতে কি বোঝ ?]

5. Write a short essay on 'play way in Education'.

["খেলাভিত্তিক শিক্ষা" বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর ।]

6. What is meant by play-way in Education ? How will you infuse play elements in education ?

[খেলাভিত্তিক শিক্ষা বলতে কি বোঝ ? কিভাবে শিক্ষার মধ্যে খেলার বৈশিষ্ট্য সংযোজন করবে ?]

7. What is meant by play-way in education ? What are its advantages ?

[খেলাভিত্তিক শিক্ষা কি ? এই ব্যবস্থার সুবিধাগুলি কি কি ?]

8. Critically discuss the various theories of play. How will you reconcile them ?

[খেলার বিভিন্ন তত্ত্বগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর । তুমি কিভাবে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবে ?]

9. Write an essay on : Characteristics and any two important theories of play ?

[খেলার বৈশিষ্ট্য ও যে কোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর ।]

10. Write notes on [টীকা লিখ] :

(a) Play-way in education [খেলাভিত্তিক শিক্ষা]

(b) Anticipatory theory of play [খেলার প্রত্যাশামূলক তত্ত্ব]

(c) Play & work [খেলা ও কাজ]

সপ্তদশ অধ্যায়

শিক্ষায় সক্রিয়তাবাদ

Activivity Principle in Education

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে চিন্তাধারা শিক্ষা-জগৎকে প্রভাবিত করছিল, তার মূলে এই মতবাদই ছিল যে—মনোময় জগৎই প্রকৃত জগৎ, বস্তুজগৎ মিথ্যা ছায়া মাত্র। তাই প্রাচীন শিক্ষার ব্যবস্থায় আমরা মানসিক বৃত্তির কৃত্রিম উৎকর্ষণের চেষ্টা দেখতে পাই। ভাববাদী দর্শনের প্রভাবে পৃথিবীর সকল দেশই এক সময় আচ্ছন্ন ছিল এবং তারই প্রভাবে শিক্ষাকে একটা অতি-মানবীয় বস্তুজগতের সঙ্গে সংপর্কহীন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হত। এই শিক্ষার মূল নীতি হ'ল, মানুষের মনকে জ্ঞানের বোঝায় ভারাক্রান্ত ক'রে তুলতে হবে; মানুষ এতদিনের প্রচেষ্টায় জীবনের যে সব মূল সূত্রগুলো আবিষ্কার করেছে, তা দিয়ে শিশুকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলতে পারলেই শিক্ষার দায়িত্ব সম্পন্ন হবে। সে শিক্ষা তার জীবনে কিছু কাজে আসুক বা না-আসুক, এ বোঝা তাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে, এই হ'ল গতানুগতিক শিক্ষার মূল নীতি।

প্রস্তাবনা

এই প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ প্রথম জানালেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিন্তাবিদ্ রুশো। তিনি তাঁর 'এমিলে'র জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে এই গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় আসল ব্যক্তি 'শিশু' নিষ্ক্রিয়, সে শিক্ষার কোন মূল্য থাকতে পারে না। তিনি ঘোষণা করলেন, শিক্ষায় শিশুর স্বাভাবিক অঙ্গসঞ্চালনকে যদি বাধা দেওয়া হয়, তার দ্বারা সার্থক জীবনবিকাশ হবে না। শিশুরা পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ ক'রে শিখবে, তার জন্য কোন বাধা থাকবে না, বা তার ওপর কোন ইচ্ছা জোর ক'রে চাপানো হবে না। এটাই শিক্ষার মূলনীতি হওয়া উচিত। রুশোর পরবর্তীকালে শিক্ষার উপকরণ নির্বাচনে যেমন এক নতুন ধারার সৃষ্টি হ'য়েছে, তেমনি শিক্ষার পদ্ধতি-নির্বাচনেও নতুন ধারার প্রবর্তন হ'য়েছে। এক দিকে শিশুকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্থির ক'রে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা তার আপন বৈশিষ্ট্যকে যেমন প্রকাশ করেছে, তেমনি সক্রিয়তাকে শিক্ষার মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ ক'রে শিশুর শিক্ষাকে পরিপূর্ণতার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

সক্রিয়তার পক্ষে রুশো

রুশোর অনুগামী প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্ই সক্রিয়তাবাদকে শিক্ষার মূল নীতি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। পেস্তালাৎসী, ফ্রয়েবেল, মন্তেশ্বরী, হার্বার্ট, ডিউই প্রত্যেকেই এই সক্রিয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষাও সক্রিয়তাবাদের ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। গান্ধীজি গতানুগতিক শিক্ষার সমালোচনা ক'রে সক্রিয়তা-বাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলেছেন—"We have upto now concentrated on stuffing children's minds with all kinds of information, without

even thinking of stimulating or developing them. Let us now cry a halt and concentrate on educating the child properly through manual work ; not as side activity but as prime means of intellectual activity". ফ্রয়েবেল আত্মসক্রিয়তাকে (self activity) একমাত্র শিক্ষার পদ্ধতি বলে বর্ণনা করেছেন। মন্তেশ্বরীও স্বয়ং-শিক্ষণের (auto-education) ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সক্রিয়তাবাদের পক্ষে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্

ডিউই তাঁর সমস্ত শিক্ষাদর্শনের মধ্যে এই সক্রিয়তার মতবাদকে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতালে একসুরে। সেটা ক্লাশ নামধারী খাঁচায় জিনিস হবে না।" এমনিভাবে আধুনিক সকল শিক্ষাবিদের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, তাঁরা বিশেষভাবে শিশুর সক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই থেকে আমরা বলতে পারি আধুনিক শিক্ষা যে শুধু শিশু-কেন্দ্রিক তাই নয়, আধুনিক যুগ শিশু-সক্রিয়তার যুগও বটে। এখন প্রশ্ন হ'ল, শিক্ষায় সক্রিয়তা বলতে আমরা কি বুঝি ?

॥ সক্রিয়তাবাদ কি ? ॥
(What is Activity Principle ?)

সক্রিয়তাবাদের মূল কথা হ'ল মানুষ যান্ত্রিক সত্তা নয়, সে জীবনীশক্তিসম্পন্ন জৈবিক তন্ত্র। তার মধ্যে স্বাধীন অহং সত্তা সব সময় ক্রিয়াশীল ; নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত। তার জীবনবিকাশের মূল প্রক্রিয়া হ'ল আত্ম-অভিযোজন (self adjustment)। নিজের ইচ্ছার সক্রিয়তায় সে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে আগ্রহশীল, আর তার মাধ্যমেই তার শিক্ষা ও আত্মবিকাশ।

শিক্ষা ও জীবনবিকাশের মূল ধর্ম

সুতরাং তার জীবনবিকাশের মূলে আছে প্রত্যক্ষ বস্তুজগতের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ ; নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানলাভ। সে স্বাভাবিকভাবে হাতে-কলমে কাজ ক'রে বিশ্বজগৎকে জানতে চায়। সুতরাং, তার শিক্ষাও হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। জন ডিউই বলেছেন—"Life is a byproduct of activities and education is born out of these activities." কর্মের মাধ্যমেই ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হবে, আর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হ'লেই শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হবে। এই হ'ল সক্রিয়তাবাদের মূল বক্তব্য। তা'হলে শিক্ষায় সক্রিয়তা বলতে আমরা বুঝি, শিক্ষা হবে উদ্দেশ্যপূর্ণ কোন প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে (concrete and productive activity)। এই কর্মসম্পাদনকালেই শিশু শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখী আচরণ, দক্ষতা, অভ্যাস এবং আদর্শ লাভ করবে।

শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ততা সক্রিয়তাবাদের মূল কথা। শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দের সঙ্গে কাজে যোগদান করবে এবং কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে শিখবে। সুতরাং এই দিক্ থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় খেলাভিত্তিক শিক্ষায় (play-way principle)

সঙ্গে এর কোন তফাৎ নেই। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে শিক্ষার্থীকে যে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, এই দুই তত্ত্ব তারই মূল নীতিতে বিশ্বাসী। খেলার মধ্যে যেমন শিশু কোন বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলে না ; তার স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশু তার স্বাভাবিক প্রবণতার বশবর্তী হ'য়েই কাজে হাত দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষা উপজাত ফল (By product) মাত্র। খেলাভিত্তিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল খেলা ; আর কর্মভিত্তিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল 'কাজ'। সুতরাং খেলাভিত্তিক শিক্ষাকে সক্রিয় কর্মভিত্তিক শিক্ষার একটা বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাহ'লে সক্রিয়তার মূল বৈশিষ্ট্য হল :

শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয়তাবাদ

(১) সক্রিয়তাবাদ অনুযায়ী শিক্ষা হবে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কোন 'কর্মকেন্দ্রিক'।

(২) সক্রিয়তাবাদ অনুযায়ী বিশেষ কর্মটি হবে উৎপাদনমূলক (Productive)। এইজন্য একে অনেক সময় উৎপাদন-ভিত্তিক শিক্ষাতত্ত্বও (Productive principle) বলা হয়।

(৩) শিশুর স্বাধীন ইচ্ছাভিত্তিক কর্ম নির্বাচন করা হবে।

(৪) এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা হবে উপজাত ফল (By product) মাত্র।

(৫) এতে শিশুর কাজ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং আনন্দপূর্ণ পরিবেশে সে কাজ করবে।

(৬) সক্রিয়তাবাদের সঙ্গে খেলাভিত্তিক শিক্ষার কোন তফাৎ নেই।

॥ সক্রিয়তা-ভিত্তিক শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি ॥
(Psychological basis of Activity Principle in Education

শিক্ষায় সক্রিয়তাবাদ মনোবিদ্যার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। আপাতভাবে আলোচনা করলেই বোঝা যায়, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে এই মতবাদে শিশুর স্বভাবজ দেহ-সঞ্চালনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। শিশু বা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক যে-কোন শিক্ষণ-পরিকল্পনা মনোবিদ্যার তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সক্রিয়তাবাদের ক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি, বিভিন্ন দিক্ থেকে এর উপযোগিতা আমরা দেখতে পাই।

প্রস্তাবনা

[এক] প্রাচীন দার্শনিকদের চিন্তাধারায় দেখতে পাই এবং আধুনিক মনোবিদ্‌রাও স্বীকার করেন, সুস্থ মন সুস্থ দেহের সঙ্গে সহাবস্থান করে। দেহ এবং মনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আধুনিক মনোবিদ্‌রাও স্বীকার করেন। সক্রিয় শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবে নির্দিষ্ট কোন কাজ সম্পাদন করে। এই কাজ করতে গেলে তার অঙ্গসঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। সে কৃষি-সংক্রান্ত কাজই হোক্ বা কারখানার সরঞ্জাম নিয়ে কাজ হোক্, প্রত্যেক কাজেই অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়, এর মাধ্যমেই দেহের পুষ্টিসাধন হয়। এই কাজের মাধ্যমে

দৈহিক বিকাশ

তার স্নায়ুমণ্ডলীর কাজের সক্রিয়তা বাড়ে এবং তা তার জ্ঞান-আহরণে সহায়তা করে। কারণ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় (Sense organ) এবং স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমেই আমরা বহির্জগতের জ্ঞান আহরণ করি।

[দুই] শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সংস্কারজাত প্রবণতাগুলো (Instinctive urge) আছে, সেগুলোর সার্থক উদ্‌গমন (Sublimation) করা। যে সব প্রবণতা তার ব্যক্তিজীবনের পক্ষে ভাল, তাদের বিকাশ করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এই দু'দিক্ থেকে সহায়তা করে। প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের কৌতূহল (Curiosity), নির্মাণ (Construction), সংগ্রহ (Acquisition) ইত্যাদি প্রবণতা-গুলোকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। কাজের মাধ্যমে শুধু যে এইসব প্রবণতার শক্তির বাহ্যিক প্রকাশ হয় তাই নয়, নতুন ধরনের প্রেষণাশক্তিও তার মধ্যে জাগ্রত হয়। কারণ, কোন প্রবণতার তাড়নায় যখন স্বাভাবিকভাবে সে কোন কাজ বেছে নিয়ে তা সার্থকভাবে সম্পাদন করে, তখনই তার মধ্যে সফলতার আনন্দ আসে এবং এই আনন্দ তার মধ্যে নতুন প্রেষণা-শক্তি (Motivation) যোগায়। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রের মূল প্রয়োজনীয় যে উপাদান প্রেষণা, তা স্বাভাবিকভাবে জাগ্রত হয় যদি সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

প্রবৃত্তিমূলক

[তিন] কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীর মনে প্রক্ষোভমূলক তৃপ্তি আসে। মনোবিদ্ থর্নডাইক (Thorndike) তাঁর ভ্রান্তি-প্রচেষ্টার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতাকে (Learning by doing) শিক্ষণের পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

[চার] থর্নডাইক তাঁর ফললাভের সূত্রে (Law of effect) বলেছেন, শিখন সার্থক হয় যখন ফল ভাল হয়। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ফল সম্পর্কে অবগত করে, তারা নিজেদের কর্মের ফল জানতে পারে। কোন কাজ করতে গিয়ে, তা যদি সে সার্থকভাবে করতে পারে, স্বাভাবিকভাবে সেই কাজ তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করবে; সঙ্গে সঙ্গে এই সফলতা তাকে আরও নতুন কাজে হাত দেওয়ার জন্য প্রেষণা-শক্তি (Motivation) যোগাবে। বিখ্যাত মনোবিদ্ গ্যারেট (Garrett) বলেছেন— "Learning is a function of a motive incentive condition." উদ্‌বোধক (Incentive) শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা (Motive) সৃষ্টি করে এবং প্রেষণার তাড়নাতেই ব্যক্তি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করতে চায়; তার ফলেই তার শিখন (Learning) হয়। সক্রিয়তাবাদেরও মূল কথা হ'ল কাজ, যার প্রতি শিশু স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট। এই কাজই উদ্‌বোধক হিসেবে তার মধ্যে প্রেষণা-শক্তি সৃষ্টি করবে শিক্ষার জন্য। সুতরাং, এদিক্ থেকেও সক্রিয়তাবাদ মনোবিজ্ঞানসম্মত।

প্রেষণা

[পাঁচ] মনোবিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষে মানুষে পার্থক্য

বর্তমান। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (individual difference) প্রকৃতির নিয়ম। কোন বিশেষ শ্রেণীতে এমন অনেক ছাত্র আছে যারা উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন; স্বাভাবিকভাবে তারা হয়ত গতানুগতিক পদ্ধতিতে বিমূর্ত জ্ঞান (abstract knowledge) গ্রহণ করতে সক্ষম।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব

কিন্তু সাধারণ শ্রেণীতে অনেক ছাত্র থাকে যারা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তারা সহজভাবে কোন বিমূর্ত জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেইসব জ্ঞান যদি পরিবেশন করা না হয়, তাঁরা তা গ্রহণ করতে পারে না। তাই সাধারণের সুবিধার জন্য বিমূর্ত জ্ঞানকে বস্তুধর্মী করার দরকার; যার জন্য মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল—"From concrete to the abstract." কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনা বিমূর্ত জ্ঞানকে বস্তুধর্মী ক'রে শিশুমনের উপযোগী ক'রে পরিবেশন করতে সহায়তা করে।

অবসাদ ও অন্যান্য মানসিক অবস্থার দূরীকরণ

[ছয়] কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য থাকার জন্য তা শিশুদের মধ্যে সহজে বিরক্তি (Boredom), একঘেয়েমি (Monotony) বা মানসিক অবসাদ (Mental fatigue) আনে না। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় এগুলো বিশেষ সমস্যা হিসেবে দাঁড়ায়, যা মনোবিদ্‌দের সমাধান করতে হয় নানা রকম পরোক্ষ পদ্ধতিতে।

[সাত] মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন বলেছেন—"The workshop is undoubtedly a character building institution." সক্রিয়তা-ভিত্তিক শিক্ষায় শৃংখলার কোন সমস্যাই থাকে না। উচ্ছৃংখলতা আসে অতৃপ্তি, ব্যর্থতা বা হতাশা (Frustration) থেকে। কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় সেই ধরনের কোন সুযোগ নেই।

শৃংখলা-স্থাপনের সুবিধা

বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে শিশুরা নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ পায়। ফলে, শৃংখলা স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এসে যায়। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—"The progress that the child makes in the use of his limbs gives it a sense of joy and fulfilment a feeling that is essential to the growth of every boy and girl and when one is compelled merely to listen passively without any opportunity of self-expression, outbursts of indiscipline occur." মনোবৈজ্ঞানিক দিক্ থেকে শৃংখলার মূল কথা হ'ল—আত্ম-বিকাশ (Self-expression), আত্মতৃপ্তি (Self-satisfaction) এবং স্বাধীনতা (Freedom)। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এর সবগুলোই নিতে সক্ষম।

[আট] শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন; ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। তার এই বিকাশের মধ্যে পড়ে দেহ এবং মন দুই-ই। একমাত্র কর্মকেন্দ্রিক সক্রিয় শিক্ষাই ব্যক্তির এই পরিপূর্ণ বিকাশের দায়িত্ব বহন করতে পারে। শিশু সক্রিয়তার দ্বারাই তার দেহ ও মনের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে পারে। ব্যক্তিসত্তার (Personality) বিকাশে তাই এই পদ্ধতি বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান

অধিকার করেছে। আধুনিক কালে সব চিন্তাবিদ্‌ই এ কথা স্বীকার করেন। কার্ল মার্কস (Karl Marx), যিনি আধুনিক সমাজ-চিন্তার ইতিহাসে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেছেন, তিনিও বলেছেন—"The education of the future will, in the case of every child over a certain age, combine productive labour with education and athletics not merely as one of the methods of raising social production but as the only methods of producing fully developed human being"

॥ সক্রিয়তা-ভিত্তিক শিক্ষার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি ॥
(Sociological basis of Activity principle)

সক্রিয়তাবাদ যে কেবলমাত্র মনোবিদ্যার তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা নয়, এই শিক্ষাধারা সমাজ-বিজ্ঞানের উন্নত আদর্শের ওপরও প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের কল্যাণ সাধন করা। ব্যক্তির উন্নতি এবং সমাজের অগ্রগতি দুই-ই আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। সক্রিয় কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সমাজের দিকের কথাও বিশেষভাবে বিবেচনা করে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পরস্পরের ওপর শ্রদ্ধা রেখে বাস করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করে এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা। সমাজ-জীবনে সুষ্ঠুভাবে বাস করার জন্য যে সব মানসিক ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার, তার প্রত্যেকটির অনুশীলন করা হয় এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় সামাজিক উপযোগিতার কয়েকটা দিক্ সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করছি।

প্রস্তাবনা

[এক] সুস্থ সমাজ-জীবনের সবচেয়ে বেশী দরকার সহযোগিতামূলক সহ-অবস্থান। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই সহযোগিতার প্রশিক্ষণ পায়। একত্রে মিলেমিশে তারা বিশেষ কোন কাজ সমাধা করে। এর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবের বিকাশলাভ করে। এই সহযোগিতার মনোভাব তারা পরবর্তী কালে সমাজ-জীবনের সঙ্গে আজীবন বহন করে নিয়ে যায়। এই ধরনের কাজের মধ্যে তারা আনন্দ পায়। একজনের বোঝা আর একজন সহজভাবে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। বি. জি. খের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন। 'কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ ব্যক্তি—সমাজসম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে।'

সামাজিক সহযোগিতার প্রশিক্ষণ

[দুই] কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ছোটবেলা থেকে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে শিশুদের সচেতন করে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য তার নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী জাতীয় উৎপাদনে সহায়তা করা। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মধ্যে কর্মবিমুখতা এনে দেয়। শিক্ষার পদ্ধতি যদি সক্রিয় হ'য়, তবে তার মাধ্যমে শিশুরা বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ লাভ করে, যা তার ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগে। এই ধরনের শিক্ষা সমাজে শিক্ষিত ও

শ্রমের মর্যাদা

অশিক্ষিতের মধ্যে যে ভেদ আছে, তা দূর করে সামগ্রিকভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

[তিন] আধুনিক কালে শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে, এই পদ্ধতি তার গতিকে ত্বরান্বিত করবে। শিক্ষার গণতান্ত্রিকতার মূল কথা হ'ল শিক্ষা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষা সকলকে দিতে হবে এবং সকলেরই তা পাওয়ার অধিকার আছে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সহজভাবে সকলেরই মনের উপযোগী ক'রে পরিবেশন করা যায়। জাকির হুসেন বলেছিলেন—"Under democratic and socialistic pattern of society, education has to meet the needs of everybody, and as such productive and socially useful work should be the chief instrument of universal education." এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতবর্ষে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছিল।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন

[চার] কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের বেকার-সমস্যা সহজভাবে দূর করা যায়। শিক্ষা যদি জীবনের উপযোগী হয়, তা'হলে তা ব্যক্তিকে তার জীবিকা-উপার্জনে সহায়তা করবে। শিক্ষা সম্বন্ধে সংকীর্ণ ধারণা এবং শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মবিমুখতা বেকার-সমস্যার কারণ। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে যথাযোগ্য কর্মভাব (work attitude) জাগিয়ে তুলবে।

জীবিকার্জনের সহায়ক

[পাঁচ] কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে শহরের জীবনের সঙ্গে গ্রামীণ জীবনের যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। আমাদের দেশে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে শহর-জীবনের যে পার্থক্য আছে, কেবলমাত্র যোগ্য কর্মভাব উদ্বুদ্ধ ক'রে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করা যেতে পারে। যারা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত আছে, তারা যেমন কাজ করছে, আবার যারা কল-কারখানায় কাজ করছে, তারাও তেমনি কাজ করছে; এই মনোভাব জাগ্রত করতে না পারলে জাতীয় সংহতি ব্যাহত হবে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগ্য মনোভাব সৃষ্টি ক'রে এই ধরনের বিভেদমূলক চিন্তা দূর করতে পারে। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন (কোঠারী) কর্ম-অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার (work-experience) উপযোগিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একই কথা বলেছেন—"It might help social and national integration by strengthening the links between the individual and the community and by creating bonds of understanding between the educated persons and the masses.

সামাজিক সংহতি স্থাপন

॥ আলোচনা ॥

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে কোন বাধা নেই যে, সক্রিয়তা-বাদ শিক্ষাক্ষেত্রে এক সার্থক নীতি। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে শিক্ষাকে মনোবিদ্যা ও সমাজবিদ্যাসম্মত করতে সক্রিয়তাবাদই একমাত্র পারে। মানুষের জীবন-ধারণের

উপযোগী এবং তার মনোধর্মী শিক্ষা-পদ্ধতি রচনা ক'রে, এই শিক্ষানীতি শিক্ষাক্ষেত্রে যে মানববাদের আন্দোলন (Humanism) গড়ে তুলেছে, তা যে-কোন সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই কারণে এই মতবাদ আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিক্ষাচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। ডিউই-এর ল্যাবরেটরী স্কুল, আমেরিকার প্রোগ্রেসিভ এসোসিয়েশনের Thirty School Experiment, রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় কর্মমূলক অভিজ্ঞতার তত্ত্ব (work-experience), গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা—এই মৌলিক নীতির সর্বজনীন আবেদনেরই প্রমাণ। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (রাধাকৃষ্ণন), মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন (মুদালিয়ার) এবং ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের (কোঠারী) রিপোর্টে এই মতবাদকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টে কর্মমূলক অভিজ্ঞতাকে (work-experience) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হ'য়েছে।

সক্রিয়তাবাদের সর্বজনীন আবেদন

কিন্তু সক্রিয়তাবাদ যে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন, সে কথা বলা যায় না। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম-রচনার খুবই অসুবিধা আছে। কারণ বিশেষ কোন কাজকে কেন্দ্র ক'রে সম্পূর্ণ জ্ঞানকে সমন্বিত করা খুবই মুশকিল হ'য়ে পড়ে। এ সম্পর্কে আমরা পাঠ্যক্রম আলোচনার সময় উল্লেখ করেছি। তাছাড়া, এই ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা সকল স্তরের শিক্ষার পক্ষে উপযোগী নয়। প্রাথমিক স্তরে এই ধরনের পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে আনন্দ আনতে পারে এবং শিক্ষাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে শুধুমাত্র কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যক্তির জ্ঞানকে খুবই সীমাবদ্ধ ক'রে তুলবে। আবার এই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করলে পাঠ-গ্রহণে অনেক বেশী সময় লাগে। জীবনের সীমিত পরিসরের মধ্যে আমরা যদি সম্পূর্ণভাবে এই পদ্ধতির ওপর নির্ভর করি, তাহ'লে শিক্ষার সময়কাল অনেক বেড়ে যাবে। এটা ব্যক্তি ও সমাজ দু'ও দিক থেকে কাম্য নয়। তাই ব্যবহারিক দিক্ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, কর্মভিত্তিক শিক্ষা বা সক্রিয়তা-তত্ত্বের অনেক অসুবিধা আছে।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ত্রুটি

ব্যবহারিক অসুবিধা থাকলেও আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সক্রিয়তাবাদ শিক্ষার ইতিহাসে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমেই জীবনের তত্ত্বগত দিক্ ও ব্যবহারিক দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। সুন্দর পরিবেশে, সুশিক্ষকের পরিচালনায়, সুপরিকল্পিত পথে যদি সক্রিয়তাকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তবে তা শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি দূর করতে পারবে। তার নিজস্ব যে ত্রুটির দিক্ আছে তাকে আমরা দূর করতে পারি যদি শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণকে (Class teaching) সম্পূর্ণরূপে বর্জন না ক'রে তার পরিপূরক হিসেবে এই নীতিকে ব্যবহার করি। আর তাই করার চেষ্টা করা হ'য়েছে বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে।

মন্তব্য

সারসংক্ষেপ

আধুনিক কালে যে সব তত্ত্ব ও নীতি শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল সক্রিয়তাবাদ (Activity principle)। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার সামগ্রস্তপূর্ণ নীতি হিসেবে এই মতবাদ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। রুশো, পেস্তালাৎসী, ফ্রয়েবেল, মন্তেষরী, ডিউই ইত্যাদি প্রত্যেক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদ্গণ এই নীতিকে সমর্থন করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি প্রভৃতি ভারতীয় চিন্তাবিদ্ও এই নীতিকে সমর্থন করেছেন। এই নীতির মূল কথা হ'ল—শিক্ষা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তাভিত্তিক হবে। এই অর্থে খেলাভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তবে সক্রিয়তাবাদের মধ্যে কিছু ফলের প্রত্যাশা আছে। যাতে শিশুর সক্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে কিছু উৎপাদন করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। তাই সক্রিয়তাবাদ-এর মূল বক্তব্য হ'ল—(১) শিক্ষা হবে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচিত কোন কর্মকেন্দ্রিক, (২) ঐ কর্মটি হবে উৎপাদনমূলক (Productive), (৩) শিক্ষা হবে উপজাত ফল এবং (৪) এতে খেলাভিত্তিক শিক্ষার সকল বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকবে।

সক্রিয়তাবাদ আধুনিক শিক্ষার নীতি হিসেবে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হ'য়েছে, তার কারণ, এর দ্বারা—(১) শিশুর দৈহিক বিকাশ সাধন করা যায়, (২) শিশুর প্রক্ষোভিক বিকাশে সহায়তা করা যায়; (৩) শিশুর মধ্যে শিক্ষামুখী প্রেরণা জাগ্রত করা যায়; (৪) শিশুর ব্যক্তিসত্তা বিকাশ করা যায়, (৫) শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারা বজায় রাখা যায়, (৬) শিক্ষাক্ষেত্রে একঘেয়েমি দূর করা যায়, (৭) শিখন-প্রক্রিয়ার (Learning) সুষ্ঠু পরিচালনা করা যায় এবং (৮) শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা-স্থাপনের কাজ সহজ হয়। সবশেষে, (৯) শিশুর প্রবৃত্তিমূলক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করা যায়।

তাছাড়া, সক্রিয়তাবাদের সামাজিক গুরুত্বও আছে। এর মাধ্যমে (১) শিশুর সামাজিক সহযোগিতার প্রশিক্ষণ হয়; (২) শিশুদের মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত করা যায়; (৩) শিশুকে জীবিকা-অর্জনের জন্য বৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতা দেওয়া যায়, (৪) সামাজিক সংহতি স্থাপন করা যায় এবং (৫) শিক্ষা-পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে একথা স্মরণ রাখার দরকার, সক্রিয়তাভিত্তিক কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার পূর্বোক্ত সুবিধাগুলি আছে বলে, শুধুমাত্র তাদের দ্বারা শিক্ষার সকল উদ্দেশ্য সফল হবে, একথা ঠিক নয়। শিক্ষাকে কেবলমাত্র কর্মকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক করলে, শিশুর অনেক গুণের বিকাশ হবে না। তাই শ্রেণী-শিক্ষণের পরিপূরক হিসেব তাকে বর্তমান শিক্ষায় ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. **What is meant by activity principle in education? Discuss the psychological basis of this principle.**

[শিক্ষার সক্রিয়তাবাদ বলতে কি বোঝায়? এই নীতির মূলে যে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, সে সম্পর্কে আলোচনা কর।]

2. **Discuss what do you know about activity movement in education. What sociological advantages are derived from such a principle?**

[শিক্ষায় 'সক্রিয়তা আন্দোলন' সম্পর্কে যা জান আলোচনা কর। এই নীতি সামাজিক সুবিধাগুলি কি?]

3. **Distinguish between activity principle & play-way principle. Discuss the advantages of activity principle in education.**

[সক্রিয়তার নীতি ও খেলাভিত্তিক শিক্ষার নীতির পার্থক্য নির্ধারণ কর। সক্রিয়তা-নীতির সামাজিক সুবিধাগুলি কি?]

4. **What do you understand by activity principle in education? Why are children interested in activity methods?**

['শিক্ষার সক্রিয়তাবাদ' বলতে তুমি কি বোঝ? শিশুরা কেন সক্রিয়তা-ভিত্তিক পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়?]

5. **Write notes on [টীকা লিখ]:**

(a) Activity principle in education [শিক্ষার সক্রিয়তাবাদ]

(b) Characteristics of activity principle in Education [শিক্ষার সক্রিয়তা-বাদের বৈশিষ্ট্য]

(c) Psychological basis of activity principle [সক্রিয়তাবাদের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি]

(d) Sociological basis of activity principle [সক্রিয়তাবাদের সামাজিক ভিত্তি]

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিক্ষণ-পদ্ধতির ভূমিকা

Introduction to Teaching Methods

শিক্ষার বিভিন্ন দিক্ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি—শিক্ষালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পাঠ্যক্রম। এছাড়া, শিক্ষার যথাযোগ্য পদ্ধতি-নির্ধারণও শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক্। শিক্ষার বিভিন্ন দিকে যেমন আধুনিক চিন্তাধারা অনুপ্রবেশ করেছে, তেমনি তার পদ্ধতির মধ্যেও অভিনবত্বের অভাব নেই। ফলে, পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা আমাদের বদলেছে এবং বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হ'য়েছে। আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী শিক্ষকের কাজ হ'ল জ্ঞান ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। এই সংযোগ-স্থাপনের জন্য যে প্রক্রিয়া শিক্ষক অনুসরণ করেন, তাই হ'ল পদ্ধতি (Method)। এক কথায়, পদ্ধতি-শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং পাঠ্যক্রম এদের মধ্যে সংযোগ-স্থাপনের প্রক্রিয়া। রাস্ক (Rusk) একে "The process of establishing and maintaining contact between the pupil and the subject-mater" ব'লে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং শিক্ষণ-পদ্ধতি (Method of teaching) আমরা তাকেই বলব যা শিক্ষার্থীর সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ সাধন করে। এটা শুধুমাত্র শিক্ষকের প্রচেষ্টা নয় ; যে প্রচেষ্টার দ্বারা শিক্ষার্থী জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী না হয়, সে প্রক্রিয়াকে আমরা পদ্ধতি বলব না।

প্রস্তাবনা

শিক্ষণ-পদ্ধতির বিবর্তনের ধারা অনুশীলন করলে দেখতে পাই এই পদ্ধতি মানব-মনের সংগঠন-সংক্রান্ত ধারণার ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন শক্তিবাদীদের ধারণা ছিল মন কতকগুলো পরস্পর-নিরপেক্ষ শক্তির দ্বারা গঠিত এবং শিক্ষার মাধ্যমে এইসব শক্তির উৎকর্ষণ করাই হ'ল শিক্ষকের কাজ। সুতরাং, পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ছিল চর্চা করা। সে চর্চা হ'ল বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে মানসিক ক্ষমতার বা শক্তির। কিন্তু আধুনিক কালে মন সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে। মন হ'ল সামগ্রিক সত্তা এবং মনের অভিজ্ঞতাও সামগ্রিক সুসমঞ্জস রূপ নিয়েই থাকে। বস্তুজগৎ থেকে আমরা খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা গ্রহণ করি না, সামগ্রিক অভিজ্ঞতাই গ্রহণ করি। গেস্টাল্ট-মতবাদীরা বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন। সুতরাং এই যদি মনের ধর্ম হয়, তবে পদ্ধতিকেও সামগ্রিক রূপ নিতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষণ-পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনকে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। কিন্তু শিক্ষণ-পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই মতবাদ-প্রয়োগের যথেষ্ট অসুবিধা আছে। কারণ, শিশুদের মন অপরিপক্ব ; তারা সমস্ত কিছু জ্ঞানকে সুসংবদ্ধভাবে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে, তাদের পক্ষে জ্ঞানকে সুসংবদ্ধভাবে যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যদিও আদর্শগত দিক্ থেকে এই পদ্ধতি বাঞ্ছনীয়, তবুও ব্যবহারিক দিক্ থেকে এর

শিক্ষণ-পদ্ধতির বিবর্তন

অসুবিধা আছে। তাই আধুনিক কালে আমরা দেখতে পাই পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার প্রচেষ্টা। এই কারণে দু'ধরনের শিক্ষণ-পদ্ধতির আবির্ভাব হ'য়েছে—তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি (Logical method) এবং মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি (Psychological method)। প্রথম আমরা এদের তুলনামূলক আলোচনা করব।

॥ তর্কবিদ্যা ও মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি ॥
(Logical and Psychological Method)

তর্কবিদ্যার নীতির ওপর ভিত্তি ক'রে যে শিক্ষণ-পদ্ধতি গড়ে উঠেছে, তাকে বলা হয় তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যা ঘটছে, যা হচ্ছে, তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যা হওয়া উচিত, সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হয়; শিক্ষার্থীর যুক্তিশক্তিকে বা বিচার করার ক্ষমতাকে কাজে লাগানো হয় যে পদ্ধতিতে, তাকেই বলা হচ্ছে তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় (K. K. Mookherjee) তাঁর New Education and its Aspects বই-এ তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির সংজ্ঞা দিয়েছেন—"The logical method is one which is based upon the nature of knowledge." এখানে শিক্ষার্থীর বিচারশক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষক এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু সুসংবদ্ধভাবে পর পর ছাত্রদের কাছে উপস্থাপন করেন। ফলে, শিক্ষার্থীর মন পরিপক্ক না হওয়ার জন্য সব সময় সে জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না এই পদ্ধতিতে। অপর দিকে মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রক্রিয়া এবং চাহিদার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনের প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"The psychological method, therefore, directs us to take the child mind as it is, and starts from the normal nature and capacities of children as we find them actually."

তর্কবিদ্যা ও মনোবিদ্যা-সম্মত পদ্ধতি কি?

তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে বিকৃত না ক'রে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু আমাদের পাঠ্য বিষয়ে এমন অনেক ধারণা আছে, যা এতই বিমূর্ত যে, শিশুমনের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কারণ অপরিণত শিশুমন সহজে বিমূর্ত জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি শিশুর পক্ষে উপযোগী হয় না। অন্য দিকে মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে শিশুর মনের স্বাভাবিক অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। শিশুরা স্বাভাবিকভাবে মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। তাই তাকে বিমূর্ত-জ্ঞান দিতে হ'লে মূর্ত বস্তুর (concrete object) সাহায্য নিতে হবে। গণিতে সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা দিতে হ'লে তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী পর পর কতকগুলো শব্দ (এক, দুই, তিন···) এবং তার সঙ্গে সংকেতগুলোর (১, ২, ৩ ··)

মূর্ত ও অমূর্ত বিষয়বস্তু

সমন্বয় করব মৌখিক চর্চার মাধ্যমে। কিন্তু এগুলো আসলে বিমূর্ত ধারণা। শিশুরা মুখস্থ করে ঠিকই; কিন্তু অর্থ তার কাছে বোধগম্য নয়। মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে আমরা একটা, দুটো, তিনটে বস্তু দেখিয়ে তাদের সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা করব। তাই মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল বিমূর্ত জ্ঞানকে বস্তুকেন্দ্রিক ক'রে মূর্ত করা (concretization)। কিন্তু শিক্ষার্থীকে বিমূর্ত সংখ্যা নিয়েই নাড়াচাড়া করতে হবে এবং বিমূর্ত বস্তু সম্বন্ধে ধারণা স্থাপন করতে হবে। তাই মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে আমরা প্রাথমিক কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি শিশুমনের বিশেষ উপযোগী। তাই আধুনিক শিক্ষার একটি নীতি হ'ল—"From concrete to abstract".

পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা

তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সামনে এমন জ্ঞান উপস্থিত করা হয় যার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ জীবনের কোন যোগাযোগ থাকে না। শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেই জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে, এই ধরনের জ্ঞান গ্রহণ করতে তার পক্ষে অসুবিধা হয়। সে তার মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না। ফলে, সব দিকই তার কাছে বোঝাস্বরূপ মনে হয়। আধুনিক মনোবিদ্যার ধারণা অনুযায়ী শিক্ষণ হয় অভিজ্ঞতার পরিবর্ধন ও পরিবর্জনের মাধ্যমে। এখন এই পরিবর্ধনের জন্য সব সময় অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। শিক্ষার্থী যা জানে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে যদি নতুন জ্ঞান উপস্থিত করা না হয়, তাহ'লে সবকিছুই তার কাছে খাপছাড়া মনে হবে। মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে তাই অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন জ্ঞান পরিবেশন করা হয়। শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না যে, এই দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছু ফাঁক আছে, বা শিক্ষার্থীকে দুই বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের জন্যও প্রথার অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হয় না। এতে মানসিক শক্তিরও অপচয় হয় না। তাই মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হ'ল—এই পদ্ধতিতে শিশুকে তার পরিচিত জগৎ থেকে অপরিচিতের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তা

তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা থাকে একেবারে নিষ্ক্রিয়। আধুনিক কালে সব শিক্ষাবিদ্ এবং মনোবিদ্ বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষার্থী যে পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় থাকে, তার মাধ্যমে শিক্ষা হ'তে পারে না। শিশুরা স্বভাবতই সক্রিয় থাকতে চায়। তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে তারা নিষ্ক্রিয় শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শিক্ষকরা যুক্তির সাহায্যে তাদের কাছে বিষয়বস্তু পরিবেশন করেন। এই কারণে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে শিশুর প্রকৃতিবিরোধী। কিন্তু মনোবিদ্যানির্ভর পদ্ধতিতে শিশুকে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করা হয়। এটি কোন প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমেও হ'তে পারে বা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেও হ'তে পারে। মোট কথা, শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে পাঠে যদি অংশ গ্রহণ না করে, তাহ'লে শিক্ষা সার্থক হবে না। মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সেই সুযোগ দান করে।

আবার, তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিজস্ব সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়। সব শিক্ষার্থী সব জিনিস সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, সকলের মেধা সমান নয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে যখন আমরা বিষয় উপস্থাপন করি, তখন আমরা ধরে নিই যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীই সমান। আর ঠিক পাঠ্যপুস্তক যেমন যুক্তিক্রমে সাজানো হয়, সেইভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার চেষ্টা করি। কিন্তু এতে ক'রে শিক্ষার্থী সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে, পদ্ধতির দ্বারা সকলে সমান উপকৃত হয় না।

ব্যক্তিগত সমতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

মনোবিদ্যার ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে ব্যক্তির নিজস্ব আগ্রহ, অনুরাগ, ক্ষমতা ইত্যাদি বিচার ক'রেই পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়।

ব্যক্তিগত সমতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

॥ আলোচনা ॥

এছাড়া, মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির আরও নানা রকম বৈশিষ্ট্য আছে। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ আংশিক ও সামগ্রিক পদ্ধতির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ এই শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত ক'রে তুলেছে। তাই আধুনিক কালে যে কোন শিক্ষণ-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গেলেই প্রথমে বলতে হয়, তা মনোবিদ্যাসম্মত (Psychological)। এই পদ্ধতিতে শিশুর মনের ধর্মকে কাজে লাগিয়ে মনোবিকাশের চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতি শিশুর আগ্রহ-ভিত্তিক ব'লে পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনের আলাদা কোন সমস্যা থাকে না। শিশু কাজের আনন্দেই কাজ করে, সে কাজের মধ্যে সে তার নিজের চাহিদাগুলো পরিপূর্ণভাবে চরিতার্থ করতে পারে। মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি তাকে সেই সুযোগ দান করে। তাই এই পদ্ধতি শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির সুবিধা

কিন্তু এর থেকে যেন এই ধারণা না হয় তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়। তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিরও অনেক সুবিধা আছে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল শিক্ষার্থীরা জ্ঞানকে যেভাবে ব্যবহার করবে, এই পদ্ধতিতে আমরা সেই ভাবে তাকে শিক্ষা দিই। শিক্ষিত ব্যক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি ঐ পদ্ধতিতেই জ্ঞান-প্রদানের চেষ্টা করে। মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য আবার নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তাছাড়া, বয়স্কদের ক্ষেত্রে বা ওপরের শ্রেণীতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়. সর্বশেষে একথাই বলতে হয় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করলেও বিভিন্ন অংশের মধ্যে যুক্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীর

তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির সুবিধা

বর্তমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছুকে বিচার করতে শিখলে, শিক্ষার যে চরম লক্ষ্য, তা ব্যাহত হবে। সবকিছু যুক্তিবিচারে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে শিক্ষার মাধ্যমে যেসব জীবনাদর্শ গড়ে উঠবে, তা চিরস্থায়ী হবে না। তাই বলতে হয়, মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি শিশুদের পক্ষে খুবই উপযোগী, কিন্তু তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি বয়স্কদের একমাত্র পদ্ধতি।

সারসংক্ষেপ

এক কথায়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পাঠ্যক্রম, অর্থাৎ, শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংযোগ-স্থাপনের প্রক্রিয়াই হ'ল শিক্ষণ-পদ্ধতি (Teaching-method)। শিক্ষার অন্যান্য নীতির মত শিক্ষণ-পদ্ধতিরও বিবর্তন হয়েছে। এই বিবর্তন মানব মনের ধারণার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে। সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দু ধরনের শিক্ষণ-পদ্ধতির কথা বিবেচনা করা হয়—(১) প্রাচীন তর্কবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি (Logical method) এবং (২) আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি (Psychological method)। তর্কবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। তাই এখানে বিষয়বস্তুকে যুক্তিপূর্ণ ক্রমে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয়। শিশুমন তা গ্রহণ করতে সক্ষম কিনা, তা বিচার করা হয় না। মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুকে শিশুমনে গ্রহণের উপযোগী ক্রমে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ, শিশু বা শিক্ষার্থীকে এখানে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই উভয় পদ্ধতিরই সুবিধা আছে। তাই দুই-ই বর্তমানে প্রচলিত। মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিশুদের পক্ষে উপযোগী পদ্ধতি এবং তর্কবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বয়স্কদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Explain the difference between logical and psychological methods. Discuss their application in curricular subjects.

[তর্কবিজ্ঞানসম্মত ও মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। পাঠ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা কর।]

2. Discuss the various characteristics of psychological method of teaching.

[মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

3. Write notes on [টীকা লিখ] :
   (a) Psychological method [মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি]
   (b) Logical method [তর্কবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি]

উনবিংশ অধ্যায়

আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি

Modern Methods of Instruction

আধুনিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক্ থেকে পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার লক্ষ্য (Aims), বিষয়-বস্তু (Subject matter), শিক্ষার্থী-শিক্ষক ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাছাড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানের (Social science) প্রভাবের ফলে শিক্ষণ-পদ্ধতির মধ্যেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যাচ্ছে, গতানুগতিক শিক্ষণ-পদ্ধতিকে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন দিক্ থেকে সমালোচনা করেছেন এবং তার পরিবর্তে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নতুন পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য। এর ফলে আধুনিক কালে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদানের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি দেখতে পাই। এর প্রত্যেকটিতেই আধুনিক মনোবিদ্যার তত্ত্ব প্রয়োগ করার চেষ্টা হ'য়েছে। তাই এদের আমরা মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি (Psychological method)-ও বলতে পারি। এই সব পদ্ধতি ও পরিকল্পনার বিশেষ কয়েকটা সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

।। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি ।।

(The Kindergarten System)

এই পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন জার্মান শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবেল (Froebel)। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষাদর্শনকে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর করার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর নাম দেন তিনি 'কিণ্ডারগার্টেন'। পরবর্তী কালে এই বিদ্যালয় থেকে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতির নাম হয়েছে 'কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি'। 'কিণ্ডারগার্টেন' কথার অর্থ হ'ল 'শিশু-উদ্যান' (Childrens' Garden)। ফ্রয়েবেল শিক্ষাক্ষেত্রে 'শিক্ষালয়' বা 'বিদ্যালয়' কথাটা ব্যবহারে পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মধ্যে শিশুর আত্মসক্রিয়তাই (Self-activity) একমাত্র পদ্ধতি (Method)। শিশু স্বাধীনভাবে নিজে নিজে কাজ করবে, এবং তার মাধ্যমে সে শিক্ষার উন্নততর আদর্শের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই তাঁর কিণ্ডারগার্টেনের মূল কথা হ'ল শিশুর স্বাধীন সক্রিয়তা। তারা নাচবে, গান গাইবে এবং বিভিন্ন খেলনা নিয়ে খেলা করবে। শিশুরা বাগানের ছোট ছোট চারাগাছ। মালী যেমন বাগানের প্রত্যেক গাছের প্রতি যত্ন নেয়, তাদের জল দেয়, সার দেয়, ঠিক তেমনি শিক্ষকরাও শিশুদের যথাযোগ্য যত্নের সঙ্গে তাদের জীবন-বিকাশের পথে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি মূল ও ভিত্তি

ফ্রয়েবেলের শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল আত্মসচেতনতার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনার ভেতর তিনি সেই প্রচেষ্টাই করেছেন।

॥ কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য ॥
(Characteristics of Kindergarten System)

(১) আত্মসক্রিয়তা ও খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই উদ্দেশ্যে শিশুদের অঙ্গভঙ্গীর সহযোগে ছড়া, গান ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা থাকে এই পদ্ধতির মধ্যে।

আত্মসক্রিয়তা

(২) ইন্দ্রিয়-পরিচালনার প্রশিক্ষণের (sense-training) ওপর এই পদ্ধতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। শিশুর জ্ঞান আসে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। তাই ফ্রয়েবেল শৈশবে ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর জন্য কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের খেলনা নিয়ে খেলার ব্যবস্থা থাকে। এদের বলা হয় 'উপহার' (Gift)। ফ্রয়েবেল বলেছেন, এই সব উপহার শিশুর কাছে জগতের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন উপহারের মধ্যে থাকে ভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির কাঠের টুকরো, কাঠি, তুলো, সুতো, নানা রঙের বল ইত্যাদি। এই সব ছোট ছোট খেলনা যার প্রতি শিশু খুব সহজে আকৃষ্ট হয়, তাদের মাধ্যমে শিশুর রঙ, আকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা হয়।

ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ

(৩) আনন্দই হ'ল কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির মূল কথা। শিশুরা তাই খেলাধূলা করার সুযোগ পায় এই পদ্ধতিতে। ফ্রয়েবেল শিশুদের খেলার সঙ্গে কাজের সার্থক সমন্বয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজের ব্যবস্থা করেছেন। এগুলোর তিনি নাম দিয়েছেন বৃত্তি (Occupation)। নানা রকমে কাগজ ভাঁজ করা, কাগজের সাহায্যে নানা রকম খেলনা তৈরি করা, কাগজের ফুল তৈরি করা, সেলাই করা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম কাজের ব্যবস্থা থাকে এই কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে। এগুলো কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির উপকরণ।

আনন্দ

(৪) গান এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিশুদের যে-কোন কাজ করতে দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের গানের ছন্দের তালে। তারা ছন্দের তালের প্রতি স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয় এবং ফলে কাজগুলোও তারা আগ্রহের সঙ্গে এবং আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করে।

গান ও ছন্দ

(৫) কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে প্রকৃতি-পরিচয়কে (Nature study) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। বিশ্বের সব শক্তির সঙ্গে একাত্মবোধ অনুভব করতে হ'লে প্রকৃতি-জগতের সঙ্গে একান্তভাবে পরিচিত হওয়ার দরকার। তাই শিক্ষার এই প্রথম স্তরে ফ্রয়েবেল প্রকৃতি-পাঠের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রকৃতি-পাঠ

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক্ হল এই যে, শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর বহুমুখী জীবনবিকাশ সম্ভব হয়, এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম কৌশলই শিক্ষার্থী এখানে শেখে, তবে নিষ্ক্রিয়ভাবে নয়; তার প্রতি পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে

অংশ গ্রহণ করে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর জীবনকে এক স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপন করা হয়। ফলে, একই সঙ্গে তারা জ্ঞানমূলক এবং সামাজিকতামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই জন্যই শিশুর মধ্যে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনাদর্শ গড়ে ওঠে। কিণ্ডারগার্টেন-পদ্ধতি শিশুর সুষম ও ঐক্যবদ্ধ (consistent) ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সহায়তা করে। তাই আজকাল প্রায় পৃথিবীর সমস্ত দেশেই এই পদ্ধতির প্রচলন হ'য়েছে তিন থেকে ছ' বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আমাদের দেশেও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পদ্ধতির প্রচলন হ'য়েছে, বিশেষ ক'রে শহরাঞ্চলে।

বক্তব্য

॥ মন্তেস্বরী পদ্ধতি ॥
(The Montessori Method)

মন্তেস্বরী পদ্ধতির প্রবর্তক হ'লেন ইতালীর ডঃ মাদাম মরিয়া মন্তেস্বরী। মন্তেস্বরী রুশোর শিক্ষা-চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি শিশুর স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ফ্রয়েবেল-এর মত মন্তেস্বরী ইন্দ্রিয়-পরিচালনার প্রশিক্ষণের (sense traning) ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মাদাম মন্তেস্বরী চিকিৎসা-বৃত্তি ছেড়ে সারা জীবন ধ'রে শিক্ষামূলক গবেষণায় নিজেকে নিয়োগ করেন এবং তাঁর শিক্ষাতত্ত্বকে প্রয়োগ করার জন্য 1907 সালে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর নাম দেন Casa-dei-Bambini বা শিশুনিকেতন। শিশুর মধ্যে যে সব অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আছে, তাকে প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই হ'ল তাঁর পদ্ধতির মূল কথা। তিনি ফ্রয়েবেলের উপহার ও বৃত্তির (Gifts and Occupation) মত নানা ধরনের খেলনা তৈরি করেন। এদের নাম দেন ডিডাকটিক্ যন্ত্র (Didactic apparatus)। এই সব খেলনা এমনভাবে পরিকল্পিত যে, শিশুরা নিজেরাই ঐ সব খেলনার মাধ্যমে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব হাতে নেবে; নিজেরাই নিজেদের ভ্রম সংশোধন করবে।

মন্তেস্বরী পদ্ধতির মূল ভিত্তি

॥ মন্তেস্বরী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ॥
(Characteristics of Montessori System)

[এক] এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা-দান। এই পদ্ধতির মূল বক্তব্য হ'ল, শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মনের পরিপূর্ণ বিকাশ করতে হবে। সুতরাং তার মধ্যে যে সব অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আছে, তাকে যদি বিধিনিষেধের অনুশাসনে চেপে রাখা হয়, তাহ'লে তার পরিপূর্ণ বিকাশ কোন মতে সম্ভব হবে না। শৃঙ্খলা আসবে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে।

স্বাধীনতা

[দুই] শিক্ষা হবে শিশুর সক্রিয় প্রচেষ্টার দ্বারা। শিশুকে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। তারা নিজেরা হাতে-কলমে কাজ করবে। তাতে তাদের ভুল হ'তে পারে, কিন্তু তারা নিজেরা শুধরে নেবে। বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয়-পরিমার্জনের উপযোগী কাজ দেওয়ার জন্য মন্তেস্বরী ডিডাক্টিক্ যন্ত্রের (Didactic apparatus) প্রবর্তন করেন। এই খেলনাগুলোতে নিজের ভুল শুধ্‌রে নেওয়ার মত ব্যবস্থা আছে। শিশুরা যখন এইসব খেলনা-যন্ত্র নিয়ে খেলা করবে, একজন শিক্ষিকা তাদের পরিচালনা করবেন। মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে এই শিক্ষিকার নাম দেওয়া হ'য়েছে পরিচালিকা (Directress)। কারণ, শিক্ষিকা যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করবেন শিশুদের স্বাধীন কাজে।—সুতরাং এই পদ্ধতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানে স্বয়ংশিক্ষার নীতি (Principle of Auto-education) অনুসরণ করা হয়েছে।

সক্রিয়তা

[তিন] মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়-পরিমার্জনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় উভয়ের উৎকর্ষণের কথা বলেছেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিডাকটিক্ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন মন্তেস্বরী। অপর দিকে কর্মেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের শরীরচর্চার ব্যবস্থা, হাতের কাজ করার ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে স্থান পেয়েছে। বাগানের কাজ করা, পশুপাখী পোষা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে একদিকে তাদের কর্মেন্দ্রিয়ের যেমন উন্নতি হবে, অন্যদিকে নানারকম সামাজিক গুণেরও বিকাশ হবে।

ইন্দ্রিয়-পরিচালনার প্রশিক্ষণ

[চার] মন্তেস্বরী পদ্ধতির সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্বকে (Theory of individual difference) বিশেষভাবে অনুমোদন করা। প্রত্যেক শিশুরই নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা আছে এবং এই ব্যক্তিসত্তার দিক থেকে তারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। শিক্ষণ-পদ্ধতি এমন হওয়া দরকার যাতে ক'রে কোন শিশুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন না হয়। এই কারণে শ্রেণীকক্ষে দলগতভাবে পাঠদানের পদ্ধতিকে এখানে স্থান দেওয়া হয়নি। প্রচলিত ব্যবস্থাকে মন্তেস্বরী একেবারে বাতিল ক'রে দিয়েছেন। অ্যাডাম (Adam) বলেছেন—"The knell of class teaching has been rung." আর সেই ঘণ্টা বাজিয়েছেন মন্তেস্বরী। বিদ্যালয়ে শ্রেণীবিভাগের প্রচলন থাকবে। কিন্তু তা শিক্ষাদানের জন্য নয়, প্রশাসনের সুবিধার জন্য মাত্র। প্রত্যেক শিশুকে তার নিজস্ব ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বিকশিত করার সুযোগ দিতে হবে। এই দিক্ থেকে বিচার ক'রে বলা যায় মন্তেস্বরী পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষা (Individualized instruction)।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব

॥ কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি ও মন্তেস্বরী পদ্ধতি ॥
(Kindergarten and Montessori System)

বর্তমানে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে মন্তেস্বরী পদ্ধতি এক নতুন আন্দোলন গড়ে

তুলেছে। পৃথিবীর সকল দেশে এই পদ্ধতির বহুল প্রচার হ'য়েছে। অনেক দিক থেকে এই পদ্ধতির সঙ্গে ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির মিল আছে। দার্শনিক চিন্তাধারার দিক্ থেকে ফ্রয়েবেল ও মন্তেস্বরীর মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও তাদের প্রবর্তিত পদ্ধতির মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। যেমন, শিশুর স্বাধীনতার ব্যবস্থা উভয় পদ্ধতির মধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে। শিক্ষা যে শিশুর সক্রিয়তার দ্বারা সম্ভব, সে কথাও দুজনে স্বীকার করেছেন। এই সক্রিয়তাকে কার্যকরী করার জন্য কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে যেমন উপহার এবং বৃত্তির (Gifts and occupation) ব্যবস্থা করা হয়েছে, মন্তেস্বরী পদ্ধতিতেও তেমনি বিভিন্ন ধরনের ডিডাক্‌টিক যন্ত্রের (Didactic apparatus) ব্যবস্থা আছে। তাঁরা উভয়েই খেলাভিত্তিক (Play-way) শিক্ষার কথা বলেছেন। উভয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উভয় পদ্ধতিতেই ইন্দ্রিয়-পরিচালনার প্রশিক্ষণের (sense tranining) ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। তাই বিভিন্ন দিক্ থেকে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি এবং মন্তেস্বরী পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে।

দুই পদ্ধতির মিল

তবে তাদের মধ্যে পার্থক্যও অনেক আছে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শৃঙ্খলার দায়িত্ব শিক্ষিকার। কিন্তু মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষিকা শিশুর কাজ নানাভাবে উপহার ও বৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে পরিচালিকা (Directress) সে রকম কোন নিয়ন্ত্রণ রাখেন না। শিশুরা নিজের ইচ্ছামত খেলা বেছে নিতে পারে এই পদ্ধতিতে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুর সামগ্রিক গুণের বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাকে সমাজ-পরিবেশের মধ্যে স্থাপন ক'রে তার সামাজিক গুণবিকাশের চেষ্টা করা হয় এই পদ্ধতিতে। কিন্তু মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, প্রকৃতির পরিচয় পড়ানো হয় দুই পদ্ধতিতে দুই উদ্দেশ্য নিয়ে। এই রকম নানা দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

দুই পদ্ধতির অমিল

তবে উভয় পদ্ধতিরই বহুল প্রচার আধুনিক কালে হয়েছে। এই দুই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হ'ল যে, এখানে যেসব খেলনা (উপহার, বৃত্তি এবং ডিডাকৃটিক্ যন্ত্র) ব্যবহার করা হয় তার সংখ্যা এত কম যে তাদের দ্বারা শিশুর সম্পূর্ণ জ্ঞান হ'তে পারে না। এই সবের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা শিশুরা অর্জন করতে পারে না। এর বাইরেও নানা রকম কাজে তারা আকৃষ্ট হয়।

মন্তব্য

।। ডাল্টন পরিকল্পনা ।।
(The Dalton Plan)

রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু-স্বাধীনতার যে আন্দোলন গড়ে তোলেন, তার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন শিক্ষাদানের পরিকল্পনার আবির্ভাব হয়। ডাল্টন পরিকল্পনা

এই আন্দোলনের ফলেই গড়ে উঠেছে। এই পরিকল্পনার স্রষ্টা হলেন পার্ক'হার্স্ট (Parkhurst)। তিনি শিশুর ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে বিদ্যালয় হবে একটা পরীক্ষাগার (Laboratory), যেখানে শিশুরা নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। শুধু মাত্র নিষ্ক্রিয়ভাবে শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করবে না। এর জন্য তিনি তাঁর নিজের পরিকল্পনাকে পরীক্ষাগার প্রণালী (Laboratory Plan) আখ্যা দিয়েছেন। শ্রীমতী পার্কহার্স্ট তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করেন ১৯২০ সালে আমেরিকার ডাল্টন শহরে এক বিদ্যালয়ে। এই থেকে এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হ'য়েছে ডাল্টন প্ল্যান।

॥ ডাল্টন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ॥
(Characteristics of the Dalton Plan)

ডাল্টন পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনটি—স্বাধীনতা (Freedom), সমাজীকরণ (Socialization) এবং ব্যক্তিগত ক্রিয়া (Individual work)।

ডাল্টন পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হ'ল স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা দু'দিক থেকে দেওয়া হবে এই পরিকল্পনায়। এক হ'ল প্রশাসনিক স্বাধীনতা, দ্বিতীয় হ'ল কাজের স্বাধীনতা। বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্য তালিকা বিদ্যালয়ে থাকবে না এবং নির্দিষ্ট সময়-তালিকারও প্রয়োজন নেই। শিশুরা কোন বিশেষ বিষয়ে যতক্ষণ আগ্রহী থাকবে, তত সময় ধরেই সেই বিষয়ের ওপর কাজ করবে। ঘণ্টা বাজিয়ে তার আগ্রহকে বাধা দিয়ে বিষয়ান্তরে মনোযোগ নিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অন্য দিক থেকে শিশুদের কাজের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। তারা শ্রেণীকক্ষে, যখন তখন যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারে এবং দরকার হ'লে পরস্পরের মধ্যে যুক্তি-পরামর্শ করতে পারে। গতানুগতিক শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে তাদের স্বাধীনতাকে নষ্ট করা চলবে না।

স্বাধীনতা

ডাল্টন পরিকল্পনার আর একটা উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর সামাজিক গুণ বিকাশ করা। শিশুদের অবাধ স্বাধীনতা দিলে তারা পরস্পরের সঙ্গে যে মেলামেশার সুযোগ পাবে, তার মাধ্যমে তাদের সামাজিক শিক্ষা হবে, তাদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হবে; কাজের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাবের বিকাশ হবে, এইভাবে তাদের মধ্যে আরও নানা ধরনের সামাজিক গুণের বিকাশ হবে। তাই অনেক শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—ডাল্টন পরিকল্পনা ঠিক বিশেষ ধরনের শিক্ষণ-পদ্ধতি (Teaching method) নয়, এক নতুন ধরনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা, যার মধ্যে শিশুরা স্বাধীনভাবে কাজ ক'রে নিজের জীবনবিকাশের উপযোগী পথে এগিয়ে যাবে।

সামাজিক বিকাশ

ডাল্টন পরিকল্পনার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা (Individualized instruction)। যদিও ডাল্টন পরিকল্পনায় শিশুদের বিভিন্ন শ্রেণীতে

ভাগ করার রীতি আছে, তবে শ্রেণীবিন্যাস পাঠদানের জন্য। প্রত্যেক শিশুকে তার নিজস্ব ক্ষমতা, চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী বিকাশের সুযোগদান করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। নিজের ক্ষমতার জন্য কোন শিশু যদি এগিয়ে যায়, তাকে বাধা দেওয়া চলবে না। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—"The individual student is never sacrificed for the class in a Dalton School". এক কথায়, মনোবিদ্যার তত্ত্বের ওপর ভিত্তি ক'রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (Individual difference) ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে এই পরিকল্পনায়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

॥ ডাল্টন পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক ॥
(Different aspects of Dalton Plan)

ডাল্টন পরিকল্পনায় কাজ পরিচালনা করার জন্য চারটি জিনিস অবশ্য প্রয়োজন। এই পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়কে পরিচালনা করার জন্য দরকার—(১) পরীক্ষাগার (Laboratory), (২) বিশেষজ্ঞ শিক্ষক (Specialist, teacher), (৩) কার্যভার (Assignment) এবং ৪) ল্য-নিরূপণের ব্যবস্থা (Assessment)।

পার্কহার্স্ট তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে 'পরীক্ষাগার পরিকল্পনা' নাম দিয়েছিলেন। এর কারণ তিনি বলেছেন, বিদ্যালয়ে যদি এই পরিকল্পনা চালু করতে হয়, তা'হলে শ্রেণীকক্ষগুলোকে পরীক্ষাগারে অবশ্য পরিণত করতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণী হবে এক-একটা সামাজিক গুণ অনুশীলনের পরীক্ষাগার (Socio-logical Laboratory)। এই পরীক্ষাগারে কিছু যন্ত্রপাতি থাকবে, কিছু বই, চার্ট এবং ছবি থাকবে। শিক্ষার্থীরা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করবে। এ ছাড়া, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক-একটা ছোট পরীক্ষাগার থাকবে, এইগুলোকে বলা হবে বিষয়কক্ষ (ubject room)। প্রত্যেক ঘরে বিষয়ের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে যন্ত্রপাতি, ছবি এবং চার্ট দিয়ে। যেমন, ইতিহাসের ঘরের দেওয়ালে বিভিন্ন ঘটনার চিত্র আঁকা থাকবে, ঐতিহাসিক ম্যাপ থাকবে, ফটোগ্রাফ, মডেল, চার্ট ইত্যাদিও থাকবে। প্রত্যেক শিশুর স্বাধীনতা থাকবে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাওয়ার। ইচ্ছা করলে সে একই ঘরে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে কয়েক মিনিট ক'রে বিভিন্ন ঘরে কাটাতে পারে। যদি কোন বিষয়ে কোথাও সে অসুবিধা অনুভব করে, শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাহায্য করতে পারেন। অর্থাৎ, এক কথায়, শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয় তার আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী শিখবার। অনেক সময় এই ধরনের হাতে-কলমে কাজ ৷ .খতে গিয়ে ছাত্ররা নানা রকম অসুবিধার মধ্যে পড়ে। অনেক সময় জ্ঞান সুসমঞ্জস হয় না, তাই প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন ক'রে সাধারণভাবে আলোচনার ব্যবস্থাও থাকে এই পদ্ধতিতে। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হ'লে বিদ্যালয়ের সমস্ত গতানুগতিক সংগঠনকে বদলে ফেলতে হবে এবং ছাত্রদের

পরীক্ষাগার

শিক্ষার মান অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষের বিন্যাস না ক'রে বিষয়কেন্দ্রিক শ্রেণীকক্ষ গড়ে তুলতে হবে।

ডাল্টন পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিষয়ের জন্য যেমন পরীক্ষাগার থাকবে, তেমনি প্রত্যেক পরীক্ষাগারের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ক'রে শিক্ষক থাকবেন। সাধারণ শ্রেণীতে শিক্ষাদান করার চেয়ে এই শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশী হবে। সাধারণ বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, একই শিক্ষক ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু শ্রেণী পরিবর্তন করেন তাই নয়, বিষয়ও পরিবর্তন করেন। অর্থাৎ, একই শিক্ষক ইতিহাস পড়ান, ইংরেজীও পড়ান, আবার দরকার হ'লে অঙ্কও করান। কিন্তু এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ হ'লে এক-একজন শিক্ষক এক-একটি বিষয়ের ভার নিয়ে থাকবেন। অর্থাৎ, বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষাগারের জন্য বিভিন্ন শিক্ষক থাকবেন। এই শিক্ষকের ঐ বিষয়ের জ্ঞান গভীর হওয়ার দরকার। কারণ, তিনি শ্রেণীকক্ষে কোন বাঁধাধরা নিয়মে তৈরি করা পাঠ দেবেন না। ছাত্ররা নিজেরা কাজ করবে এবং যা অসুবিধা মনে করবে বা বিশেষ কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখনই শিক্ষকদের কাছে আসবে এবং শিক্ষককে সেই প্রশ্নের জবাব সন্তোষজনকভাবে দিতে হবে। ফলে, শিক্ষককে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা নিতে হবে, তিনি যে-কোন অবস্থাতেই ছাত্রদের যে-কোন সমস্যার সমাধানে যাতে সহায়তা করতে পারেন, সেইমত তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বিশেষজ্ঞ শিক্ষক

কার্যভার (Assignment) ডাল্টন পরিকল্পনার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক, একে কেন্দ্রবিন্দুও বলা যায়। কার্যভার বলতে বলা হ'চ্ছে নির্দিষ্ট কোন সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী যতটা কাজ করবে তাকে। অর্থাৎ, বিভিন্ন বিষয়ের মূল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো একটা ছকের মধ্যে ফেলে পরিকল্পনা করা হয়। এক বছরের বা বিদ্যালয়ে যে ক'বছর শিশুরা থাকবে, সেই অনুপাতে সম্পূর্ণ বিষয়ের জ্ঞানকে ভাগ ক'রে ফেলা হয়। আবার বিভিন্ন পর্যায়ে সময়টাকে ছোট ক'রে ফেলা হয়। সাধারণতঃ এক বছরের মধ্যে শিক্ষার্থী কোন বিশেষ বিষয়ে যতটা কাজ করবে, তাকে বলা হয় কনট্রাক্ট (Contract)। এই সম্পূর্ণ কনট্রাক্টকে ভেঙ্গে ছোট ছোট ক'রে এক-এক মাসের জন্য ভাগ করা যায়। এই এক মাসের কার্যভারকে বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট (Assignment)। আবার মাসের কাজকে ভাগ করে সপ্তাহের কাজকে বলা হয় পিরিয়ড (Period)। আবার, একদিনের কাজকে বলা হয় একক (Unit)। তাহলে শিক্ষার্থী যত বছর বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করবে, তাকে ততগুলো কনট্রাক্ট করতে হবে। সুতরাং এই পরিকল্পনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'চ্ছে যে, শিক্ষাদানের আগে শিক্ষক সম্পূর্ণভাবে তার বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করেন ও পরিকল্পনা করেন। একবার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেলে তাঁর কাজ হবে, শিক্ষার্থীদের যা কাজ দেওয়া হ'য়েছে; তা নির্দিষ্ট সময়ে করছে কিনা দেখা। অবশ্য প্রত্যেক দিনের 'একক' (Unit) সে সম্পূর্ণ করছে কিনা দেখার দরকার নেই। সারা মাসের অ্যাসাইনমেন্ট সে সম্পূর্ণ করেছে কি না, সেটুকু দেখলেই চলবে। কারণ, সে ইচ্ছা করলে একদিন

কার্যভার

সারাদিন ভূগোলের ঘরেই কাটিয়ে দিতে পারে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে এইটুকু বন্ধনই মাত্র থাকে। আবার কোন শিক্ষার্থী যদি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তার কাজ সমাধা করে, তাহ'লে তাকে আবার নতুন কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু যারা নির্দিষ্ট সময়ের কাজ শেষ করতে পারে না, তাদের নিয়েই হয় মুশকিল। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষককে সক্রিয় হ'তে হয়, এই শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে সাহায্য ক'রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

প্রত্যেক শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার ফল সম্বন্ধে জানার কোন একটা ব্যবস্থা থাকার দরকার। সাধারণ শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা কি রকম হ'য়েছে, তা জানার জন্য আমরা পরীক্ষা নিই। ঠিক তেমনি ডাল্টন পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কতটা শিখলো, সে সম্পর্কে অবগত থাকার জন্য ছাত্রদের অগ্রগতির তালিকা (Record Card) রাখার প্রয়োজন। বিশেষ ক'রে ডাল্টন পরিকল্পনার মত শিক্ষা-ব্যবস্থায়, যেখানে সমস্ত দায়িত্বই শিক্ষার্থীর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, সেখানে এধরনের তালিকা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া, শিক্ষার্থীরা যদি জানতে না পারে, তারা কতদূর এগিয়েছে, তাহলে তারা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। সুতরাং, এই ধরনের তালিকা শিশুদের আরও সক্রিয় ক'রে তুলবে। পার্কহার্স্ট এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাই ছাত্রদের কাজের অগ্রগতির ও মূল্য-নিরূপণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তিন ধরনের তালিকা বা কার্ডের কথা বলেছেন। একটা হল শিক্ষার্থীদের জন্য। এই কার্ড শিক্ষার্থীদের কাছে প্রেরণার শক্তি যোগাবে।

মূল্যায়ন

দ্বিতীয়টা হ'ল শিক্ষকের কার্ড, এর দ্বারা শিক্ষক নিজে জানতে পারবেন কার কতদূর অগ্রগতি হয়েছে, কে বিশেষ সাহায্য চায় ইত্যাদি ; এবং তৃতীয়টা হল অভিভাবকের কার্ড ; এটা সাধারণতঃ বছরে একবার দেওয়া হবে অভিভাবকদেরকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত করার জন্য এবং তাঁদের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য। পার্কহার্স্ট প্রত্যেক ধরনের কার্ড লেখ-চিত্রের (Graph) সাহায্যে ছাত্রদের অগ্রগতির পরিবেশন করার কথা বলেছেন। কারণ, এতে ক'রে খুব কম সময়ে কাজ করা যায় এবং ছাত্রের বিভিন্ন দিকের অগ্রগতি সম্পর্কে খুব সহজে ধারণ পাওয়া যায়।

এই সব দিক্ ছাড়াও ডাল্টন পরিকল্পনায় সম্মেলন (conference) এবং কাজের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক

সম্মেলন

আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান করবেন। এতে করে তাঁদের জ্ঞানের সমন্বয়ও হয়। এছাড়া, সামাজিক ও মানসিক বিকাশের সহায়করূপে বিভিন্ন ধরনের কাজেরও ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, সাহিত্য-সভা, বিতর্ক, বক্তৃতা, অভিনয়, রাজনৈতিক আলোচনা, খেলাধূলা, ব্যায়াম ইত্যাদি। এদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামাজিক সচেতনতা আসে।

॥ ডাল্টন পরিকল্পনার গুণাবলী ॥
(Merits of Dalton Plan)

[এক] ডাল্টন পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া

হয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (Theory of individual difference) আধুনিক মনোবিদ্যার পরীক্ষিত তত্ত্ব। এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে। সাধারণ পদ্ধতিতে আমরা দলগতভাবে যখন শিক্ষা দিই, তখন তার এই স্বাতন্ত্র্যের প্রতি মর্যাদা দেওয়া হয় না। ফলে, সব শিক্ষার্থী সমানভাবে উপকৃত হয় না। যারা বেশী বুদ্ধিমান, তারা তাড়াতাড়ি শেখে; আবার যারা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তারা দেরীতে শেখে। আমরা চেষ্টা ক'রে যদি মধ্যপন্থাও অবলম্বন করি, তাতে ক'রে ভালরা পিছিয়ে যায়, খারাপরা উপকৃত হয় না। ডাল্টন পরিকল্পনা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী বিকাশের সুযোগ ক'রে দেয়। বর্তমান শতাব্দীতে শিক্ষাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করার যে চেষ্টা চলেছে, ডাল্টন পরিকল্পনা তাকে কার্যকরী রূপ দিয়েছে। এই দিক থেকে এই পরিকল্পনা মনোবিদ্যাসম্মত।

ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী শিক্ষা

[দুই] ডাল্টন পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণভাবে কাজের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা ও আগ্রহকে বাইরের কোন বাঁধাধরা নিয়ম দিয়ে আটকে রাখা হয় না। শিক্ষার্থী তার ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন বিষয় যখন ইচ্ছা শিখতে পারে। তাকে কোন বিশেষ বিষয় বিশেষ সময়ে শেখার জন্য বাধ্য করা হয় না। শিক্ষার্থী তার ইচ্ছামত যে-কোন জায়গায় যেতে পারে, যে-কোন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। তবে তাদের একমাসের কাজ নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয় এবং মাসের প্রথমে তাদের একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়। এই চুক্তির ফলে তার ওপর একটা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ সব সময়েই থেকে যায়, ফলে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না। ম্যাক্‌নি (Macnee) এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'The freedom does not imply licence, which is not freedom at all'.

পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা

[তিন] এই স্বাধীনতার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বা মুক্ত শৃঙ্খলার ভাবঃ গড়ে ওঠে। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলার কোন সমস্যা থাকে না। এই দিক থেকে ডাল্টন পরিকল্পনা তার সংগঠনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার সমস্যাকে সমাধান করেছে বলা যেতে পারে।

মুক্ত শৃঙ্খলা

[চার] এই পরিকল্পনায় শিক্ষার মান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয়নি। ফলে, একই বিষয়ের কক্ষে একজন শিক্ষার্থী যে ইতিপূর্বে তিনটে কনট্রাক্ট শেষ করেছে, সেও কাজ করছে; আবার যে প্রথম কনট্রাক্ট শুরু করছে, সেও কাজ করছে। এর কারণে পারস্পরিক সাহায্য খুব সহজেই পাওয়া যায়। কোন শিক্ষার্থী বিশেষ কোন অসুবিধা বোধ করলে, সে গিয়ে তার চেয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর পরামর্শ চাইতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থার দরুন অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায় শিক্ষার্থীরা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বোধ তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এবং আরও নানা রকম সামাজিক গুণেরও বিকাশ হয়।

সামাজিক বিকাশ

[পাঁচ] ডাল্টন পরিকল্পনার আর একটা বড় গুণ হ'ল, এখানে কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। শিক্ষক শুধু সহায়করূপে থাকেন, তবে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে নিষ্ক্রিয়। এই ধরনের দায়িত্ব নিয়ে নিজেরা কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা আসে এবং এই কাজের মাধ্যমে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা চরিতার্থ হয়।

দায়িত্ববোধ

[ছয়] এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের অগ্রগতিসূচক বিভিন্ন ধরনের যে কার্ড ব্যবহার করা হয়, তা মনোবিজ্ঞানসম্মত। এই কার্ড বা তালিকা থেকে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন-অবনমনের স্তর বোঝা যায়। ফলে, এই কার্ড শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবক সবাইকে আরও সক্রিয় ক'রে তোলে ॥

মূল্যায়ন

।। ডাল্টন পরিকল্পনার ত্রুটি ।।
(Demerits of Dalton Plan)

ডাল্টন পরিকল্পনার মধ্যে অভিনবত্ব থাকলেও, তার ত্রুটির দিকও কম নয়। ডাল্টন পরিকল্পনাকে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দিক্ থেকে বিচার ক'রে দেখতে গেলে অনেক অসুবিধাই দেখা দেয় এবং এই কারণে সম্পূর্ণভাবে এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

[এক] ডাল্টন পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হ'লে বিদ্যালয়ের ঘর-বাড়ী থেকে শুরু করে চেয়ার-বেঞ্চ ইত্যাদি সব কিছু বদলে ফেলতে হয়। এর ব্যয়ভার বহন করা সব বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম তো আছেই। তাই এর ব্যবহারিক প্রয়োগের বিশেষ অসুবিধা আছে।

ব্যয়ভার

[দুই] এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা পরিচালনা হ'লে যারা লাজুক প্রকৃতির ছেলে, তারা পিছিয়ে পড়ে এবং শিক্ষকের পক্ষে তাদের খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না। এই সব ছেলে সহজে কাউকে জিজ্ঞাসা করে না। তাছাড়া, যারা শিখতে পারে না, তাদের মধ্যে অনেক সময় হীনমন্যতাবোধ (sense of inferiority) দেখা দেয়। এই ধরনের মনোভাব ব্যক্তিসত্তার সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকর।

লাজুক প্রকৃতি ছাত্রদের অসুবিধা

[তিন] অনেক সময় দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য, তারা যে সব বিষয়ে বেশী আগ্রহী, সেগুলোতে অনেক এগিয়ে গেছে এবং যে সব বিষয় তার ভাল লাগে না, সে সব বিষয়ে পিছিয়ে আছে। ফলে, বিভিন্ন বিষয়ে আনুপাতিক অগ্রগতি সম্বন্ধে এই পদ্ধতিতে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

আগ্রহের তারতম্য

[চার] খুব ছোটদের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা কার্যকরী নয়। কারণ, এতটা দায়িত্ববোধ তাদের থাকে না। ফলে, তারা তাদের কন্ট্রাক্ট্ যথা সময়ে শেষ করতে পারে না।

[পাঁচ] ডাল্টন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হ'লে উপযুক্ত শিক্ষক চাই। বিশেষজ্ঞ শিক্ষক সব সময় পাওয়া মুশকিল হ'য়ে পড়ে। তাছাড়া, এই পরিকল্পনায় শিক্ষককে পাঠদান করতে হয় না ঠিকই, তবে তাঁর অন্যান্য কাজ অনেক বেড়ে যায়।

শিক্ষকের অভাব

এই সব কারণে ডাল্টন পরিকল্পনাকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করার অসুবিধা আছে। তবে এর মূল তত্ত্বের মধ্যে যে কোন ভ্রান্তি নেই, একথা সকলেই স্বীকার করেন। আমাদের দেশে এই পরিকল্পনা পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কিছু প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তার ঐ সব ব্যবহারিক অসুবিধার জন্য আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

মন্তব্য

॥ প্রোজেক্ট পদ্ধতি ॥
(The Project Method)

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিভিন্ন দিক থেকে আলোড়নের সৃষ্টি হ'য়েছে, প্রোজেক্ট পদ্ধতি তারই একটি ফল। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর সক্রিয়তাকে যোগ্য মর্যাদা দিতে গিয়ে এই পদ্ধতির সৃষ্টি। জন ডিউই বলেছিলেন, শিশুদের শিক্ষা হবে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের মধ্যে। আর সেই সমস্যা সমাধান করবে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই। সুতরাং জ্ঞানলাভ বা শিক্ষার জন্য দুটো জিনিস দরকার—সমস্যা (Problem), অপরটা হ'ল শিশুদের সক্রিয়তা। এই দুই উপাদানের সমন্বয় করা হয়েছে প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতি জন ডিউইর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি ক'রে থাকলেও, জন ডিউই কিন্তু এর প্রবর্তক নন। জন ডিউই সমস্যা-সমাধান পদ্ধতির (Problem Method) কথা বলেছিলেন, কিন্তু সে পদ্ধতি নানা কারণে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু তাঁরই এক অনুগামী উইলিয়ম হার্ড কিলপ্যাট্রিক (Kilpatric) এই প্রোজেক্ট-পদ্ধতি পরিবর্তিত আকারে প্রবর্তন করেন। দার্শনিক দিক থেকে এই পদ্ধতি জন ডিউইর সমস্যা-সক্রিয়তার তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য দিকে এই পদ্ধতি মনোবিদ্যাসম্মতও বটে। কারণ, এখানে থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তির (Trial and Error) কৌশলকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এক সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে ; তারা ভ্রান্তি ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের সক্রিয়তার দ্বারা তা সমাধান করবে। অধ্যাপক কৃষ্ণায়া (G. S. Krishnaya) বলেছেন—"The project, briefly described, is that method of teaching which encourages a maximum amount of purposeful activity on the part of the pupils." প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় এক-একটি প্রোজেক্ট (Project)-এর মাধ্যমে। প্রোজেক্ট বলতে বলা হ'চ্ছে কোন উদ্দেশ্যযুক্ত সমস্যামূলক পরিস্থিতি। এই পদ্ধতির প্রবর্তক কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrick) ; প্রোজেক্ট বলতে

প্রস্তাবনা

—কোন উদ্দেশ্যযুক্ত কাজকে বুঝিয়েছেন, যা একটি সমাজের অনুকূল পরিবেশে আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পাদন করা হয় ("A whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment".)। প্রোজেক্টের আরও কার্যকরী সংজ্ঞা দিয়েছেন ইস্টিভেনসন (Stevenson)। তিনি বলেছেন, যে সমস্যামূলক কাজ তার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সম্পন্ন করা হয়, তাই হ'ল প্রোজেক্ট ("A project is problematic act carried to completion in its natural setting".)। এই ধরনের কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় প্রজেক্ট পদ্ধতিতে।

॥ প্রোজেক্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ॥

(Characteristics of the Project Method)

উপরি-উক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রেজেক্ট পদ্ধতির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

[এক] প্রত্যেক প্রোজেক্ট মানেই একটি সমস্যা। সমস্যা ছাড়া প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া যায় না। কারণ, এই পদ্ধতির মূল কথা হ'ল জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করা এবং তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করা।

সমস্যা

[দুই] প্রোজেক্ট সমস্যা নির্বাচন করা হয় বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা যে কাজ করে, তা একেবারে উদ্দেশ্যহীন নয়; বরং সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ ঠিক করা হয় এবং ঐ কাজ সম্পাদন করলে আমাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। সুতরাং, প্রোজেক্ট পদ্ধতির সক্রিয়তা যান্ত্রিক সক্রিয়তা নয়, উদ্দেশ্যমূলক (Purposive) সক্রিয়তার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

উদ্দেশ্য

[তিন] প্রোজেক্ট পদ্ধতির আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক পরিবেশে কাজ করবে। সাধারণ বিদ্যালয়ে আমরা পাঠদানের জন্য কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করি; ফলে গতানুগতিক শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের কোন সম্পর্কই থাকে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা যে কাজ করে, তা তারা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই সম্পন্ন ক'রে থাকে। এতে ক'রে শিক্ষা-পরিবেশ থেকে কৃত্রিমতা দূর করা যায়।

কর্ম-পরিস্থিতির স্বাভাবিকতা

[চার] আবার, প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে দু'ধরনের পরিবেশের কথা বলা হ'য়েছে। এক ধরনের পরিবেশ কাজের স্বাভাবিক পরিবেশ, যার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করলাম। অপর যে পরিবেশের কথা বলা হ'য়েছে, তা সমাজের অনুরূপ পরিবেশ। শিক্ষার্থী যে কোন সমস্যাই গ্রহণ করুক-না-কেন, তা তারা দলগতভাবে সমাধান করবে। যদি কোন একক সমস্যা-সমাধানেরও প্রচেষ্টা থাকে, তার জন্য সমাজে যেমন সে অন্যের সাহায্য নেয়, সে সাহায্য নেওয়ার বা পরামর্শ

সামাজিক পরিবেশ

নেওয়ার সুযোগ থাকবে। সামাজিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য হ'ল—সমবেদনা, সহযোগিতা, অনুকরণের সুযোগ এবং পরস্পর-নির্ভরশীলতা। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে এই সব কিছুরই সংযোজন করা হয় কর্মমূলক পরিস্থিতিতে। এর মাধ্যমে কর্ম-পরিস্থিতি থেকে কৃত্রিমতা যেমন দূর হবে, অন্যদিকে, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণেরও বিকাশ হবে।

[পাঁচ] প্রোজেক্ট পদ্ধতির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহকে কাজে প্রয়োগ করা। প্রোজেক্টের সংজ্ঞার 'whole hearted" কথাটা এই অর্থে ব্যবহার করা হ'য়েছে। শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কাজকে গ্রহণ করবে, তাকেই তারা সম্পূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যাবে; তার জন্য তারা সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করবে। তাই শিশুদের কর্ম নির্বাচন করার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় এই পদ্ধতিতে। ফলে, তারা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে। এই আন্তরিকতা প্রোজেক্ট পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কর্ম-নির্বাচনের স্বাধীনতা

[ছয়] প্রোজেক্ট পদ্ধতির আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল দায়িত্ববোধ। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ওপর কর্ম-সম্পাদনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে তাদের দায়িত্ববোধের বিকাশ হয়।

দায়িত্ব আরোপ

॥ প্রোজেক্ট পদ্ধতির বিভিন্ন দিক ॥

(Different aspects of the Project Method)

যে-কোন শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে হলে তাঁকে চারটে স্তরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়, তা তিনি সেই পর্যায়গুলো সম্বন্ধে সচেতন থাকুন আর নাই থাকুন। প্রথমতঃ, তাঁকে বিশেষ পাঠের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। পরে পাঠদানের জন্য একটা খসড়া পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। তৃতীয়তঃ, পাঠদান করতে হয় তাঁর ঐ খসড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী; এবং সবশেষে, তাঁর শিক্ষণের দ্বারা ছাত্ররা কতটা প্রভাবিত হ'য়েছে, তা বিচার ক'রে বা পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতেও এই চারটে স্তরকেই অনুসরণ করা হয়।

গতানুগতিক পদ্ধতির বিভিন্ন স্তর

(১) উদ্দেশ্য স্থাপন (purposing),
(২) পরিকল্পন (Planning),
(৩) সম্পাদন (Execution), এবং
(৪) বিচারকরণ বা পরীক্ষণ (Judgment)।

প্রোজেক্ট-পদ্ধতি এই চারটি স্তরকে মেনে চললেও তার প্রয়োগের তারতম্য আছে। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে এই প্রত্যেকটি স্তরকে শিক্ষকের কাজ বলেই মনে করা হয় এবং তিনিই এগুলো করেন। কিন্তু প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে এই সমস্ত স্তরেই শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য, শিক্ষক তাদের সব সময়ই সাহায্য করেন।

বিশেষভাবে উদ্দেশ্য-স্থাপন এবং পরিকল্পনা-স্তরে শিক্ষকের পরোক্ষ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা আছে, যেহেতু সমস্ত দায়িত্বই শিক্ষার্থীর ওপর দেওয়া হচ্ছে, সেহেতু এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের কোন স্থান নেই। বরং একথা বলতে হবে, এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করতে হ'লে শিক্ষককে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে এবং তা দল-নায়কের ভূমিকা। তিনি প্রয়োজনের সময় তাঁর সুচিন্তিত মত দিয়ে শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালনা করবেন। সব সময় প্রত্যক্ষভাবে তাঁর নিজের মতবাদ চাপিয়ে দেবেন না।

প্রজেক্টের বিভিন্ন স্তর

এখন আলোচনা করা যাক, এই বিভিন্ন স্তরে কাজ কিভাবে হয়। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহযোগিতায় তাদের কার্জটি ঠিক করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ করলে কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে, সে সম্পর্কেও তারা আলোচনা করবে। এমনিভাবে কোন কাজ নেওয়ার আগে তারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হবে। এই উদ্দেশ্য তাদের পরবর্তী কালে প্রেষণা-শক্তি যোগাবে। এটাই হ'ল প্রথম স্তর।

উদ্দেশ্য-স্থাপন

দ্বিতীয় স্তরে, শিক্ষার্থীরা এবং শিক্ষক মিলিতভাবে কিভাবে কর্ম সম্পাদন করা হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কি কি ভাবে অগ্রসর হ'লে সমাধান করা যাবে; কার কার সাহায্য দরকার; এসব কিছু পূর্বে থেকে ঠিক ক'রে নেওয়া হয়। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে কর্মসম্পাদনের বিভিন্ন সম্ভাব্য দিক্ বিশ্লেষণ ক'রে দেখা হয় এবং তার ভিত্তিতে একটি কার্যকরী পরিকল্পনা রচনা করা হয়। এই পরিকল্পনা রচনা শিক্ষার্থীদের হ'লেও শিক্ষকের দায়িত্ব এখানে কোন অংশে কম নয়। তিনি এখানে পরোক্ষ প্রভাব দ্বারাও শিক্ষার্থীদের সঠিক পরিকল্পনা রচনা করতে সহায়তা না করলে সম্পূর্ণ শিক্ষণ-প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

পরিকল্পনা

এর পরে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ কর্মমূলক স্তরে যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা কাজে অগ্রসর হয় এবং কর্ম সম্পাদন করে। শিক্ষক এই পর্যায়ে তাদের পাশেই থাকেন, কোন অসুবিধা হ'লে সাহায্য করেন এবং প্রয়োজনবোধে প্রোজেক্টটিকে বিশ্লেষণ ক'রে তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতেও সহায়তা করেন।

সম্পাদন

সবশেষে, সমস্যা বা কাজটির ফলাফল বিচার করা হয়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করা হ'য়েছিল, তার পরিণতিতে কি ফল লাভ হয়েছে অর্থাৎ তা কতটা সার্থক হ'য়েছে তা বিচার ক'রে দেখা হয় এই স্তরে। এই স্তরের বিচারকরণেও শিক্ষক কর্মসম্পাদনের সময়কার পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতাগুলি বিবৃত করেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের নিজের নিজের প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করতে সহায়তা করেন।

বিচারকরণ

।। প্রজেক্টের শ্রেণীবিভাগ ।।
(Classification of Project)

উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রোজেক্টকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। আমরা কিলপ্যাট্রিকের শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করছি। তিনি মনে করেন, উদ্দেশ্যই হ'ল পদ্ধতির মূল কথা। তাই উদ্দেশ্যের দিক্ থেকে প্রোজেক্টকে তিনি চার ভাগে ভাগ করেছেন—

উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রোজেক্টকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। আমরা কিলপ্যাট্রিকের শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করছি। তিনি মনে করেন, উদ্দেশ্যই হ'ল পদ্ধতির মূল কথা। তাই উদ্দেশ্যের দিক্ থেকে প্রোজেক্টকে তিনি চার ভাগে ভাগ করেছেন—

[এক] সংগঠনমূলক কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যে সব প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয়, তাকে কিলপ্যাট্রিক **সংগঠনমূলক প্রোজেক্ট** বলেছেন। অবশ্য এই সংগঠনমূলক প্রজেক্টের অন্তর্গত হবে যে-কোন ধরনের সৃজনধর্মী কাজও। নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা বা কোন একটা জিনিস তৈরি করা, ইত্যাদি কাজ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

[দুই] **উপভোগাত্মক বা গ্রহণাত্মক প্রোজেক্ট** বলতে তিনি সেই সব কাজকে বলেছেন যাদের উদ্দেশ্য হ'ল কোন আদর্শ জিনিসকে উপভোগ বা গ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে কাজ বা প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয়, সেখানে শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক সক্রিয়তার সুযোগ থাকে কম। যেমন, গল্প শোনা, গান শোনা ইত্যাদি।

[তিন] অনেক সময় প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য হয় বিশেষ কোন বিষয়কেন্দ্রিক কাজ শেখা বা জ্ঞান আয়ত্ত করা। যেমন, কবিতা মুখস্থ করা, অঙ্কের সুদ-কষা শেখা, ভূগোলের জরীপ শেখা ইত্যাদির জন্য যে ধরনের প্রোজেক্ট, তাদের বলা হয় **বিশেষ শিক্ষামূলক প্রোজেক্ট**।

[চার] কোন বিশেষ মানসিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যে সব প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয়, তাদের বলে **সমস্যামূলক প্রোজেক্ট**। যেমন, গ্রহণ কেন হয়, কুয়াশা কেন হয়, ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করার জন্য যে-সব প্রোজেক্ট নেওয়া হয়, তার ভেতর শিক্ষার্থীদের সামনে একটা বিশেষ সমস্যা তুলে ধরা হয়, বা তাদের মনের মধ্যে এই সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। বিশেষ প্রোজেক্টের কাজের মধ্য দিয়ে তারা এই সমস্যার সমাধান করে।

শিশুর সম্পূর্ণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-কোন এক ধরনের প্রোজেক্ট হ'লেই চলবে না। প্রোজেক্টের শ্রেণীকরণের উদ্দেশ্য এই নয় যে, বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রোজেক্ট গ্রহণ করবো। প্রত্যেক শিশুর পরিপূর্ণ জীবনবিকাশের জন্য সব রকম প্রোজেক্টেরই প্রয়োজন।

মন্তব্য

।। প্রোজেক্ট পদ্ধতির গুণাবলী
(Merits of Project Method)

প্রোজেক্ট পদ্ধতি গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতির অনেক দোষ-ত্রুটিই দূর করেছে।

প্রোজেক্ট পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষাদানের কাজ অনেকাংশে বিজ্ঞানসম্মত হবে। এর গুণাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করলে দেখা যাবে যে, এই পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। প্রোজেক্ট-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত গুণগুলোর উল্লেখ করেছি—

সক্রিয়তা

[এক] প্রথমতঃ, প্রোজেক্ট সক্রিয়তাবাদের (Activity principle) ওপর প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তিসত্তা বিকাশের জন্য ব্যক্তির সক্রিয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কোন রকম মানসিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টা ছাড়া চিরস্থায়ীভাবে আনা যায় না। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে সেই সক্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ করে।

স্বাধীনতা

[দুই] দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করলে শিশুদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। পাঠ্যবস্তু নির্বাচন থেকে শুরু ক'রে সম্পাদন এবং পরীক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার সব স্তরেই শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে শৃংখলার সমস্যা যেমন থাকে না, তেমনি আত্মনির্ভরতার বিকাশ হয়।

প্রেরণা

[তিন] এই পদ্ধতি নিজেই শিক্ষার্থীকে কর্মপ্রেরণা বা প্রোষণা যোগায়। কারণ, প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীরা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা তাদের কর্মের প্রেরণা যোগায়। ফলে, তারা কাজকে বোঝা বলে মনে করে না।

জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্তি

[চার] প্রোজেক্টগুলো সাধারণতঃ শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। দৈনন্দিন জীবনে যা তারা দেখছে, তাকেই কেন্দ্র ক'রে প্রোজেক্ট রচনা করে। ফলে, শিক্ষা হয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার অর্থ খুবই 'রিষ্কার হ'য়ে দাঁড়ায় এবং তারা স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী হয়।

অনুবন্ধ

[পাঁচ] প্রোজেক্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের (correlation) কাজ সহজ ভাবে হয় এবং শিক্ষার্থীদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ের (Subject) মধ্যে যে আপাতঃবিভেদের রেখা আছে, তা ধরা পড়ে না। ফলে, জ্ঞান সুসংবদ্ধভাবে মনের স-সংগঠনের ঐক্য আনে।

বৃত্তিমুখী শিক্ষা

[ছয়] প্রোজেক্ট পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমুখী শিক্ষাও লাভ করে। এই পদ্ধতিকে তাই জীবনকেন্দ্রিক পদ্ধতিও বলা চলে। বিভিন্ন প্রোজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ভিত্তি তৈরি হয় এবং এই সব কাজ করার ফলে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎকালে বৃত্তি-নির্ধারণের কাজ অনেক সহজ হয়। তার কারণ বিশেষ বৃত্তির প্রতি তার প্রবণতা অনেক সময় এখান থেকে বিকাশলাভ করে।

[সাত] বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থী'রা কোন সমস্যা যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা সমাধান করে। এই ধরনের যৌথ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তাদের অনেক সামাজিক গুণ বিকাশলাভ করে। এই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় প্রোজেক্ট পদ্ধতি সামাজিকতা শিক্ষাতেও সহায়তা করে।

সামাজিক শিক্ষা

[আট] প্রোজেক্টের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী শরীর চর্চা করার সুযোগ পায়। তাই এই পদ্ধতি দৈহিক বিকাশেরও সহায়ক।

শরীরচর্চা

[নয়] এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী'র নিজস্ব সৃজনাত্মক চিন্তার (original thinkning) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মুখস্থ ক'রে পাশ করার প্রচেষ্টাকে এখানে কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। ফলে, শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ লাভ ঘটে।

চিন্তাশক্তির বিকাশ

[দশ] এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাই জানতে পারে। ফলে, তারা কতদূর এগিয়েছে, সে সম্পর্কে ধারণা তাদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে।

ফললাভ

[এগারো] সবশেষে, এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক অনেক সহজ হয়, পারস্পরিক প্রীতির ভাব জেগে ওঠে তাদের মধ্যে এবং শিক্ষকও অনেক সময় একঘেয়ে কাজের হাত থেকে রেহাই পান বলে তাঁর মনে প্রফুল্লতা আসে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

॥ প্রোজেক্ট পদ্ধতির ত্রুটি ॥

(Demerits of the Project Method)

প্রোজেক্ট পদ্ধতির মধ্যে নানা রকম সুবিধা থাকলেও তার পরিকল্পনা এবং ব্যবহারিক মূল্যের দিক থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে আদর্শ পদ্ধতি বলা যায় না। এই পদ্ধতির অসুবিধা বা ত্রুটির দিক্‌ও আছে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ তাকে বিভিন্ন দিক্ থেকে সমালোচনা করেছেন—

[এক] এই পদ্ধতির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করলে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান পাওয়া শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, পাঠ্যক্রমের সব অংশকেই সমস্যামূলক পরিস্থিতি বা প্রোজেক্টে রূপান্তরিত করা যায় না। ফলে, জ্ঞানের মধ্যে ফাঁক থেকে যায় এবং শিক্ষার্থীর ধারণাও সুসমঞ্জস হয় না। গতানুগতিক পদ্ধতি বা বক্তৃতার দ্বারা ঐ ফাঁক পূরণ করতে হয়।

বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের অভাব

[দুই] এই পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। কোন প্রয়োজনীয় অংশ যদি পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ে যায়, তাহ'লে সম্পূর্ণ প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তাই শিক্ষকের বিশেষভাবে চিন্তা করার দরকার হয় এবং তার অভিজ্ঞতাও থাকা চাই। এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক সব সময় পাওয়া মুশকিল হ'য়ে পড়ে। তাছাড়া,

শিক্ষকের অভাব

এই পদ্ধতিতে পরিশ্রম অনেক বেশি হয় বলে শিক্ষকরা একে যতটা সম্ভব এড়িয়ে যেতে চান।

[তিন] আবার অনেক সময় পরিচালনার ত্রুটির জন্য প্রোজেক্টের উদ্দেশ্যের চেয়ে পরিকল্পনাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে, শিক্ষার্থীরা কাজটাই শেখে, কিন্তু অন্যান্য যে সংযুক্ত জ্ঞান, তা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই সম্ভাবনা দু'দিক থেকে আসতে পারে—শিক্ষকের দিক্ থেকেও, শিক্ষার্থীর দিক্ থেকেও। শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবে কাজ ভালবাসে। তারা যদি কাজ পায় সেটাকে বড় ক'রে দেখে, উদ্দেশ্যটাকে দেখে না। ফলে, জ্ঞানমূলক বিকাশের দিক অবহেলিত হয়।

জ্ঞানের গুরুত্ব হ্রাস

[চার] এই পদ্ধতিতে ওপরের দিকের শ্রেণীতে পাঠ দান করার খুব অসুবিধা আছে। এই ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করলে দেখা গেছে, উচ্চশ্রেণীতে পাঠরত শিক্ষার্থীরা বিষয়ের ওপর তত গুরুত্ব দেয় না। তাদের কাছে সব কিছু হালকা মনে হয়। ফলে, তারা নিজেদেব চিন্তাশক্তিব খুব বেশী প্রয়োগ করতে চায় না।

উচ্চশ্রেণীতে অসুবিধা

[পাঁচ] এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমকে নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে শেষ করা যায় না। কারণ, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ক'রে শিক্ষককে বসে থাকতে হয়।

সময়ের অসুবিধা

এই অসুবিধাগুলোর কথা এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদ্‌রাও বিবেচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এর বেশীর ভাগ ত্রুটিই আমাদের গতানুগতিক চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণরূপে বদলে ফেলতে হবে, তবেই এই পদ্ধতির সার্থকতা উপলব্ধি করা যাবে। এই পদ্ধতি প্রযোগ করতে হ'লে, পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক চিন্তাধারা বদলে তার পরিবর্তে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity curriculum) রচনা করতে হবে। শিক্ষকের মনোভাবেরও পরিবর্তন করতে হবে।

মন্তব্য

॥ বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ॥

(Basic System of Education)

বুনিয়াদী শিক্ষা মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষামূলক চিন্তার ফলস্বরূপ প্রবর্তিত হয়েছে। গান্ধীজি যদিও বিশেষভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন জীবনের বেশীর ভাগ সময়, তবুও তাঁর মনে ধারণা ছিল, এই রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা জাগ্রত করার জন্য দেশবাসীর আদর্শ শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এবং তাঁর প্রবর্তিত 'বুনিয়াদী শিক্ষা' বহু দিনের চিন্তার ফল। দক্ষিণ আফ্রিকায়

থাকাকালীন তাঁর যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল এবং পরে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বাস করার সময় তাঁর যে অভিজ্ঞতা হ'য়েছে, তার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষা জন্মলাভ করেছে। 1914 সালে তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন তখন টলস্টয় ফার্মে (Tolstoy farm) তিনি নতুন ধরনের শিক্ষামূলক পরীক্ষার সূত্রপাত করেন। এখানে সবাই একই পরিবারভুক্ত লোকের মতো বাস করতো এবং গান্ধীজিকে পিতার মত শ্রদ্ধা করতো। গান্ধীজি দেহ ও মনের বিকাশের জন্য ছাত্রদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করতেন। পাঠ্যপুস্তকের কোন ব্যবস্থা ছিল না। মানসিক বিকাশের জন্য ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয় মুখে মুখে শেখানো হ'তো এবং দৈহিক বিকাশের জন্য নানারকম কাজও নির্দিষ্ট করা ছিল। মাটি কাটা, লাঙ্গল করা, বাগান পরিচর্যা করা ইত্যাদি কাজ ছাত্রদের করতে হ'ত। 1915 সালে তিনি ভারতবর্ষে এসে শাবরমতীতে অনুরূপ একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরে 1935 সালে সেবাগ্রামে আর একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে থাকাকালীন 1937 সালে তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁর শিক্ষামূলক পরীক্ষার কথা 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এইজন্য একে অনেক সময় সেবাগ্রাম-পদ্ধতিও বলা হয়। সেই বছরই অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় তিনি শিক্ষাবিদ্‌দের এক সম্মেলন ডাকেন এবং এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য ডঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাই একে অনেক সময় ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাও (Wradha Scheme) বলা হয়। এই পরিকল্পনা বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে। আমরা এখানে তার বর্তমান সংগঠনের দিক্ সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

প্রস্তাবনা

এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হ'ল, শিশুর দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশসাধন করা, আর তার জন্য যে-কোন একটা হাতের কাজকে শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"The principle idea is to impart the whole education of the body and the mind and the soul through the handicraft that is to be taught to the children. You have to draw out all that is in the child through teaching all the processes of the handicraft and your lessons in history, geography and arithmetic will be related to the craft".

বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য

॥ বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ॥
(Characteristics of Basic System)

গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনার অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে আধুনিক কালে। এই পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো। আমরা এই পরিকল্পনায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই, তার উল্লেখ করছি।

[এক] শিক্ষাকে জল, বায়ু, আলো ইত্যাদির মত একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস হিসেবে বিবেচনা করা হ'চ্ছে। বায়ু, আলো, জল যেমন আমরা মুক্তভাবে পাই, তার জন্য অর্থের দরকার হয় না, তেমনি শিক্ষাকেও অবৈতনিক করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষাকে তাই অবৈতনিক করার কথা বলা হ'য়েছে।

অবৈতনিক

[দুই] গান্ধীজি তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনের কালে শিক্ষাকে বাধ্যতা-মূলক করার কথাও বলেছেন।

বাধ্যতামূলক

[তিন] এই শিক্ষার সময়কাল হবে আট বছর। যদিও ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় এই সময়-সীমার কথা বলা হয়েছিল। পরে খের (Kher) কমিটি এই শিক্ষাকাল আরও একবছর বাড়ান। ফলে, এই শিক্ষার অন্তর্গত শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা হবে ছ' থেকে চোদ্দ বছর।

সময়কাল

[চার] এই পদ্ধতিতে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হ'য়েছে। কারণ, মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশুর চিন্তাশক্তি, ভাববোধ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করা সম্ভব হবে।

মাতৃভাষার গুরুত্ব

[পাঁচ] এই পদ্ধতিতে শিক্ষাকে সক্রিয় করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'য়েছে। কাজ এবং খেলার মাধ্যমে শিশুরা শিক্ষা করবে। তাই গান্ধীজি খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন—"In my scheme of things, the hand will handle tools before it draws or traces the writing, the eyes will read the pictures of letters and words as they will know other things in life, the ear will catch the names and meaning and sentences".

সক্রিয়তার নীতি

[ছয়] বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ওপর শুধু যে গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে, তাই নয়। শিক্ষার্থীরা যে কাজ করবে, তা উৎপাদনমূলকও হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমূলক কাজের (Productive activ[illegible]) মাধ্যমে শিক্ষা করবে এই পদ্ধতিতে।

উৎপাদনের নীতি

[সাত] এই শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাকে স্বয়ংনির্ভরশীল করার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। শিক্ষার্থী বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে শিখবে, একই সঙ্গে উৎপাদন করবে এবং এই সব জিনিস বিক্রয় ক'রে যে অর্থাগম হবে, তাতে শিক্ষার কিছুটা খরচ চলবে। এই উদ্দেশ্যেই গান্ধীজি এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এতে ক'রে দুঃস্থ পিতামাতাদের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যকে বর্তমান কালে আর গ্রহণ করা হয়নি।

স্বয়ংনির্ভরশীলতা

[আট] এই পদ্ধতিতে হস্তশিল্পকে (Craft) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। সুতো কাটা, কাপড় বোনা ইত্যাদি শিল্পকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন গান্ধীজি। এছাড়া, কৃষিকাজ, সেলাই-এর কাজ ইত্যাদিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে।

হস্তশিল্পের গুরুত্ব

[নয়] বুনিয়াদী শিক্ষায় হস্তশিল্পকে শুধুমাত্র অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও বিবেচনা করা হ'য়েছে। গান্ধীজি বলেছিলেন, এই হস্তশিল্পকে কেন্দ্র ক'রেই অন্য সমস্ত বিষয়ের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ-স্থাপনের (Correlation) জন্য হস্তশিল্পকেই কেন্দ্রবিন্দু ধরতে বলা হ'য়েছে। অবশ্য জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টে সম্পর্ক-স্থাপনের জন্য আরও দুটো মধ্যমের কথা বলা হয়েছে। এই দুটো মাধ্যম হ'ল সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ।

অনুবন্ধের নীতি

[দশ] পাঠ্যক্রম রচনার ব্যাপারেও এই পদ্ধতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই পাঠ্যক্রম বিশেষভাবে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাঠ্যক্রম

(১) **একটি মূল হস্তশিল্প** (Basic Craft) **:** সুতো কাটা, কাপড় বোনা, কৃষিকাজ, কাঠের কাজ বা ধাতুর কাজ ইত্যাদির যে কোন একটি গ্রহণ করতে হবে এবং তারই মাধ্যমে অনুবন্ধন স্থাপন করা হবে।

(২) **মাতৃভাষা :** শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করতে হবে।

(৩) **অঙ্ক :** অঙ্কের শুধুমাত্র ব্যবহারের দিক্ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কাজ করতে গিয়ে যতটুকু অঙ্কের প্রয়োজন হয়, তাই শিখবে শিক্ষার্থীরা।

(৪) **সমাজবিদ্যা :** এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে বুঝতে শিখবে।

(৫) **সাধারণ বিজ্ঞান :** বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাব জ্ঞান যা দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে, সেইটুকু মাত্র জানতে হবে।

(৬) **চিত্রাঙ্কন :** এর মাধ্যমে সৌন্দর্যবোধের বিকাশ হবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হবে।

(৭) **সংগীত :** ছাত্রছাত্রীদের সংগীতের প্রতি যে স্বাভাবিক আগ্রহ আছে, তা চরিতার্থ হবে।

(৮) **বাধ্যতামূলক শরীর-চর্চা :** এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশ হবে। পাঠ্যক্রমের সমস্ত বিষয় শিক্ষার্থীরা শিখবে উপজাত হিসেবে কাজ করতে গিয়ে।

[এগার] বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠনের পদ্ধতিতে নতুনত্ব আছে। শিশুর সম্পূর্ণ শিক্ষাকে দু'টো স্তরে ভাগ করা হ'য়েছে—একটা হ'ল নিম্ন-বুনিয়াদী স্তর 6 থেকে 10 বছর পর্যন্ত এবং অপরটা হ'ল উচ্চ-বুনিয়াদী স্তর 11 থেকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত। এই দুই স্তরের পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। কেবলমাত্র উচ্চ-বুনিয়াদী স্তরে মেয়েদের জন্য সাধারণ বিজ্ঞানের পরিবর্তে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের কথা বলা হ'য়েছে।

সংগঠনিক বৈশিষ্ট্য

[বারো] এই পদ্ধতিতে যৌথ প্রচেষ্টার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন কাজ শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সম্পাদন করে। এই সব যৌথ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক গুণের বিকাশ হয় এবং নৈতিক গুণেরও বিকাশ হয়।

সামাজিক বিকাশ

।। বুনিয়াদী শিক্ষার গুণাবলী ।।
(Merits of the Basic System)

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার যে সব সাধারণ গুণ আছে, বুনিয়াদী শিক্ষারও তা আছে। কারণ বুনিয়াদী শিক্ষাও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা। এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত। এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার চাহিদাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে ভারতবর্ষের মত অর্থনৈতিক দিক্ থেকে অনুন্নত দেশের সামাজিক চাহিদাকে সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা ক'রে তার সমাধান করার চেষ্টা করা হ'য়েছে। এছাড়া, তার বিভিন্ন বিশেষ গুণগুলোর কথা উল্লেখ করছি—

(১) এই পদ্ধতি সক্রিয়তাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে আগ্রহী হয়। এই আগ্রহ শিক্ষার্থীদের যে শুধুমাত্র পাঠে অনুপ্রাণিত করে তাই নয়, ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের বৃত্তিমূলক প্রচেষ্টাতেও অনুপ্রাণিত করে।

আগ্রহ

(২) এই পদ্ধতিতে যে কাজকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার সৃজনাত্মক এবং সামাজিক উপযোগিতার দিক্‌ও আছে। ফলে, সেই কাজ সম্পাদনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক চেতনার বিকাশ হয়।

সামাজিক চেতনা

(৩) কায়িক শ্রমকে পাঠ্যক্রমে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মন থেকে কর্মবিমুখতা ছোটবেলা থেকে দূর হয়। ফলে, ভবিষ্যৎ জীবনে তারা কোন কাজকে ছোট ক'রে দেখে না। বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিও মমত্ববোধ জাগে।

শ্রমের মর্যাদা

(৪) কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ বিরাজ করে। কারণ, এই কাজকে তারা বোঝা হিসেবে বিবেচনা করার বড় একটা অবকাশ পায় না।

আনন্দ

(৫) দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এই শিক্ষার সম্পর্ক আছে বলে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র-স্থাপনে এই পদ্ধতি সহায়তা করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক

(৬) শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে যখন কর্মসম্পাদন করে, তার মধ্য দিয়ে তাদের অনেক প্রয়োজনীয় সামাজিক সংলক্ষণের গুণাবলী (Social traits) বিকাশলাভ করে এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুস্থ সমাজ-জীবন যাপনে সহায়তাসাধন করে। যেমন—সততা, আত্মসংযম, সহযোগিতা ইত্যাদি।

সামাজিক গুণের বিকাশ

(৭) এই পদ্ধতিতে মাতৃভাষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে ক'রে শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারা পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। প্রথম এই পরিকল্পনা যখন রচনা করা হয়, তখন ইংরেজী শিক্ষাকে এই পদ্ধতি থেকে বর্জন করা হ'য়েছিল। কিন্তু এখন ইংরেজী একটা ভাষা হিসেবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে।

মাতৃভাষায় শিক্ষা-দানের সুবিধা

(৮) বুনিয়াদী পদ্ধতীতে শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমূলক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়। এখানে যে-সব হস্তশিল্প শেখানো হয়, তার যে-কোন একটাকে পরবর্তী কালে শিক্ষার্থীরা বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষার এই দিকের কথা বিবেচনা ক'রে তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হ'য়েছে। এই কারণে, বুনিয়াদী শিক্ষা শিশুর বৃত্তিমূলক জীবনের বিকাশে সহায়তা করে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

(৯) এই শিক্ষা-পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটা শিশুকেন্দ্রিকও বটে। কারণ, শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার ওপর এই পদ্ধতিতে গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে।

শিশুর চাহিদার গুরুত্ব

(১০ এই পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে শরীরচর্চাকে গ্রহণ করা হ'য়েছে। ফলে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশকেও শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

দৈহিক বিকাশ

(১১) সবশেষে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নৈতিক চেতনা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সচেতনতার সঙ্গে নৈতিক মানের উন্নতি করারও চেষ্টা করা হ'য়েছে।

নৈতিক বিকাশ

॥

(**Demerits of Basic System of Education**)

বুনিয়াদী শিক্ষার উপরি-উক্ত গুণগুলো থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে তা যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয় হয়নি। এর কারণ অবশ্য নানা রকম আছে। এর জন্য আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, আমাদের চিন্তাধারা অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু তা ছাড়াও, এই পদ্ধতির মধ্যেকার অনেক ত্রুটিও এর জন্য দায়ী। প্রধান ত্রুটিগুলো হলো :

প্রথমতঃ, বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশেষ কোন হস্তশিল্পের সাহায্যে শিক্ষাকে সক্রিয় ক'রে তোলার কথা বলা হ'য়েছে। কিন্তু এতে ক'রে পরিপূর্ণ সক্রিয়তা শিক্ষাক্ষেত্রে আসে না। তার কারণ, আমরা যদি শুধু একটি কাজের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবদ্ধ রাখি, তাহ'লে তার অন্যান্য কাজের প্রতি যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তাকে দমন করা হয়। তাছাড়া, সব

সক্রিয়তার অপপ্রয়োগ

শিক্ষার্থীরই যে মুষ্টিমেয় কয়েকটা কাজের মধ্যে একটার প্রতি প্রবণতা থাকবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

অনুবন্ধের নীতির অপপ্রয়োগ

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ শিক্ষাকে বিশেষ নির্বাচিত হস্তশিল্পের মাধ্যমে শেখানোর কথা বলা হ'য়েছে। এই ধরনের অনুবন্ধ (correlation) স্থাপন সব সময় সম্ভব হয় না। অনেক সময় এই অনুবন্ধ কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়ে। বর্তমানে অবশ্য শিক্ষার্থীর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্ক-স্থাপনের কথা বলা হ'য়েছে। তাতে ক'রে কাজ অনেকটা সহজ হ'য়েছে।

শিক্ষকের অভাব

তৃতীয়তঃ, এই অনুবন্ধ-প্রণালীতে পড়ানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে উপযুক্ত শিক্ষকের খুবই অভাব। ফলে, বুনিয়াদী পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে।

শিক্ষাপদ্ধতি সর্বজনীন নয়

চতুর্থতঃ, বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রামীণ ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কারণ, যে পরিবেশে এই শিক্ষার কথা ব'লা হ'য়েছে, তা গ্রামের জীবনের পক্ষে উপযোগী এবং শিল্প-নির্বাচন গ্রামের জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভব। কিন্তু শহরের শিল্প নির্বাচন ক'রে এই পদ্ধতিতে পড়ানোর অনেক অসুবিধা আছে। তার কারণ শহরের শিল্প মানেই যান্ত্রিক এবং জটিল। এই কারণে বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতে সর্বজনীন শিক্ষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি।

সাংগঠনিক অসুবিধা

সর্বশেষে, এই শিক্ষাপদ্ধতিতে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের পর আর কোন পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয়নি। ফলে, যারা আরও শিক্ষা চায়, তাদের আবার গতানুগতিক বিদ্যালয় এবং কলেজে যেতে হয়। উচ্চস্তরের এই শিক্ষার সঙ্গে এই পদ্ধতির বিশেষ কোন মিল না থাক · শিক্ষার্থীদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। এই শিক্ষা তাদের পক্ষেই উপযোগী, যারা এই স্তরের পর আর পড়াশুনা করবে না।

মন্তব্য

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি ক্রমবিকাশমান পদ্ধতি। তাই গান্ধীজির প্রবর্তনের পর এর অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হ'য়েছে এবং হ'য়ে চলেছে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা এবং তার চাহিদার কথা বিবেচনা ক'রে জাতির জনক শিক্ষার যে আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ধারণ ক'রে গেছেন, তাকে স্থির রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ভারত সরকার এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্য খুবই সচেষ্ট। এই কারণে, 1956 সালে একটি কমিটি নিয়োগ করা হ'য়েছিল বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি সমীক্ষা ক'রে দেখার জন্য। এই কমিটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তাঁদের রিপোর্টে ; উন্নতির জন্যও নানারকম পন্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু, এসব সত্ত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় লুপ্ত হ'তে চলেছে। এর প্রধান কারণ, আমাদের আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব।

তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বুনিয়াদী পদ্ধতি, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে লুপ্ত হ'তে চললেও, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগের ফলে তার কিছু কিছু ভাল বৈশিষ্ট্য আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ইতিমধ্যে স্থায়ীভাবে প্রভাবিত করেছে।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক কালে শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হ'য়েছে। এই সব পদ্ধতিগুলি সবই মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Psychological method)। কারণ এর প্রত্যেকটিতে শিশুমনের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি, মন্তেস্বরী পদ্ধতি, ডাল্টন পরিকল্পনা প্রজেক্ট পদ্ধতি ও বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তক হ'লেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবেল। এই পদ্ধতিতে শিশুদের ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণের (Sense training) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। তাছাড়া, গান, প্রকৃতি-পাঠ ও সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। এই শিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেল কতকগুলি উপকরণ ব্যবহার করেছেন যেগুলির মধ্য দিয়ে শিশুকে সক্রিয় করে তোলা হয়। এই সব উপকরণগুলির কতক-গুলিকে বলা হয় উপহার (Gift) এবং অন্যগুলিকে বলা হয় বৃত্তি (Occupation)।

মন্তেস্বরী পদ্ধতির প্রবর্তক হ'লেন মাদাম মরিয়া মান্তেস্বরী। এই পদ্ধতিতেও শিশুর ইন্দ্রিয়-প্রশিক্ষণ ও সক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। এখানে ব্যক্তিগতভাবে শিশুকে নজর দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে। তাছাড়া, শিশুকে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিশুকে সক্রিয় করে তোলার জন্ম এখানেও বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়। এগুলির নাম "ডিডাকটিভ যন্ত্র"।

ডাল্টন পরিকল্পনার প্রবর্তন করেন শ্রীমতী পারকার্স্ট। এই পরিকল্পনা আমেরিকার ডাল্টন শহরে এক বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবর্তন করা হয় বলে একে 'ডাল্টন পরিকল্পনা' বলে। এই পরিকল্পনাকে পরীক্ষাগার পরিকল্পনাও (Laboratory plan) বলা হয়। কারণ এখানে গতানুগতিক শ্রেণীর পরিবর্তে বিষয়-কক্ষের কথা বলা হ'য়েছে। এই বিষয়-কক্ষগুলি এক-একটি পরীক্ষাগার। এখানে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করতে পারে। এক-একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক এই পরীক্ষাগারগুলির দায়িত্বে থাকেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ ঠিক করে দেওয়া হয়। ঐ কাজটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করলে তবে তাকে পরের কাজ দেওয়া হয়। ইচ্ছা করলে একজন শিক্ষার্থী সারাদিন একই বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতে পারে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে সকল বিষয়ের কাজ শেষ করতে হয়। সাধারণত, এক বছরের কাজকে বলা হয় কন্ট্রাক্ট। এক মাসের কাজকে বলা অ্যাসাইনমেন্ট। এক সপ্তাহের কাজকে বলা হয় পিরিয়ড। এবং একদিনের কাজকে বলা হয় ইউনিট। সাধারণতঃ এক মাসের অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে শিক্ষার্থীর কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে সুবিধা হ'ল শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে এবং নিজের আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী অগ্রসর হ'তে পারে। তবে এই পদ্ধতি পরিচালনার ক্ষেত্রে নানারূপ অসুবিধা থাকায়, এর সার্বজনীন প্রয়োগ করা যাচ্ছে না।

প্রজেক্ট পদ্ধতি মূলতঃ জন ডিউইর শিক্ষানীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিল্‌প্যাট্রিক এই পদ্ধতিকে একটি পরিপূর্ণ রূপ দেন। এই পদ্ধতিতে একটি 'প্রজেক্ট'-এর মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। প্রজেক্ট হ'ল এক ধরনের শিক্ষামূলক কাজ যাকে স্বাভাবিক পরিবেশে সম্পন্ন করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশী। এখানে কাজ নির্বাচন তা'র পরিকল্পনা রচনা, কর্মসম্পাদন এবং মূল্যায়ন সবই শিক্ষার্থীরা করে থাকে। এই নির্বাচিত কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে, তারা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে থাকে। এই পদ্ধতির সুবিধা হ'ল এখানে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় ফলে তারা কাজে আগ্রহী হয়। এর পদ্ধতিতে বিশেষভাবে শিক্ষাকে সামাজিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীর সামাজিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও জ্ঞানমূলক শিক্ষা একত্রে লাভ করতে পারে

বুনিয়াদী শিক্ষাকে গান্ধীজির শিক্ষামূলক চিন্তার প্রয়োগ বলা যায়। গান্ধীজি শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষ যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং সামাজিক উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে তার ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন তাছাড়া, তিনি শিক্ষাকে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর করে তোলার কথাও বিবেচনা করেছিলেন। এই কারণে, বুনিয়াদী শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করা হয়েছিল এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হ'য়েছে ঐ হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে জ্ঞানের সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে এই পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা পরিচালন করলে জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে সামাজিক তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করা যায়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশও হয়। তাছাড়া শিক্ষার ব্যয় শিক্ষাই বহন করতে পারে। গান্ধীজির বুনিয়াদী পদ্ধতি দীর্ঘদিন আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হ'য়েছে। কিন্তু বর্তমানে অসুবিধার কথা বিচার করে তাকে পরিত্যাগ করা হ'য়েছে

প্রশ্নাবলী

1 Describe Froebel's Kindergarten System and main principles acting behind it

ফ্রয়েবেল এর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির বিবরণ দাও এবং যে নীতি-স্বরূপ যে নীতিগুলি কাজ করছে সেগুলি উল্লেখ কর।

2 Discuss the main features of Montessori's System of Education.

[মন্তেস্বরী পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।]

3. Make a comparative study of the Kindergarten Method and Montessori method of instruction

[কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি ও মন্তেস্বরী পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা কর]

4. Give a short description of the Dalton Plan and discuss its merits and demerits.

[ডাল্‌টন পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং তার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

5. Give a critical estimate of the Dalton Plan as an organisation of school work, stating possibilities for its adoption.

[বিদ্যালয়-সংগঠনের পন্থা হিসাবে ডাল্‌টন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং এই পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে উল্লেখ কর।]

6. **Critically discuss the merits and demerits of Dalton plan.**

[ডাল্টন পরিকল্পনার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

7. **Discuss the advantages and limitations of Project Method.**

[প্রজেক্ট পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।]

8. **Why is Project Method called a method of "learning by doing" ? Give examples of some project that can be undertaken in school.**

[প্রজেক্ট পদ্ধতিকে কেন 'সক্রিয় শিখনের পদ্ধতি' বলা হয় ? বিদ্যালয়ে গ্রহণযোগ্য কতকগুলি প্রজেক্টের উদাহরণ দাও।]

9. **What is Project Method and how it is basically different from the traditional methods ? How and to what extent can this method be applied in school ?**

[প্রজেক্ট পদ্ধতি কি ? গতানুগতিক পদ্ধতির সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য কোথায় ? কিভাবে এবং কতটুকু এই পদ্ধতিকে বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা যায় ?]

10. **State the significant features of Wardha Scheme of education and critically consider the value of same.**

[ওয়ার্ধা পরিকল্পনার তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত কর এবং তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।]

11. **Give a critical estimate of Basic Education as a progressive method.**

[প্রগতিশীল পদ্ধতি হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল্যায়ন কর।]

12. **Write an essay on objectives of Basic Education in India.**

[ভারতবর্ষে বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর]

13. **Write notes on :** [টীকা লিখ]

(a) **Kindergarten Method** [কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি]

(b) **Montessori Method** [মন্তেস্বরী পদ্ধতি]

(c) **Project & Basic Craft** [প্রজেক্ট ও মূল হস্তশিল্প]

(d) **Contract, Assignment, Period & Unit in Dalton Plan**

[ডাল্টন পরিকল্পনায় কণ্ট্রাক্ট, অ্যাসাইনমেণ্ট, পিরিয়ড ও ইউনিট

(e) **Laboratory Plan** [পরীক্ষাগার পরিকল্পনা]

14. **Show your acquaintance either with Project Method or Dalton Plan and point out the play-way principle working behind it.**

[প্রজেক্ট পদ্ধতি অথবা ডাল্টন পরিকল্পনার পরিচয় দাও এবং এর মূলে খেলাভিত্তিক শিক্ষানীতির প্রভাব সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যক্ত কর।]

15. **What is meant by the Project Method ? What are its main features ?**

[প্রজেক্ট বা প্রকল্প পদ্ধতি কাকে বলে ? এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি ?]

16. **Discuss fully either the 'Kindergarten' method or the 'Montessori' method of teaching ?**

['কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি' অথবা 'মন্তেস্বরী পদ্ধতি' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।]

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা-দর্শনের বিভিন্ন নীতিগুলি সম্পর্কে এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে পৃথক পৃথক ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক কালে, শিক্ষার বিভিন্ন ধারণার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তার সামগ্রিক ফলশ্রুতি সম্পর্কে আমাদের মনে তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। এই সামগ্রিক ফলশ্রুতিকে একটি মাত্র কথায় প্রকাশ করা যায়—"শিশুকেন্দ্রিকতা"। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে।

বিংশ অধ্যায়

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা
(Child-centric Education)

শিক্ষা-বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। আধুনিক শিক্ষা যে গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে, সে সম্পর্কে কিছু ধারণা আমাদের হ'য়েছে। শিক্ষার অর্থ, শিক্ষার তাৎপর্য (concept of education), শিক্ষার লক্ষ্য (aims of education), পাঠ্যক্রমের ধারণা (concept of curricular), শিক্ষক সম্পর্কে ধারণা (concept of teacher), শিক্ষার্থী সম্পর্কে ধারণা (concept of pupil), শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণা (concept of discipline), পাঠদান-পদ্ধতি (method of teaching) প্রভৃতি শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গেই অভিনবত্বের ছোঁয়াচ লেগেছে বর্তমান শতাব্দীতে। বিংশ শতাব্দী চিন্তা-জগতে যেসব আলোড়ন এনেছে, তা সমাজ-জীবনকে যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ঢেলে সাজিয়েছে, শিক্ষাকেও তেমনি নবরূপ দিয়েছে। শিক্ষার এই নবরূপ ভিন্নমুখী নয়। যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বর্তমান শতাব্দীতে এসে একই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে। তাই আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্ (psychologist), বৈজ্ঞানিক scientist), সমাজ-বিজ্ঞানী (social scientist), শিক্ষাবিদ্ (educationist), চিন্তাবিদ্ (thinker)—এক কথায়, সকলেই মহামিলনক্ষেত্রে রূপান্তরিত হ'য়েছে। বহু ভিন্নমুখী ধারা কোন এক শক্তিকে কেন্দ্র ক'রে ধীরে ধীরে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যে মহা সঙ্গমের সৃষ্টি করেছে, তাই হ'ল আধুনিক শিক্ষা। আর যে শক্তি তাদের পরস্পরের কাছাকাছি টেনে এনেছে, তা হ'ল 'শিক্ষার্থী' বা শিশু। তাই আধুনিক শিক্ষা শিশু-কেন্দ্রিক (child-centric)। অর্থাৎ, শিশু-কেন্দ্রিকতাই আধুনিক শিক্ষা ; আধুনিক শিক্ষাই শিশুকেন্দ্রিক।

প্রস্তাবনা

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল বক্তব্য হ'ল শিশুই হবে শিক্ষার মূল বিন্দু যাকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার অন্যান্য অঙ্গ পরিচালিত হবে। অর্থাৎ, শিশুর আগ্রহ, শিশুর নিজস্ব ক্ষমতা, শিশুর চাহিদা, শিশুর প্রয়োজন ইত্যাদির কথা বিবেচনা ক'রে তার জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। তার গ্রহণ-ক্ষমতার ও মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে পাঠদানের পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। পাঠ্যক্রম শিশুর জন্য, বিদ্যালয় শিশুর জন্য। এক কথায়, সমগ্র শিক্ষাই শিশুর জন্য ; বয়স্কদের চাহিদার কথা ভেবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। শিক্ষক, অভিভাবক এখানে গৌণ ব্যক্তি ; সহায়কমাত্র, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রক নয়। এটাই হ'ল আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য। গতানুগতিক মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দীর্ঘদিনের চেষ্টায়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা কি ?

মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হ'লে তার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

॥ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বিবর্তন ॥

(Evolution of Child-Centric Education)

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলতে বর্তমানে আমরা যা বুঝি, তা হঠাৎ একদিন আরম্ভ হ'য়ে যায়নি। বহু বিশিষ্ট মনীষী ও চিন্তাবিদ্‌দের চেষ্টায়, আধুনিক শিক্ষায় এই নীতি স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। তাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে বহু প্রাচীন ও আধুনিক মনীষীর কথা উল্লেখ করতে হয়। তাঁদের সকলের অবদান সম্পর্কে আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল ধারাটি অনুশীলন করা। এবং এই কারণে, আমরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্‌দের নাম উল্লেখ করব।

কুইন্টিলিয়ান

এ বিষয়ে প্রথমতঃই উল্লেখ করতে হ'য় প্রাচীন রোমান শিক্ষাবিদ্ কুইন্টিলিয়ানের কথা। তাঁর লেখায় শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য তিনি করেছিলেন, তার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষানীতির অনেক মিল আছে। যেমন, তিনি শিশুর সামর্থ্য বা ক্ষমতানুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছিলেন। শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার ওপরও তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাছাড়া, তিনি শিক্ষার্থীদের দৈহিক শাস্তিদানেরও বিরোধী ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কুইন্টিলিয়ান তাঁর শিক্ষা-চিন্তায় শিশু বা শিক্ষার্থীদের প্রতি সমবেদনামূলক মনোভাব দেখিয়ে গেছেন এবং এই মনোভাব ধীরে ধীরে আধুনিক কালে প্রবাহিত হয়েছে।

ইরাসমাস

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মানবতাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। তার মূল কথা ছিল শিক্ষাকে মানব-মনের চাহিদার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। যে সব বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌গণ এই আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইরাসমাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর নিজস্বতা বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছিলেন। পাঠ্যসূচী রচনার ক্ষেত্রে শিশুর আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে, শিক্ষাকে খেলা-ভিত্তিক করার কথা তিনি বলে গেছেন। তাছাড়া, শিক্ষা-পরিকল্পনা যাতে শিশুর বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, সেদিকে নজর দেওয়ার কথা তিনি বলেছেন। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে শিক্ষা যাতে শিশুর প্রকৃত এবং স্বাভাবিক চাহিদাগুলি মেটাতে সক্ষম হয়, সেভাবেই শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন বিখ্যাত চিন্তাবিদ্

কমেনিয়াস। তাঁর মত ছিল শিক্ষাকে বস্তুধর্মী করতে হবে। অর্থাৎ, বিমূর্ত জ্ঞান শিশুমন গ্রহণ করতে সক্ষম নয়, তাই তাকে মূর্ত বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা দিতে হবে; শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে মূর্ত করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি শিশুর দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের কথা বলেছেন। প্রত্যক্ষণধর্মী মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার কথা তিনি প্রথম উল্লেখ করেন। এই হিসেবে বলা যায়, কমেনিয়াস বিজ্ঞানভিত্তিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তক। বস্তুধর্মী পাঠ পরিচালনা করার জন্য তিনি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন। তাঁর এই পাঠ্যপুস্তকে ১৫০টি ছবি ছিল। এই এক-একটি ছবি এক-একটি পাঠ (Lesson) হিসেবে বিবেচনা করা হ'ত।

কমেনিয়াস

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষাক্ষেত্রে আর এক মতবাদের আবির্ভাব ঘটে রুশোর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে। একে বর্তমানে বলা হয় প্রকৃতিবাদ (naturalism)। রুশো শিশুকে দেবতার সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,—শিশু পবিত্র মন নিয়েই জন্মায়, কিন্তু সমাজ তাকে কলুষিত করে। তাই তাঁর মতে শিক্ষাকে আদর্শ পথে পরিচালিত করতে হ'লে শিশুকে সামাজিক প্রভাবের বাইরে রাখতে হবে। তার শিক্ষা হবে সহজ, স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে। তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে তার জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নির্ধারণের জন্য। আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিশু এগিয়ে যাবে পরিণতির দিকে, এবং তার মাধ্যমেই শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। এর থেকে দেখা যায়, আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই রুশোর চিন্তার মধ্যে ছিল। রুশো ছিলেন তাত্ত্বিক। তিনি নিজে তাঁর চিন্তাধারার কোন প্রয়োগ করেননি। তিনি যদি তা করতে পারতেন, তাহ'লে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এত দিন অপেক্ষা করতে হ'ত না। রুশোর চিন্তাকে কার্যকরী করার দায়িত্ব এসে পড়ে পরবর্তী অনুগামীদের ওপর। তাঁর অনুগামীরাই তাঁর তত্ত্বকে প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবর্ধন ক'রে আধুনিক পরিণতিতে নিয়ে এসেছেন। তাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাস উল্লেখ করতে গেলে এই রকম কয়েকজন রুশো-অনুগামীর অবদানের কথা স্মরণ করতে হয়।

রুশো

বেসডো ছিলেন রুশোরই সমসাময়িক। তিনি রুশোর চিন্তাধারাকে প্রথমতঃ প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করেন একটি বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে। এই প্রতিষ্ঠানে শিশু-প্রকৃতির অনুকূল শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং খেলাধূলা ও আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ, বেসডোর এই প্রচেষ্টা পরবর্তী কালে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার নীতি-গ্রহণে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

রুশোর মতাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে পেস্টালাৎসী (Pestalozzi) শিশুদের শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতির কথা বলেন। তিনি একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন, যেখানে বৌদ্ধিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলার জন্য নানা ধরনের

কাজ করানো হ'ত। তিনি জ্ঞানের বিষয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক'রে তোলার জন্য 'বস্তু ভিত্তিক পাঠ' (object lesson) নামের শিক্ষণের নতুন কৌশল বা পদ্ধতির কথা বলেন। পেস্টালাৎসীর শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণাও ছিল প্রগতিশীল। তিনি পরোক্ষভাবে মুক্ত শৃঙ্খলার কথাই বলেছিলেন। পেস্টালাৎসীকে মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষানীতির জনক বলা হয়। অর্থাৎ, তিনি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকে অনেকাংশে পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন।

পেস্টালাৎসীর পরে যিনি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান, তিনি হ'লেন জার্মান শিক্ষাবিদ্ হার্বার্ট। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর আগ্রহের (interest) গুরুত্বের কথা তিনি প্রথম বলেন এবং আগ্রহের মনোবিদ্যাসম্মত ব্যাখ্যা দেন। শিক্ষণের জন্য যে শিশুর আগ্রহসৃষ্টি প্রয়োজন, একথা প্রথম তিনি বলেন। তাই তাঁর এই নীতিতে শিক্ষণ অনেকখানি শিক্ষার্থী-নির্ভর হ'য়ে পড়ে।

সমসাময়িক কালে, ফ্রয়েবেলও শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর যে নীতি প্রচার করেন, তাও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বিকাশে সহায়তা করেছে। ফ্রয়েবেল, শিশুর আত্মসক্রিয়তাকে শিক্ষার মূলভিত্তি হিসাবে ধরেছেন। শিশু আত্মসক্রিয়তায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, তাই তার শিক্ষা ; এই ছিল ফ্রয়েবেলের মত। এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্য তিনি শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে এক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন যার নাম কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

এইসব মনীষীদের চিন্তাধারা ও কার্যাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে আধুনিক কালে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন দেশে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। যেমন, আমেরিকায় পার্কার, ডিউই, ফ্রান্সে কুসিনে' (Cousinet), জার্মানীতে বার্টহোল্ড অটো, ইংলণ্ডে সেসিল রেডি (Reddie) এবং ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি এ'রা প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রচেষ্টার দ্বারা আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকে একই স্থায়ী রূপ দিয়েছেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা যা আমরা বর্তমানে দেখছি, তা বর্তমান শতাব্দীর একান্ত নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নয়। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারায় এর আংশিক প্রকাশ দেখা গেছে। তাঁদের সকলের প্রচেষ্টায়, কালের সীমা অতিক্রম ক'রে এই নীতি বর্তমান শতাব্দীতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাই আধুনিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল শিশুকেন্দ্রিকতা (Child Centricism)।

।। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ।।

(Characteristics of Child Centric Education)

ইতিপূর্বে আমরা শিক্ষার বিভিন্ন দিক্ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যা কিছু উল্লেখ করেছি, সেগুলি সবই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। তাই আলোচ্য অংশে

নতুন কিছু উল্লেখ করার নেই, শুধু আলোচনাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করবো।

[এক] প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা ছিল জ্ঞান-আহরণের কৌশলমাত্র। শিক্ষক ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। তিনি তাঁর উদ্‌বৃত্ত ভাণ্ডার থেকে কিছু জ্ঞান শিক্ষার্থীদের বিতরণ করতেন। শিক্ষার্থীর কাজ ছিল সেই জ্ঞান গ্রহণ করা। কিন্তু শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় 'শিক্ষা' শব্দকে অনেক বেশী ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হ'চ্ছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনে যে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া চলছে, তাই হ'ল আধুনিক অর্থে শিক্ষা। শিক্ষা হ'ল শিশুর জীবনে এক ধরনের অভিযোজন-প্রক্রিয়া (adjustment process)। জীব-জগতে চিরন্তন এক অভিযোজনের প্রক্রিয়া চলছে। যে সব প্রাণী পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পেরেছে, তারাই টিকে আছে; আর যারা পারেনি তারা বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। শিক্ষাও শিশুর জীবনে এক ধরনের অভিযোজন-প্রক্রিয়া, জল, আলো, বাতাসের মতই এর সজীবতা বজায় রাখা প্রয়োজন। শিক্ষাব এই তাৎপর্য শিশুব জীবনভিত্তিক এবং শিশুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব ধারণা

[দুই] শিক্ষার লক্ষ্য (aims of education) নির্ধারণ করতে গিয়ে পূর্ববর্তী যুগে শিক্ষাবিদ্‌রা বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছেন। তাঁদের সেই মতবাদগুলিকে আমরা প্রধানতঃ দুটো শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। একটি হ'ল ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ এবং অপরটি হ'ল সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। কিন্তু আধুনিক কালে এ রকম কোন পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য রাখা হয়নি। ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও সামাজিক চাহিদা উভয়ের ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবন যেমন আছে, তেমনি সামাজিক জীবনও আছে। এর কোনটিকেই অপরটির স্বার্থে বিসর্জন দেওয়া হয়নি। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা বিকাশ করা এবং সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। একক মানবশিশু সমাজ ছাড়া বাঁচতে পারে না, আবার ব্যক্তির উন্নতি না হ'লে সামাজিক উন্নতি হয় না। তাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তির কল্যাণের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ সাধন করা। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যের এই বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই তাঁর একটি মন্তব্যে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন,—তিনি বলেছেন, "শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বাড়িয়ে তুলে তার সামাজিক যোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলা"।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য

[তিন] প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী সার্থক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে থাকবে সমাজের অতীত অভিজ্ঞতা। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মানুষের অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য পাঠ্যক্রমে কেবল কৃষ্টিমূলক বিষয়ই রাখা হ'ত। কিন্তু শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রমের নতুন গতিধর্মী সংব্যাখ্যান দেওয়া হ'য়েছে। এই পাঠ্যক্রম হবে পরিবর্তনশীল এবং জীবন-ভিত্তিক। শিশুর এবং সমাজের চাহিদা উভয়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে পাঠ্যক্রমে। এই পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম

শিক্ষাবিদ্ মনরো (Monroe) বলেছেন—"The curriculum must present to the child in idealised form, present life, present social activities, present ethical aspirations, present appreciation of the cultural value of the past." অর্থাৎ, অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ ক'রে তুলে ধরাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য।

[চার] শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পদ্ধতি (Tcaching Method) প্রাচীন শিক্ষণ-পদ্ধতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। প্রাচীন শিক্ষণ-পদ্ধতিতে শিক্ষক ছিলেন মুখ্য ব্যক্তি এবং তাঁর একমাত্র কৌশল ছিল মৌখিক নির্দেশনা দান (verbal instruction)। কিন্তু শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হ'য়েছে। আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সেগুলি মনোবিজ্ঞানসম্মত। শিশুর আগ্রহ, ক্ষমতা, চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষণ-পদ্ধতিকে ঢেলে সাজাতে গিয়ে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন—ডাল্টন পরিকল্পনা (Dalton plan), উইনেট্কা পরিকল্পনা (Winnetka plan), ডেক্রলি পদ্ধতি (Decroly system), প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project method). বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা (Basic system), ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি শিক্ষণ-পদ্ধতিতে শিক্ষণের নিয়ন্ত্রণ খুবই কম, তাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যকে যতদূর সম্ভব কমিয়ে মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে হবে।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পদ্ধতি

[পাঁচ] শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, শিক্ষকের দায়িত্ব কমে গেছে। বরং এ কথা বলাই ঠিক হবে, শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্ব বেড়েছে। তিনি শুধুমাত্র জ্ঞানদান ক'রে তার কর্তব্য শেষ করবেন না, তিনি হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু, নির্দেশক এবং জীবন-দর্শনের প্রতীক। ব্যক্তি-জীবনে যে জীবনব্যাপী শিক্ষা-প্রক্রিয়া চলেছে, তার তিনি নিষ্ক্রিয় দর্শক নন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব, নিজের কুশলতা ও সমবেদনামূলক মনোভাবের এবং জীবন-দর্শনের দ্বারা শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করবেন। শিক্ষার্থী যখন আপন সক্রিয়তার মাধ্যমে শিখবে, শিক্ষক তাকে প্রয়োজনবোধে সাহায্য করবেন। তাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের কাজ ও দায়িত্বের পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটেছে। তাঁর দায়িত্ব হ'ল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করা।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব পদ্ধতি

[ছয়] বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষালয়গুলিকে কেবলমাত্র জ্ঞান-বিতরণের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষালয়েরও সাংগঠনিক পরিবর্তন হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে উন্নত ধরনের অভিযোজনের অধিকারী ক'রে তোলা। আর সেই প্রশিক্ষণের জন্য চাই আদর্শ পরিবেশ। তাই শিক্ষালয়-পরিবেশকে আদর্শভাবে গড়ে তুলতে বলা হ'য়েছে। শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে সংগঠিত করার কথা বলা হ'য়েছে। শিক্ষালয় জীবনের সঙ্গে যদি

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষালয়

সমাজ-জীবনের পার্থক্য থাকে, তাহ'লে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে অভিযোজন করতে পারবে না এবং তার ফলে ব্যক্তিজীবনের বিকাশ ব্যাহত হবে। তাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল শিক্ষালয় হবে সমাজেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ (miniature society)। তাছাড়া, এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষালয়ের দায়িত্বেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একদিকে সে যেমন শিক্ষার্থীর সামনে সমাজ-জীবনের প্রতিরূপ তুলে ধরে তাদের সামাজিক জীবনবিকাশে সহায়তা করবে, অন্যদিকে সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ক'রে শিক্ষার্থীর শিক্ষালয়-জীবনের সঙ্গে কর্মজীবনের সহজতম সংযোগ স্থাপন করাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শৃঙ্খলা

[সাত] শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষালয়ের জন্য 'শৃঙ্খলা'র নতুন তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বে শিক্ষালয়কে ভাবা হ'ত কঠোর শৃঙ্খলার স্থান। শৃঙ্খলা বলতে তখন শাসনকে বোঝাত। শিশুর সকল রকম স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছাকে দমন করতে না পারলে শিক্ষার কাজ চলতে পারে না, এই ছিল প্রাচীন ধারণা। কিন্তু শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন ক্রিয়াকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। তাকে যদি স্বাভাবিকভাবে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া না হয়, তাহলে তার শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করবে না। শিশুর স্বাধীনতাকে দমন করলে, তার মানসিক সংগঠনে গোলযোগ দেখা দেয়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় মুক্ত শৃঙ্খলা বা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার (Free discipline or spontaneous discipline) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও সক্রিয়তা

[আট] শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল শিশুর শিখন-প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে কর্মের মধ্য দিয়ে পরিচালনা। এই নীতির মূল কথা হ'ল শিশুকে নিষ্ক্রিয় রেখে কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ ও সার্থক হ'তে পারে না। শিক্ষার্থী হাতে-কলমে কাজ ক'রে নিজে যা শিখবে, তাই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর এই সক্রিয়তার ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষণ-পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে। আধুনিক কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাও এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা

[নয়] বর্তমানে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হ'য়েছে। যে সমাজ-পরিবেশের মধ্যে সে জন্মেছে, যে অভিজ্ঞতা সে সমাজ থেকে পাচ্ছে, তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করাই শিক্ষার মূল কথা। তাই বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শিক্ষা দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। তাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাও (Experience centred education) বলা যায়।

[দশ] শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনী স্পৃহাকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করা হয় এবং বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তার সৃজনাত্মক ক্ষমতার উন্মেষ সাধন করা হয়। কারণ, ব্যক্তি যদি সমাজ-অগ্রগতিতে সহায়তা না করে, তা'হলে সমাজ স্থবির হ'য়ে পড়বে। তাই সমাজ-অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে যা কিছু বৈশিষ্ট্য, তাকেই চর্চার মাধ্যমে বাড়িয়ে তুলতে হবে। তাছাড়া, সৃজনাত্মক কর্মের সুযোগ শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক অনুরাগ (vocational interest) বিকাশে সহায়তা করে।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও সৃজনশীলতা

[এগার] শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের (Development of Personality) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। পরিপূর্ণ বিকাশ বলতে শিক্ষার্থীর দৈহিক (Physical), মানসিক (mental), নৈতিক (moral) ইত্যাদি সমস্ত রকম দিকের বিকাশকে বোঝায়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত কাজগুলিকে (extra-curricular activities) পাঠ্যক্রমিক বিষয়গুলির (curricular subject) মত সমান গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। তাই খেলাধুলা, সাহিত্য-চর্চা, ভ্রমণ ইত্যাদির মত কাজগুলি এই নতুন তাৎপর্যে সহপাঠ্যক্রমিক কাজ (cocurricular activities) নাম গ্রহণ করেছে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী

[বার] সবশেষে, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা-দানের নীতি ঘোষণা করেছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু নিজের ইচ্ছা ও পছন্দমত কাজ করতে পারে। শ্রেণীকক্ষের বাধ্যবাধকতার মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখতে নিষেধ করা হ'য়েছে। তবে এই স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। কেবলমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের প্রেরণা বজায় রাখার জন্যই কর্ম-সম্পাদনের স্বাধীনতা। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার গতি ত্বরান্বিত হয়।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও স্বাধীনতা

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারার সমন্বয় হ'য়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত শিক্ষা-দর্শনের ধারা অনুশীলন করলে আমরা লক্ষ্য করি, বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ তিনটি বিশিষ্ট চিন্তার ধারা প্রবহমান রেখেছিলেন। এগুলি হ'ল মনোবৈজ্ঞানিক ধারা (psychological tendency), বৈজ্ঞানিক ধারা (scientific tendency) এবং সামাজিক ধারা (sociological tendency)। মনোবৈজ্ঞানিক ধারা থেকে জন্ম নিয়েছে শিশুর প্রতি আগ্রহ ও সমবেদনা। প্রকৃতক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক ধারাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক। বৈজ্ঞানিক ধারা শিক্ষার্থীকে প্রদত্ত অভিজ্ঞতার বিস্তৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর তার প্রভাবে পাঠ্যক্রম বিস্তৃত হ'য়েছে এবং জীবনভিত্তিক হ'য়ে গড়ে উঠেছে। সমাজবৈজ্ঞানিক ধারা শিক্ষাকে সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার ওপর জোর দিয়েছে। আর শিশুকেন্দ্রিক

মন্তব্য

শিক্ষায় তাই শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিরূপ হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা এই প্রত্যেকটি ধারার আদর্শ গ্রহণ ক'রে তাদের মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন করেছে। তাই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা সমন্বয়ধর্মী।

॥ সারসংক্ষেপ ॥

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা কোন তাৎক্ষণিক ঘটনা নয়, বিভিন্ন চিন্তাবিদদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি, কুইন্টিলিয়ন, ইরাসমাস, কমেনিয়াস, রুশো, পেস্তালাৎসী প্রভৃতি চিন্তাবিদগণ শিক্ষাক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের যে চেষ্টা করেছিলেন, তারই প্রভাবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জন্ম। যেহেতু শিশুকেন্দ্রিকতা আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য: সেহেতু আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শের নীতিগুলি তার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষামূলক সকল চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটেছে।

প্রশ্নাবলী

1. **It is said that modern education has shifted the focus of attention from the subject matter to the child. Do you agree? Give reasons for your answer.**

[এ কথা সাধারণতঃ বলা হয় যে, আধুনিক শিক্ষা তার দৃষ্টি বিষয়বস্তু থেকে সরিয়ে শিশুর ওপর নিবদ্ধ করেছে। তুমি কি এ বিষয়ে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।]

2. **Write a short essay on Child-centrtc Education.**

[শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর।]

3. **Explain : it is meant by saying that modern education is child-centric, and discuss the place of teacher in it.**

[আধুনিক শিক্ষা-শিশুকেন্দ্রিক বলতে কি বোঝায়, ব্যাখ্যা কর। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

4. **Enumerate the characteristics of child-centric education.**

[শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।]

5. **Trace the development of the concept of child-centric education.**

[শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারণার ইতিহাস পর্যালোচনা কর।]

6. **How did the concept of 'child centricism' originate in modern education? What are the characteristics of child-centric education?**

[আধুনিক শিক্ষায় শিশুকেন্দ্রিকতার ধারণা কিভাবে উদ্ভব লাভ করে? শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি?]

7. **What is the value of child centricism in education? Give an example of a child centric process of education.**

[শিক্ষায় শিশুকেন্দ্রিতার মূল্য কি? একটি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ধারার উদাহরণ দাও।

8. **Discuss the meaning and significance of child-centricism in education. Enumerate the characteristics of child-centric education.**

[শিক্ষায় শিশুকেন্দ্রিকতার অর্থ ও তাৎপর্য কি? শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।]

॥ শিক্ষামূলক প্রবন্ধ

শিক্ষা আধুনিক অর্থে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। বর্তমানে সামাজিক সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্র মূলতঃ শিক্ষার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু, রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্যে যে বিনিয়োগ করে থাকে, তার জন্য সে কিছু ফল বা লাভ আশা করে। তার সেই আশা ত্রিমুখী। সে আশা করে, শিক্ষার দ্বারা, সে ব্যক্তির অন্তর্জগতে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে তাকে উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী করবে; সে আশা করে, ব্যক্তির সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করবে, তাকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে তৈরি ক'রে দেবে; এবং সে আশা করে, শিক্ষার দ্বারা সে ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে। শিক্ষার এই তিনটি দিক্ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে পর পর তিনটি প্রবন্ধে—(১) প্রক্ষোভিক অভি[illegible]নের জন্য শিক্ষা, [illegible] সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক অভিযোজনের জন্য শিক্ষা এবং (৩) ও উৎপাদনশীলতার জন্য শিক্ষা ॥

এক
শিক্ষামূলক প্রবন্ধ

প্রক্ষোভিক অভিযোজনের জন্য শিক্ষা

Education for Emotional adjustment

জীবের অভিব্যক্তির মূলে আছে অভিযোজন (adjustment)। জীবন-সংগ্রামে যে সব প্রাণী সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পেরেছে, তারাই পৃথিবীর বুকে টিকে আছে। অভিযোজন একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া (Extensive process)। পৃথিবীর বুকে যেদিন জীবনের প্রথম স্পন্দন শোনা গেছে, সেদিন থেকেই এই প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে সক্রিয়তালাভ করেছে। তবে সাধারণ অর্থে মানুষের ক্ষেত্রে অভিযোজন বলতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলাকে বুঝি। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে আমরা বিশ্ব-প্রকৃতিকে বুঝি। প্রকৃতির রহস্য-উদ্ঘাটনের জন্য মানুষ আবহমান কাল ধরে সংগ্রাম করে চলেছে। মানবসভ্যতার আদি যুগ থেকে চলছে তার সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা। আর এই বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতি হ'চ্ছে। যেহেতু প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ফল বস্তুধর্মী, সেহেতু অভিযোজন কথাটি সাধারণ অর্থে এই ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতি ছাড়াও মানুষের আর এক প্রকৃতি বর্তমান। এটি হ'ল তার আপন মনঃপ্রকৃতি। অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষের একটি অন্তর-পরিবেশ আছে। এই অন্তর-পরিবেশের উপাদানগুলি হ'ল বিভিন্ন ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক চাহিদা ও প্রবণতা এবং বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে, এই অন্তর পরিবেশের উপাদানগুলি তার বাহ্যিক পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে নির্ধারণ করে দেয়। মানসিক যে-সকল উপাদান এমনিভাবে প্রাকৃতিক অভিযোজনে সহায়তা করে থাকে, তাদের মধ্যে প্রক্ষোভ (Emotion) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে বিচারবুদ্ধিশীল জীব হিসেবে আখ্যা দিলেও তার বেশীর ভাগ আচরণই যে প্রক্ষোভ (Emotion) দ্বারা নির্ধারিত হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। তাই আলোচ্য অংশে আমরা মানুষের আন্তর পরিবেশের মধ্যে কিভাবে প্রক্ষোভমূলক অভিযোজন সংঘটিত হয় এবং শিক্ষার দ্বারা কিভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রস্তাবনা

প্রক্ষোভিক অভিযোজন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমতঃ প্রক্ষোভ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। মনোবৈজ্ঞানিক অর্থে প্রক্ষোভ কোন মানসিক প্রক্রিয়া নয় ; এক ধরনের মানসিক অবস্থা (Mental state)। বিভিন্ন ধরনের এই মানসিক অবস্থাকে আমরা রাগ, ভয়, ভালবাসা ইত্যাদি নানা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করি। কিন্তু, এই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখার দরকার, এই আন্তরিক মানসিক

অবস্থাগুলির বহিঃপ্রকাশ হয় দেহযন্ত্রের মাধ্যমে বা আচরণের মাধ্যমে। তাছাড়া এই, আন্তরিক অবস্থাগুলি আমাদের আচরণগত ভারসাম্য (behavioural equilibrium) নষ্ট করে। তাই আধুনিক মনোবিদ্‌রা বলেছেন—প্রক্ষোভ হ'ল মানুষের মনের এমন এক আন্তরিক অবস্থা যার আচরণগত প্রকাশ আছে এবং যা মানুষের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে। মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকে প্রক্ষোভকে কর্মক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ, প্রক্ষোভ মানুষের কাজের পেছনে শক্তি যোগায়। আমরা রাগের বশবর্তী হ'য়ে যখন কর্মসম্পাদন করি, তখন সেই কাজের অতিরিক্ত শক্তি আসে ঐ মানসিক অবস্থার কাছ থেকে। প্রক্ষোভ প্রসঙ্গে আবও কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রক্ষোভ মানুষের জীবনে জন্মগতভাবে থাকে, আবাব তার বিকাশ হয়। জন্মগতভাবে যে প্রক্ষোভগুলি তার মধ্যে থাকে, সেগুলিকে বলা হয় **প্রাথমিক প্রক্ষোভ**। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি অন্যান্য মনোবিদ্ বলেছেন, এই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলি ব্যক্তির জন্মগত চাহিদার সঙ্গে যুক্ত থাকে। আবার কতকগুলি প্রক্ষোভ পরবর্তীকালে প্রাথমিক প্রক্ষোভের বিভেদীকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। সুতরাং, প্রক্ষোভ-সংক্রান্ত যে সকল তথ্য আমাদের এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক, সেগুলি হ'ল— ১) পক্ষোভ এক ধবনের মানসিক অবস্থা ; (২) প্রক্ষোভ আচরণের নির্ধারক ; (৩) প্রক্ষোভ আচরণের শক্তির উৎস এবং (৪) প্রক্ষোভ বিকাশধর্মী।

প্রক্ষোভের প্রকৃতি

এখন দেখা যাক্, প্রক্ষোভমূলক অভিযোজন বলতে কি বোঝায়। আমরা জানি, মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে। এই প্রক্ষোভ-গুলিকে বলা হয় **প্রাথমিক প্রক্ষোভ**। এই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলি কি কি, এ নিয়ে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তবে সাধারণতঃ ম্যাকডুগালের যে তালিকাকে মেনে নেওয়া হয়, সেখানে দেখা যায়, পরস্পর বিপরীতধর্মী প্রক্ষোভ বর্তমান। এখন ব্যক্তি যদি একই বস্তু বা ধারণাব পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর বিপরীতধর্মী প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে ত'হলে তার মধ্যে আচবণগত বৈষম্য দেখা দেবে। এই আচরণগও বৈষম্যের কারণ, মানসিক অভ্যন্তরীণ অবস্থার ভাবসাম্যের অভাব। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে ব্যক্তি তার প্রক্ষোভিক অবস্থাগুলির মধ্যে সার্থকভাবে সঙ্গতি বিধান করতে পারেনি। আবার, ব্যক্তি জন্মের পর থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানা ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টি করাব ক্ষমতা অর্জন করে। এই ধরনের প্রক্ষোভগুলি কতকগুলি প্রাথমিক প্রক্ষোভের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হয় বলে এদের **মিশ্র প্রক্ষোভ** বলা হয়। এই মিশ্র প্রক্ষোভগুলিও অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। ব্যক্তির আচরণগত বৈষম্য এই ধরনের মিশ্র প্রক্ষোভগুলির পরস্পর-বিরোধী অবস্থার জন্য সৃষ্ট হ'য়ে থাকে। তাই আধুনিক মনোবিদ্‌গণ মনে করেন, ব্যক্তি-জীবনেব আচরণগত অপ্রতিযোজন (Maladjustment), প্রাথমিক মিশ্র-অর্জিত প্রক্ষোভগুলির সমন্বয়ের অভাবের দরুন ঘটে থাকে। তাছাড়া, ব্যক্তিজীবনে প্রক্ষোভিক বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার (Personality) বিকাশ হয়। ব্যক্তিসত্তার এই বিকাশ বিশেষ ভাবে প্রক্ষোভিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এই সমন্বয়ের বিভিন্ন পর্যায় আছে।

প্রক্ষোভমূলক অভিযোজন

সমন্বয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ বস্তুধর্মী সেণ্টিমেণ্ট (Sentiment) গঠিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বস্তুধর্মী সেণ্টিমেণ্ট গঠিত হয় এবং সবশেষে বিমূর্ত সামাজিক ধারণা ও মূল্যবোধগুলিকে কেন্দ্র করে সেণ্টিমেণ্ট (Sentiment) গঠিত হয়। এমনিভাবে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার ক্রমসমন্বয়নের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হয়। এখন, কোন বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে যদি পরস্পর-বিরোধী সেণ্টিমেণ্ট ব্যক্তিজীবনে গঠিত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আচরণগত বৈষম্য দেখা দেবে। সবশেষে, প্রক্ষোভ আমাদের আন্তরিক মানসিক অবস্থা হ'লেও তার একটি আচরণগত দিক আছে। প্রত্যেক প্রক্ষোভিক অবস্থার নিজস্ব আচরণগত বহিঃপ্রকাশ আছে। এদের বলা হয়, **প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া** (Emotional reaction)। ব্যক্তির জীবন-বিকাশের সঙ্গে প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ারও বিকাশ হয়। এই বিকাশ সামাজিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি কোন ব্যক্তি তার বয়স-উপযোগী প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া করতে ব্যর্থ হয়, তা'হলে তাকে পরিণত ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলা যাবে না। সুতরাং, এই সব ঘটনাগুলি একত্রে বিচার করলে বলা যায়, ব্যক্তি-জীবনে প্রক্ষোভমূলক অবস্থা ও প্রতিক্রিয়াগুলির সার্থক সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভিক অবস্থাগুলির মধ্যে সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে আচরণগত সঙ্গতিবিধানে সক্ষম হয়, তাকেই বলা হয় **প্রক্ষোভিক অভিযোজন** (Emotional adjustment)।

প্রক্ষোভিক অভিযোজন, সুষম ব্যক্তিসত্তা বিকাশের দিক্ থেকে যেমন প্রয়োজন, তেমনি সামাজিক দিক্ থেকেও প্রয়োজন। প্রক্ষোভিক অপ্রতিযোজনের যে কি ভয়াবহ রূপ হ'তে পারে, তা আমরা গত দুটি বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা থেকে উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের সামাজিক জীবনেও এর ভয়াবহ রূপ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। সমাজের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সাধারণ কতকগুলির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমপ্রকৃতির প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়াসম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়, তাহ'লে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যেমন—বর্তমানে ভাষা, রাজ্যের সীমানা ইত্যাদি নিয়ে একই রাষ্ট্রভুক্ত মানুষের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তাই প্রক্ষোভিক অভিযোজন সামাজিক দিক্ থেকে বাঞ্ছনীয়। মনোবিদ্ রস বলেছেন—"Emotion constantly relighten the vitality of life, especially in social life. অবশ্য সেই প্রক্ষোভের যদি ব্যক্তি-মনে সমন্বয়ন হয়। অপ্রতিযোজন ঘটলে চরম সামাজিক বিপর্যয় ঘটবে।

প্রক্ষোভ ও সামাজিক বিকাশ

॥ শিক্ষা ও প্রক্ষোভিক অভিযোজন ॥
(Education & Emotional Adjustment)

শিক্ষা ব্যক্তি-জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রক্রিয়া। সর্বাঙ্গীণ বিকাশ বলতে ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, প্রক্ষোভিক সকল রকম দিকের বিকাশকে বোঝায়। ব্যক্তি-জীবনের এই বিভিন্ন দিকের বিকাশ সামগ্রিকভাবে সহায়তা করে।

সুতরাং, এই সাধারণ নীতি অনুসারে, শিক্ষার উদ্দেশ্য আংশিকভাবে হ'লেও, ব্যক্তির প্রক্ষোভিক বিকাশে সহায়তা করা। তাছাড়া, আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, প্রক্ষোভিক বিকাশ ব্যক্তির সামাজিক বিকাশেও সহায়তা করে। কারণ, প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টির ক্ষমতা থেকে ব্যক্তির সামাজিক পরিণমন বিচার করা হয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রক্ষোভিক বিকাশ তখনই সুসম্পন্ন হ'য়েছে বলা যাবে, যখন ব্যক্তিজীবনে, সার্থক প্রক্ষোভিক অভিযোজন হবে। এই কারণে শিক্ষাকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে হ'লে শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভিক অভিযোজনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষা হবে প্রক্ষোভিক অভিযোজনের সহায়ক প্রক্রিয়া।

শিক্ষা ও প্রক্ষোভমূলক অভিযোজন

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রক্ষোভিক অভিযোজন সংঘটিত হ'য়েছে কিনা তার কতকগুলি আচরণগত সূচকের (Behavioural index) কথা মনোবিদ্‌গণ উল্লেখ করেছেন। যেহেতু প্রক্ষোভ আন্তরিক অবস্থা এবং তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেহেতু কতকগুলি বহিরাচরণ প্রত্যক্ষ ক'রে তার সম্বন্ধে অনুমান করতে হয়। শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন হয়। তাই প্রক্ষোভমূলক অভিযোজনের আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি জানা থাকলে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার সুবিধা হয়। মনোবিদ্‌গণ প্রক্ষোভমূলক অভিযোজনের যে আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হ'ল—

অভিযোজনের বৈশিষ্ট্য

( ) অসামাজিক প্রক্ষোভগুলির সংযত প্রকাশ।

(২) বিরূপ কোন মন্তব্য বা মতবাদকে প্রক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সহ্য করা।

(৩) বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী অবস্থার মধ্য থেকে ভাল অংশটি বেছে নেওয়া।

(৪) ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রকাশের ক্ষেত্রে সংযত অনুভূতির প্রকাশ।

(৫) ব্যক্তিগত দুর্বলতা, ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সেই সম্পর্কে সংযত প্রতিক্রিয়া করা।

(৬) ব্যক্তিগত ভুল স্বীকার করা।

(৭) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সাফল্যকে সংযতভাবে গ্রহণ করা।

(৮) কোন পরিস্থিতির অকৃতকার্যতাকে সহনশীল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা।

(৯) হতাশাকে দীর্ঘ সময় প্রশ্রয় না দেওয়া।

(১০) সামাজিক রীতিনীতির প্রতি উপযুক্ত প্রক্ষোভিক সংযুক্তি প্রকাশ করা।

(১১) নিজের প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা অন্যকে আঘাত না করা।

(১২) সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তির প্রতি যোগ্য প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া করা। এবং

(১৩) নির্দিষ্ট বস্তু বা ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সকল সময়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা।

এখন, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধরনের আচারণগত বৈশিষ্ট্য বিকাশে সহায়তা করতে হ'লে আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনাকে এই উদ্দেশ্যে রচনা করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক কার্যসূচী গ্রহণ করলে, শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভিক অভিযোজনকে সহায়তা করা যায়। এই সব কার্যসূচীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল—

অভিযোজনমুখী কৌশল

[এক] প্রক্ষোভিক অভিযোজনের শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক জ্ঞানমূলক শিক্ষার দ্বারা সম্ভব নয়। প্রক্ষোভিক অভিযোজন মূলতঃ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংঘটিত হ'তে পারে। তাই এ-বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে হ'লে, তাদের বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন করতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষালয়ের বা শিক্ষার দায়িত্ব হবে এমন পরিবেশ রচনা করা, যার মধ্যে বসবাস করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পাদন করতে পারে। শিক্ষার্থীরা যখন প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করবে, তখনই তাদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই নিয়ন্ত্রণ আংশিকভাবে বস্তুধর্মী কৌশল প্রয়োগ ক'রে এবং আংশিকভাবে ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা করতে হবে। যে সব প্রক্ষোভ ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, সেই সব প্রক্ষোভ যাতে সৃষ্ট না হয়, সেই অনুযায়ী শিক্ষালয়-পরিবেশ রচনা করতে হবে। আবার, যে সকল প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সহায়ক, সেগুলির প্রকাশ-উপযোগী পরিবেশ রচনা করা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য। এইভাবে পরিবেশ রচনা ক'রে শিক্ষার্থী'র প্রক্ষোভিক অভিযোজনকে সহায়তা করা যায়। তাছাড়া, শিক্ষার্থী'রা প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়াগুলি অনেক সময় অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা করে। শিক্ষালয়ে তারা শিক্ষকের আচরণই অনুকরণ করার চেষ্টা করে। তাই শিক্ষক তাঁর নিজের প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদনে যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবেন, সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থী'রাও প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করতে শিখবে। এইভাবে, প্রক্ষোভিক অভিযোজনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী'দের পরিমিত মাত্রায় প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে শিক্ষা লাভ করবে। সুতরাং এই আলোচনা থেকে বলা যায়, শিক্ষার দ্বারা প্রক্ষোভিক অভিযোজনের সহায়তা করতে হ'লে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা-পরিবেশকে প্রক্ষোভিক বিকাশের উপযোগী করে রচনা করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রের বস্তুগত অংশ (Material Part) এবং মানবীয় অংশ (Human Part) দুইয়েরই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

শিক্ষার পরিবেশ

[দুই] আমরা জানি, প্রক্ষোভ মানুষের প্রবৃত্তি এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তি জীবন-পরিস্থিতিতে যদি তার প্রবৃত্তিমূলক প্রবণতা বা মৌলিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করতে পারে, তাহ'লে তার প্রক্ষোভগুলির মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলার অবকাশ থেকে না। অর্থাৎ, চাহিদার পরিতৃপ্তিতে প্রক্ষোভিক অভিযোজন সংঘটিত হয়। তাই শিক্ষার দ্বারা এই কাজে সহায়তা করতে হ'লে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলি চাহিদাভিত্তিক হওয়া উচিত। অর্থাৎ, প্রক্ষোভমূলক অভিযোজনের শিক্ষার পাঠ্যক্রম (Curriculum) নতুন করে রচনা করতে হবে। এই পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীদের চাহিদাগুলি যাতে পরিতৃপ্ত হয়, সেদিকে নজর রেখে

চাহিদার তৃপ্তি

পাঠ্যসূচী রচনা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনে নানারকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিগুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে নানা রকম চাহিদা সৃষ্টি করে। এই চাহিদাগুলি যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয়ে চরিতার্থ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বহুমুখী পাঠ্যক্রম নির্বাচন করতে হবে।

[তিন] শিক্ষা কেবলমাত্র চাহিদা তৃপ্তির দিকেই লক্ষ্য রেখে প্রক্ষোভিক অভিযোজনকে সহায়তা করে, একথাই সম্পূর্ণভাবে সত্য, তা স্বীকার করা যায় না। কারণ, শিক্ষা সব সময় শিক্ষার্থীর সব রকম চাহিদা পরিতৃপ্ত করবে, একথা ঠিক নয়।

চাহিদার সংবোধন

শিক্ষার্থীর মধ্যে নানাধরনের প্রাথমিক ও অর্জিত চাহিদা থাকতে পারে। সেই সবগুলি চাহিদাই প্রত্যক্ষভাবে পরিতৃপ্ত করা অনেক সময় বাঞ্ছনীয় নয়। তাই, অনেক ক্ষেত্রে চাহিদাগুলির সংবোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ কতকগুলি চাহিদার সংবোধন না করলে সুস্থভাবে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ করা যায় না। তাই প্রক্ষোভিক অভিযোজনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষা সবসময় শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির দিকে লক্ষ্য দেবে না ; ঐ শিক্ষার্থীর কতকগুলি চাহিদার পরিবর্তন চাইবে। এই উদ্দেশ্যে কাজ করতে হ'লে কোন কিছু জোর ক'রে আরোপ করলে চলবে না। কারণ, প্রক্ষোভ ও চাহিদার মত আন্তরিক অবস্থাগুলিকে জোর করে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলে ব্যক্তিজীবনে প্রক্ষোভিক অপ্রতিযোজন দেখা দেবে। তাই আলোচনা ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে পরোক্ষভাবে চাহিদাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে এই কাজে সহায়তা করা যাবে।

[চার] স্মরণ রাখা দরকার, প্রক্ষোভ মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হ'লেও তার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। প্রক্ষোভ ব্যক্তির সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে। সমাজের মধ্যে যে আমরা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্থাপন করি, তা বিশেষভাবে প্রক্ষোভিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে শিশুরা

শিক্ষালয়

গোষ্ঠী জীবনের মধ্যেই নানা ধরনের প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া আয়ত্ত করে। তাই তাদের প্রক্ষোভিক অভিযোজনে সহায়তা করতে হ'লে শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ রচনা করতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষালয়ে আদর্শ মানবীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অন্যান্য শিক্ষাকর্মী, সকলে মিলে যাতে এই সামাজিক একটি সুন্দর সমাজ-পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেন, সেদিকে সকলকে সচেষ্ট হ'তে হবে। এই সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের প্রতি উপযুক্ত প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদন ক'রে অভিযোজন সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান (Practical Knowledge) লাভ করবে; এবং পরবর্তী বৃহত্তর সমাজ-জীবনে তা সঞ্চালিত করবে। তাই শিক্ষাকে প্রক্ষোভিক অভিযোজনে সহায়তা করতে হ'লে শিক্ষালয়গুলির সামাজিকীকরণ প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষার নীতি হিসেবে এটিকে গ্রহণ করা হ'য়েছে।

[পাঁচ] আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ব্যক্তি-জীবনে প্রক্ষোভিক অভিযোজনে

সহায়তা করতে হ'লে তার চাহিদাগুলির তৃপ্তি একান্তভাবে প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের ব্যবস্থা করতে পারলে শিক্ষার্থী'রা তাদের বিভিন্ন চাহিদা পরিতৃপ্ত করার সুযোগ পায়। শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষের পাঠ এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান তাদের মনে অনেক সময় বিরূপ প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে শ্রেণীকক্ষের বাইরে বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের সুযোগ থাকলে, সেখানে তারা স্বাধীনভাবে নিজের বহুমুখী চাহিদাগুলির তৃপ্তির সুযোগ পায় এবং প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়াগুলি প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এদের মাধ্যমে তাদের মানসিক চাপ হ্রাস পায়; তাছাড়া বাস্তব পরিস্থিতিতে উপযুক্ত প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া করার প্রশিক্ষণও লাভ করে। এই কারণে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষাক্ষেত্রে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী

[ছয়] শিক্ষার্থী'দের মধ্যে সৃজনাত্মক স্পৃহা বর্তমান। নতুন কিছু সৃষ্টি করায় তাদের আনন্দ; আর সেই আনন্দ তাদের মধ্যে আরও কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করে এবং তৃপ্তি আনে। তাদের এই সৃজনাত্মক স্পৃহাকে প্রতিরোধ করলে তাদের মধ্যে প্রক্ষোভিক অপ্রতিযোজন দেখা দেয়। তাই প্রক্ষোভিক অভিযোজনে সহায়তা করতে হ'লে শিক্ষার মধ্যে শিক্ষার্থী'র সৃজনীস্পৃহার তৃপ্তির সুযোগ দিতে হবে; শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে তারা যদি ভুলও করে, তাহলেও ব্যক্তি-সত্তা বিকাশের পক্ষে তা খারাপ নয়। কারণ, আত্মসক্রিয়তা থেকে যে ভুল হয়, আত্মসক্রিয়তা দিয়ে তারা শুধরে নেয়। তাই সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা (Activity based education) বা খেলাভিত্তিক শিক্ষা (Play-way method) প্রক্ষোভিক অভিযোজনে সহায়তা করে। অর্থাৎ, একথা বলা যায়, প্রক্ষোভিক অভিযোজনের জন্য শিক্ষার পদ্ধতি হবে সক্রিয়তা-নীতিভিত্তিক।

সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতি

[সাত] ব্যক্তির ভবিষ্যৎ কর্মময় জীবনের পরিস্থিতি অনেক সময় তাকে আশঙ্কিত করে তোলে। এর ফলে তার মধ্যে নানারূপ বিকৃত প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। তাই শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে যাতে সুষ্ঠুভাবে অভিযোজন করতে পারে, সেদিকে শিক্ষাকে নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীর বর্তমান শিক্ষা যদি ভবিষ্যৎ কর্মময় দায়িত্বশীল জীবনের অভিযোজনের সম্পর্কে তাকে নিশ্চিন্ত করতে পারে, তাহলে তাদের জীবনে প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতি-বিধানের সম্ভাব্যতা বেড়ে যায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। শিক্ষান্তে উপার্জনে অন্ততঃ আংশিক নিরাপত্তা, সুস্থ প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদনে সহায়তা করে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

[আট] আমরা জানি, শুধুমাত্র প্রক্ষোভ নয়, ব্যক্তিজীবনের আবরণগুলি প্রক্ষোভ-উদ্ভূত সেণ্টিমেণ্ট দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সেণ্টিমেণ্টগুলি (Sentiment) আরও ক্রমসমন্বয়ের পর্যায়ে উন্নীত হ'য়ে ব্যক্তিসত্তার সংগঠনকে মজবুত করে। সেণ্টিমেণ্টগুলি

গঠিত হ'লে প্রক্ষোভগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের অবসান হয়। তাই সেণ্টিমেণ্ট গঠন, প্রক্ষোভমূলক অভিযোজনেরই লক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখার দরকার, সেণ্টিমেণ্টগুলি গঠিত হয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এই কারণে, শিক্ষা দ্বারা সেণ্টিমেণ্ট গঠনের কাজকে সহায়তা করা যায়। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বস্তু ও ধারণাকে কেন্দ্র করে যত বিস্তৃত সেণ্টিমেণ্ট গড়ে তোলা সম্ভব হবে, প্রক্ষোভিক অভিযোজনের দৃঢ়তাও তত বৃদ্ধি পাবে।

সেণ্টিমেণ্ট গঠন

সুতরাং, এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, উপযুক্ত শিক্ষা-পরিকল্পনার দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভিক অভিযোজনকে সহায়তা করা যায়। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হ'লে শিক্ষার পাঠক্রম, পরিবেশ ও পদ্ধতি সকল দিকে পরিবর্তন সাধন করতে হবে। শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, প্রক্ষোভিক অভিযোজনের ওপর শিক্ষার্থীর সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া নির্ভর করছে। এর ওপর তার চারিত্রিক বিকাশ ও সামাজিক বিকাশ উভয়ই নির্ভর করছে। আধুনিক চিন্তাবিদ্‌গণ বলেছেন, সামাজিক চেতনা (Social consciousness) ব্যক্তিজীবনে প্রক্ষোভিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। তাই যে শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে উপযুক্ত সামাজিক চেতনা গঠনে সহায়তা করবে, তার দ্বারা সমাজ-অন্তর্গত ব্যক্তিদের প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে। তাই ভারতের একজন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্য বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন—"Education must make the growing youth realise that they are indisolubly bound to the nation and its destiny, its tragedies and joys, its conficts and settlements, its failures and achievements, its mistakes and wisdoms and they should come to regard it with pride and with love". শিক্ষা যদি এই উদ্দেশ্যে সফল হয়, তাহ'লে প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে প্রক্ষোভিক অভিযোজনের কোন সমস্যাই থাকবে না।

আলোচনা

সারসংক্ষেপ

মানুষকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে হয়, তেমনি অন্তর-পরিবেশের সঙ্গেও অভিযোজন করতে হয়। এই অভিযোজনের মাধ্যমেই তার বৃদ্ধি। অন্তর-পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল তার প্রক্ষোভ (Emotion)। প্রক্ষোভ এক ধরনের মানসিক অবস্থা যাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু, এদের সঙ্গে যুক্ত আচরণগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। মন-জগতে বিশৃঙ্খলা তাই আচরণে প্রকাশ পায়। তখন আমরা তাকে বলি, প্রক্ষোভ-

মূলক অপ্রতিযোজন। যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভিক অবস্থাগুলির মধ্যে সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে আচরণগত সঙ্গতিবিধানে সক্ষম হয়, তাকেই বলা হয় প্রক্ষোভিক অভিযোজন। এই প্রক্ষোভিক অভিযোজন ব্যক্তিসত্তার বিকাশেই শুধু সহায়তা করে না, ব্যক্তির সামাজিক বিকাশেও সহায়তা করে।

শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির প্রক্ষোভিক অভিযোজনকে সহায়তা করা। প্রক্ষোভিক অভিযোজনের সহায়ক শিক্ষা-পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত দিক-গুলির প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন—(১) প্রক্ষোভিক বিকাশ-উপযোগী পরিবেশ রচনা; (২) চাহিদার তৃপ্তিদানের ব্যবস্থা; (৩) চাহিদার সংবোধনের ব্যবস্থা; (৪) শিক্ষালয়ে মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন, (৫) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার ব্যবস্থা; (৬) সক্রিয়তা-ভিত্তিক পদ্ধতি নির্বাচন; (৭) বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ও (৮) সেন্টিমেন্ট গঠনের ব্যবস্থা।

সবশেষে স্মরণ রাখার দরকার, প্রক্ষোভিক অপ্রতিযোজন দূর করতে হ'লে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. **Write an essay on "Education for Emotional Adjustment."**
   ["প্রক্ষোভিক অভিযোজনের জন্য শিক্ষা" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।]
2. **What is meant by emotional adjustment? How it can be helped through education?**
   [প্রক্ষোভিক অভিযোজন বলতে কি বোঝায়? শিক্ষার দ্বারা প্রক্ষোভিক অভিযোজনকে কিভাবে সহায়তা করা যায়?]
3. **Write an essay on "Education & Emotional adjustment".**
   ["শিক্ষা ও প্রক্ষোভিক অভিযোজন" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।]
4. **Discuss how social and emotional adjustments are mutually related. Mention the role of education in the field of emotional adjustment of the pupil.**
   [সামাজিক ও প্রক্ষোভমূলক অভিযোজনের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর। প্রক্ষোভিক অভিযোজনের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা কি উল্লেখ কর।]

দুই
শিক্ষামূলক প্রবন্ধ

সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক অভিযোজনের জন্য শিক্ষা

[**Education for Productivity**]

মানুষ সামাজিক জীব। একক বিচ্ছিন্ন মানুষের কল্পনা অবাস্তব। মনুষ্য-জীবনের যে ইতিহাস আমাদের জানা আছে, তা তার সমাজ-বিবর্তনেরই ইতিহাস। অন্য দিকে প্রত্যেক মানুষ বা ব্যক্তি বিকাশশীল। কিন্তু, তার এই বিকাশ শূন্য ক্ষেত্রের মধ্যে সংঘটিত হয় না। সে তার জীবন-পরিবেশের মধ্যেই বিকাশলাভ করে। এই কারণে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ (Social environment) নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়ে থাকে। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী, শিক্ষা একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ সামাজিক কাজ (Purposeful social activity)। এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল—ব্যক্তি বা শিশুর সামাজিকীকরণ (Socialization)। শিশুর সামাজিকীকরণ হ'লে সে পরিপূর্ণ সামাজিক জীবে পরিণত হয়। সামাজিক জীব হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রের নাগরিক (Citizen of a State) বা একটি সমাজের সদস্য। সে তার নিজের সমাজের মধ্যে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করতে থাকে। অর্থাৎ, সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (social interaction) শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনা (social consciousness) জাগ্রত করে এবং এই চেতনা শিক্ষা বা নতুন সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে। ফলে, সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি শিক্ষামূলক। কারণ, এগুলি শিশুর মধ্যে সামাজিক বি[illegible]য়ের প্রতি আগ্রহ-সঞ্চারে এবং সামাজিক অভ্যাসগঠনে সহায়তা করে থাকে। তাই এই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, শিক্ষার সঙ্গে শিশুর সামাজিক বিকাশ (Social development) সম্পর্কযুক্ত।

প্রস্তাবনা—শিক্ষা ও সামাজিক বিকাশ

এখন, শিক্ষা এবং সামাজিক বিকাশ যদি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে তাদের এই সম্পর্কের প্রকৃতি আরও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারুইন তাঁর অভিব্যক্তিবাদে বলেছিলেন, জীবজগতে বুদ্ধির (Intelligence) আবির্ভাব অনেক পরে হ'য়েছে। প্রাণী অভিব্যক্তির স্তরে যত উন্নত হয়েছে, জীবন-পরিবেশ তার তত জটিল হ'তে শুরু করেছে। আর সেই জটিল জীবন-পরিবেশে অভিযোজনের জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন হ'য়েছে। ডারুইনের এই ম[illegible]বাদের অনুসরণে কিছু শিক্ষাবিদ্ বলেছেন, বুদ্ধির অধিকারী মানুষের জীবনেও বহু জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এ বিষয়ে তাকে সহায়তা করার জন্যই শিক্ষার প্রচলন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিকে অভিযোজনে সহায়তা করা। শিক্ষার অভিযোজনমূলক

শিক্ষা ও অভিযোজন

লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এবং শিক্ষার লক্ষ্য যে আংশিকভাবে অভিযোজন (Adjustment), একথা আমরা স্বীকার করেছি। তাহ'লে এ পর্যন্ত আমরা দুটি পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করছি—(১) শিক্ষা হ'ল সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়া (Education is the process on social development) ; (২) শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তিজীবনের অভিযোজনে সহায়তা করা এখন, দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষাকে যদি এক ধরনের সচেষ্ট প্রক্রিয়া (Conscious deliberate) হিসেবে গ্রহণ করি, তাহ'লে তার পরিকল্পনাও উদ্দেশ্যমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হ'বে, যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সমাজ-জীবনে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে, এই প্রবন্ধে আর একটি কথা 'কৃষ্টিমূলক অভিযোজন' (Cultural adjustment) ব্যবহার করা হ'য়েছে। সামাজিক অভিযোজনের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে ঐ কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে।

সামাজিক অভিযোজন ও কৃষ্টিমূলক অভিযোজনের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করতে হ'লে প্রথমতঃ সামাজিক অভিযোজন ও কৃষ্টিমূলক অভিযোজন বলতে কি বোঝায়, সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানবশিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাকে সামাজিক বা অসামাজিক কিছু বলা যায় না। সে সম্পূর্ণ এক নতুন জীবন-পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে। মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকার থেকে সে যখন বিশ্বজগতে আবির্ভূত হয়, তখন তার কাছে বিশ্বপ্রকৃতির আলো, জল, বাতাস সবই মিলে এক নতুন পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশের এইসব অঙ্গের সঙ্গে তাকে অভিযোজন করতে হয়। অভিযোজন করতে পারলে তার জীবনীশক্তি স্থায়ী হবে, নতুবা তার মৃত্যু। জন্মমুহূর্ত থেকে তার আশেপাশে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও বহু ব্যক্তি থাকেন। এই সব ব্যক্তিগণ তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং, শিশুর কাছে প্রাকৃতিক পরিবেশও (Physical environment) যেমন নতুন, এই মনুষ্য-পরিবেশও (Human environment) নতুন। জীবনধারণের জন্য তাকে এই পরিবেশের সঙ্গেও অভিযোজন করতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এই যে মনুষ্য-পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করছে, তাকেই বলা হয় সামাজিক অভিযোজন (Social adjustment)। জৈবিক অভিযোজন যেমন জীবনী শক্তিকে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন সামাজিক অভিযোজনও তেমনি দলবদ্ধভাবে বসবাস করার জন্য প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই অভিযোজনে সহায়তা করে সমাজের কৃষ্টিমূলক উপাদানগুলি (Cultural) elements)। কৃষ্টি হ'ল সঞ্চালনযোগ্য সকলরকম সামাজিক উত্তরাধিকারের সমষ্টি (Some total of social heritage) অর্থাৎ, কৃষ্টিমূলক উপাদানগুলি সমাজের মধ্যে সৃষ্ট এবং উপযুক্ত মানবীয় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় সঞ্চালনযোগ্য। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ব্যক্তির সামাজিক জীবন সর্বতোভাবে তার সমাজকৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিংস্‌লে ডেভিস্ (Kingsley Davis) বলেছেন,

অভিযোজন ও কৃষ্টিমূলক উপাদান

"Man's social life is governed by his culture." শিশু জন্মের পর থেকে সমাজের এই কৃষ্টিমূলক উপাদানগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এবং তাদেরই নিয়ন্ত্রণে সে সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করে। অর্থাৎ, সমাজের কৃষ্টিমূলক উপাদানগুলি শিশুর সামাজিকীকরণে বা সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করে থাকে। এই কারণে, সামাজিক অভিযোজনের সমস্যার সঙ্গে কৃষ্টিমূলক উপাদানগুলিকে একত্রে বিচার করা হয়।

ব্যক্তি-জীবনে সামাজিক অভিযোজন (Social adjustment) বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন আকারে সংঘটিত হ'য়ে থাকে। ব্যক্তি-জীবনের এই সামাজিক অভিযোজনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে অধ্যাপক ব্রাউন (F. J. Brown) অভিযোজন প্রক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—(১) ধনাত্মক অভিযোজন (Positive adjustment), (২) নিষ্ক্রিয় অভিযোজন (Passive adjustment) এবং (৩) ঋণাত্মক অভিযোজন (Negative adjustment)। শিশু জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন একক সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে আচরণ সম্পাদন করে। এবং সেই আচরণকে পুনরাবৃত্তির দ্বারা স্থায়ী করে। একই বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে একই অর্থ বা তাৎপর্য, সংযোগ (Meaning, signifiance, association) বা সামাজিক সম্পর্ক (Social relation) বারবার স্থাপন করে শিশুরা সামাজিক প্রতিক্রিয়া (Social reaction) সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে, অনুবর্তনের (Conditioning) নিয়মে ঐ প্রতিক্রিয়াগুলি স্থায়িত্ব লাভ করে। এইভাবে, সে সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সেগুলিকে ভালবাসতে শেখে। এই জাতীয় সামাজিক অভিযোজনকে বলা হয় **ধনাত্মক অভিযোজন** (Positive adjustment)। **দ্বিতীয়তঃ,** সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করতে করতে শিশু তার অবচেতন মনে (Unconscious mind) সামাজিক কৃষ্টিমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে অবচেতন অনুকরণের (unconscious imitation) মাধ্যমে শিশু কৃষ্টিমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে। এই ধরনের সামাজিক অভিযোজনকে **নিষ্ক্রিয় অভিযোজন** (Passive adjustment) বলা হয়। নিষ্ক্রিয় অভিযোজনের দরুন শিশুরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সেগুলি এত শক্তিসম্পন্ন যে, তাদেরকে পরবর্তীকালে ব্যক্তিজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তৃতীয়ত, অনেক সময় সমাজ-জীবনের প্রয়োজনে ব্যক্তিকে তার পুরাতন সামাজিক অভ্যাস (Social habit) ত্যাগ করতে হয়। যখন, ব্যক্তি জীবিকা-অর্জনের তাগিদে বা অন্য কোন বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য, নির্দিষ্ট কৃষ্টিসম্পন্ন নিজস্ব গোষ্ঠী (Cultural group) থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে অন্য কৃষ্টিসম্পন্ন গোষ্ঠীতে বসবাস করতে বাধ্য হয়, তখন, তাকে কিছু কিছু পূর্বলব্ধ সামাজিক আচরণ বর্জন ক'রে নতুন আচরণ গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে কৃষ্টিমূলক উপাদান-বর্জনের মাধ্যমে অভিযোজন-প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই জাতীয় সামাজিক অভিযোজনকে বলা হয় **ঋণাত্মক অভিযোজন** (Negative adjustment)।

অভিযোজনের প্রকৃতি

সার্থকভাবে সমাজ-জীবনে বসবাস করতে হ'লে এই তিন ধরনের অভিযোজন করার ক্ষমতা ব্যক্তিকে অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ, ব্যক্তিকে উপযুক্ত সামাজিক

প্রতিক্রিয়াগুলি আয়ত্ত করতে হবে ; তাকে সামাজিক কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাভাবাপন্ন হ'তে হবে এবং তার ব্যক্তিত্বের সংগঠন এমন নমনীয় উপাদান দিয়ে তৈরি করতে হবে যার দ্বারা সে গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে নতুন সামাজিক পরিবেশে অভিযোজন করে জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে। এইসব দিকে শিক্ষাই তাকে সাহায্য করতে পারে। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষাকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই আধুনিক কালে শিক্ষামূলক সমাজবিদ্যায় (Educational Sociology) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। শিক্ষা যদি ব্যক্তিকে তার সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করতে না পাবে, তাহ'লে সে শিক্ষার কোন মূল্য নেই। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (মুদালিয়ার কমিশন) তাঁদের প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"No education is worth the name which does not inculcate the qualities necessary for living graciously, harmoniously and effectively with one's fellow men." ব্যক্তিকে তার সামাজিক অভিযোজনের প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে হলে আদর্শ শিক্ষ-পরিকল্পনার প্রয়োজন, এই মূল কথা আধুনিক সকল শিক্ষাবিদ্‌ই স্বীকার করেন।

মন্তব্য

।। সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক অভিযোজনের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা ।।
Educational Plan for Social and Cultural Adjustment

শিশু সামাজিক অভিযোজনের সহায়ক শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করতে হ'লে তিনটি দিকের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সামাজিক অভিযোজন তিনভাবে সংঘটিত হয়। ঐ তিন ধরনের অভিযোজন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা যায়, সেই উপযোগী তিন ধরনের কার্যক্রম শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে (১) এমন কতকগুলি কাজের ব্যবস্থা করতে হবে যার দ্বারা শিশু প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিশিষ্ট সামাজিক আচরণ আয়ত্ত করতে পারে ; (২) এমন পরিবেশ রচনা করতে হবে যাতে অবচেতন মনে তাকে প্রভাবিত করা যায়, এবং (৩) এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যার দ্বারা তার চারিত্রিক নমনীয়তা আনা যায়। এমন দেখা যাক, এই শিক্ষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের কর্মসূচী কি ধরনের হবে।

প্রথমতঃ, শিক্ষাকে শিশুর সামাজিক অভিযোজনমুখী করতে হ'লে এমন কতকগুলি কার্যসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাদের মাধ্যমে সে প্রয়োজনীয় সামাজিক আচরণগুলি আয়ত্ত করতে পারে। এই প্রয়োজনীয় সামাজিক আচারণগুলি কি ? সমাজ-জীবনে সার্থকভাবে বসবাস করতে হ'লে সবচেয়ে বেশী যেগুলি প্রয়োজন, সেগুলি হ'ল সহযোগিতামূলক মনোভাব, দলের প্রতি আনুগত্য এবং সমাজ-পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ক্ষমতা। শিক্ষার দ্বারা নিম্নলিখিত উপায়ে শিক্ষার্থীকে ঐ আচরণগুলি সম্পাদনের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়।

[এক] শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান বা উপদেশের মাধ্যমে গড়ে তোলা যায় না। এই ধরনের মনোভাব গড়ে তুলতে হ'লে তাদের প্রত্যক্ষভাবে জীবন-অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে হবে এবং জীবন-পরিস্থিতিতে আচরণ-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে-মিশে পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করার ক্ষমতা-অর্জন চর্চাসাপেক্ষ। তাই শিক্ষালয়ে, শিক্ষার্থীরা যাতে এই ধরনের কাজ করার সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যে সব বৌদ্ধিক ও কায়িক শ্রমসাপেক্ষ কাজ পরিচালনা করা হয়, শিক্ষার্থীরা সেই সব কাজে যাতে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক-একটি ছোট ছোট দল গঠন ক'রে তাদের ওপর যদি বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহ'লে শিক্ষার্থীরা দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলে। এই সব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অক্ষম বা অপেক্ষাকৃত স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অন্যান্য উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অনেক বেশী পরিমাণে আত্মবিশ্বাসী হ'য়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমানে নানা ধরনের শিক্ষণ-পদ্ধতির (Teaching method) ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখার দরকার সহযোগিতামূলক মনোভাব শুধুমাত্র কার্য-পরিচলনার রীতি পরিবর্তন করে আনা যায় না। শিক্ষকবেও কর্মপরিস্থিতিতে সহযোগিতামূলক মনোভাব দেখাতে হবে; তবেই শিক্ষার্থীরা এবিষয়ে অনুপ্রাণিত হবে। এই মনোভাব উপযুক্ত শিক্ষা-পরিচালনার দ্বারা একবার গঠন করতে পারলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সামাজিক অভিযোজনের পথ সুগম হবে।

সহযোগিতামূলক মনো-ভাবের বিকাশ

[দুই] বিদ্যালয়ে উপযুক্ত সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা ক'রে শিক্ষার্থীদের সামাজিক অভিযোজনের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা যায়। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে, তাই সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular activities) বা শ্রেণীকক্ষ-বহির্ভূত শিক্ষামূলক কার্যাবলীর (Off-the-class activities) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এন. সি সি. (N. C. C.), এ সি সি. (A. C. C), স্কাউট (Scout), জাতীয় সেবা-প্রকল্প (N. S. S.) ইত্যাদি কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে তাদের সামাজিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং তারা সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হয়। এই জাতীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গোষ্ঠীজীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারে এবং প্রত্যক্ষ পরিস্থিতিতে কিভাবে সঠিক আচরণ সম্পাদন ক'রে অভিযোজন করতে হয়, তার অভিজ্ঞতাও তারা লাভ করে। এই ধরনের বিভিন্ন যৌথ কর্মসূচী, শিক্ষার্থীদের নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলে এবং সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ সমাজসেবামূলক কর্মে নিযুক্ত হ'য়ে নাগরিক দায়িত্ব-পালনের প্রশিক্ষণও লাভ করে। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনে বাস্তব পরিস্থিতিতে সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করে।

যৌথ-কর্মপ্রচেষ্টা

[তিন] শিক্ষার্থীকে সামাজিক অভিযোজনের প্রশিক্ষণ দিতে হ'লে তাদের

সমাজ-পরিবেশে বসবাসের সুযোগ ক'রে দিতে হবে। আজ যারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে, ভবিষ্যতে তারা স্বাধীন নাগরিক জীবনে, সমাজ-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে সুষ্ঠু সমাজ-পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে পারে, এবং তারা যাতে ঐ পরিস্থিতিতে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে, তার জন্য তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণ যদি সমাজ-অনুকূল পরিবেশের মধ্যে দিতে হয়, তাহ'লে বিদ্যালয়গুলিকে সমাজ-অনুরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত করতে হবে। এই জন্য বিদ্যালয়-প্রশাসন ব্যবস্থার অনুরূপ স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা (self government) প্রবর্তন করতে হবে। বিদ্যালয় স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে শিক্ষার্থী'রা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংস্থা পরিচালন প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করবে। তাছাড়া, এইরূপ কাজে সফলভাবে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে তাদের যে আচরণ সম্পাদন করতে হবে এবং যে ধরনের অভিযোজনমূলক প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে, তা ভবিষ্যৎ জীবনে কার্যকরী হবে।

স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থী'দের সামাজিক অভিযোজনের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে হ'লে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যার প্রভাবে শিক্ষার্থী'রা অবচেতন মনে কতকগুলি আচরণগত অভ্যাস ও মনোভাব গঠন করতে পারে এই উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—

[চার] শিক্ষার্থী'র সামাজিক অভিযোজন-সহায়ক আচরণ আয়ত্তীকরণে সহায়তা করতে হলে, তাদের মধ্যে গোষ্ঠী-চেতনা জাগ্রত করতে হবে। এই গোষ্ঠী-চেতনা থেকেই জন্ম নেবে কতকগুলি মূল্যবোধ (value)। শিক্ষার্থী'দের মধ্যে গোষ্ঠী-চেতনা আসবে গোষ্ঠী-জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকে। এই অভিজ্ঞতা দু'ভাবে দেওয়া যায়।

প্রথমতঃ, পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের মাধ্যমে ; **দ্বিতীয়তঃ**, প্রত্যক্ষ পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। এই উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রম রচনার সময় বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন। পাঠ্যসূচীর মধ্যে এমন সব বিষয় ও আলোচ্য বস্তু রাখতে হবে, যেগুলি শিক্ষার্থী'দেরকে গোষ্ঠী-জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে এবং যেগুলি পাঠ করলে তাদের সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। অর্থাৎ, বিষয় পাঠ করলে, সেই সংক্রান্ত জ্ঞান যাতে তাদের অবচেতন-মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়তঃ, আমাদের স্মরণ রাখার দরকার, উপযুক্ত মনোভাব গঠন এবং শিক্ষার্থী'দের দৃষ্টিভঙ্গীর স্থায়ী পরিবর্তন কেবলমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারা সব সময় সম্ভব নয়। এই কারণে, তাদের সামনে উদাহরণ স্থাপন করা একান্তভাবে প্রয়োজন। যে মূল্যবোধগুলি আমরা শিক্ষার্থী'দের মধ্যে জাগ্রত করতে চাই, সেগুলি শিক্ষার্থী'রা যাতে বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ করতে পারে, এবং অনুকরণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী'রা শিক্ষকের আচরণই খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করে। তাই শিক্ষকের আচরণ হবে, তার কাছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যেগুলি সে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুকরণ করবে। সুতরাং, শিক্ষার দ্বারা শিশুদের সামাজিক মূল্যবোধ

সামাজিক মূল্যবোধ

জাগ্রত ক'রে অভিযোজন-প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে হলে, পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষকের আচরণ উভয়কে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

[পাঁচ] সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা যদি শৈশবে করতে পারে, তাহ'লে ভবিষ্যতে তাদের সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক অভিযোজন সহজ হয়।

উৎসব-পালন

শিক্ষার্থীদের এই সকল আচরণগুলির সঙ্গে পরিচিত করতে হ'লে শিক্ষালয়ে ঐগুলির অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনার সময় এইগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া যায়। এই সব উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি যাতে সর্বাঙ্গীণ মার্জিত রুচির পরিচায়ক হয়, সেদিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তার পরোক্ষ প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপর এসে পড়ে।

[ছয়] সমাজ পরিবর্তনশীল। জীবনে সার্থকভাবে অভিযোজন করার অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের দিতে না পারলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তাই শিক্ষার্থীদের সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করতে হ'লে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এই পরিকল্পনায় কাজ করলে শিক্ষার্থীরা সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবে এবং সমাজ-পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের আচরণকে

বিদ্যালয়-সমাজ সম্পর্ক

নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে শিক্ষকের নির্দেশনায়। বিদ্যালয় যদি সমাজ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপনে ব্যর্থ হয়, তবে শিক্ষার্থীরা বর্তমান সমাজ-জীবনের ধারা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকবে। এই অজ্ঞতা সুস্থ সামাজিক অভিযোজনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, তাই সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করার জন্য মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের সমাজের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে, তারা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করবে। এই ধরনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে সমাজের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করা যাবে।

তৃতীয়তঃ, সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করতে হ'লে, শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক নমনীয়তা আনতে হবে। আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থায়, কোন ব্যক্তি নির্দিষ্টভাবে একই গোষ্ঠী-জীবনের মধ্যে বাস করতে পারবে, এ কথা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। জীবিকার জন্য তাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে হবে ; একটি কৃষ্টিমূলক গোষ্ঠীতে গিয়ে বসবাস করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে মিশ্র কৃষ্টিমূলক গোষ্ঠীতেও (Mixed cultural group) তাকে বসবাস করতে হয়। তাই এরূপ পরিস্থিতিতে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে, সেদিকেও শিক্ষাকে নজর দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে।

[সাত] কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিকে তার সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করে থাকে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সার্বজনীন। এগুলির দ্বারা ব্যক্তি যে কোন কৃষ্টিমূলক পরিবেশে অভিযোজন করতে পারে। যেমন।—আত্মবিশ্বাস,

চারিত্রিক প্রশিক্ষণ

সহনশীলতা, সাহসিকতা, দায়িত্ববোধ, সামাজিকতা (Sociability), কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদির মত চারিত্রিক উপাদানগুলি ব্যক্তিকে সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করে। তাই শিক্ষাকে সামাজিক অভিযোজনমুখী

করতে হ'লে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে এবং এই দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

[আট] উপযুক্ত চিন্তা ও বিচার শক্তির বিকাশ ব্যক্তির সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি যে-কোন সামাজিক ঘটনাকে যথাযথ যুক্তির বিচার ক'রে তার মূল্যায়ন করতে পারে, তাহ'লে কোন রকম সামাজিক বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকে না। তাই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিচারক্ষমতা ও স্বাধীন নিরপেক্ষ চিন্তন-ক্ষমতার বিকাশ সাধন করতে হবে। বর্তমান সমাজের বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্যাগুলি নিয়ে যদি ছাত্রদের মাঝে মাঝে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহ'লে তাদের এইরূপ নিরপেক্ষ বিচার ও চিন্তন-ক্ষমতার বিকাশ হয়। বিদ্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করলে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পায় এবং পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগও পায়। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীরা অন্যের মতামত সহনশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করতেও শেখে।

চিন্তা ও বিচার শক্তির বিকাশ

[নয়] যেহেতু ব্যক্তির ভবিষ্যৎ সামাজিক জীবন তার বৃত্তি-নিযুক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেহেতু সামাজিক অভিযোজন করতে হ'লে ঐ সম্ভাব্য পরিস্থিতিগুলি সম্পর্কে তার পূর্ব পরিস্থিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তি যদি পূর্বে জানতে পারে, তাকে কিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হবে এবং সেখানে কিরূপ আচরণ সম্পাদন করতে হবে, তাহ'লে তার অনেকখানি মানসিক প্রস্তুতি (Mental readiness) থাকে। এই মানসিক প্রস্তুতি তার অভিযোজনে সহায়তা করে। শিক্ষা, ব্যক্তিকে উপযুক্ত বৃত্তিমূলক জ্ঞান ও তথ্য পরিবেশন ক'রে তার সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করতে পারে। অর্থাৎ, সামাজিক কৃষ্টিমূলক অভিযোজনের জন্য শিক্ষায়, শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক জ্ঞান-সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ে অতিথি হিসাবে এনে, শিক্ষার্থীদের ঐ সব বৃত্তি-সংক্রান্ত পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান পরিবেশন করানো যায়। এতে একদিকে শিক্ষার্থীদের যেমন বৃত্তিমুখী আগ্রহ সৃষ্ট হয়, তেমনি অন্যদিকে তাদের মধ্যে অভিযোজনমুখী প্রস্তুতি গঠন করা যায়।

বৃত্তিমূলক জ্ঞান

॥ আলোচনা ॥

ব্যক্তি-জীবনের সুষম বিকাশের জন্য সার্থক অভিযোজন প্রয়োজন। এই অভিযোজন বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যেমন হওয়ার দরকার, তেমনি সামাজিক পরিবেশের সঙ্গেও বাঞ্ছনীয়। সামাজিক অভিযোজন ও প্রাকৃতিক অভিযোজন পরস্পর-বিরোধী ধারণা নয়। যে কৌশলগুলির দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করা যায়, তার সবগুলির না হ'লেও কতকগুলিকে সামাজিক অভিযোজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এইসব সাধারণ কৌশলের মধ্যে শিক্ষা (Education) হ'ল একটি। শিক্ষাকে সামাজিক অভিযোজনের সহায়ক প্রক্রিয়া হিসেবে কার্যকরী করে তুলতে হ'লে,

পূর্বোক্ত বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী বিদ্যালয়ে গ্রহণ করতে হবে। তবে একথা স্মরণ রাখার প্রয়োজন অভিযোজন মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা (Personal problem)। যে কোন পরিস্থিতি ব্যক্তি যেভাবে প্রত্যক্ষ করে, সেই ভাবে সে অভিযোজন করে ; যে চাহিদা তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই চাহিদাই তার অভিযোজনমূলক আচরণের প্রকৃতিও নির্ধারণ ক'রে দেয়। সুতরাং, আমরা এখানে অভিযোজনকে একটি সাধারণ সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করে যে শিক্ষা-পরিকল্পনার উল্লেখ করলাম, তা সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, একথা বললে ভুল হবে। তাই সামাজিক অভিযোজনের প্রকৃতি কেবলমাত্র সচেতন শিক্ষক, বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ মুহূর্তে তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারেন। সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক অভিযোজনের জন্য শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট স্থায়ীরূপ দান করা অবাস্তব।

সারসংক্ষেপ

শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করা। সামাজিক বিকাশ হয় সার্থক সামাজিক অভিযোজনের মাধ্যমে। সামাজিক অভিযোজনের সঙ্গে কৃষ্টিমূলক উপাদানগুলি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। কৃষ্টিমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি যে প্রভাব শিশুর ওপর বিস্তার করে তার দ্বারা সামাজিক অভিযোজনের পথ সুগম হয়।

সামাজিক অভিযোজন তিন ধরনের হতে পারে—ধনাত্মক নিষ্ক্রিয় ও ঋণাত্মক। শিক্ষার দ্বারা অভিযোজন-প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে হ'লে, তার এই তিনটি দিকের কথা চিন্তা করতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষা-পরিকল্পনা এমন ভাবে রচনা করতে হবে, যাতে তার প্রভাবে (১) শিক্ষার্থীরা কতকগুলি সামাজিক [illegible] গ্রহণ করতে [illegible] (ধনাত্মক অভিযোজন) (২) শিক্ষার্থীদের অবচেতন-মনে প্রভাব বিস্তার করে [illegible] মনোভাব গড়ে তোলা যায় (নিষ্ক্রিয় অভিযোজন) এবং (৩) শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক নমনীয়তা সৃষ্টি করে কৃষ্টিমূলক উপাদান বর্জন ও গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলা যায় (ঋণাত্মক অভিযোজন)।

এই উদ্দেশ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকে পরিচালিত করতে হ'লে বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে- (১) সহযোগিতামূলক মনোভাবের বিকাশের চেষ্টা (২) যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার ব্যবস্থা, (৩) স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন, (৪) চারিত্রিক প্রশিক্ষণ, (৫) চিন্তন ও বিচারকরণের ক্ষমতার বিকাশ (৬) সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা, (৭) কৃষ্টির উপলব্ধি বৃদ্ধির কর্মসূচী, (৮) বিদ্যালয়-সমাজে নিবিড় সম্পর্কস্থাপন এবং (৯) বৃত্তিমূলক জ্ঞান ও পরামর্শ।

সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক অভিযোজনের জন্য শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট স্থায়ী পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ, ব্যক্তিভেদে অভিযোজন-সমস্যা ভিন্ন ধরনের, তাই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে একটি সাধারণ অবস্থার কথা বিবেচনা করা হ'য়েছে মাত্র।

প্রশ্নাবলী

1 **Write an essay on "Education for Social and Cultural Adjustment"**
["সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক অভিযোজনের জন্য শিক্ষা—এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।]

2 **What is meant by social adjustment ? How is it related to cultural elements ? Draw up a scheme of education for enhancing the process of social adjustment of the pupil.**
[সামাজিক অভিযোজন বলতে কি বোঝায় ? সামাজিক অভিযোজনের সঙ্গে কৃষ্টিমূলক উপাদানের সম্পর্ক কি ? শিক্ষার্থীর সামাজিক অভিযোজনে সহায়ক একটি শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা কর।]

3. **Education is the process of social development. How this process of social development can be effected ?**
['শিক্ষা হ'ল সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়া'—এই সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে কিভাবে কার্যকরী করা যায় ?

4. **Write notes on** (টীকা লেখ) :
   (a) **Education & Social adjustment**
   [শিক্ষা ও সামাজিক অভিযোজন]
   (b) **Education for Social adjustment**
   [সামাজিক অভিযোজনের জন্য শিক্ষা]

তিন

শিক্ষামূলক প্রবন্ধ

উৎপাদনশীলতার জন্য শিক্ষা

[Education for Productivity]

আমরা ইতিপূর্বে শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্য (vocational aim of education) নীতি (Principle of activity), কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity Curriculum) ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এগুলির প্রত্যেকটি আধুনিক শিক্ষার এক-একটি নীতি। আধুনিক কালে, প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ এই সকল নীতিগুলির সুবিধার কথা স্বীকার করেছেন, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। অন্য দিকে আমরা আধুনিক শিক্ষার তাৎপর্য ও কাজের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছি, শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process) এবং তার কাজ হ'ল সামাজিক বিবর্তন বা পরিবর্তনে সহায়তা করা। সামাজিক এই পরিবর্তন অনেকাংশে নির্ভর করে সমাজের অর্থনীতির ওপর। অর্থনৈতিক পরিবর্তন মানুষের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যেও পরিবর্তন আনে। সমাজের এই অর্থনৈতিক বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভর করে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণের ওপর। তাই ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন সংযুক্ত। শিক্ষাকে যদি সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহ'লে সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হ'লে, তাকে উৎপাদনের (Production) সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করবো।

প্রস্তাবনা

আদিম যুগে মানুষ নিজের জীবনধারণের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতো। সে কাঁচা মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো, সস্থান হিসেবে গুহা ব্যবহার এবং পরিধেয় হিসেবে ব্যবহার করতো গাছের বাকল। অর্থাৎ, প্রকৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে যা দিত, তাই দিয়েই সে জীবন ধারণ করতো। কিন্তু ধীরে ধীরে তার জীবনযাত্রার পরিবর্তন হতে লাগলো। জীবনের মান উন্নত হ'ল। তার ফলে দেখা গেল, সে প্রাকৃতিক কাঁচা মালকে (Raw material) কাজে লাগিয়ে ব্যবহারের জন্য নতুন নতুন সামগ্রী তৈরি করছে। যেমন, খাদ্যের কথা ভাবা যাক্, এখন সে প্রাকৃতিক বস্তুকে বিভিন্ন কৌশলে রান্না করে গ্রহণ করে। বসবাসের জন্য আরামপ্রদ গৃহ নির্মাণ করে; পরিধানের জন্য নানা ধরনের তন্তু দিয়ে বস্ত্র বয়ন করে। এমনি ভাবে জীবনের মানবৃদ্ধির চাহিদায় মানুষ নিজের বিচার ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক সামগ্রী থেকে নতুন নতুন দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করতে লাগলো। একেই বলে উৎপাদন। অর্থাৎ কাঁচা মাল, অর্থ ও শ্রমবিনিয়োগ ক'রে যে সামগ্রী প্রস্তুত হ'চ্ছে, তাকেই বলা হ'চ্ছে উৎপাদন। যে কৌশলে মানুষ এই উৎপাদনক্রিয়া সম্পন্ন

উৎপাদনশীলতা

করে, তাকে বলা হয় **উৎপাদনশীলতা** (Productivity)। বর্তমানে যে কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের গুরুত্ব নির্ধারিত হয় তার উৎপাদন-ক্ষমতার দ্বারা। যে রাষ্ট্র যত বেশী পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করতে পারে, সে তত উন্নত এবং বিশ্ব-সমাজে তার গুরুত্ব তত বেশী। তাই উৎপাদনশীলতা রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সূচক। প্রসঙ্গক্রমে, এ কথাও স্মরণ রাখাব দরকার, কোন রাষ্ট্রই বর্তমানে তার সমগ্র উৎপাদনকে প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের ভরণপোষণের জন্য ব্যবহার করে না। উৎপাদনের কিছু অংশ পরোক্ষভাবে অন্যান্য উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজেও ব্যবহার করা হয় বা নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যবহার কবা হয়। অর্থাৎ, উৎপাদন রাষ্ট্রের বা সমাজের সামগ্রিক উন্নতিতে সহায়তা ক'রে থাকে।

উৎপাদনের এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলা যায় শিক্ষাও এক ধরনের উৎপাদনশীল সংস্থা। কারণ, বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশে শিক্ষার জন্য অর্থ ও শ্রম উভয়ই বিনিয়োগ করা হয়, এর মধ্য দিয়ে আদর্শ ভবিষ্যৎ নাগরিকরা উৎপাদিত হয়। শিক্ষার এই তাৎপর্য চিন্তাবিদ্ ও রাষ্ট্র-নায়কদের কাছে সমস্যারও সৃষ্টি করেছে। কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজ বা রাষ্ট্র যে অর্থ বিনিয়োগ করছে, তার থেকে প্রত্যক্ষভাবে কোন লাভ বা মুনাফা পাচ্ছে না। ফলে, রাষ্ট্রের কাছে শিক্ষা একটা বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আর্থিক উন্নয়নমূলক সংস্থা থেকে অর্থবরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষা-খাতে ব্যয় কবতে হ'চ্ছে। অনেকের ধারণা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগ জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যুক্তির মধ্যে বাস্তব সভ্যতা থাকলেও, এ কথা স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় না যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ বন্ধ ক'রে সব অর্থ কারিগরী বা অন্যান্য অর্থকরী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হোক। তাই আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌গণ, এই বাস্তব সমস্যার, যাকে বলা হয় 'শিক্ষার অর্থনীতি' (Economics of education), সমাধান করার জন্য বিকল্প পন্থার কথা চিন্তা করেছেন। তাঁরা বলেছেন শিক্ষার অর্থনীতিকে দু'দিক্ থেকে চিন্তা করতে হবে। প্রথমতঃ, শিক্ষা-শিল্প থেকে যে বস্তু উৎপাদিত হ'চ্ছে তাকে আর্থিক মূল্যে বিচার করলে চলবে না, তার প্রকৃত মূল্যায়ন হবে গুণগত দিক্ থেকে। অর্থাৎ, শিক্ষা নাগরিকদের যে গুণগত পরিবর্তন করবে, তা সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র বা সমাজের মূল্যমান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। **দ্বিতীয়তঃ,** শিক্ষা প্রত্যেক নাগরিকের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ক'রে জাতীয় উৎপাদন-বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। সুতরাং, এই দিক্ থেকে বিচার করলে বলা যায়, শিক্ষার অর্থনীতি (Economics of education) সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির পরিপন্থী নয়। তবে, শিক্ষার এই তাৎপর্যকে কার্যকরী করে তুলতে হ'লে, শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে।

শিক্ষা-অর্থনীতি

মন্তব্য

।। শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতা ।।
(Education & Productivity)

এ কথা সত্য, দেশের সকল নাগরিকের সুষ্ঠু শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন কোন রাষ্ট্রের পক্ষে তা সরাসরি ব্যয় করা সম্ভব নয়, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে তো কোনমতেই সম্ভব নয়। গান্ধীজী আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে বলেছিলেন—"As a nation we are so backward in education that we cannot hope to fulfil our obligations to the nation in this respect, in a given time, during this generation, if the programme is to depend on money. If education is made free and universal, I fancy that even under an ideal system of Government, we shall not be able to get crores of rupees which one should require for finding education of all the children of school going age.", এই সমস্যার বাস্তব সমাধানের জন্য গান্ধীজি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষাই শিক্ষার খরচ যোগাতে পারে এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি উৎপাদনমূলক কাজ (Productive work) করার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকে সক্রিয়তাভিত্তিক করা হয়েছিল। গান্ধীজির এই মূল নীতি বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই গ্রহণযোগ্য হ'য়েছে এবং সব দেশেই শিক্ষাকে জাতীয় উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হ'য়েছে। শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ককে বর্তমানে বৃত্তীয় (circular) ক্রমে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। এই তাৎপর্য অনুযায়ী, শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় উৎপাদন বা আয়বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে ; আবার জাতীয় আয়বৃদ্ধি হ'লে শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন (Indian Education Commission—Kothari) বলেছেন,—"Education and productivity can thus constitute a rising spiral whose different parts sustain and support one another". অর্থাৎ, শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতা উভয়ে মিলে একটি প্যাঁচানো স্তম্ভ রচনা করে, যার প্রত্যেকটি অংশ অপর অংশকে অবলম্বন যোগাচ্ছে। সুতরাং, শিক্ষার জন্য উৎপাদন দরকার এবং উৎপাদনের জন্যও শিক্ষার দরকার।

শিক্ষা ও উপাদান

শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত করলে নানা দিক্ থেকে সুবিধা পাওয়া যায়। এই সম্পর্ক যেহেতু পরস্পর নির্ভরশীলতার, সেহেতু উভয় প্রক্রিয়াই এই সম্পর্কের দ্বারা উপকৃত হয়। শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত করলে, শিক্ষা-প্রক্রিয়া যে সব দিক থেকে উপকৃত হয়, সেগুলি হল—

শিক্ষার ওপর উৎপাদনের প্রভাব

[এক] শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের কাজ সহজ হয় ; উৎপাদনভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার

লক্ষ্যকে বস্তুধর্মী ক'রে তোলে ; ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েরই কাজ করার সুবিধা হয়।

[দুই] শিক্ষাকে উৎপাদনভিত্তিক করলে শিক্ষণ-পদ্ধতি (Teaching method) অপেক্ষাকৃত বস্তুধর্মী হয়। কারণ, উৎপাদনভিত্তিক শিক্ষায় জ্ঞানমূলক পাঠের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

[তিন] শিক্ষাকে উৎপাদনভিত্তিক করলে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলা যায়। ফলে, শিক্ষার্থীদের প্রেরণা ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য অতিরিক্ত বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করতে হয় না।

[চার] শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত করলে শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়। এর ফলে, শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনে জীবিকা-অর্জনের উপযোগী হ'য়ে গড়ে উঠতে পারে। তাদের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আসে।

[পাঁচ] উৎপাদনমুখী শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে। যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থীদের উৎপাদনশীল কাজ করতে হ'য়, সেই পরিবেশের প্রভাবে নানা ধরনের সামাজিক গুণ তাদের মধ্যে বিকাশলাভ করে।

[ছয়] সবশেষে, শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনশীলতাকে সংযুক্ত করলে শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং সেই শিক্ষা জীবনমুখী বা জীবনকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে। আমরা জানি, এই জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষাই বর্তমানে কাম্য।

সমাজের ওপর প্রভাব

অপরদিকে, শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত করলে সমাজও উপকৃত হয়। উৎপাদনমুখী শিক্ষা, যে সব দিকে সমাজ বা রাষ্ট্রকে সহায়তা করে, সেগুলি হ'ল—

[এক] উৎপাদনমুখী শিক্ষা শিক্ষার আর্থিক ব্যয়ভার লাঘব করে। অর্থাৎ, শিক্ষার মাধ্যমে যে উৎপাদন হয়, তা শিক্ষা-পরিকল্পনা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সমাজ পুনরায় বিনিয়োগ করতে পারে। ফলে, সমাজের মধ্যে নাগরিকদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা যায়।

[দুই] উৎপাদনভিত্তিক শিক্ষা, জাতীয় আয় বা সামাজিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞানমুখী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতার প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের একটি বৃত্তিতে দক্ষতা-অর্জনে সহায়তা করে। ফলে, উন্নত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা পরবর্তী জীবনে সামাজিক উৎপাদনকে বৃদ্ধি করে।

[তিন] উৎপাদনমুখী শিক্ষা সমাজকে তার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ও উন্নতি সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলে এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা-রচনায় উৎসাহিত করে। এর ফলে সমাজপরিকল্পিত পথে বিকাশলাভের সুযোগ পায়। পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

[চার] উৎপাদনমুখী শিক্ষা সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে

সমাজিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে সহায়তা করে। শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা যখন সমবেতভাবে কাজ করে, তখন তাদের মধ্যে বৃহত্তর সমাজের আরোপিত যে বিভেদ তা দূর হয়। প্রত্যেকেই অন্যদের সম্পর্কে সচেতন হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় কর্ম সম্পাদন ক'রে থাকে। ফলে, এই ব্যবস্থায় সামাজিক বন্ধন অনেক বেশী দৃঢ় করে তোলা যায়।

[পাঁচ] সবশেষে, শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনশীলতাকে সংযুক্ত করলে প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব ক্ষমতা এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়। এই সচেতনতা সমাজের মধ্যে শোষণকে বন্ধ ক'রে সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শ-স্থাপনে সহায়তা করে থাকে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতাকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করলে নানা দিক্ থেকে সুবিধা হয়। এই সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যক্তি-তান্ত্রিক লক্ষ্য ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা যায়। এখন, কি কি উপায় অবলম্বন করলে শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যোগ করা যায়, তাই হ'ল আমাদের কাছে প্রধান সমস্যা। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন (Indian Education Commission—Kothari) এ বিষয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। সেই সুপারিশগুলির কথা উল্লেখ করলে এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। কমিশন যে সুপারিশগুলির কথা বলেছেন, সেগুলি হ'ল—(১) বিজ্ঞানকে শিক্ষার ও কৃষ্টির অংশ হিসেবে গ্রহণ; (২) কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতাকে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিকরণ; (৩) মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখীকরণ এবং (৪) উন্নত স্তরে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার উন্নয়ন ও গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণ। এখন, এই দিকগুলি সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা যাক্।

শিক্ষাকে উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্তির উপায়

[এক] আধুনিক ও প্রাচীন সমাজের মধ্যে পার্থক্য হ'ল—আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগে কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদন-কৌশলকে উন্নত করেছে। গতানুগতিক প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদন (Production) ছিল মূলতঃ অবৈজ্ঞানিক। সেখানে উৎপাদনের জন্য বিশেষতঃ প্রচেষ্টা-ভুলের পদ্ধতি (Trial & Error) ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু আধুনিক সফল উন্নত দেশেই, উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক কৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান প্রয়োগ করা হ'চ্ছে। তাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যদি তাদের জীবিকার জন্য তৈরি করে দিতে হয়, তাহ'লে ঐ সব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার মৌলিক ধারণাগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটাতে হবে। যে মৌলিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে গ্রহণ করবে, তা তারা ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগিয়ে কর্মক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। সুতরাং, শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হ'লে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার করতে হবে।

বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার

[দুই] শিক্ষাকে যদি উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করতে হয়, তাহ'লে শিক্ষাক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা (work-experience) দিতে হবে।

ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন বলেছেন, আমাদের গতানুগতিক শিক্ষালয়গুলিতে বিশেষভাবে তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং গণিত ও বিজ্ঞানের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অথচ পরিপূর্ণ শিক্ষার বৌদ্ধিক জ্ঞান ছাড়াও কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা ও সমাজ-সেবামূলক অভিজ্ঞতা দেওয়া উচিত। শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক-কেন্দ্রিক বৌদ্ধিক জ্ঞান শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করে না। তাছাড়া, কেবলমাত্র বৌদ্ধিক জ্ঞান, শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। শিক্ষাকে সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হ'লে কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতাকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষা উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন আরও বলেছেন, প্রাচীনকালে শিশুরা পরিবারের মধ্যে বসবাস করতে করতে কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন করত ঠিকই, কিন্তু, তারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করত তা ছিল মূলতঃ অবৈজ্ঞানিক উৎপাদন-কৌশল। ফলে, ঐ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা সামাজিক বা জাতীয় উৎপাদন-বৃদ্ধিতে সহায়তা করত না। কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা, গতানুগতিক বৌদ্ধিক বা জ্ঞানমূলক শিক্ষার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকভিত্তিক কর্মসম্পাদনের অভিজ্ঞতার সমন্বয় ক'রে জাতীয় উৎপাদন-বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন এই কর্মসূচীর সুবিধার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—"It could contribute to the increasing of national productivity both by helping students to develop insights into productive processes and the use of science and by generating in them the habit of hard responsible work."

কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা

[তিন] শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করতে হ'লে, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার (Vocational education) ওপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ও উন্নত শিক্ষার স্তরেও প্রযুক্তিবিদ্যা ও কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি, কৃষিবিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা অনেক কম। তাছাড়া বর্তমানে আমাদের দেশে কারিগরী বিদ্যার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই উভয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ যাতে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ পায় এবং উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করতে পারে, সে অনুযায়ী শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষাকে জাতীয় উৎপাদনের সহায়ক করতে হ'লে উপযুক্ত সংখ্যক কৃষি-বিদ্যালয় ও কারিগরি প্রশিক্ষণের কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এইসব বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে বৃত্তিমূলক পাঠের অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া, শিক্ষার্থীরা যাতে এইসব বিদ্যালয়ে প্রয়োগমূলক বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। এই কাজ শুরু হবে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকে। তবেই শিক্ষার্থীরা পরবর্তী জীবনে, নিজ নিজ নির্বাচিত বৃত্তিতে সার্থকভাবে কর্মসম্পাদন করতে সক্ষম হবে এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সফল ক'রে তোলা যাবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

[চার] সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থা কখনই স্থিতিশীল থাকতে পারে না। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি হ'চ্ছে। বিজ্ঞানের এই দুই শাখার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদকের কৌশলও পরিবর্তিত হ'চ্ছে। জাতীয় স্বার্থে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়, তাহ'লে আমাদের উন্নততর উৎপাদন কৌশল (Better production technique) উদ্ভাবন করতে হবে। শিক্ষা যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা'হলে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তাই শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য উপযুক্ত গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থী'রা যদি উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎপাদন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার সুযোগ পায়, তাহ'লে এই কাজ সম্পাদনে তারা সক্ষম হবে।

গবেষণা

শিক্ষাকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করার জন্য যে কৌশল ও পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করা হ'ল, সেগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এর কোন একটি বাদ দিয়ে এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা যায় না। এই চারটি পরিকল্পনাকে বিচ্ছিন্ন পর্যায়ে কার্যকরী করতে পারলে শিক্ষা তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং জাতীয় উৎপাদন-বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে, আমাদের দেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করা হ'য়েছে। কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে গ্রহণ করা হ'য়েছে ; মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার ওপর পূর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ; উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হ'য়েছে। এইসব ব্যবস্থাগুলি কতটুকু কার্যকরী হয় এবং জাতীয় উৎপাদন-বৃদ্ধিতে কি পরিমাণে সাহায্য করতে পারে, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

মন্তব্য

সারসংক্ষেপ

সমাজের একটি প্রধান দায়িত্ব, নাগরিকদের জীবনযাপনের স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করা। এই স্বাচ্ছন্দ্য আনা সম্ভব জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি হ'তে পারে উৎপাদন বৃদ্ধি ক'রে। জাতীয় উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য অধিক শ্রম ও অর্থবিনিয়োগ করতে হবে। নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষাদানও সমাজের দায়িত্ব। শিক্ষার জন্যও আর্থিক বিনিয়োগ করতে হয়। কিন্তু, এই বিনিয়োগ থেকে প্রত্যক্ষভাবে কোন ফল পাওয়া যায় না। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কিভাবে শিক্ষার আর্থিক ব্যয় কমানো যায় ? এই সমস্যা-সমাধানের জন্য আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌গণ বলেছেন—শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করার তাৎপর্য হ'ল -শিক্ষা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি হ'লে শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অধিক অর্থ বিনিয়োগ ক'রে নাগরিকদের নৈতিক মান-উন্নয়নে সহায়তা করবে। বৃত্তাকারে এই পারস্পরিক সহযোগিতা চলতে থাকবে।

শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করলে, নানা দিক্ থেকে সুবিধা পাওয়া যাবে। প্রথমতঃ, শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যাবে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক উন্নতিতে সহায়তা করা যাবে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশেও সহায়তা করা যাবে। চতুর্থতঃ, এই ব্যবস্থায় সমাজও উপকৃত হবে।

শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত করার বিভিন্ন পন্থার মধ্যে চারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চারটি হ'ল—(১) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দান; (২) কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা গ্রহণের সুযোগ দান; (৩) মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (৪) বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার ব্যবস্থা করা।

প্রশ্নাবলী

1. **Write an essay on "Education for Productivity".**
   ["উৎপাদনশীলতার জন্য শিক্ষা"—বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।]
2. **What is meant by productivity ? Why is it necessary to relate education to productivity ?**
   [উৎপাদনশীলতা বলতে কি বোঝায় ? শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা কি ?]
3. **What is meant by education for productivity ? How education can be linked with productivity ?**
   ['উৎপাদনশীলতার জন্য শিক্ষা' বলতে কি বোঝায় ? শিক্ষাকে কিভাবে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় ?]
4. **Write notes on (টীকা লিখ) :**
   Education & Productivity [শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতা]

পরিশিষ্ট

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নাবলী
(Short answer type Questions)

শিক্ষার অর্থ ও তাৎপর্য ঃ

(১) সংকীর্ণ অর্থে 'শিক্ষা' বলতে কি বোঝায় ?
(২) ব্যাপক অর্থে 'শিক্ষা' কি ?
(৩) শিক্ষা-প্রক্রিয়ার দুটি মেরু কি কি ?
(৪) শিক্ষা মানুষের জৈবিক প্রয়োজন কিভাবে মেটায় ?
(৫) শিক্ষার সামাজিক উপযোগিতা কি ?
(৬) শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূল আলোচনার ক্ষেত্রগুলি কি ?
(৭) মানসিক শৃঙ্খলার ধারণা বলতে কি বোঝ ?
(৮) শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণাটি কি ?
(৯) সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত 'শিক্ষার' একটি সংজ্ঞা দাও।
(১০) ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত 'শিক্ষার' একটি উদাহরণ দাও।
(১১) সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত 'শিক্ষা' শব্দের পদ্ধতিগত পার্থক্য কি ?
(১২) 'Education' শব্দের কোন্ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বর্তমানে ব্যবহার করা হয় ?

শিক্ষার কাজ ঃ

(১) 'শিক্ষা গতীয় ধর্মীসম্পন্ন' বলতে কি বোঝায় ?
(২) শিক্ষা কিভাবে জীবন-বিকাশের গতি নির্ধারণ করে ?
(৩) শিক্ষার যে কোন দুটি বস্তুধর্মী কাজের উল্লেখ কর।
(৪) শিক্ষার ব্যক্তিকল্যাণমূলক কাজ বলতে কি বোঝ
(৫) শিক্ষার সমাজকল্যাণমূলক কাজ কি ?

শিক্ষার উপাদান ঃ

(১) শিশুকে শিক্ষার উপাদান বলা হয় কেন ?
(২) শিক্ষককে শিক্ষাব উপাদান বলা হয় কেন ?
(৩) পাঠ্যক্রমকে শিক্ষার উপাদান বলা হয় কেন ?
(৪) শিশু, শিক্ষক ও পাঠ্যক্রমের সম্পর্ক।
(৫) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে কি ধরনের পারস্পরিক ক্রিয়া হয় ?
(৬) শিক্ষালয়কে শিক্ষার উপাদান বলা হয় কেন ?

শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

(১) শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ধারণের প্রয়োজন কি ?
(২) শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তনশীল কেন ?
(৩) শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্যের অসুবিধাগুলি কি ?

(৪) শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্যের সুবিধাগুলি কি ?
(৫) শিক্ষার কোন কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে পারে না কেন ?
(৬) শিক্ষা ব্যক্তিকে কি ধরনের অভিযোজনে সহায়তা করে ?
(৭) শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের সপক্ষে দুটি যুক্তি দাও।
(৮) শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সপক্ষে দুটি যুক্তি দাও।
(৯) শিক্ষা ও জাতীয় উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক কি ?
(১০) শিক্ষা ও জাতীয় সংহতির মধ্যে সম্পর্ক কি ?
(১১) শিক্ষা ও আধুনিকতার মধ্যে কি সম্পর্ক হওয়া উচিত ?
(১২) শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকার দরকার কেন ?
(১৩) প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল ?
(১৪) শিক্ষার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য কি ?

শিক্ষা ও সমাজ ঃ

(১) সামাজিক প্রক্রিয়া কাকে বলে ?
(২) শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলার দুটি কারণ উল্লেখ কর।
(৩) শিক্ষাকে সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল বলা হয় কেন ?
(৪) শিক্ষার দ্বারা যে সামাজিক পরিবর্তন হয় তার দুটি ক্ষেত্র উল্লেখ কর।
(৫) দুটি সামাজিক প্রক্রিয়ার নাম উল্লেখ কর এবং প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপ কি ?
(৬) পারস্পরিক ক্রিয়া কি ?
(৭) সহাবস্থান কি ?

বংশগতি ও পরিবেশ ঃ

(১) মানুষের বংশগতি বলতে কি বোঝায় ?
(২) 'পরিবেশ' কথার তাৎপর্য কি ?
(৩) 'মানসিক বংশগতি' বলতে কি বোঝায় ?
(৪) 'সামাজিক বংশগতি' কথার তাৎপর্য কি ?
(৫) ব্যক্তির জীবনবিকাশে বংশগতির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য দুটি যুক্তি উপস্থাপন কর।
(৬) ব্যক্তির জীবনবিকাশে পরিবেশের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য দুটি যুক্তি উপস্থাপন কর।
(৭) বংশগতি নিয়ে গবেষণা করেছেন, এরকম দুজন বৈজ্ঞানিকের নাম কর।
(৮) পরিবেশের গুরুত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন, এরকম দু'জনের নাম কর।

শিক্ষার সংস্থা—১ ঃ

(১) শিক্ষালয় ছাড়া শিক্ষার কয়েকটি সংস্থার নাম উল্লেখ কর।
(২) আধুনিক অর্থে 'শিক্ষালয়ের' একটি সংজ্ঞা দাও।
(৩) শিক্ষালয়ের সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজ বলতে কি বোঝায় ?

(৪) শিক্ষালয়ের সংশোধনী কাজ বলতে কি বোঝায় ?
(৫) শিক্ষালয় কিভাবে সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়তা করে ?
(৬) 'শিক্ষালয় ও সমাজ পরস্পরের পরিপূরক' বলতে কি বোঝায় ?
(৭) শিক্ষালয়-জীবন ও সমাজ-জীবনের সাদৃশ্যের একটি দিক্ উল্লেখ কর।
(৮) 'সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ' বলতে কি বোঝায় ?
(৯) মালিকানার ভিত্তিতে আমাদের দেশে শিক্ষালয়গুলিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ?
(১০) শিক্ষালয়ের সংরক্ষণমূলক কাজটি কি ?
(১১) শিক্ষালয়ের শ্রেণী-বিভাজনের ভিত্তিগুলি কি ?
(১২) শিক্ষালয়ের সঞ্চালনমূলক কাজটি কি ?

শিক্ষার সংস্থা—২ :

(১) শিক্ষার কয়েকটি পরোক্ষ সংস্থার নাম উল্লেখ কর।
(২) পরিবারের শিক্ষামূলক কাজগুলি কি ?
(৩) শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের কোন্ ব্যক্তির ভূমিকা সবচেয়ে বেশী ?
(৪) শিক্ষক-অভিভাবক সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা কি ?
(৫) রাষ্ট্র যে সব শিক্ষামূলক দায়িত্ব পালন করে, তার যে কোন দুটি উল্লেখ কর।
(৬) শিক্ষালয় ছাড়া আর কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার মাধ্যম বলা যায় ?
(৭) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দুটি শিক্ষাগত উপযোগিতা উল্লেখ কর।
(৮) আধুনিক পরিবারের শিক্ষাগত অক্ষমতার দুটি কারণ বল।

শিক্ষার সংস্থা—৩ :

(১) শিক্ষার দুটি সক্রিয় সংস্থার নাম কর।
(২) শিক্ষার দায়িত্ব পালন করে এমন চারটি ক্লাবের ন. কর।
(৩) সংবাদপত্রকে শিক্ষার নিষ্ক্রিয় মাধ্যম বলা হয় কেন ?
(৪) সংবাদপত্র শিক্ষালয়ে রাখার প্রয়োজন কি ?
(৫) চলচ্চিত্রের দুটি খারাপ প্রভাবের উল্লেখ কর।
(৬) বেতার-পাঠের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা উল্লেখ কর।
(৭) বিদ্যালয়ে সংবাদপত্র রাখা উচিত কেন ?
(৮) চলচ্চিত্রের দুটি শিক্ষামূলক উপযোগিতার কথা উল্লেখ কর।

পাঠ্যক্রম :

(১) পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা কি ?
(২) আধুনিক অর্থে পাঠ্যক্রমের একটি সংজ্ঞা দাও।
(৩) পাঠ্যক্রম রচনার কয়েকটি রীতির কথা উল্লেখ কর।
(৪) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের দুটি অসুবিধার কথা উল্লেখ কর।

(৫) কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম কাকে বলে ?
(৬) কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের যে কোন দুটি সুবিধার কথা উল্লেখ কর।
(৭) পাঠ্যক্রম ও চাহিদার সম্পর্ক কি ?
(৮) উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ (S. U. P. W.) বলতে কি বোঝায় ?
(৯) বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বিষয়বস্তুকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ?
(১০) শিক্ষায় সক্রিয়াভিত্তিক পাঠ্যক্রম কাকে বলে ?
(১১) পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে অগ্রমুখিতার নীতি বলতে কি বোঝায় ?
(১২) পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যে পার্থক্য কি ?
(১৩) পাঠ্যক্রম রচনার 'পরিবর্তনশীলতা'র নীতি কি ?
(১৪) মাধ্যমিক স্তরের বর্তমান পাঠ্যক্রমের মূল কাঠামো উল্লেখ কর।

শিক্ষকতার কাজ ও গুণাবলী :

(১) আদর্শ শিক্ষকের পাঁচটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।
(২) শিক্ষকের জ্ঞানস্পৃহা থাকা উচিত কেন ?
(৩) 'শিক্ষক হবেন পিতার বিকল্প'—কথাটির তাৎপর্য কি ?
(৪) "শিক্ষক শিক্ষার্থীর বন্ধু, নির্দেশক এবং জীবনাদর্শ"—কথাটির তাৎপর্য কি ?
(৫) আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের যে কোন দুটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ কর।
(৬) প্রধান শিক্ষককে পাঠদান ছাড়া অন্য যে কাজগুলি করতে হয়, সেগুলি উল্লেখ কর।
(৭) শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা কিরূপ হওয়া উচিত ?
(৮) শিক্ষকের নির্দেশনামূলক দায়িত্ব কি ?

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা :

(১) আধুনিক অর্থে শৃঙ্খলার একটি সংজ্ঞা দাও।
(২) মুক্ত শৃঙ্খলা কি ?
(৩) স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা কি ?
(৪) শৃঙ্খলা ও শাসনের পার্থক্য কি ?
(৫) বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনের পথে দুটি পরিবেশগত বাধার কথা উল্লেখ কর।
(৬) বিদ্যালয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দুটি ব্যক্তিগত কারণ নির্দেশ কর।
(৭) বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-স্থাপনে শিক্ষকের নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার ভূমিকা কি ?
(৮) শৃঙ্খলা ও বিধানের মধ্যে পার্থক্য কি ?
(৯) শিশুর স্বাধীনতা থাকা উচিত কেন ?
(১০) শৃঙ্খলার সঙ্গে স্বাধীনতা কিভাবে যুক্ত থাকে ?

বিদ্যালয়ের শৃংখলা ও স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা :

(১) মনিটর প্রথা কি ?
(২) স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা কি ?
(৩) স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা ও স্বতঃস্ফূর্ত শৃংখলার সম্পর্ক কি ?
(৪) বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দুটি সুবিধার কথা উল্লেখ কর।
(৫) কয়েকটির স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থার নাম উল্লেখ কর।
(৬) নগরানুরূপ স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা কি ?
(৭) শিক্ষার্থী-পরিষদ গঠনের সপক্ষে দুটি যুক্তি দাও।
(৮) শিক্ষার্থী-পরিষদের দুটি কাজ সম্পর্কে উল্লেখ কর।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী :

(১) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীকে বহিঃশ্রেণীগত কার্যাবলী বলা হয় কেন ?
(২) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী কিভাবে শিক্ষামূলক নির্দেশনার কাজে সহায়তা করে ?
(৩) সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজ কাকে বলে ?
(৪) সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজ পরিচালনা করার অসুবিধাগুলি কি ?
(৫) সহপাঠ্যক্রমিক কাজ কাকে বলে ?
(৬) শিক্ষামূলক সহপাঠ্যক্রমিক দুটি কাজের নাম উল্লেখ কর।
(৭) শরীরচর্চামূলক সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী কি ?
(৮) সহপাঠ্যক্রমিক সামাজিক উপযোগিতা কি ?

পরীক্ষা গ্রহণ :

(১) পরীক্ষার দুটি উপযোগিতার কথা উল্লেখ কর।
(২) পরীক্ষা কিভাবে শিক্ষকের দক্ষতার উন্নতি করে ?
(৩) শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে কি পরীক্ষার দ্বারা উন্নতি করা যায়
(৪) নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা কি ?
(৫) রচনাধর্মী পরীক্ষা কি ?
(৬) নির্ণায়ক পরীক্ষা বলতে কি বোঝায় ?
(৭) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন কি ?
(৮) কিউমুলেটিভ রেকর্ড-এ কোন্ কোন্ বিষয়ের তথ্য সংরক্ষণ করা হয় ?
(৯) বহিঃসংস্থা পরিচালিত পরীক্ষা কাকে বলে ?
(১০) পরীক্ষা ও মূল্যায়নের পার্থক্য কি ?
(১১) বহু নির্বাচনী অভীক্ষা ও সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষার উদাহরণ দাও।
(১২) পরীক্ষা-গ্রহণের দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ কর।
(১৩) রচনাধর্মী পরীক্ষার চারটি ত্রুটি উল্লেখ কর।
(১৪) নৈর্ব্যক্তিক বা বহুমুখী প্রশ্নের চারটি উদাহরণ দাও।